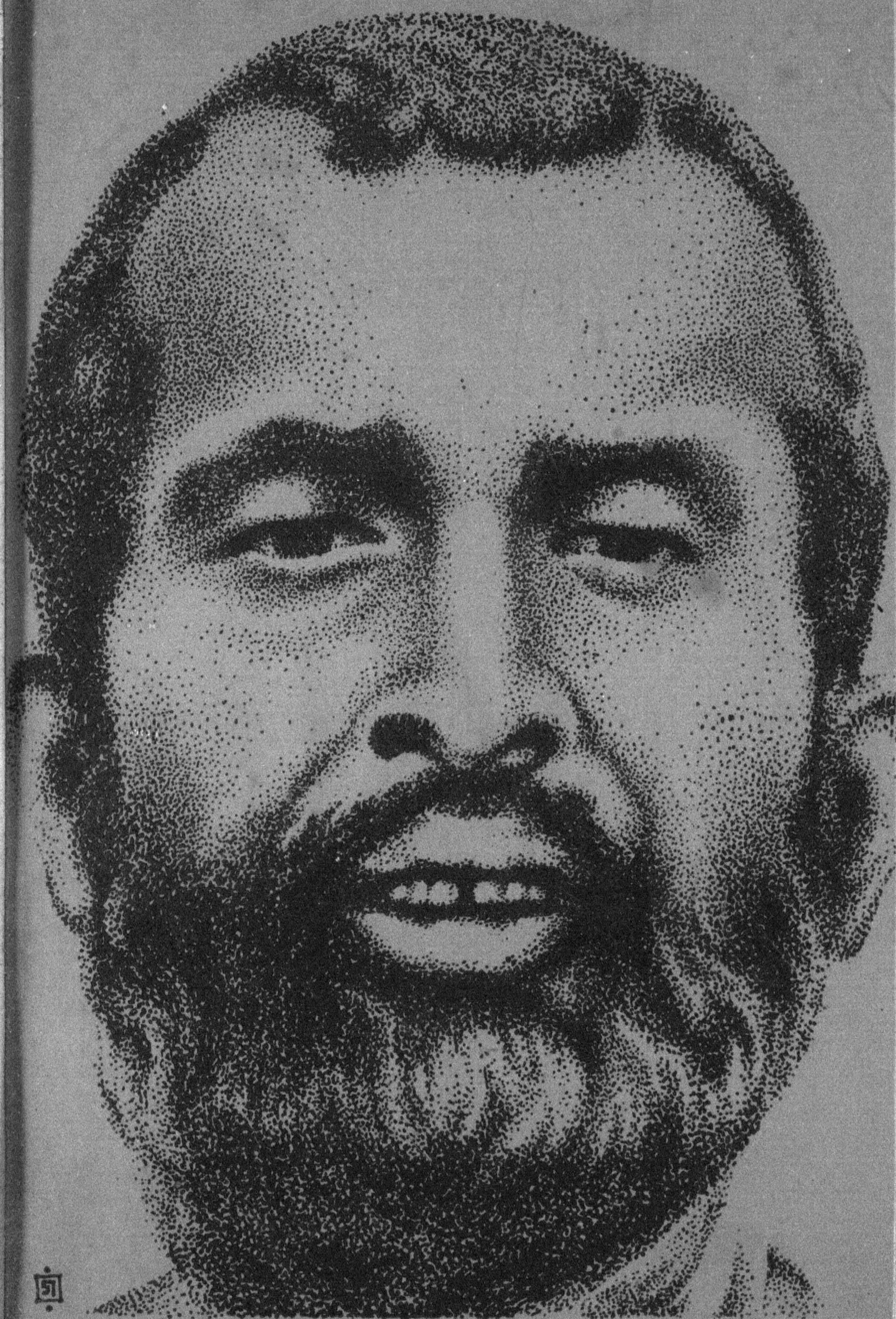
শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত অভিধান

ডঃ নীরদবরণ হাজরা



মণ্ডল বুক হাউস ॥ ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯



প্রথম প্রকাশ
শুভ ১লা বৈশাখ ১৩৯৩ সন

প্রকাশক
শ্রীসুনীল মণ্ডল
৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ শিল্পী
শ্রীগণেশ বসু
৫৯৫ সারকুলার রোড
হাওড়া-৪

ব্লক
মডার্ণ প্রসেস
কলেজ রো
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ইম্প্রেসন্ হাউস
৬৪ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট
কলকাতা-৯

মুদ্রক
শ্রীবংশীধর সিংহ
বাণী মুদ্রণ
১২ নরেন সেন স্কোয়ার
কলকাতা-৯ ।

শ্রীঅজিত দাসকে

সাহিত্যব্রতী হিসাবে নিষ্ঠা, সততা, সামাজিক
দৃষ্টিভঙ্গি এবং ক্লান্তিহীন শ্রম করবার
দীক্ষা লাভ করেছি যার দৃষ্টান্তে

এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

ইতিহাস ॥	বিদ্রোহ-বিপ্লব-স্বাধীনতা
আকর গ্রন্থ ॥	মঞ্চে আলোক-সম্পাত
	আবৃত্তি-কোষ
	ভাষণ-কোষ
সম্পাদিত গ্রন্থ ॥	কৃত্তিবাসী রামায়ণ
	কাশীদাসী মহাভারত।
কিশোর গ্রন্থ ॥	রামরহিমের বন্ধু
	কথাসরিৎ-সাগর
	সিন্দবাদের অভিযান
যন্ত্রস্থ ॥	শ্রীমদ্‌ভাগবত (পূর্ণাঙ্গ কাব্যানুবাদ)
	যুবমানস ঃ প্রতিজ্ঞা প্রস্তুতি প্রগতি
	মঞ্চে শব্দবিজ্ঞান ও শব্দ সংযোজন।
	তিন রসিকের রসস্পর্শ।

সূচীপত্র

নি বে দ ন

ক.

হিন্দুমাত্রেই বিশ্বাস করেন যে, যুগের প্রয়োজনে ধর্মকে নতুন করে ব্যাখ্যা ও সংস্কার করতে পরমাত্মার অংশ নিয়ে নররূপী দেবতার আবির্ভাব হয়। তাঁকেই বলা হয় অবতার। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ঊনবিংশ শতাব্দীর যুগ-বিবর্তনের কালে ধর্ম-সংস্থাপন করতে এসেছিলেন। এজন্য তাঁকেও বলা হয় অবতার। কেউ বলেন যুগাবতার।

হিন্দুধর্মের মধ্যে যে সার্বজনীনতা ও সুউচ্চ দার্শনিকতা রয়েছে, ঊনবিংশ শতকের ইউরোপীয় সভ্যতা ও খ্রীষ্টীয় ধর্মের সংঘাতে তা অনিকেত হয়ে উঠেছিল। এই সংঘাতকে আত্মস্থ করতে উদ্ভব হয়েছিল ব্রাহ্মসমাজের, আর্য সমাজের থিয়সফিস্ট্ সোসাইটির। এঁরা সকলেই নেতি নেতি করে অগ্রসর হয়েছেন। প্রত্যেকেই আচার-আচরণের বিধি-বিধানের গণ্ডি টেনে বর্জন করতে করতে সংস্কৃত করতে চেয়েছেন ধর্মকে—শুদ্ধ করতে চেয়েছেন। এর ফলে ব্যাষ্টির কোণা কেটে গোষ্ঠীই তৈরী হয়েছে। যুগসংকটকে বা সমাজকে সার্বিকভাবে আশ্রয় দেবার শক্তি তাঁদের ছিল না। অথচ এঁরা সামাজিক মঙ্গল চিন্তায় বা নিষ্ঠায় ঊণ ছিলেন না। হিন্দুসমাজের এক একটা পরিশুদ্ধ রূপ পরিকল্পনা করে তাকেই মূর্ত করতে চেয়েছিলেন এঁরা।

ঠিক এই কালেই ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব। তিনি অসীম আকাশের মতো এক উদার আমন্ত্রণ নিয়ে আবির্ভূত হলেন। বর্জন নয়—গ্রহণ হল তাঁর রীতি। নির্বাচন নয়, নির্বিচার আলিঙ্গন হ'ল তাঁর আচার। দার্শনিক সূক্ষ্মতা নয়—সরল বিশ্বাস হল তাঁর মন্ত্র। গঙ্গাজলের মতো সব আবিলতাকে গ্রহণ করেও ভক্তিস্রোতের মহিমায় তিনি সকলকে পরিশুদ্ধ করে নিতে চাইলেন। যুগের দ্বিধান্বিত মানসিকতা কাটাতে তিনি বললেন, যত মত, তত পথ। বললেন, ত্যাগই জীবনের ব্রত। নারদীয় ভক্তিই পাথেয়। কলিযুগে নামমাত্র সার।

দানবরাজ বলির মাথা যখন স্বর্গ ছাড়িয়েও অনেক অনেক উঁচুতে উঠে গেছিল, তখন সেই দানবকে দমন করতে আবির্ভাব হল যে অবতারের, তিনি এলেন বলির ঠিক বিপরীতে—বামন রূপে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিস্পর্ধী ভারতীয় ধর্ম-বিদেরাও বেদ-পুরাণ-স্মৃতি শাস্ত্রের মধ্যে ধর্ম-সত্যের সন্ধান করছিলেন পাণ্ডিত্যের আশ্রয়ে। আর তাই এই দ্বিবিধ পাণ্ডিত্যকে শাসন করতে যুগাবতারকে আসতে হল নিরক্ষর রূপে। সেই নিরক্ষরের মুখেই শোনা গেল সবচেয়ে বড় প্রত্যয়ের কথা। ধর্মসংঘাতের ভাবতরঙ্গে ডুবু ডুবু মানুষেরা ধরবার মতো আশ্রয় পেলেন। এমনি করে বললে বোধ হয় ভুল

বলা হবে না যে, যুগের বুভুক্ষা ও উৎকণ্ঠা নিয়ে এসে নরেন্দ্রনাথ ঐ নিরক্ষর গ্রাম্য পূজারী ব্রাহ্মণের ভাবসমুদ্রে ডুব দিয়ে লাভ করলেন যুগ-বিবেক এবং পরমানন্দ—তারই পরিণতিতে আমরাও লাভ করলাম বিবেকানন্দ। তিনি সমস্ত বলির দর্প দলিত করলেন। অবতার-স্পর্শে দলিত বলিরাও মুক্তি পেল।

সেদিন শ্রীশ্রী ঠাকুরের সৌরভে যে মধুকরেরা তাঁর পাশে জমেছিলেন, শ্রীম তাদের মধ্যে এক আশ্চর্য পুরুষ। কালের দেবতা তাকে দিয়ে এক অসাধারণ কাজ করিয়ে নিলেন। তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সান্নিধ্যর দিনগুলির স্মৃতি ও বিবরণ শ্রুতি-ধরের মতো সঞ্চয় করে রাখতেন মনের মণিমঞ্জুষায়। প্রথম অবসরেই তা লিপিবন্ধ করে ফেলতেন। আমরা পৃথিবীর ধর্মবেত্তাদের উপদেশাবলীর এমন **Direct and Recorded on the same day** উপাদান খুব কম পাই। শ্রীমর 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' ঠাকুরকে আজও আমাদের সামনে জীবন্ত করে রেখেছে। এ গ্রন্থ পড়তে পড়তে স্বর ও ভঙ্গিমা সহ ঠাকুর যেন মানসচক্ষে মূর্ত হয়ে ওঠেন। ভাগ্যহীন আমাদের জন্য যিনি এই আনন্দস্বরূপকে চিরজীবী করে রেখেছেন, তাঁকেও সহস্র কোটি প্রণাম।

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' পড়তে গেলে বোঝা যায় নিরক্ষর গদাধর ভারতীয় সর্ব-শাস্ত্র কি গভীরভাবেই আত্মস্থ করেছিলেন। বাঙলাদেশের সহজ জীবনযাত্রা ও পরিবেশ থেকে নিতান্ত সাধারণ উপমাবস্তু গ্রহণ করে কি গভীর তত্ত্বকেই না তিনি অতি সহজবোধ্যরূপে উপস্থিত করেছেন। তত্ত্ব প্রতিটি ক্ষেত্রে উপলব্ধির সত্তায় সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে। তাইত তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে কেশব সেন থেকে নরেন্দ্র-নাথ রাখাল—সকলেই অনিকেততা কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন। সেকালের সর্বশাস্ত্র-মন্থনবীর বিদ্যাসাগরকেও বলতে হয়, আপনার কাছে আজ নতুন করে শিখলাম। পণ্ডিতেরও পণ্ডিত শ্রীশ্রীঠাকুরের এই অমৃতবাণীকে উপযুক্ত ভাবে অধ্যয়ন, অনুশীলন ও ব্যবহার আমাদের জীবনেও অমৃতের স্পর্শ এনে দিতে পারে।

শ্রীম-কথিত পাঁচখণ্ড কথামৃতকে এমনি ব্যবহারিক প্রয়োজনে লাগাবার পক্ষে বাধা গ্রন্থটির আঙ্গিক বা **Form**। গ্রন্থটি ডাইরির আকারে লেখা। শ্রী-মর উপস্থিতিতে শ্রীশ্রীঠাকুর যেদিন যে প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন, সেদিন সে প্রসঙ্গই যতদূর সম্ভব বাস্তবানুগ রূপে লিপিবন্ধ করা হয়েছে। এ যেন সেদিনের অভিনীত নাটকের পাণ্ডুলিপি। এই গুণেই কথামৃত আমাদের মনে সেদিনের দৃশ্যপট, কুশীলব, তাদের ভাষণ ক্রিয়া সহ সমগ্র দৃশ্যকে সজীব করে তুলতে পারে। অথচ এই গুণটিই ব্যবহারিক দিক থেকে প্রয়োগের বাধা।

শ্রী-ম কথিত কথামৃত বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, সেখানে আলোচনার কোন নির্দিষ্ট ক্রম নেই। যেদিন সমবেত জন যে প্রসঙ্গের সূত্রপাত করেছেন, সেদিন সেই প্রসঙ্গেই আলোচনা হয়েছে। ফলে একই বিষয়ে আলোচনা ছড়িয়ে আছে নানা স্থানে। কোথাও ভাবভঙ্গি এমনকি উপমাদিও অভিন্ন। আবার কোথাও সমবিষয়ে আলোচনা নানা স্থানে ছড়িয়ে থেকেও উপমার ভিন্নতায় ও উপস্থাপন বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র। ব্যবহারিক দিক থেকে প্রথম রীতির আলোচনা পুনরুক্তি মাত্র। একটি রেখে অন্যগুলি বাতিল করলে ব্যবহারিক প্রয়োজন বাড়ে। দ্বিতীয়

ক্ষেত্রে আলোচনাগুলি একস্থানে সন্নিবেশিত হওয়া দরকার। ইচ্ছামাত্রে প্রয়োজনীয় বিষয়কে সম্পূর্ণরূপে এবং অনাবশ্যক বর্জিত রূপে প্রস্তুত পেলেই ষোল আনা ব্যবহারিক প্রয়োজন মেটে। এই আকাঙ্ক্ষা থেকেই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত অভিধান পরিকল্পিত হয়েছে।

খ.

আলোচ্য গ্রন্থের তিনটি পর্ব বা খণ্ড। প্রথম খণ্ডে ঠাকুরের উপদেশ ও মতামতগুলিকে বিষয় অনুসারে বিন্যস্ত করা হয়েছে। বক্তব্যগুলিকে বিষয় অনুসারে নাম দিতে গিয়ে দেখা গেছে কোন কোন বিষয়ের একাধিক নামকরণ সম্ভব। এক্ষেত্রে সবকটি নামেই সূচক তৈরী করা হয়েছে। একটি সূচককে প্রধান ধরে সেখানে সমগ্র বাণী মুদ্রিত করা হয়েছে, অন্য সূচকে প্রধান-সূচকের নাম উল্লেখ করে, তা দেখবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর ফলে পাঠক কোন বিশেষ বাণীকে যে নামেই খুঁজুন, সহজেই সন্ধান পাবেন।

যে সব বাণী একই বাকভঙ্গিতে বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত ছিল, সে সব বাণী আমরা এক বারই মাত্র উল্লেখ করেছি। কিন্তু একই বিষয়ে বিভিন্ন দিনে বলা বাণীগুলি যখন বাকভঙ্গিতে ভিন্ন, বা বিষয়টির ভিন্ন ভিন্ন দিক নিয়ে আলোচিত হয়েছে, সেখানে আমরা একই সূচকের অধীনে সবগুলি বাণীকে ক, খ, ক্রমে সজ্জিত করেছি। এতে একদিকে পাঠক যেমন ঐ বিষয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের সমগ্র মতটিকে একস্থানে পাবেন, ঠিক তেমনি নিজের প্রয়োজনীয় মতটিকেও সহজেই হাতের কাছে প্রস্তুত পাবেন।

বাণীগুলির ব্যবহারিক উপযোগিতা বাড়াতে, আমরা অনুপূরক বক্তব্যগুলিকেও সূচকেয় তলায় দ্রষ্টব্য বলে উল্লেখ করেছি। উৎসাহী পাঠক পাতা উল্টে সেগুলি দেখলে বিষয় সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুরের সামগ্রিক অবধারণার পরিচয় পাবেন।

দ্বিতীয় ভাগ বা খণ্ড পরিপূর্ণভাবে শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণদেবের জীবনী সংক্রান্ত তথ্যে পূর্ণ। পাঠকের সুবিধার জন্য এই খণ্ডের প্রথমেই সূত্রাকারে শ্রীশ্রীঠাকুরের একটি জীবনতথ্য-পঞ্জী দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী অংশে ঠাকুরের নিজ মুখে বলা নিজ সম্পর্কিত তথ্যগুলি বিষয়ের নামানুসারে বর্ণানুক্রমে সাজান হল। ঠাকুরের জীবন সংক্রান্ত নানা তথ্য সঞ্চয়ের সঙ্গে এই অংশ আত্মজীবনী পাঠেরও আনন্দ দেবে। রামকৃষ্ণদেবের অননুকরণীয় ভাষায় আত্মকথনে এক ভিন্নজাতের রস-সম্ভোগ সম্ভব।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পড়তে বসলে আমরা বহু ব্যক্তি ও চরিত্রের নামের সম্মুখীন হই, যারা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্ত পরিকর, গুনমুগ্ধ বা মাত্র কৌতূহল বশে আগত। শ্রীশ্রীঠাকুরও নানা সময়ে নানা জনের উল্লেখ করেন। এদের পরিচয় না জানলে কথামৃতের সামগ্রিক রসসম্ভোগ সম্ভব নয়। অথচ এঁদের অনেকের সম্পর্কে আমরা সামান্যই জানি, কারো সম্পর্কে কিছুই জানি না। এমন কি অনেকের নাম পর্যন্ত শুনি নি। এমন রামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যপ্রাপ্ত বা উল্লেখিত ব্যক্তির পরিচয় ও সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী সংকলিত হয়েছে তৃতীয়পর্বে।

এই গ্রন্থকে পরিপূর্ণ করতে আরও কয়েকটি খণ্ড বা ভাগের পরিকল্পনা আমার ছিল। যেমন,

১. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব যে সব গান গাইতেন, শুনতেন এবং শুনতে ভালবাসতেন, তার তালিকা, পরিচয় ও কথা।

২. শ্রীশ্রীঠাকুর যে সব বাড়িতে বাস করেছেন তার পরিচয় ও বর্ণনা।

আমার গ্রন্থাগারিক সুহৃদ বিশ্বনাথ সিংহের দাবী ছিল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্পর্কিত একটি গ্রন্থতালিকা ও পরিচয়ও এতে সংযোজন করা হোক।

এ তিনটি বিষয়ে কাজ শুরু করেছিলাম। কিন্তু বোধ হল, সব একত্রিত করলে গ্রন্থমূল্য এবং কলেবর দুই-বৃদ্ধি হবে। বিশেষতঃ উল্লেখিত বিষয়গুলি প্রথমতঃ সর্ব সাধারণের আগ্রহের বিষয় নয়—এগুলি গবেষকের আগ্রহের বিষয়; দ্বিতীয়তঃ এগুলি বর্তমান গ্রন্থের নামের অন্তর্গত হওয়াও বিধেয় নয়। এজন্য এগুলিকে স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশের আশা রইল।

আলোচ্য গ্রন্থে আমরা যে বর্ণানুক্রম অনুসরণ করেছি তা হল : অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, এ, ঐ, ও, ঔ, ং, ঃ, ঁ, ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, ট, ঠ, ড, (ড়) ঢ (ঢ়) ণ, ত, থ, দ, ধ, ন, প, ফ, ব, ভ, ম, য, (য়) র, ল, শ, ষ, স, হ।

পারিবারিক দুর্বিপাকে জড়িয়ে পড়ে আমি এ গ্রন্থ মুদ্রণের প্রথম দিকে প্রকাশকের সহায়তা করতে পারিনি। এর ফলে ১, ১২, ২২ ও ৩১ পৃষ্ঠায় বড় হরফে অনাবশ্যকভাবে আছি, আ-ই, আকবর শা—ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, ঈশ্বর-এক—ঈশ্বর-ভক্ত, ঈশ্বর ভক্তবৎসল—ঈশ্বরের হাসি কথাগুলি মুদ্রিত হয়েছে। পাঠককে শব্দগুলি মুদ্রিত নেই ভেবে নিতে অনুরোধ করব।

প্রকাশক হিসাবে সুনীলবাবু যে যত্ন এবং সতর্কতা অবলম্বন করেন, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। বিশেষতঃ এমন একটি অ-ব্যবসায়িক গ্রন্থ-প্রকাশের ঝুঁকি নেওয়ার দুঃসাহস যার, তাকে কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে পথ নেই। তবু দু-চারটে ত্রুটি থেকে গেল। সহৃদয় পাঠক ত্রুটি নির্দেশ করে পত্র বা গ্রন্থের পরিমার্জনে পরামর্শ দিলে কৃতজ্ঞ থাকব।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব সকলের মঙ্গল করুন—এই প্রার্থনা জানিয়ে শেষ করছি। ইতি—

অঙ্গনা। কৃষ্ণনগর। নদীয়া
২৫শে চৈত্র, ১৩৯২
[৮ এপ্রিল, ১৯৮৬]

নীরদবরণ হাজরা

● প্রথম ভাগ ●

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত
অভিধান

[শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ ও বাণীর বিষয় অনুসারে বর্ণানুক্রমিক সজ্জা]

তব কথামৃতম্ তপ্তজীবনম্ কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততম, ভুবি গৃণন্তি যে ভুরিদা জনাঃ ॥
॥ শ্রীমদ্ভাগবত ॥

অছি। অহংকার ত্যাগ না করলে ঈশ্বরের কৃপা হয় না।

কর্মের বাড়িতে যদি একজনকে ভাঁড়ারী করা যায়, যতক্ষণ ভাঁড়ারে সে থাকে ততক্ষণ কর্তা আসে না। যখন সে নিজে ইচ্ছা ক'রে ভাঁড়ার ছেড়ে চলে যায়, তখনই কর্তা ঘরে চাবি দেয় ও নিজে ভাঁড়ারের বন্দোবস্ত করে।

নাবালকেরই অছি। ছেলেমানুষ নিজে বিষয় রক্ষা করতে পারে না, রাজা ভার ল'ন। অহংকার ত্যাগ না করলে ঈশ্বর ভার লন না।

বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীনারায়ণ ব'সে আছেন, হঠাৎ নারায়ণ উঠে দাঁড়ালেন। লক্ষ্মী পদসেবা করছিলেন; বললেন, 'ঠাকুর কোথা যাও?' নারায়ণ বললেন, 'আমার একটি ভক্ত বড় বিপদে পড়েছে তাই তাকে রক্ষা করতে যাচ্ছি!' এই ব'লে নারায়ণ বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার ফিরলেন। লক্ষ্মী বললেন, 'ঠাকুর এত শীঘ্র ফিরলেন যে?' নারায়ণ হেসে বললেন, 'ভক্তটি প্রেমে বিহ্বল হয়ে পথে চলে যাচ্ছিল, ধোপারা কাপড় শুকাতে দিছ্‌ল, ভক্তটি মাড়িয়ে যাচ্ছিল। দেখে ধোপারা লাঠি লয়ে তাকে মারতে যাচ্ছিল। তাই আমি তাকে রক্ষা করতে গিয়েছিলাম।' লক্ষ্মী আবার বললেন, 'ফিরে এলেন কেন?' নারায়ণ হাসতে হাসতে বললেন, 'সে ভক্তটি নিজে ধোপাদের মারবার জন্য ইট তুলেছে দেখলাম। তাই আর আমি গেলাম না।'

অজ্ঞান। যতক্ষণ বোধ যে ঈশ্বর সেথা সেথা, ততক্ষণ অজ্ঞান। যখন হেথা হেথা, তখনই জ্ঞান।

একজন তামাক খাবে, ত প্রতিবেশীর বাড়ি টিকে ধরাতে গেছে। রাত অনেক হয়েছে। তারা ঘুমিয়ে পড়েছিল। অনেকক্ষণ ধ'রে ঠেলাঠেলি করবার পর, একজন দোর খুলতে নেমে এলো। লোকটির সঙ্গে দেখা হ'লে সে জিজ্ঞাসা করলে, কি গো, কি মনে ক'রে? সে বললে, আর কি মনে করে, তামাকের নেশা আছে, জান ত; টিকে ধরাব মনে করে। তখন সেই লোকটি বললে, বাঃ তুমি ত বেশ লোক! এত কষ্ট ক'রে আসা, আর দোর ঠেলাঠেলি। তোমার হাতে যে লণ্ঠন রয়েছে।

যা চায়, তাই কাছে। অথচ লোকে নানাস্থানে ঘুরে।

দ্রঃ 'জ্ঞান-অজ্ঞান'॥ ব্রহ্ম ঃ জ্ঞান-অজ্ঞান॥

অজ্ঞান-জ্ঞান-বিজ্ঞান। জীব প্রথমে অজ্ঞান হ'য়ে থাকে। ঈশ্বর বোধ নাই, নানা জিনিস বোধ—অনেক জিনিস বোধ। যখন জ্ঞান হয় তখন তার বোধ হয় যে ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন। যেমন পায়ে কাঁটা ফুটেছে, আর একটি কাঁটা যোগাড় করে এনে এ কাঁটাটি তোলা। অর্থাৎ জ্ঞান কাঁটা দ্বারা অজ্ঞান কাঁটা তুলে ফেলা। আবার বিজ্ঞান হলে দুই কাঁটাই ফেলে দেওয়া—অজ্ঞান কাঁটা এবং জ্ঞান কাঁটা।

তখন ঈশ্বরের সঙ্গে নিশিদিন কথা, আলাপ হচ্ছে—শুধু দর্শন নয়।
যে দুধের কথা কেবল শুনেছে সে অজ্ঞান; যে দুধ দেখেছে তার জ্ঞান হয়েছে। যে দুধ খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে তার বিজ্ঞান হয়েছে।

অজ্ঞানী ও জ্ঞানী। যারা অজ্ঞান, ঈশ্বরকে মানে না, অথচ সংসারে আছে, তারা যেন মাটির ঘরের ভিতর বাস করে। ক্ষীণ আলোতে শুধু ঘরের ভিতরটি দেখতে পায়। কিন্তু যারা জ্ঞান লাভ করেছে, ঈশ্বরকে জেনেছে, তারপর সংসারে আছে, তারা যেন শার্সির ঘরের ভিতর বাস করে। ঘরের ভিতরও দেখতে পায়, ঘরের বাহিরের জিনিসও দেখতে পায়। জ্ঞান-সূর্যের আলো ঘরের ভিতরে খুব প্রবেশ করে। সে ব্যক্তি ঘরের ভিতরের জিনিস খুব স্পষ্টরূপে দেখতে পায়,—কোন্‌টি ভাল, কোন্‌টি মন্দ, কোন্‌টি নিত্য, কোন্‌টি অনিত্য।

অদ্বৈতম্‌। যিনিই ব্রহ্ম তিনিই আদ্যাশক্তি। একজন রাজা বলেছিল যে, আমায় এক কথায় জ্ঞান দিতে হবে। যোগী বললে, আচ্ছা তুমি এক কথাতেই জ্ঞান পাবে। খানিকক্ষণ পরে রাজার কাছে হঠাৎ একজন যাদুকর এসে উপস্থিত। রাজা দেখলে, সে এসে কেবল দুটো আঙ্গুল ঘুরাচ্ছে, আর বলছে, 'রাজা, এই দেখ, এই দেখ।' রাজা অবাক্‌ হয়ে দেখছে। খানিকক্ষণ পরে দেখে দুটো আঙ্গুল একটা আঙ্গুল হয়ে গেছে। যাদুকর একটা আঙ্গুল ঘোরাতে ঘোরাতে বলছে, 'রাজা এই দেখ, রাজা এই দেখ।' অর্থাৎ ব্রহ্ম আর আদ্যাশক্তি প্রথম দুটা বোধ হয়। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান হলে আর দুটা থাকে না। অভেদ! এক! যে একের দুই নাই। অদ্বৈতম্‌।

দ্রঃ শক্তির অভেদ। ব্রহ্ম ও আদ্যাশক্তি। ব্রহ্ম খ।

অধিকারীভেদ। কি জানো, রুচিভেদ, আর যার যা পেটে সয়। তিনি নানা ধর্ম নানা মত করেছেন—অধিকারী বিশেষের জন্য। সকলে ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী নয়, তাই আবার তিনি সাকার পূজার ব্যবস্থা করেছেন। মা ছেলেদের জন্য বাড়িতে মাছ এনেছে। সেই মাছে ঝোল, অম্বল ভাজা আবার পোলাও করলেন। সকলের পেটে কিন্তু পোলাও সয় না; তাই কারু কারু জন্য মাছের ঝোল করেছেন,—তারা পেট রোগা। আবার কারু সাধ অম্বল খায়, বা মাছ ভাজা খায়। প্রকৃতি আলাদা—আবার অধিকারী ভেদ।

অধ্যাত্ম রামায়ণ। দ্রঃ 'কেশব সেন প্রথম জ্ঞান…'

'অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তঃ'। শোনো! আলো জ্বাল্লে বাদুলে পোকার অভাব হয় না! তাঁকে লাভ কল্লে তিনি সব জোগাড় করে দেন—কোন অভাব রাখেন না। তিনি হৃদয় মধ্যে এলে সেবা করবার লোক অনেক এসে জোটে।
একটি ছোক্‌রা সন্ন্যাসী গৃহস্থবাড়ী ভিক্ষা করতে গিছলো। সে আজন্ম সন্ন্যাসী। সংসারের বিষয় কিছু জানে না। গৃহস্থের একটি যুবতী মেয়ে এসে ভিক্ষা দিলে। সন্ন্যাসী বল্লে, মা এর বুকে কি ফোড়া হয়েছে? মেয়েটির মা বল্লে, না বাবা! ওর পেটে ছেলে হবে বলে ঈশ্বর স্তন করে দিয়েছেন—ঐ স্তনের দুধ ছেলে খাবে। সন্ন্যাসী তখন বল্লে, তবে আর ভাবনা কি? আমি আর কেন ভিক্ষা করবো? যিনি আমায় সৃষ্টি করেছেন তিনি আমায় খেতে

দেবেন।

শোনো। যে উপপতির জন্য সব ত্যাগ করে এলো, সে বলবে না ; শ্যালা তোর বুকে বসবো আর খাবো।

অনন্ত পথ। ক. অনন্ত পথ—তার মধ্যে জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি—যে পথ দিয়া যাও, আন্তরিক হলে ঈশ্বরকে পাবে।

দ্র. প্রতিপাদ্য ঃ সচ্চিদানন্দ।

খ. অভাবমুখ চৈতন্য আর ভাবমুখ চৈতন্য। ভাব ভক্তি একটি পথ আছে ; আর অভাবের একটি আছে। তুমি অভাবের কথা বলছ। কিন্তু 'সে বড় কঠিন ঠাঁই গুরু-শিষ্যে দেখা নাই।' জনকের কাছে শুকদেব ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশের জন্য গেলেন। জনক বললেন, 'আগে দক্ষিণা দিতে হ'বে,—তোমার ব্রহ্মজ্ঞান হ'লে আর দক্ষিণা দেবে না, কেন না তখন গুরুশিষ্যে ভেদ থাকে না।'

ভাব অভাব সবই পথ। অনন্ত মত অনন্ত পথ। কিন্তু একটি কথা আছে। কলিতে নারদীয় ভক্তি—এই বিধান। এ পথে প্রথমে ভক্তি, ভক্তি পাকলে ভাব, ভাবের চেয়ে উচ্চ মহাভাব আর প্রেম। মহাভাব আর প্রেম জীবের হয় না। যার তা হয়েছে তার বস্তুলাভ অর্থাৎ ঈশ্বরলাভ হয়েছে।

অনন্তের স্পর্শ। শ্রীরামকৃষ্ণ (ত্রৈলোক্যের প্রতি) অনন্ত ছুঁতে চাও কেন? তোমাকে ছুঁলে কি তোমার সব শরীরটা ছুঁতে হবে? যদি গঙ্গাস্নান করি তাহ'লে হরিদ্বার থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত কি ছুঁয়ে যেতে হবে? 'আমি গেলে ঘুচিবে জঞ্জাল'। যতক্ষণ 'আমি'টুকু থাকে ততক্ষণ ভেদবুদ্ধি। 'আমি' গেলে কি রইল তা কেউ জানতে পারে না,—মুখে বলতে পারে না। যা আছে তাই আছে। তখন খানিকটা এঁতে প্রকাশ হয়েছে আর বাদ বাকিটা ওখানে প্রকাশ হয়েছে,—এ সব মুখে বলা যায় না। সচ্চিদানন্দ সাগর।—তার ভিতর 'আমি' ঘট। যতক্ষণ ঘট ততক্ষণ যেন দুভাগ জল,—ঘটের ভিতরে এক ভাগ, বাহিরে এক ভাগ। ঘট ভেঙ্গে গেলে—এক জল—তাও বলবার যো নাই।—কে বলবে?

অনাসক্ত। তাঁকে চিন্তা যত ক'রবে, ততই সংসারের সামান্য ভোগের জিনিসে আসক্তি কমবে। তাঁর পাদপদ্মে যত ভক্তি হবে, ততই বিষয়বাসনা কম প'ড়ে আসবে, ততই দেহের সুখের দিকে নজর ক'মবে ; পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ বোধ হবে, নিজের স্ত্রীকে ধর্মের সহায় বন্ধু বোধ হবে, পশুভাব চ'লে যাবে, দেবভাব আসবে, সংসারে একেবারে অনাসক্ত হ'য়ে যাবে। তখন সংসারে যদিও থাকো জীবন্মুক্ত হ'য়ে বেড়াবে। চৈতন্যদেবের ভক্তেরা অনাসক্ত হ'য়ে সংসারে ছিল।

অনাসক্ত হওয়া কঠিন। কামিনী-কাঞ্চনের ভিতরে থেকে কি করে হবে? অনাসক্ত হওয়া বড় কঠিন। একদিকে মেগের দাস, একদিকে টাকার দাস, আর একদিকে মনিবের দাস, তাদের চাকরী করতে হয়।

অনাসক্তি। ক. কর্ম একেবারে ত্যাগ করবার যো নাই। তোমার প্রকৃতিতে তোমায় কর্ম করাবে। তা তুমি ইচ্ছা কর আর নাই কর। তাই ব'লেছে অনাসক্ত হ'য়ে কর্ম কর। অনাসক্ত হ'য়ে কর্ম করো ;—কি না, কর্মের ফল আকাঙ্ক্ষা ক'রবে না। যেমন পূজা জপ তপ ক'রছো, কিন্তু লোকমান্য হবার জন্য নয় কিম্বা

পুণ্য করবার জন্য নয়।

এরূপ অনাসক্ত হ'য়ে কর্ম করার নাম **কর্মযোগ**। ভারী কঠিন। একে কলিযুগ, সহজেই আসক্তি এসে যায়। মনে করছি অনাসক্ত হ'য়ে কাজ করছি কিন্তু কোন দিক দিয়ে আসক্তি এসে যায়, জানতে দেয় না। হয়তো পূজা মহোৎসব করলুম, কি অনেক গরীব কাঙ্গালদের সেবা করলুম—মনে করলুম যে, অনাসক্ত হ'য়ে করছি, কিন্তু কোন্ দিক দিয়ে লোকমান্য হবার ইচ্ছা হয়েছে, জানতে দেয় না। তবে একেবারে অনাসক্ত হওয়া সম্ভব কেবল তাঁর, যাঁর ঈশ্বর দর্শন হয়েছে।

খ. ঐশ্বর্য থাকলেই যে তাতে আসক্ত হতেই হবে, এমন কিছু নয়। শম্ভু (মল্লিক) বলত, 'হৃদু, পোঁটলা বেঁধে বসে আছি।' আমি বলতাম কি অলক্ষণে কথা কও!—

তখন শম্ভু বলে, 'না,—বলো, এ সব ফেলে যেন তাঁর কাছে যাই।'

অনাহত শব্দ। ক. শব্দ ব্রহ্ম, ঋষি মুনিরা ওই শব্দ লাভের জন্য তপস্যা করতেন। সিদ্ধ হলে শুনতে পায়, নাভি থেকে ঐ শব্দ আপনি উঠছে—অনাহত শব্দ।

একমতে, শুধু শব্দ শুনলে কি হবে? দূর থেকে শব্দ-কল্লোল শোনা যায়। সেই শব্দ-কল্লোল ধরে গেলে সমুদ্রে পেঁাছান যায়। যে কালে কল্লোল আছে সে কালে সমুদ্রও আছে। অনাহত ধ্বনি ধ'রে ধ'রে গেলে তার প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম তাঁর কাছে পেঁাছান যায়। তাঁকেই **পরমপদ** বলেছে। 'আমি' থাকতে ওরূপ দর্শন হয় না। যেখানে 'আমি'ও নাই, 'তুমি'ও নাই, একও নাই অনেকও নাই; সেই-খানেই এই দর্শন।

খ. অনাহত শব্দ সর্বদাই এমনি হ'চ্ছে। প্রণবের ধ্বনি। পরব্রহ্ম থেকে আসছে, যোগীরা শুনতে পায়। বিষয়াসক্ত জীব শুনতে পায় না। যোগী জানতে পারে যে, সেই ধ্বনি একদিকে নাভি থেকে উঠে ও আর একদিকে সেই ক্ষীরোদশায়ী পরব্রহ্ম থেকে উঠে।

অনুরাগ। অনুরাগ হলে ঈশ্বর লাভ হয়। খুব ব্যাকুলতা চাই। খুব ব্যাকুলতা হলে সমস্ত মন তাঁতে গত হয়।

একজনের একটি মেয়ে ছিল। খুব অল্পবয়সে মেয়েটি বিধবা হয়ে গিছিল। স্বামীর মুখ কখনও দেখে নাই। অন্য মেয়ের স্বামী আসে দেখে। সে একদিন বললে, বাবা, আমার স্বামী কই? তাঁর বাবা বললে, গোবিন্দ তোমার স্বামী; তাঁকে ডাকলে তিনি দেখা দেন। মেয়েটি ঐ কথা শুনে ঘরে দ্বার দিয়ে গোবিন্দকে ডাকে আর কাঁদে;—বলে, গোবিন্দ! তুমি এস, আমাকে দেখা দাও, তুমি কেন আসছো না। ছোট মেয়েটির সেই কান্না শুনে ঠাকুর থাকতে পারলেন না; তাকে দেখা দিলেন।

দ্রঃ অভ্যাস ও অনুরাগ।

অনুরাগ (গোপীদের)। আহা, গোপীদের কি অনুরাগ! তমাল দেখে একেবারে প্রেমোন্মাদ। শ্রীমতীর এরূপ বিরহানল যে চক্ষের জল সে আগুনের ঝাঁঝে শুকিয়ে যেতো—জল হ'তে হ'তে বাষ্প হয়ে উড়ে যেতো। কখনও কখনও তাঁর

ভাব কেউ টের পেত না। সায়ের দীঘিতে হাতী নামলে কেউ টের পায় না।

অনুরাগ (অঞ্জন)। আবার আছে 'অনুরাগ অঞ্জন'। শ্রীমতী বলেছেন, 'সখি চতুর্দিক কৃষ্ণময় দেখছি!' তারা বললে, 'সখি অনুরাগ-অঞ্জন চোখে দিয়েছ তাই ঐরূপ দেখছো।' এরূপ আছে যে, ব্যাঙের মুন্ডু পুড়িয়ে কাজল তৈয়ার করে, সেই কাজল চোখে দিলে চারিদিক সর্পময় দেখে।

অনুরাগ (বাঘ)। বাঘ যেমন কপ কপ করে জানোয়ার খেয়ে ফেলে, তেমনি 'অনুরাগ বাঘ' কাম ক্রোধ এই সব রিপুদের খেয়ে ফেলে। ঈশ্বরে একবার অনুরাগ হলে কামক্রোধাদি থাকে না। গোপীদের ঐ অবস্থা হয়েছিল। কৃষ্ণে অনুরাগ।

অনুরাগ (প্রথম অবস্থা)। কি অবস্থা সব গেছে! দেশে চিনে শ্যাঁকারী আর আর সমবয়সীদের বললাম, ওরে তোদের পায়ে পড়ি একবার হরিবোল বল। সকলের পায়ে পড়তে যাই! তখন চিনে বললে, ওরে তোর এখন প্রথম তাই সব সমান বোধ হয়েছে। প্রথম ঝড় উঠলে যখন ধুলো উড়ে তখন আম-গাছ তেঁতুল-গাছ সব এক বোধ হয়। এটা আম গাছ এটা তেঁতুল গাছ চেনা যায় না।

অনুলোম-বিলোম। দ্রঃ 'নেতি নেতি বিচার' আদ্যাশক্তি-খ

অন্তরে-বাইরে। অন্তরে বাইরে, দুই দেখছি। অখন্ড সচ্চিদানন্দ! সচ্চিদানন্দ কেবল একটা খোল আশ্রয় করে এই খোলের অন্তরে বাহিরে রয়েছেন। এইটি দেখছি।

অন্ধের হস্তিদর্শন। কেউ কেউ বলে, ঈশ্বর সাকার, তিনি নিরাকার নন। এই ব'লে আবার ঝগড়া। যে বৈষ্ণব, সে বেদান্তবাদীর সঙ্গে ঝগড়া করে।

যদি ঈশ্বর সাক্ষাৎ দর্শন হয়, তা হ'লে ঠিক বলা যায়। যে দর্শন করেছে, সে ঠিক জানে ঈশ্বর সাকার, আবার নিরাকার। আরো তিনি কত কি আছেন তা বলা যায় না।

কতকগুলো কাণা একটা হাতীর কাছে এসে পড়েছিল। একজন লোক ব'লে দিলে, এ জানোয়ারটির নাম হাতী। তখন কাণাদের জিজ্ঞাসা করা হ'ল হাতীটা কি রকম? তারা হাতীর গা স্পর্শ করতে লাগল। একজন বললে, 'হাতী একটা থামের মত!' সে কাণাটি কেবল হাতীর পা স্পর্শ করেছিল। আর একজন বললে, 'হাতীটা একটা কুলোর মত!' সে কেবল একটা কানে হাত দিয়ে দেখেছিল। এই রকম যারা শুঁড়ে কি পেটে হাত দিয়ে দেখেছিল তারা নানাপ্রকার বলতে লাগল। তেমনি ঈশ্বর সম্বন্ধে যে যতটুকু দেখেছে সে মনে করেছে, ঈশ্বর এমনি; আর কিছু নয়।

অপরাধ। অপরাধ সকলের হয় না। ঈশ্বরকোটির অপরাধ হয় না। যেমন চৈতন্যদেবের ন্যায় অবতারের।

ছেলে যদি বাপকে ধ'রে আলের উপর দিয়ে চলে, তা হলে বরং খানায় পড়তে পারে। কিন্তু বাপ যদি ছেলের হাত ধরে সে ছেলে কখনও পড়ে না।

শোনো, আমি মার কাছে শুদ্ধা ভক্তি চেয়েছিলাম। মাকে বলেছিলাম, এই লও তোমার ধর্ম এই লও তোমার অধর্ম; আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই লও তোমার

শুচি, এই লও তোমার অশুচি ; আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। মা এই লও তোমার পাপ, এই লও তোমার পুণ্য ; আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও।'

অবতার। ক. ঈশ্বর অনন্ত হউন আর যত বড় হউন,—তিনি ইচ্ছা করলে তাঁর ভিতরের সার বস্তু মানুষের ভিতর দিয়ে আসতে পারে ও আসে। তিনি অবতার হ'য়ে থাকেন, এটি উপমা দিয়ে বুঝান যায় না। অনুভব হওয়া চাই। প্রত্যক্ষ হওয়া চাই। উপমার দ্বারা কতকটা আভাস পাওয়া যায়। গরুর মধ্যে শিংটা যদি ছোঁয়, গরুকেই ছোঁয়া হলো ; পা'টা বা লেজটা ছুঁলেও গরুটাকে ছোঁয়া হলো। কিন্তু আমাদের পক্ষে গরুর ভিতরের সার পদার্থ হচ্ছে দুধ। সেই দুধ বাঁট দিয়ে আসে।

সেইরূপ প্রেম ভক্তি শিখাবার জন্য ঈশ্বর মানুষ দেহ ধারণ ক'রে সময়ে সময়ে অবতীর্ণ হন।

খ. মানুষে তিনি বেশী প্রকাশ। যদি বল অবতার কেমন ক'রে হবে, যাঁর ক্ষুধা তৃষ্ণা এই সব জীবের ধর্ম অনেক আছে, হয়ত রোগশোকও আছে ; তার উত্তর এই যে, 'পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম প'ড়ে কাঁদে।'

দেখ না রামচন্দ্র সীতার শোকে কাতর হ'য়ে কাঁদতে লাগলেন। আবার হিরণ্যাক্ষ বধ করবার জন্য বরাহ অবতার হ'লেন। হিরণ্যাক্ষ বধ হ'ল, কিন্তু নারায়ণ স্বধামে যেতে চান না। বরাহ হ'য়ে আছেন। কতকগুলি ছানাপোনা হয়েছে। তাদের নিয়ে এক রকম বেশ আনন্দে রয়েছেন। দেবতারা বললেন, এ কি হ'ল, ঠাকুর যে আসতে চান না। তখন সকলে শিবের কাছে গেল ও ব্যাপারটি নিবেদন ক'রলে। শিব গিয়া তাঁকে অনেক জেদাজেদি করলেন, তিনি ছানাপোনাদের মাই দিতে লাগলেন। (সকলের হাস্য)। তখন শিব ত্রিশূল এনে শরীরটা ভেঙ্গে দিলেন। ঠাকুর হিহি করে হেসে তখন স্বধামে চলে গেলেন।

দ্রঃ চৈতন্যদেব। ঈশ্বর দর্শন কি করা যায় ? (খ)

অবতার ঃ গাভীর বাঁট। তাঁর নানা লীলা, ঈশ্বরলীলা, দেবলীলা, নরলীলা, জগৎ-লীলা ; তিনি মানুষ হয়ে অবতার হয়ে যুগে যুগে আসেন, প্রেম ভক্তি শিখাবার জন্য। দেখ না চৈতন্যদেব। অবতারের ভিতরেই তাঁর প্রেম ভক্তি আস্বাদন করা যায়। তাঁর অনন্ত লীলা—কিন্তু আমার দরকার প্রেম, ভক্তি। আমার ক্ষীরটুকু দরকার। গাভীর বাঁট দিয়েই ক্ষীর আসে। অবতার গাভীর বাঁট।

অবতারতত্ত্ব। ক. ঈশ্বরের সব ধারণা কে করতে পারে ? তা তাঁর বড় ভাবটাও পারে না, আবার ছোট ভাবটাও পারে না। আর সব ধারণা করা কি দরকার ? তাঁকে প্রত্যক্ষ করতে পারলেই হলো। তাঁর অবতারকে দেখলেই তাঁকে দেখা হল। যদি কেউ গঙ্গার কাছে গিয়ে জল স্পর্শ করে, সে বলে—গঙ্গা দর্শন স্পর্শন ক'রে এলুম। সব গঙ্গাটা হরিদ্বার থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত, হাত দিয়ে ছুঁতে হয় না।

তোমার পাটা যদি ছুঁই, তোমায় ছোঁয়াই হ'ল।

যদি সাগরের কাছে গিয়ে একটু জল স্পর্শ করো, তাহলে সাগর স্পর্শ করাই হ'ল। অগ্নিতত্ত্ব সব জায়গায় আছে, তবে কাঠে বেশী।

খ. মানুষদেহ ধারণ ক'রে ঈশ্বর অবতীর্ণ হন। তিনি সর্বস্থানে সর্বভূতে আছেন বটে, কিন্তু অবতার না হলে জীবের আকাঙ্ক্ষা পূরে না, প্রয়োজন মেটে না। কি রকম জানো? গরুর যেখানটা ছোঁবে, গরুকে ছোঁয়াই হয় বটে। শিঙটা ছুঁলেও গাইটাকে ছোঁয়া হ'ল; কিন্তু গাইটার বাঁট থেকেই দুধ হয়।

দ্রঃ সাধু মহাত্মায় বিশ্বাস।

অবতার তত্ত্বে অবিশ্বাসের মূলে। ঈশ্বর অবতার হ'তে পারেন, এ কথা যে ওঁর 'সায়েন্স'-এ নাই। তবে কেমন ক'রে বিশ্বাস হয়?

একটা গল্প শোন—একজন এসে বললে, ওহে! ও পাড়ায় দেখে এলুম অমুকের বাড়ি হুড়মুড় ক'রে ভেঙ্গে পড়ে গেছে। যাকে ও কথা বললে, সে ইংরাজী লেখা-পড়া জানে। সে বললে, দাঁড়াও, একবার খপরের কাগজখানা দেখি। খপরের কাগজ পড়ে দেখে যে, বাড়ি ভাঙ্গার কথা কিছুই নাই। তখন সে ব্যক্তি বললে, ওহে তোমার কথায় আমি বিশ্বাস করি না। কই, বাড়ি ভাঙ্গার কথা তো খপরের কাগজে লেখা নাই। ও সব মিছে কথা।

অবতারাদি। অবতারাদি ঈশ্বরকোটি। তারা ফাঁকা জায়গায় বেড়াচ্ছে। তারা কখনও সংসারে বদ্ধ হয় না,—বন্দী হয় না। তাদের 'আমি' মোটা 'আমি' নয়—সংসারী লোকদের মত। সংসারী লোকদের অহঙ্কার, সংসারী লোকদের 'আমি' —যেন চতুর্দিকে পাঁচিল, মাথার উপর ছাদ;—বাহিরে কোন জিনিস দেখা যায় না। অবতারাদি 'আমি' পাতলা 'আমি'। এ 'আমি'র ভিতর দিয়ে ঈশ্বরকে সর্বদা দেখা যায়। যেমন একজন লোক পাঁচিলের একপাশে দাঁড়িয়ে আছে,—পাঁচিলের দুদিকেই অনন্ত মাঠ। সেই পাঁচিলের গায়ে যদি ফোকর থাকে পাঁচিলের ওধারে সব দেখা যায়। বড় ফোকর হ'লে আনাগোনাও হয়। অবতারাদির 'আমি' ঐ ফোকরওয়ালা পাঁচিল। পাঁচিলের এধারে থাকলেও অনন্ত মাঠ দেখা যায়;—এর মানে, দেহধারণ করলেও তারা সর্বদা যোগেতেই থাকে। আবার ইচ্ছে হ'লে বড় ফোকরের ওধারে গিয়ে সমাধিস্থ হয়। আবার বড় ফোকর হ'লে আনা-গোনা করতে পারে; সমাধিস্থ হ'লেও আবার নেমে আসতে পারে।

অবতারের আবির্ভাব। অগ্নিতত্ত্ব কাঠে বেশী। ঈশ্বরতত্ত্ব যদি খোঁজ, মানুষে খুঁজবে। মানুষে তিনি বেশী প্রকাশ হন। যে মানুষে দেখবে উর্জিতাভক্তি—প্রেমভক্তি উথলে পড়ছে—ঈশ্বরের জন্য পাগল—তাঁর প্রেমে মাতোয়ারা—সেই মানুষে নিশ্চিত জেনো, তিনি অবতীর্ণ হ'য়েছেন।

তিনি তো আছেনই, তবে তাঁর শক্তি কোথাও বেশী প্রকাশ, কোথাও বা কম প্রকাশ। অবতারের ভিতর তাঁর শক্তি বেশী প্রকাশ; সেই শক্তি কখন কখন পূর্ণভাবে থাকে। শক্তিরই অবতার।

দ্রঃ জগন্মাতার প্রকাশ।

অবধূতের গুরু। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে যে, অবধূত চব্বিশ গুরুর মধ্যে চিলকে একটি গুরু করেছিলেন। এক জায়গায় জেলেরা মাছ ধরছিলো, একটি চিল এসে একটা মাছ ছোঁ মেরে নিয়ে গেল। কিন্তু মাছ দেখে পেছনে পেছনে প্রায় এক

হাজার কাক চিলকে তাড়া ক'রে গেল ; আর সঙ্গে সঙ্গে কা কা ক'রে বড় গোলমাল ক'রতে লাগলো। মাছ নিয়ে চিল যে দিকে যায়, কাকগুলোও তাড়া ক'রে সেই দিকে যেতে লাগলো। দক্ষিণ দিকে চিলটা গেল, কাকগুলোও সেই দিকে গেল ; আবার উত্তর দিকে যখন সে গেল, ওরাও সেই দিকে গেল। এইরূপে পূর্ব দিকে ও পশ্চিম দিকে চিল ঘুরতে লাগলো। শেষে ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে ঘুরতে ঘুরতে মাছটা তার কাছ থেকে পড়ে গেল। তখন কাকগুলো চিলকে ছেড়ে মাছের দিকে গেল। চিল তখন নিশ্চিন্ত হ'য়ে একটা গাছের ডালের উপর বসলো। বসে ভাবতে লাগলো—ঐ মাছটা যত গোল করেছিল। এখন মাছ কাছে নাই আমি নিশ্চিন্ত হ'লুম।

অবধূত চিলের কাছে এই শিক্ষা ক'রলেন যে, যতক্ষণ সঙ্গে মাছ থাকে অর্থাৎ বাসনা থাকে ততক্ষণ কর্ম থাকে আর কর্মের দরুন ভাবনা, চিন্তা অশান্তি। বাসনা ত্যাগ হ'লেই কর্মক্ষয় হয় আর শান্তি হয়।

অবধূতের আর এক গুরু। অবধূতের আর একটি গুরু ছিল—মৌমাছি! মৌমাছি অনেক কষ্টে অনেক দিন ধরে মধু সঞ্চয় করে। কিন্তু সে মধু নিজের ভোগ হয় না। আর একজন এসে চাক ভেঙ্গে নিয়ে যায়। মৌমাছির কাছে অবধূত এই শিখলেন যে, সঞ্চয় করতে নাই।

অবিদ্যা কেন সৃষ্ট। শ্রীরামকৃষ্ণ—তাঁর লীলা ; অন্ধকার না থাকলে আলোর মহিমা বোঝা যায় না। দুঃখ না থাকলে সুখ বোঝা যায় না। 'মন্দ' জ্ঞান থাকলে তবে 'ভাল' জ্ঞান হয়।

আবার আছে, খোসাটি আছে বলে তবে আমটি বাড়ে ও পাকে। আমটি তয়ের হ'য়ে গেলে তবে খোসা ফেলে দিতে হয়। মায়ারূপ ছালটি থাকলে তবেই ক্রমে ব্রহ্মজ্ঞান হয়। বিদ্যা-মায়া, অবিদ্যা-মায়া আমের খোসার ন্যায় ; দুইই দরকার।

অবিদ্যা নাশ। 'নামবীজ' দেখ।

অবিদ্যা স্ত্রী। যে ঈশ্বরের পথে বিঘ্ন দেয়, সে অবিদ্যা স্ত্রী।

অব্যাভিচারিণী ভক্তি। 'প্রেমাভক্তি' দ্রষ্টব্য।

অভিনয় [বেশ্যানারী চৈতন্য সেজেছে]। তারা চৈতন্যদেব সেজেছে, তা হ'লেই বা। শোলার আতা দেখলে সত্যকার আতার উদ্দীপন হয়।

একজন ভক্ত রাস্তায় যেতে যেতে দেখে, কতকগুলি বাবলা গাছ রয়েছে। দেখে ভক্তটি একেবারে ভাবাবিষ্ট। তার মনে হয়েছিল যে, ঐ কাঠে শ্যামসুন্দরের বাগানের কোদালের বেশ বাঁট হয়। অমনি শ্যামসুন্দরকে মনে পড়েছে। যখন গড়ের মাঠে বেলুন দেখতে আমায় নিয়ে গিয়েছিল, তখন একটি সাহেবের ছেলে একটা গাছে ঠেসান দিয়ে ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দেখাও যা, অমনি কৃষ্ণের উদ্দীপন হ'ল ; অমনি সমাধিস্থ হয়ে গেলাম।

চৈতন্যদেব মেড়গাঁ দিয়ে যাচ্ছিলেন। শুনলেন, গাঁয়ের মাটিতে খোল তৈয়ার হয়। যেই শোনা অমনি ভাবাবিষ্ট হয়ে গেলেন।

শ্রীমতী মেঘ কি ময়ূরের কণ্ঠ দেখলে আর স্থির থাকতে পারতেন না। শ্রীকৃষ্ণের উদ্দীপন হয়ে বাহ্যশূন্য হয়ে যেতেন।

অভিনয় ও মিথ্যা। যারা সৎ, অভিনয়েও তাদের মিথ্যা কথা বা কাজ ভাল নয়। কেশব সেনের নববৃন্দাবন নাটক দেখতে গিছলাম। কি একটা আনলে ক্রস (Cross); আবার জল ছড়াতে লাগলো, বলে শান্তিজল। একজন দেখি মাতাল সেজে মাতলামি ক'রছে। ভক্তের পক্ষে ওরূপ সাজাও ভাল নয়। ওসব বিষয়ে মন অনেকক্ষণ ফেলে রাখায় দোষ হয়। মন ধোপা ঘরের কাপড়, যে রঙে ছোপাবে সেই রঙ হ'য়ে যায়। মিথ্যাতে অনেকক্ষণ ফেলে রাখলে মিথ্যার রঙ ধরে যাবে।

কেশব (সেন) সাধু সেজে শান্তিজল ছড়াতে লাগলো। আমার কিন্তু ভালো লাগলো না। অভিনয় করে শান্তিজল।

আর একজন (কু-বাবু) পাপ পুরুষ সেজেছিল। ও রকম সাজাও ভাল না। নিজে পাপ করাও ভাল না—পাপের অভিনয় করাও ভাল না।

দ্রঃ কপট সাধনা।

অভিমান। ক. 'আমি মুক্ত এ অভিমান খুব ভাল। 'আমি মুক্ত' এ কথা বলতে বলতে সে মুক্ত হয়ে যায়। আবার 'আমি বদ্ধ' এ কথা বলতে বলতে সে ব্যক্তি বদ্ধই হয়ে যায়। যে কেবল বলে 'আমি পাপী' 'আমি পাপী' সেই শালাই পড়ে যায়। বরং বলতে হয়, আমি তাঁর নাম করেছি, আমার আবার পাপ কি, বন্ধন কি!

খ. আচ্ছা, অভিমান, অহঙ্কার জ্ঞানে হয়—না, অজ্ঞানে হয়? অহঙ্কার তমোগুণ, অজ্ঞান থেকে উৎপন্ন হয়। এই অহঙ্কার আড়াল আছে ব'লে তাই ঈশ্বরকে দেখা যায় না। 'আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল।' অহঙ্কার করা বৃথা। এ শরীর, এ ঐশ্বর্য কিছুই থাকবে না। একটা মাতাল দুর্গা প্রতিমা দেখছিল। প্রতিমার সাজগোজ দেখে বলছে, মা, যতই সাজো-গোজো, দিন দুই তিন পরে তোমায় টেনে গঙ্গায় ফেলে দিবে। তাই সকলকে বলছি, জজই হও আর যেই হও সব দু'দিনের জন্য। তাই অভিমান, অহঙ্কার ত্যাগ করতে হয়।

গ. ছাগলকে কেটে ফেলা গেছে, তবু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নড়ছে।

স্বপ্নে ভয় দেখেছো; ঘুম ভেঙ্গে গেল, বেশ জেগে উঠলে তবু বুক দুড়দুড় করে। অভিমান ঠিক সেই রকম। তাড়িয়ে দিলেও আবার কোথা থেকে এসে পড়ে। অমনি মুখ ভার ক'রে বলে, আমায় খাতির ক'ল্লে না।

অভ্যাস। রোজ অভ্যাস করতে হয়। সার্কাসে দেখে এলাম ঘোড়া দৌড়ুচ্ছে তার উপর বিবি এক পায়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কত অভ্যাসে ঐটি হয়েছে।

অভ্যাস ও অনুরাগ। আর তাঁকে দেখাবার জন্য অন্ততঃ একবার ক'রে কাঁদ। এই দুটি উপায়,—অভ্যাস আর অনুরাগ, অর্থাৎ তাঁকে দেখবার জন্য ব্যাকুলতা।

অভ্যাস যোগ। ওদেশে ছুতোরদের মেয়েরা চিঁড়ে ব্যাচে। তারা কতদিক সামলে কাজ করে শোন। ঢেঁকির পাট পড়ছে, এক হাতে ধানগুলি ঠেলে দিচ্ছে, আর এক হাতে ছেলেকে কোলে করে মাই দিচ্ছে। আবার খদ্দের এসেছে, ঢেঁকি এদিকে পড়ছে, আবার খদ্দেরের সঙ্গে কথাও চলছে। খদ্দেরকে বলছে, তাহলে

তুমি যে ক পয়সা ধার আছে সে ক পয়সা দিয়ে যেও, আর জিনিষ লয়ে যেও। দ্যাখো,—ছেলেকে মাই দেওয়া, ঢেঁকি পড়ছে ধান ঠেলে দেওয়া, ও কাঁড়া ধান তোলা আবার খদ্দেরের সঙ্গে কথা বলা, এক সঙ্গে করছে। এরই নাম অভ্যাস যোগ। কিন্তু তার পনের আনা মন ঢেঁকির পাটের দিকে রয়েছে, পাছে হাতে পড়ে যায়। আর এক আনায় ছেলেকে মাই দেওয়া আর খদ্দেরের সঙ্গে কথা কওয়া। তেমনি যারা সংসারে আছে, তাদের পনের আনা মন ভগবানে দেওয়া উচিত। না দিলে সর্বনাশ; কালের হাতে পড়তে হবে। আর এক আনায় অন্যান্য কর্ম কর। ঈশ্বরেতে মন রেখে তেমনি সংসারে নানা কাজ করতে পার। কিন্তু অভ্যাস চাই; আর হুঁসিয়ার হওয়া চাই, তবে দু'দিক রাখা যায়।

দ্র. কর্মভোগ।

অমর। 'অমৃতসাগর' দ্রষ্টব্য।

অমৃত-সাগর। দেখ, অমৃত-সাগরে যাবার অনন্ত পথ। যে কোন প্রকারে হউক এ সাগরে পড়তে পারলেই হ'ল। মনে কর অমৃতের একটি কুন্ড আছে। কোন রকমে এই অমৃত একটু মুখে পড়লেই অমর হবে;—তা তুমি নিজে ঝাঁপ দিয়েই পড়, বা সিঁড়িতে আস্তে আস্তে নেমে একটু খাও, বা কেউ তোমায় ধাক্কা মেরে ফেলেই দিক। একই ফল। একটু অমৃতের আস্বাদন করলেই অমর হবে।

অর্থ অনর্থের মূল। অর্থ-ই আবার অনর্থ হয়। তোমরা ভাই ভাই বেশ আছ, কিন্তু ভাইয়ে ভাইয়ে হিস্যে নিয়ে গোল হয়। কুকুররা গা চাটাচাটি করছে, পরস্পর বেশ ভাব কিন্তু গৃহস্থ যদি ভাত দুটি ফেলে দেয় তাহলে পরস্পর কামড়াকামড়ি করবে।

অল্পবিদ্যা। একটু গীতা, একটু ভাগবত, একটু বেদান্ত প'ড়ে লোকে মনে করে, আমি সব বুঝে ফেলেছি। চিনির পাহাড়ে একটা পিঁপড়ে গিছলো। এক দানা চিনি খেয়ে তার পেট ভ'রে গেল। আর এক দানা মুখে ক'রে বাসায় নিয়ে যাচ্ছে। যাবার সময় ভাবছে, এবারে এসে পাহাড়টা সব নিয়ে যাব।

অসাম্প্রদায়িকতা।

দ্রঃ বিদ্বেষভাব বর্জন ॥ মতুয়ার বুদ্ধি ॥

অষ্টপাশ। অষ্ট বন্ধন নয়, অষ্টপাশ। তা থাকলই বা। তাঁর কৃপা হলে এক মুহূর্তে অষ্টপাশ চলে যেতে পারে। কি রকম জান, যেমন হাজার বৎসরের অন্ধকার ঘর, আলো লয়ে এলে একক্ষণে অন্ধকার পালিয়ে যায়! একটু একটু করে যায় না! ভেলকীবাজি করে, দেখেছ? অনেক গেরো দেওয়া দড়ি একধার একটা জায়গায় বাঁধে, আর এক ধার নিজের হাতে ধরে; ধরে দড়িটাকে দুই একবার নাড়া দেয়। নাড়াও দেওয়া, আর সব গেরো খুলেও যাওয়া। কিন্তু অন্য লোকে সেই গেরো প্রাণপণ চেষ্টা করেও খুলতে পারে নাই। গুরুর কৃপাবলে সব গেরো এক মুহূর্তে খুলে যায়। [কেশব সেনের পরিবর্তনের কারণ শ্রীরামকৃষ্ণ]

দ্রঃ গুরুকৃপা।

অহংকার। 'বাছুরের অবস্থা' দ্রষ্টব্য।

'ঈশ্বরদর্শন হবার লক্ষণ' দ্রষ্টব্য।

অভিমান খ—সিদ্ধি'

যতক্ষণ অহংকার ততক্ষণ অজ্ঞান। অহংকার থাকতে মুক্তি নাই।

অহংকার কেমন ক'রে যায়? ঈশ্বরকে দর্শন না করলে অহংকার যায় না। যদি কারু অহংকার গিয়ে থাকে, তার অবশ্য ঈশ্বরদর্শন হয়েছে।

অহংকার ত্যাগ : দ্রষ্টব্য অছি।

অহংকার থেকে মুক্তি। যতক্ষণ অহংকার থাকে, ততক্ষণ জ্ঞান হয় না; আমার মুক্তিও হয় না। এই সংসারে ফিরে ফিরে আসতে হয়। বাছুর হাম্বা হাম্বা (আমি আমি) করে, তাই অত যন্ত্রণা। কষায়ে কাটে, চামড়ায় জুতা হয়। আবার ঢোল-ঢাকের চামড়া হয়; সে ঢাক কত পেটে, কষ্টের শেষ নাই! শেষে নাড়ী থেকে তাঁত হয়, সেই তাঁতে যখন ধুনুরীর যন্ত্র তৈয়ার হয় আর ধুনুরীর তাঁতে তুঁহু তুঁহু (তুমি তুমি) ব'লতে থাকে, তখন নিস্তার হয়। তখন আর হাম্বা হাম্বা (আমি আমি) বলছে না; বলছে তুঁহু তুঁহু (তুমি তুমি) অর্থাৎ হে ঈশ্বর, তুমি কর্তা, আমি অকর্তা; তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র; তুমিই সব।

অহংকারের আবরণ। ক. জীবের অহংকারই মায়া। এই অহংকার সব আবরণ ক'রে রেখেছে। 'আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল।' যদি ঈশ্বরের কৃপায় 'আমি' অকর্তা, এই বোধ হ'য়ে গেল, তা হলে সে ব্যক্তি তো জীবন্মুক্ত হ'য়ে গেল। তার আর ভয় নাই।

'এই মায়া বা অহং যেন মেঘের স্বরূপ। সামান্য মেঘের জন্য সূর্যকে দেখা যায় না—মেঘ স'রে গেলেই সূর্যকে দেখা যায়। যদি গুরুর কৃপায় একবার অহং বুদ্ধি যায় তাহলে ঈশ্বর দর্শন হয়।

আড়াই হাত দূরে শ্রীরামচন্দ্র যিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর; মধ্যে সীতারূপিনী মায়া ব্যবধান আছে বলে লক্ষ্মণরূপ জীব সেই ঈশ্বরকে দেখতে পান নাই। এই দেখ, আমি এই গামছাখানা দিয়ে মুখের সামনে আড়াল করছি আর আমায় দেখতে পাচ্ছ না। তবু আমি এত কাছে। সেইরূপ ভগবান সকলের চেয়ে কাছে তবু এই মায়া আবরণের দরুণ তাঁকে দেখতে পারছ না।

খ. জীবের অহংকার আছে ব'লে ঈশ্বরকে দেখতে পায় না। মেঘ উঠলে আর সূর্য দেখা যায় না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে না ব'লে কি সূর্য নাই? সূর্য ঠিক আছে।

তবে 'বালকের আমি' এতে দোষ নাই, বরং উপকার আছে। শাক খেলে অসুখ হয়, কিন্তু হিঞে শাক খেলে উপকার হয়। হিঞে শাক শাকের মধ্যে নয়। মিছরি মিষ্টির মধ্যে নয়। অন্য মিষ্টিতে অসুখ করে, কিন্তু মিছরিতে কফ-দোষ করে না।

তাই কেশব সেনকে বলেছিলাম, আর বেশী তোমায় বললে দলটল থাকবে না! কেশব ভয় পেয়ে গেল। আমি তখন বললাম, 'বালকের আমি' 'দাস আমি' এতে দোষ নাই।

দ্রঃ গুরুকৃপা।

অহঙ্কারের বস্তু অনিত্য। কেউ ঐশ্বর্যের—বিভব, মান, পদ ; এই সবের—অহঙ্কার করে। এ সব দুই দিনের জন্য ; কিছুই সঙ্গে যাবে না।
[সঙ্গে, টাকার অহঙ্কার দ্রষ্টব্য]

অহং ও সমাধি। বেদে আছে যে, সপ্তভূমিতে মন গেলে তবে সমাধি হয়। সমাধি হ'লেই তবে অহং চলে যেতে পারে। মনের সচরাচর বাস কোথায় ? প্রথম তিন ভূমিতে। লিঙ্গ, গুহ্য, নাভি—সেই তিন ভূমি, তখন মনের আসক্তি কেবল সংসারে—কামিনী-কাঞ্চনে। হৃদয় যখন মনের বাস হয় তখন ঈশ্বরীয় জ্যোতিঃ দর্শন হয়। সে ব্যক্তি জ্যোতিঃ দর্শন করে বলে 'একি !' 'একি !' তারপর কণ্ঠ। সেখানে যখন মনের বাস হয়, তখন কেবল ঈশ্বরীয় কথা কহিতে ও শুনিতে ইচ্ছা হয়। কপালে—ভ্রূমধ্যে—মন গেলে তখন সচ্চিদানন্দরূপ দর্শন হয়, সেই রূপের সঙ্গে আলিঙ্গন স্পর্শন করতে ইচ্ছা হয় ; কিন্তু পারে না। লন্ঠনের ভিতর আলো দর্শন হয় কিন্তু স্পর্শ হয় না ; ছুঁই ছুঁই বোধ হয়, কিন্তু ছোঁয়া যায় না। সপ্তম ভূমিতে মন যখন যায় তখন অহং আর থাকে না, সমাধি হয়।'

অহংতা। 'প্রেমাভক্তি' দ্রষ্টব্য।

অহৈতুকী ভক্তি। একটি আছে অহৈতুকী ভক্তি। এটি যদি হয়, তাহ'লে খুব ভাল। প্রহ্লাদের অহৈতুকী ভক্তি ছিল। সেরূপ ভক্ত বলে, হে ঈশ্বর ! আমি ধন, মান, দেহসুখ, এ সব কিছুই চাই না। এই কর যেন তোমার পাদপদ্মে আমার শুদ্ধাভক্তি হয়।
ভক্তি [অহৈতুকী ও শুদ্ধা] দ্রষ্টব্য

আ-ঈ

॥ আকবর শা—ইন্দ্রিয় নিগ্রহ ॥

আকবর শা। দ্রঃ আল্লার কাছে চাইব।

আচার সর্বস্বতা। গঙ্গার ঘাটে নাইতে এসেছে দেখেছি। যত রাজ্যের কথা ! বিধবা পিসি বলছে—মা, দুর্গা পূজা আমি না হলে হয় না—শ্রীটি গড়া পর্যন্ত ! বাটীতে বিয়ে-থাওয়া হলে সব আমায় করতে হবে মা,—তবে হবে। ফুলশয্যের যোগাড়, খয়েরের বাগানটি পর্যন্ত।
ছাদের উপর ঠাকুর ঘর, নারায়ণ পূজা হচ্ছে। পূজার নৈবেদ্য, চন্দন ঘসা, এই সব হচ্ছে। কিন্তু ঈশ্বরের কথা একটি নাই। কি রাঁধতে হবে,—আজ বাজারে কিছু ভাল পেলে না,—কাল অমুক ব্যঞ্জনটি বেশ হয়েছিল। ও ছেলেটি আমার খুড়তুত ভাই হয়,—হাঁরে তোর সে কর্মটি আছে ?—আর আমি কেমন আছি ! —আমার হরি নাই। এই সব কথা।
দেখ দেখি ঠাকুর ঘরে পূজার সময় এই সব রাজ্যের কথাবার্তা।

আচার্য : বৈদ্য ও আচার্য দ্রষ্টব্য।

যিনি আচার্য তাঁরই পাঁচটা জানা দরকার। অপরকে বধ করবার জন্য ঢাল-তলোয়ার চাই ; আপনাকে বধ করবার জন্য একটি ছুঁচ বা নরুণ হলেই হয়।

আচার্যগিরি। আচার্যগিরি করা বড় কঠিন। ওতে নিজের হানি হয়। অমনি দশজন মানছে দেখে, পায়ের উপর পা দিয়ে বলে 'আমি বলছি আর তোমরা শুন।' এই ভাবটা বড় খারাপ। তার ঐ পর্যন্ত। ঐ একটু মান ; লোকে হদ্দ বলবে, 'আহা বিজয়বাবু বেশ বললেন, লোকটা খুব জ্ঞানী।' 'আমি বলছি' এ জ্ঞান ক'রো না। আমি মাকে বলি, 'মা তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র ; যেমন করাও তেমনি করি ; যেমন বলাও তেমনি বলি।'

আচার্যের কাজ। আচার্যের কাজ বড় কঠিন, ঈশ্বরের সাক্ষাৎ আদেশ ব্যতিরেকে লোকশিক্ষা দেওয়া যায় না।

যদি আদেশ না পেয়ে উপদেশ দাও, লোকে শুনবে না। সে উপদেশের কোন শক্তি নাই। আগে সাধন ক'রে, বা যে কোনরূপে হোক ঈশ্বরকে লাভ ক'রতে হয়। তাঁর আদেশ পেয়ে লেক্‌চার দিতে হয়। ও-দেশে একটি পুকুর আছে, নাম হালদার পুকুর। তার পাড়ে রোজ লোক বাহ্যে ক'রে রাখতো। সকালে যারা ঘাটে আসতো তারা তাদের গালাগালি দিয়ে খুব গোলমাল ক'রতো। গালাগালে কোন কাজ হ'ত না—আবার তার পরদিন পাড়েতেই বাহ্যে। শেষে কোম্পানীর চাপরাসী এসে নোটিশ টাঙ্গিয়ে দিলে যে, 'এখানে কেউ ওরূপ কাজ ক'রতে পারবে না। যদি করে, শাস্তি হবে।' এই নোটিশের পর আর কেউ পাড়ে বাহ্যে করত না।

তাঁর আদেশের পর যেখানে সেখানে আচার্য হওয়া যায় ও লেক্‌চার দেওয়া যায়। যে তাঁর আদেশ পায়, সে তাঁর কাছ থেকে শক্তি পায়। তখন এই কঠিন আচার্যের কর্ম করতে পারে।

এক বড় জমিদারের সঙ্গে একজন সামান্য প্রজা বড় আদালতে মোকদ্দমা ক'রেছিল। তখন লোকে বুঝেছিল যে, ঐ প্রজার পেছনে একজন বলবান লোক আছে। হয়তো আর একজন বড় জমিদার তার পেছনে থেকে মোকদ্দমা চালাচ্ছে। মানুষ সামান্য জীব, ঈশ্বরের সাক্ষাৎ শক্তি না পেলে আচার্যের এমন কঠিন কাজ করতে পারে না।

আচার্যের প্রকার। বৈদ্যের মত আচার্য তিন প্রকার। যিনি ধর্মোপদেশ দিয়ে শিষ্যদের আর কোন খবর লন না—সে আচার্য অধম। যিনি শিষ্যদের মঙ্গলের জন্য তাদের বার বার বুঝান, যাতে তারা উপদেশগুলি ধারণা করতে পারে, অনেক অনুনয়-বিনয় করেন, ভালবাসা দেখান—তিনি মধ্যম থাকের আচার্য। আর যখন শিষ্যেরা কোনও মতে শুনছে না দেখে কোনও আচার্য জোর পর্যন্ত করেন, তাঁরে বলি উত্তম আচার্য।

আচার ধর্ম। তুমি জপ, আহ্নিক, উপবাস, পুরশ্চরণ এই সব কর্ম ক'রছ তা বেশ। যার আন্তরিক ঈশ্বরের উপর টান থাকে, তাকে দিয়ে তিনি এই সব কর্ম করিয়ে লন। ফলকামনা না ক'রে এই সব কর্ম ক'রে যেতে পারলে নিশ্চিত

তাঁকে লাভ হয়। 'বৈধীকর্ম' দ্রষ্টব্য।

আড়ম্বর। তীর্থ, গলায় মালা, আচার এ সব প্রথম প্রথম করতে হয়। বস্তু লাভ হলে ভগবান দর্শন হলে, বাহিরের আড়ম্বর ক্রমে ক্রমে কমে যায়। তখন তাঁর নামটি নিয়ে থাকা আর স্মরণ মনন।

যোল টাকার পয়সা এক কাঁড়ি, কিন্তু যোলটি টাকা যখন একত্র করলে তখন অত কাঁড়ি দেখায় না। তাদের বদলে যখন একটি মোহর করলে তখন কত কম হয়ে গেল। আবার সেটি বদলে যদি একটু হীরা কর তা'হলে লোকে টেরই পায় না।

আত্মজ্ঞান। ক. অষ্টাবক্র সংহিতায় আত্মজ্ঞানের কথা আছে। আত্মজ্ঞানীরা বলে, 'সোঽহম্' অর্থাৎ 'আমিই সেই পরমাত্মা।' এ সব বেদান্তবাদী সন্ন্যাসীর মত, সংসারীর পক্ষে এ মত ঠিক নয়। সবই করা যাচ্ছে, অথচ 'আমিই সেই নিষ্ক্রিয় পরমাত্মা' এ কিরূপে হতে পারে? বেদান্তবাদীরা বলে, আত্মা নির্লিপ্ত। সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য, এ সব আত্মার কোনও অপকার করতে পারে না; তবে দেহাভিমানী লোকদের কষ্ট দিতে পারে। ধোঁয়া দেওয়াল ময়লা করে, আকাশের কিছু করতে পারে না।

খ. আপনার ভিতর আপনাকে দেখতে পেলে ত সব হয়ে গেল। ঐটি দেখতে পাবার জন্যই সাধনা। আর ঐ সাধনার জন্যই শরীর। যতক্ষণ না স্বর্ণপ্রতিমা ঢালাই হয়, ততক্ষণ মাটির ছাঁচের দরকার হয়। প্রতিমা হ'য়ে গেলে মাটির ছাঁচ্টা ফেলে দেওয়া যায়। ঈশ্বরদর্শন হলে শরীর ত্যাগ করা যায়।

তিনি শুধু অন্তরে নয়। অন্তরে বাহিরে। কালীঘরে মা আমাকে দেখালেন সবই চিন্ময়।—মা-ই সব হয়েছেন।—প্রতিমা, আমি, কোশা, কুশী, চুমকী, চৌকাট, মার্বেল পাথর;—সব চিন্ময়।

এইটি সাক্ষাৎকার করবার জন্যই তাঁকে ডাকা—সাধন ভজন—তাঁর নামগুণ কীর্তন। এইটির জন্যই তাঁকে ভক্তি করা।

আত্মপ্রবঞ্চনা। নেশা করে ধ্যান করা, সংসারী হয়ে জগৎ মিথ্যা বলা, আর যোগী হয়ে স্ত্রী-সঙ্গ করা,—এ তিনই আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র।

আত্মরক্ষা ও তমোগুণ। লোকের সঙ্গে বাস করতে গেলেই দুষ্ট লোকের হাত থেকে আপনাকে রক্ষা করবার জন্য একটু তমোগুণ দেখান দরকার। কিন্তু সে অনিষ্ট করবে বলে, উল্টে তার অনিষ্ট করা উচিত নয়।

এক মাঠে এক রাখাল গরু চরাতো। সেই মাঠে একটা ভয়ানক বিষাক্ত সাপ ছিল। সকলেই সেই সাপের ভয়ে অত্যন্ত সাবধানে থাকতো। একদিন একটি ব্রহ্মচারী সেই মাঠের পথ দিয়ে আসছিল। রাখালেরা দৌড়ে এসে বললে, ঠাকুর মহাশয়! ওদিক দিয়ে যাবেন না। ওদিকে একটা ভয়ানক বিষাক্ত সাপ আছে। ব্রহ্মচারী বললে, 'বাবা তা হোক; আমার তাতে ভয় নাই, আমি মন্ত্র জানি।' এই কথা বলে ব্রহ্মচারী সেইদিকে চলে গেল। রাখালেরা ভয়ে কেউ সঙ্গে গেল না। এদিকে সাপটা ফণা তুলে দৌড়ে আসছে, কিন্তু কাছে না আসতে আসতে ব্রহ্মচারী যেই মন্ত্র পড়লে, অমনি সাপটা কেঁচোর মতন পায়ের কাছে পড়ে রইল। ব্রহ্ম-চারী বললে, 'ওরে, তুই কেন পরের হিংসা করে বেড়াস; আয় তোকে মন্ত্র

দিব। এই মন্ত্র জপলে তোর ভগবানে ভক্তি হবে, ভগবান লাভ হবে, আর হিংসা প্রবৃত্তি থাকবে না।' এই বলে সে সাপকে মন্ত্র দিল। সাপটা মন্ত্র পেয়ে গুরুকে প্রণাম করলে আর জিজ্ঞাসা করলে, 'ঠাকুর! কি করে সাধনা করব বলুন।' গুরু বললেন, 'এই মন্ত্র জপ কর, আর কারও হিংসা ক'রো না।' ব্রহ্মচারী যাবার সময় বললে, 'আমি আবার আসবো।'

এই রকমে কিছুদিন যায়। রাখালেরা দেখে যে সাপটা আর কামড়াতে আসে না! ঢ্যালা মারে তবুও রাগ হয় না, যেন কেঁচোর মতন হ'য়ে গেছে। একদিন একজন রাখাল কাছে গিয়ে ল্যাজ ধরে খুব ঘুরপাক দিয়ে তাকে আছড়ে আছড়ে ফেলে দিলে। সাপটার মুখ দিয়ে রক্ত উঠতে লাগলো আর সে অচেতন হ'য়ে পড়লো। নড়ে না, চড়ে না। রাখালেরা মনে করলে যে সাপটা মরে গেছে। এই মনে করে তারা সব চলে গেল।

অনেক রাত্রে সাপের চেতনা হ'ল। সে আস্তে আস্তে অতি কষ্টে তার গর্তের ভিতর চলে গেল। শরীর চূর্ণ—নড়বার শক্তি নেই। অনেকদিন পরে যখন অস্থিচর্মসার তখন বাহিরে আহারের চেষ্টায় রাত্রে একবার চরতে আসতো; ভয়ে দিনের বেলা আসতো না, মন্ত্র লওয়া অবধি আর হিংসা করে না। মাটি, পাতা, গাছ থেকে পড়ে গেছে এমন ফল খেয়ে প্রাণধারণ করতো।

প্রায় এক বৎসর পরে ব্রহ্মচারী সেই পথে আবার এলো। এসেই সাপের সন্ধান করলে। রাখালেরা বললে, 'সে সাপটা মরে গেছে।' ব্রহ্মচারীর কিন্তু ওকথা বিশ্বাস হ'ল না। সে জানে, যে মন্ত্র ও নিয়েছে তা সাধন না হ'লে দেহত্যাগ হবে না। খুঁজে খুঁজে সেই দিকে তার দেওয়া নাম ধ'রে ডাকতে লাগলো। সে গুরুদেবের আওয়াজ শুনে গর্ত থেকে বেরিয়ে এলো ও খুব ভক্তিভাবে প্রণাম করলে। ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করলে, 'তুই কেমন আছিস?' সে বললে, 'আজ্ঞে ভাল আছি।' ব্রহ্মচারী বললে, 'তবে তুই এত রোগা হয়ে গিছিস কেন?' সাপ বললে, 'ঠাকুর আপনি আদেশ করেছেন—কারও হিংসা ক'রো না। তাই পাতাটা ফলটা খাই বলে বোধ হয় রোগা হয়ে গিছি।' ওর সত্ত্বগুণ হয়েছে কি না, তাই কারু উপর ক্রোধ নাই। সে ভুলেই গিছলো যে রাখালেরা মেরে ফেলবার যোগাড় করেছিল। ব্রহ্মচারী বললে, শুধু না খাওয়ার দরুন এরূপ অবস্থা হয় না, অবশ্য আরো কারণ আছে, ভেবে দেখ। সাপটার মনে পড়লো যে রাখালেরা আছাড় মেরেছিল। তখন সে বললে, 'ঠাকুর মনে পড়েছে বটে, রাখালেরা একদিন আছাড় মেরেছিল। তারা অজ্ঞান জানে না যে আমার মনের কি অবস্থা; আমি যে কাহাকেও কামড়াব না বা কোনরূপ অনিষ্ট করবো না, কেমন ক'রে জানবে?' ব্রহ্মচারী বললে, ছি! তুই এতো বোকা, আপনাকে রক্ষা করতে জানিস্ না; আমি কামড়াতেই বারণ করেছি, ফোঁস করতে নয়! ফোঁস ক'রে তাদের ভয় দেখাস নাই কেন?

দুষ্ট লোকের কাছে ফোঁস করে তাদের ভয় দেখাতে হয়, পাছে অনিষ্ট করে; তাদের গায়ে বিষ ঢালতে নাই, অনিষ্ট করতে নাই।

আত্মসমর্পণ। ১. যেমন রোগ তার তেমনি ঔষধ। গীতায় তিনি বলেছেন, 'হে

অর্জুন, তুমি আমার শরণ লও, তোমাকে সব রকম পাপ থেকে আমি মুক্ত করবো।' তাঁর শরণাগত হও, তিনি সদ্‌বুদ্ধি দেবেন, তিনি সব ভার নেবেন। তখন সব রকম বিকার দূরে যাবে। এ বুদ্ধি দিয়ে কি তাঁকে বুঝা যায়? এক সের ঘটিতে কি আর চার সের দুধ ধরে? আর তিনি না বুঝালে কি বুঝা যায়? তাই বলছি তাঁর শরণাগত হও—তাঁর যা ইচ্ছা তিনি করুন। তিনি ইচ্ছাময়। মানুষের কি শক্তি আছে? সংসারে রেখেছেন তা কি করবে? সমস্ত তাঁকে সমর্পণ কর—তাঁকে আত্মসমর্পণ কর। তাহলে আর কোন গোল থাকবে না। তখন দেখবে তিনিই সব করছেন, সবই 'রামের ইচ্ছা।'

২. দেহের সুখ-দুঃখ আছেই। যার ঈশ্বর লাভ হয়েছে সে মন, প্রাণ, দেহ, আত্মা সমস্ত তাঁকে সমর্পণ করে। পম্পা সরোবরে স্নানের সময় রাম লক্ষ্মণ সরোবরের নিকট মাটিতে ধনুক গুঁজে রাখলেন। স্নানের পর উঠে লক্ষ্মণ তুলে দেখেন যে, ধনুক রক্তাক্ত হ'য়ে রয়েছে। রাম দেখে বললেন, ভাই, দেখ, দেখ, বোধ হয় কোন জীবহিংসা হ'ল। লক্ষ্মণ মাটি খুঁড়ে দেখেন একটা বড় কোলা ব্যাঙ। মুমূর্ষু অবস্থা। রাম করুণস্বরে বলতে লাগলেন, 'কেন তুমি শব্দ কর নাই, আমরা তোমাকে বাঁচাবার চেষ্টা করতাম। যখন সাপে ধরে, তখন তো খুব চীৎকার করো।' ভেক বললে, 'রাম! যখন সাপে ধরে তখন আমি এই বলে চীৎকার করি—রাম রক্ষা করো, রাম রক্ষা করো। এখন দেখছি রামই আমায় মারছেন। তাই চুপ ক'রে আছি।'

আত্মহত্যা। আত্মহত্যা করা মহাপাপ, ফিরে ফিরে সংসারে আসতে হবে, আর এই সংসার যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে।

তবে যদি ঈশ্বরের দর্শন হ'য়ে কেউ শরীর ত্যাগ করে, তাকে আত্মহত্যা বলে না। সে শরীর ত্যাগে দোষ নাই। জ্ঞানলাভের পর কেউ কেউ শরীর ত্যাগ করে। যখন সোনার প্রতিমা একবার মাটির ছাঁচে ঢালাই হয়, তখন মাটির ছাঁচ রাখতেও পারে, ভেঙ্গে ফেলতেও পারে।

অনেক বছর আগে বরানগর থেকে একটি ছোকরা আসতো, উমের কুড়ি বছর হবে। গোপাল সেন। যখন এখানে আসতো তখন এত ভাব হ'ত যে হৃদয়কে ধরতে হ'ত—পাছে পড়ে গিয়ে হাত-পা ভেঙ্গে যায়। সে ছোক্‌রা একদিন হঠাৎ আমার পায়ে হাত দিয়ে বললে—আর আমি আসতে পারবো না—তবে আমি চললুম। কিছুদিন পরে শুনলুম যে, সে শরীর ত্যাগ করেছে।

আত্মা ও দেহ। দ্রঃ 'মায়া ঃ দেহ ও আত্মা'।

আদিকান্ড। তা শম্ভুও বলেছিল। বলে হাসপাতাল ডিস্‌পেনসারি করবো। লোকটা ভক্ত ছিল। তাই আমি বললুম, ভগবানের সাক্ষাৎকার হ'লে কি হাসপাতাল ডিস্‌পেনসারি চাইবে। লোকমান্য, পাণ্ডিত্য, বাসনা—এ সব আদি-কান্ড—

কেশব সেন বললে, ঈশ্বর দর্শন কেন হয় না। তা বললুম যে, লোকমান্য, বিদ্যা, এ সব নিয়ে তুমি আছ কি না, তাই হয় না। ছেলে চুসী নিয়ে যতক্ষণ চোসে, ততক্ষণ মা আসে না। লাল চুসী। খানিকক্ষণ পরে চুসী ফেলে যখন চীৎকার

করে, তখন মা ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে আসে।

তুমিও মোড়লী কোচ্চ। মা ভাবছে, ছেলে আমার মোড়ল হ'য়ে বেশ আছে। আছে তো থাক।

আদ্যাশক্তি। আদ্যাশক্তি লীলাময়ী; সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করছেন। তাঁরই নাম কালী, কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী। একই বস্তু, যখন তিনি নিষ্ক্রিয়—সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় কোন কাজ করছেন না—এই কথা যখন ভাবি, তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলে কই। যখন তিনি এই সব কার্য করেন, তখন তাঁকে কালী বলি, শক্তি বলি। একই ব্যক্তি নাম রূপ ভেদ।

যেমন 'জল' 'ওয়াটার' 'পানি'। এক পুকুরে তিন-চার ঘাট; এক ঘাটে হিন্দুরা জল খায়, তারা বলে 'জল'। এক ঘাটে মুসলমানেরা জল খায়, তারা বলে 'পানি'। আর এক ঘাটে ইংরেজরা জল খায়, তারা বলে 'ওয়াটার'। তিন-ই এক, কেবল নামে তফাৎ। তাঁকে কেউ বলছে 'আল্লা'; কেউ 'গড্'; কেউ বলছে 'ব্রহ্ম' কেউ 'কালী'; কেউ বলছে রাম, হরি, যীশু, দুর্গা।

খ. এই আদ্যাশক্তি আর পরব্রহ্ম অভেদ। একটিকে ছেড়ে আর একটিকে চিন্তা করবার যো নাই। যেমন জ্যোতিঃ আর মণি। মণিকে ছেড়ে মণির জ্যোতিকে ভাববার যো নাই; আবার জ্যোতিকে ছেড়ে মণিকে ভাববার যো নাই। সাপ আর তির্যকগতি। সাপকে ছেড়ে তির্যকগতি ভাববার যো নাই; আবার সাপের তির্যকগতি ছেড়ে সাপকে ভাববার যো নাই।

আদ্যাশক্তিই এই জীবজগৎ, এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন। অনুলোম, বিলোম।

দ্রঃ শক্তির অভেদ। ব্রহ্ম ও আদ্যাশক্তি। ব্রহ্ম 'খ' অদ্বৈতম্।

আদ্যাশক্তি দর্শন-এর উপায়। ব্যাকুল হৃদয়ে তাঁকে প্রার্থনা করো। আর কাঁদো। এইরূপে চিত্তশুদ্ধি হ'য়ে যাবে। নির্মল জলে সূর্যের প্রতিবিম্ব দেখতে পাবে। ভক্তের আমিরূপ আরশিতে সেই সগুণব্রহ্ম আদ্যাশক্তি দর্শন করবে। কিন্তু আরশি খুব পোঁছা চাই। ময়লা থাকলে ঠিক প্রতিবিম্ব পড়বে না।

যতক্ষণ 'আমি' জলে সূর্যকে দেখতে হয়, সূর্যকে দেখবার আর কোনরূপ উপায় হয় না। আর যতক্ষণ প্রতিবিম্ব সূর্য বই সত্য সূর্যকে দেখবার উপায় নাই, ততক্ষণ প্রতিবিম্ব সূর্যই ষোল আনা সত্য—যতক্ষণ আমি সত্য ততক্ষণ প্রতিবিম্ব সূর্যও সত্য—ষোল আনা সত্য। সেই প্রতিবিম্ব সূর্যই আদ্যাশক্তি।

ব্রহ্মজ্ঞান যদি চাও—সেই প্রতিবিম্বকে ধরে সত্য সূর্যের দিকে যাও। সেই সগুণ-ব্রহ্ম, যিনি প্রার্থনা শুনেন তাঁরেই বলো, তিনিই সেই ব্রহ্মজ্ঞান দিবেন। কেন না, যিনিই সগুণ ব্রহ্ম, তিনিই নির্গুণ ব্রহ্ম, যিনিই শক্তি, তিনিই ব্রহ্ম। পূর্ণ জ্ঞানের পর অভেদ।

আনন্দ। 'বিশ্বাস-আনন্দ কর্ম' দ্রষ্টব্য।

আনন্দের প্রকার। আনন্দ তিন প্রকার—বিষয়ানন্দ, ভজনানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ। যা সর্বদাই নিয়ে আছে—কামিনী-কাঞ্চনের আনন্দ—তার নাম বিষয়ানন্দ। ঈশ্বর নাম গুণগান ক'রে যে আনন্দ তার নাম ভজনানন্দ। আর ভগবান দর্শনের যে আনন্দ তার নাম ব্রহ্মানন্দ। ব্রহ্মানন্দ লাভের পর ঋষিদের স্বেচ্ছাচার হ'য়ে যেতো।

আপন কে ? গুরু শিষ্যকে বুঝাচ্ছিলেন, ঈশ্বর তোমার আপনার, আর কেউ আপনার নয়। শিষ্য বললে, আজ্ঞা, মা পরিবার এরা ত খুব যত্ন করেন ; না দেখলে অন্ধকার দেখেন, কত ভালবাসেন। গুরু বললেন, ও তোমার মনের ভুল। আমি তোমায় দেখিয়ে দিচ্ছি, কেউ তোমার নয়। এই ঔষধ বড়ি কয়টি তোমার কাছে রেখে দাও। তুমি বাড়ীতে গিয়ে খেয়ে শুয়ে থেকো। লোকে মনে করবে যে তোমার দেহত্যাগ হয়ে গেছে। কিন্তু তোমার সব বাহ্যজ্ঞান থাকবে, তুমি দেখতে শুনতে সব পাবে ;—আমি সেই সময় গিয়ে পড়বো।

শিষ্যটি তাই করলে। বাটীতে গিয়ে বড়ি ক'টি খেলে ; খেয়ে অচৈতন্য হয়ে প'ড়ে রইল। মা, পরিবার, বাড়ীর সকলে কান্নাকাটি আরম্ভ করলে। এমন সময় গুরু কবিরাজের বেশে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সমস্ত শুনে বললেন, আচ্ছা এর ঔষধ আছে—আবার বেঁচে উঠবে। তবে একটি কথা আছে। এই ঔষধটি আগে একজন আপনার লোকের খেতে হবে, তারপর ওকে দেওয়া যাবে। যে আপনার লোক ঐ বড়িটি খাবে, তার কিন্তু মৃত্যু হবে। তা এখানে ওঁর মা কি পরিবার এঁরা ত সব আছেন, একজন না একজন কেউ খাবেন, সন্দেহ নাই। তা হ'লেই ছেলেটি বেঁচে উঠবে।

শিষ্য সমস্ত শুনছে। কবিরাজ আগে মাকে ডাকলেন। মা কাতর হয়ে ধুলায় গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদছেন। কবিরাজ বললেন, মা। আর কাঁদতে হবে না। তুমি এই ঔষধটি খাও, তা হলেই ছেলেটি বেঁচে উঠবে। তবে তোমার এতে মৃত্যু হবে। মা ঔষধ হাতে ভাবতে লাগলেন। অনেক ভেবে চিন্তে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, বাবা, আমার আর কটি ছেলে মেয়ে আছে, আমি গেলে কি হবে, এও ভাবছি। কে তাদের দেখবে, খাওয়াবে, তাদের জন্য ভাবছি। পরিবারকে ডেকে তখন ঔষধ দেওয়া হ'ল,—পরিবারও খুব কাঁদছিলেন, ঔষধ হাতে করে তিনিও ভাবতে লাগলেন। শুনলেন যে ঔষধ খেলে মরতে হবে। তখন কেঁদে বলতে লাগলেন, ওগো, ওঁর যা হবার, তা ত হয়েছে গো ; আমার অপগণ্ডগুলির এখন কি হবে বল ? কে ওদের বাঁচাবে ? আমি কেমন ক'রে ও ঔষধ খাই ? শিষ্যের তখন ঔষধের নেশা চ'লে গেছে। সে বুঝলে যে, কেউ কারু নয়। ধড়মড় করে উঠে গুরুর সঙ্গে চলে গেল। গুরু বললেন, তোমার আপনার কেবল একজন,—ঈশ্বর।

তাই তাঁর পাদপদ্মে যাতে ভক্তি হয়,—যাতে তিনিই 'আমার' বলে ভালবাসা হয়—তাই করাই ভাল। সংসার দেখছো, দু'দিনের জন্য। আর এতে কিছুই নাই।

আপনলোকের বিবাদ। শিব ও রামের যুদ্ধ (হাস্য)। রামের গুরু শিব। যুদ্ধও হ'ল, দুজনে ভাবও হ'ল। কিন্তু শিবের ভূতপ্রেতগুলো আর রামের বানরগুলো—ওদের ঝগড়া কিচিমিচি আর মেটে না। (উচ্চহাস্য)।

আপনার লোক তা এরূপ হ'য়ে থাকে। লব কুশ যে রামের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। আবার জানো মায়ে-ঝিয়ে আলাদা মঙ্গলবার করে। যেন মার মঙ্গল, মেয়ের মঙ্গল, দুটো আলাদা। কিন্তু এর মঙ্গলে ওর মঙ্গল হয়, ওর মঙ্গলে এর মঙ্গল হয়।

তেমনি তোমাদের এর একটি সমাজ আছে ; আবার ওর একটি দরকার। (সকলের হাস্য)। তবে এ সব চাই। যদি বলো ভগবান নিজে লীলা করেছেন, সেখানে জটীলে-কুটীলের কি দরকার ? জটীলে-কুটীলে না থাকলে লীলা পোষ্টাই হয় না। (সকলের হাস্য)। জটীলে-কুটীলে না থাকলে রগড় হয় না। (উচ্চহাস্য)। রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। তাঁর গুরু ছিলেন অদ্বৈতবাদী। শেষে দুজনে অমিল। গুরু-শিষ্য পরস্পর মত খণ্ডন করতে লাগল। এরূপ হয়েই থাকে। যাই হোক, তবু আপনার লোক।

অবাঙ্মনসোগোচর। ক. না ; এ মনের গোচর নয় বটে—শুদ্ধ মনের গোচর। এ বুদ্ধির গোচর নয়—কিন্তু শুদ্ধ বুদ্ধির গোচর। কামিনী কাঞ্চনে আসক্তি গেলেই, শুদ্ধ মন আর শুদ্ধ বুদ্ধি হয়। তখন শুদ্ধ মন শুদ্ধবুদ্ধি এক। শুদ্ধমনের গোচর। ঋষি-মুনিরা কি তাঁকে দেখেন নাই ? তাঁরা চৈতন্যের দ্বারা চৈতন্যের সাক্ষাৎকার করেছিলেন।

খ. দেখ! ঈশ্বরকে দেখা যায়। 'অবাঙ্মনসোগোচর' বেদে বলেছে ; এর মানে বিষয়াসক্ত মনের অগোচর। বৈষ্ণবচরণ ব'লত, তিনি শুদ্ধ মন, শুদ্ধ বুদ্ধির গোচর। তাই সাধুসঙ্গ, প্রার্থনা, গুরুর উপদেশ এই সব প্রয়োজন। তবে চিত্ত-শুদ্ধি হয়। তখন তাঁর দর্শন হয়। ঘোলা জলে নির্মলি ফেললে পরিষ্কার হয়। তখন মুখ দেখা যায়। ময়লা আর্শিতে মুখ দেখা যায় না।

আমমোক্তারী। আচ্ছা তাঁকে আমমোক্তারী দাও। ভাল লোকের উপর যদি কেউ ভার দেয়, সে লোক কি তার মন্দ করে ? তাঁর উপর আন্তরিক সব ভার দিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসে থাক। তিনি যা কাজ ক'রতে দিয়েছেন, তাই ক'রো। বিড়ালছানার পাটোয়ারী বুদ্ধি নাই। মা মা করে। মা যদি হেঁসেলে রাখে সেইখানেই পড়ে থাকে। কেবল মিউ মিউ ক'রে ডাকে। মা যখন গৃহস্থের বিছানায় রাখে, তখন সেই ভাব। মা মা করে।

আমি। ক. সংসারী আমি। যে 'আমি'তে সংসারী করে, কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত করে, সেই 'আমি' খারাপ। জীব ও আত্মার প্রভেদ হয়েছে, এই আমি মাঝখানে আছে বলে। জলের উপর যদি একটা লাঠি ফেলে দেওয়া যায়, তাহলে, দুটো ভাগ দেখায়। বস্তুতঃ, এক জল ; লাঠিটার দরুন দুটো দেখাচ্ছে।

অহং-ই এই লাঠি। লাঠি তুলে লও, সেই এক জলই থাকবে।

খ. বজ্জাৎ আমি। 'বজ্জাৎ আমি' কে ? যে 'আমি' বলে—'আমায়' জানে না ? আমার এত টাকা, আমার চেয়ে কে বড়লোক আছে ? যদি চোরে দশ টাকা চুরি ক'রে থাকে, প্রথমে টাকা কেড়ে লয়, তারপর চোরকে খুব মারে ; তাতেও ছাড়ে না, পাহারাওয়ালা ডেকে পুলিশে দেয় ও ম্যাদ খাটায়, 'বজ্জাৎ আমি' বলে, জানে না—আমার দশ টাকা নিয়েছে। এত বড় আস্পর্ধা !

গ. দাস আমি। দুই একটি লোকের সমাধি হ'য়ে 'অহং' যায় বটে, কিন্তু প্রায় যায় না। হাজার বিচার কর, 'অহং' ফিরে ঘুরে এসে উপস্থিত। আজ অশ্বত্থ গাছ কেটে দাও, কাল আবার সকালে দেখো ফেঁকড়ী বেরিয়েছে। একান্ত যদি 'আমি' যাবে না, তবে থাক্ শালা 'দাস আমি' হয়ে। 'হে ঈশ্বর। তুমি প্রভু আমি

দাস', এইভাবে থাকো। 'আমি দাস', 'আমি ভক্ত' এরূপ 'আমিতে' দোষ নাই ; মিষ্টি খেলে অম্বল হয়, কিন্তু মিছরি মিষ্টির মধ্যে নয়।
যেমন জলরাশির উপর বাঁশ না রেখে একটি রেখা কাটা হ'য়েছে। যেন দুই ভাগ জল। আর রেখা অনেকক্ষণ থাকে না। 'দাস আমি' কি 'ভক্তের আমি' কি 'বালকের আমি' এরা যেন 'আমির রেখা মাত্র।'
ঘ. [সঙ্গে 'দাস আমির' কামক্রোধ দেখ] কাঁচা আমি।
ঙ. ব্রহ্মজ্ঞান/কেশব সেন দ্রষ্টব্য।
চ. 'দলগড়া' দ্রষ্টব্য ॥
ছ. 'মুক্তি' খ দ্রষ্টব্য। 'জ্ঞান-অজ্ঞান খ' দ্রষ্টব্য।

আমির ফেকড়ী। ঐ যে 'আমি'টে ওটাতেই বড় মুশ্কিল বাধায়। শালার 'আমি' কি যাবেই না ? এই পোড়ো বাড়ি অশ্বত্থ গাছ উঠেছে; খুঁড়ে ফেলে দাও আবার পরদিন দেখো, এক ফেকড়ী গজিয়েছে ; ঐ 'আমি'ও অমনি ধারা। পেঁয়াজের বাটি সাতবার ধোও শালার গন্ধ কি কিছুতেই যাবে নি ?

আমিই সেই। 'আমিই সেই' 'আমি শুদ্ধ আত্মা', এটি জ্ঞানীদের মত। ভক্তেরা বলে, এ সব ভগবানের ঐশ্বর্য না থাকলে ধনীকে কে জানতে পারতো ? তবে সাধকের ভক্তি দেখে তিনি যখন বলবেন, 'আমি যা, তুইও তা' তখন এক কথা। রাজা বসে আছেন, খানসামা যদি রাজার আসনে গিয়ে বসে, আর বলে, 'রাজা তুমিও যা আমিও তা' লোকে পাগল বলবে। তবে খানসামার সেবাতে সন্তুষ্ট হয়ে রাজা একদিন বলেন, 'ওরে, তুই আমার কাছে বোস্, ওতে দোষ নাই ; তুইও যা, আমিও তা!' তখন যদি সে গিয়ে বসে, তাতে দোষ হয় না। সামান্য জীবেরা যদি বলে, 'আমি সেই' সেটা ভাল না। জলেরই তরঙ্গ ; তরঙ্গের জল হয় ?

আমি ঃ ঈশ্বর দর্শনের পর। যিনি ঈশ্বর দর্শন করেছেন, তাঁর দ্বারা আর ছেলে-মেয়ের জন্ম দেওয়া সৃষ্টির কাজ হয় না। ধান পুঁতলে গাছ হয়, কিন্তু ধান সিদ্ধ করে পুঁতলে গাছ হয় না।
যিনি ঈশ্বর দর্শন করেছেন, তাঁর 'আমি'টা নামমাত্র থাকে, সে 'আমি'র দ্বারা কোন অন্যায় কাজ হয় না। নামমাত্র থাকে—যেমন নারিকেলের বেল্লোর দাগ। বেল্লো ঝরে গেছে—এখন কেবল দাগ মাত্র।

আমি-কুম্ভ। হাজার বিচার কর, আমি যায় না। আমিরূপ কুম্ভ। ব্রহ্ম যেন সমুদ্র—জলে জল। কুম্ভের ভিতরে বাহিরে জল। তবু কুম্ভ ত আছে। ঐটি ভক্তের আমির স্বরূপ। যতক্ষণ কুম্ভ আছে, আমি তুমি আছে ; তুমি ঠাকুর, আমি ভক্ত ; তুমি প্রভু, আমি দাস ; এও আছে। হাজার বিচার কর, এ ছাড়বার জো নাই। কুম্ভ না থাকলে তখন সে এক কথা।

আমি থাকবেই। কিন্তু 'আমি' থাকবেই থাকবে ; যায় না। যেমন অনন্ত জল-রাশি, উপরে নীচে, সম্মুখে পিছনে, ডাইনে বামে, জলে পরিপূর্ণ। সেই জলের মধ্যে একটি জলপূর্ণ কুম্ভ আছে। ভিতরে বাহিরে জল, কিন্তু তবুও কুম্ভটি আছে। 'আমি' রূপ কুম্ভ।

আলো। আলো (জ্যোতিঃ) পাঁচ প্রকার। দীপ আলোক, অন্যান্য অগ্নির আলো, চান্দ্র আলো, সৌর আলো ও চান্দ্র সৌর একাধারে। ভক্তি চন্দ্র ; জ্ঞান সূর্য ! কখনো কখনো আকাশে সূর্য অস্ত না যেতে যেতে চন্দ্রোদয় দেখা যায়। অবতারাদি ভক্তি-চন্দ্র জ্ঞান-সূর্য একাধারে দেখা যায়।

আল্লার কাছে চাইব। একটি ফকির বনে কুটীর করে থাকতো। তখন আকবর শা দিল্লীর বাদশা। ফকিরটির কাছে অনেকে আসতো। অতিথিসৎকার করতে তার বড় ইচ্ছা হয়। একদিন ভাবলে যে, টাকা-কড়ি না হলে কেমন করে অতিথি-সৎকার হয় ? তবে যাই একবার আকবর শার কাছে। সাধু ফকিরের অবারিত দ্বার। আকবর শা তখন নমাজ পড়ছিলেন, ফকির নমাজের ঘরে গিয়ে বসলো। দেখলে আকবর শা নমাজের শেষে বলছে, হে আল্লা, ধন দাও দৌলত দাও, আরো কত কি। এই সময়ে ফকিরটি উঠে নমাজের ঘর থেকে চলে যাবার উদ্যোগ কর্তে লাগলো। আকবর শা ইসারা করে বসতে বললেন। নমাজ শেষ হলে বাদশা জিজ্ঞাসা কল্লেন—আপনি এসে বসলেন, আবার চলে যাচ্ছেন ? ফকির বললে— সে আর মহারাজের শুনে কাজ নাই, আমি চল্লুম। বাদশা অনেক জিদ করাতে ফকির বললে—আমার ওখানে অনেকে আসে। তাই কিছু টাকা প্রার্থনা কর্তে এসেছিলাম। আকবর বললে—তবে চলে যাচ্ছিলেন কেন ? ফকির বললে, যখন দেখলুম, তুমিও ধন দৌলতের ভিখারী—তখন মনে করলুম যে, ভিখারীর কাছে চেয়ে আর কি হবে ? চাইতে হয় ত আল্লার কাছে চাইব।

আসক্তির নিস্তার। ঈশ্বরের কৃপায় তীব্র বৈরাগ্য হ'লে, এই কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি থেকে নিস্তার হ'তে পারে। তীব্র বৈরাগ্য কাকে বলে ? হচ্ছে হবে, ঈশ্বরের নাম করা যাক, এ সব মন্দ বৈরাগ্য। যার তীব্র বৈরাগ্য, তার প্রাণ ভগবানের জন্য ব্যাকুল ; মার প্রাণ যেমন পেটের ছেলের জন্য ব্যাকুল। যার তীব্র বৈরাগ্য, সে ভগবান ভিন্ন আর কিছু চায় না ; সংসারকে পাতকুয়া দেখে, তার মনে হয়, বুঝি ডুবে গেলুম। আত্মীয়দের কাল সাপ দেখে, তাদের কাছ থেকে পালাতে ইচ্ছা হয় ; আর পালায়ও। বাড়ির বন্দোবস্ত করি, তারপর ঈশ্বর চিন্তা ক'রবো, এ কথা ভাবেই না। ভিতরে খুব রোক।

আহ্নিক করবার সময়। অনেকে আহ্নিক করবার সময় যত রাজ্যের কথা কয় ; কিন্তু কথা কইতে নাই,—তাই ঠোঁট বুজে যত প্রকার ইসারা করতে থাকে। এটা নিয়ে এস, ওটা নিয়ে এস, হুঁ উঁহুঁ,—এই সব করে।

আংশিক দেখা। 'দর্শনের দোষ' দ্রষ্টব্য।

ইনি-তিনি। 'জ্ঞান কেমন করে হয়েছে জানব' দ্রষ্টব্য।

ইন্দ্রিয় নিগ্রহ কি আগে করতে হয় ? ও এক পথ আছে। বিচার-পথ। ভক্তি-পথেও অন্তরিন্দ্রিয় নিগ্রহ আপনি হয়। আর সহজে হয়। ঈশ্বরের উপর যত ভালবাসা আসবে, ততই ইন্দ্রিয়সুখ আলুনী লাগবে।

যে দিন সন্তান মারা গেছে, সেই শোকের উপর স্ত্রী-পুরুষের দেহ-সুখের দিকে কি মন থাকতে পারে ?

'ভক্তিপথ (নির্বিচার ভক্তি)' দ্রষ্টব্য।

ঈশ্বর এক—ঈশ্বরভক্ত

ঈশ্বর এক। জ্ঞানীরা যাকে ব্রহ্ম বলে, যোগীরা তাঁকেই আত্মা বলে, আর ভক্তেরা তাঁকেই ভগবান বলে।

একই ব্রাহ্মণ। যখন পূজা করে, তার নাম পূজারী; যখন রাঁধে তখন রাঁধুনি বামুন। যে জ্ঞানী, জ্ঞানযোগ ধরে আছে, সে নেতি নেতি এই বিচার করে। ব্রহ্ম এ নয়, ও নয়; জীব নয়, জগৎ নয়। এইরূপ বিচার করতে করতে যখন মন স্থির হয়, মনের লয় হয়, সমাধি হয়, তখন ব্রহ্মজ্ঞান। ব্রহ্মজ্ঞানীর ঠিক ধারণা ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা; নামরূপ এ সব স্বপ্নবৎ, ব্রহ্ম কি যে, তা মুখে বলা যায় না; তিনি যে ব্যক্তি (Personal God) তাও বলবার যো নাই।

জ্ঞানীরা ঐরূপ বলে—যেমন বেদান্তবাদীরা। ভক্তেরা কিন্তু সব অবস্থাই লয়। জাগ্রত অবস্থাও সত্য বলে—জগৎকে স্বপ্নবৎ বলে না। ভক্তেরা বলে এই জগৎ ভগবানের ঐশ্বর্য। আকাশ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য, পর্বত, সমুদ্র, জীব, জন্তু এ সব ঈশ্বর করেছেন। তাঁরই ঐশ্বর্য। তিনি অন্তরে হৃদয়মধ্যে আবার বাহিরে। উত্তম ভক্ত বলে, তিনি নিজে এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব—জীব জগৎ হয়েছেন। ভক্তের সাধ যে চিনি খায় চিনি হ'তে ভালবাসে না।

যোগীও পরমাত্মাকে সাক্ষাৎকার করতে চেষ্টা করে। উদ্দেশ্য—জীবাত্মা ও পরমাত্মার যোগ। যোগী বিষয় থেকে মন কুড়িয়ে লয় ও পরমাত্মাতে মন স্থির করতে চেষ্টা করে। তাই প্রথম অবস্থায় নির্জনে স্থির আসনে অনন্যমন হ'য়ে ধ্যান চিন্তা করে।

কিন্তু একই বস্তু। নাম-ভেদমাত্র। যিনিই ব্রহ্ম, তিনিই আত্মা, তিনিই ভগবান। ব্রহ্মজ্ঞানীর ব্রহ্ম যোগীর পরমাত্মা ভক্তের ভগবান।

'ব্রহ্মা ও কালী' দ্রষ্টব্য।

ঈশ্বর এক, নানা নাম। সব পথ দিয়ে তাঁকে পাওয়া যায়। সব ধর্মই সত্য। ছাদে উঠা নিয়ে বিষয়। তা তুমি পাকা সিঁড়ি দিয়েও উঠতে পার; কাঠের সিঁড়ি দিয়েও উঠতে পার; বাঁশের সিঁড়ি দিয়েও উঠতে পার।

যদি বল, ওদের ধর্মে অনেক ভুল, কুসংস্কার আছে; আমি বলি তা থাকলেই বা, সকল ধর্মেই ভুল আছে। সব্বাই মনে করে আমার ঘড়িই ঠিক যাচ্ছে। ব্যাকুলতা থাকলেই হ'ল; তাঁর উপর ভালবাসা, টান থাকলেই হ'ল। তিনি যে অন্তর্যামী, অন্তরের টান ব্যাকুলতা দেখতে পান। মনে কর এক বাপের অনেকগুলি ছেলে, বড় ছেলেরা কেউ বাবা, কেউ পাপা এই সব স্পষ্ট বলে তাঁকে ডাকে। আবার অতি শিশু ছোট ছেলে হদ্দ 'বা' কি 'পা' এই বলে ডাকে। যারা 'বা' কি 'পা' পর্যন্ত বলতে পারে বাবা কি তাদের উপর রাগ করবেন? বাবা জানেন যে ওরা আমাকেই ডাকছে তবে ভাল উচ্চারণ করতে পারে না। বাপের কাছে সব ছেলেই সমান।

আবার ভক্তেরা তাঁকেই নানা নামে ডাকছে; এক ব্যক্তিকেই ডাকছে। এক পুকুরের চারিটি ঘাট। হিন্দুরা জল খাচ্ছে এক ঘাটে বলছে জল; মুসলমানরা আর এক ঘাটে খাচ্ছে বলছে পানি; ইংরাজেরা আর এক ঘাটে খাচ্ছে বলছে ওয়াটার; আবার অন্য লোক এক ঘাটে—বলছে aqua।

এক ঈশ্বর তাঁর নানা নাম।

ঈশ্বর ও জগৎ। ঈশ্বরের ইচ্ছায় এই জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। সৃষ্টির পর আদ্যাশক্তি জগতের ভিতরেই থাকেন। জগৎ প্রসব করেন আবার জগতের মধ্যে থাকেন। বেদে আছে 'উর্ণনাভি'র কথা; মাকড়সা আর তার জাল। মাকড়সা ভিতর থেকে জাল বার করে, আবার নিজে সেই জালের উপর থাকে। ঈশ্বর জগতের আধার আধেয় দুই‌ই।

ঈশ্বর কল্পতরু। ঈশ্বর কল্পতরু। যে যা চাইবে, তাই পাবে। কিন্তু কল্পতরুর কাছে থেকে চাইতে হয়, তবে কথা থাকে।

তবে একটি কথা আছে—তিনি ভাবগ্রাহী। যে যা মনে ক'রে সাধনা করে তার সেইরূপই হয়। যেমন ভাব তেমনি লাভ। একজন বাজীকর খেলা দেখাচ্ছে রাজার সামনে। আর মাঝে মাঝে বলছে রাজা টাকা দেও, কাপড়া দেও। এমন সময়ে তার জিব তালুর মূলের কাছে উল্টে গেল। অমনি কুম্ভক হ'য়ে গেল। আর কথা নাই, শব্দ নাই, স্পন্দন নাই। তখন সকলে তাকে ইটের কবর তৈয়ার ক'রে সেই ভাবেই পুঁতে রাখলে। হাজার বৎসর পরে সেই কবর কে খুঁড়েছিল। তখন লোকে দেখে যে একজন যেন সমাধিস্থ হ'য়ে ব'সে আছে। তারা তাকে সাধু মনে করে পূজো করতে লাগল। এমন সময় নাড়াচাড়া দিতে দিতে তার জীব তালু থেকে সরে এল। তখন তার চৈতন্য হ'ল, আর সে চীৎকার করে বলতে লাগলো, লাগ ভেলকী লাগ। রাজা টাকা দেও, কাপড়া দেও।

ঈশ্বর কি জানা যায়? তাঁকে ইন্দ্রিয় দ্বারা বা এ মনের দ্বারা জানা যায় না। যে মনে বিষয়-বাসনা নাই সেই শুদ্ধ মনের দ্বারা তাঁকে জানা যায়।

ঈশ্বর কি বৈষম্য দোষে দুষ্ট। সে কি! ঘোড়াটাও টা আর সরাটাও টা। তুমি যা বলছো ঈশ্বর বিদ্যাসাগর ঐ কথা বলেছিল। বলেছিল, মহাশয়, তিনি কি কারুকে বেশী শক্তি দিয়েছেন, কারুকে কম দিয়েছেন? আমি বললাম, বিভুরূপে তিনি সকলের ভিতর আছেন—আমার ভিতরে যেমনি পিঁপড়েটির ভিতরেও তেমনি। কিন্তু শক্তিবিশেষ আছে। যদি সকলেই সমান হবে, তবে ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নাম শুনে তোমায় আমরা কেন দেখতে এসেছি। তোমার কি দুটো শিং বেরিয়েছে, তাই দেখতে এসেছি, তা নয়; তুমি দয়ালু, তুমি পণ্ডিত: এই সব গুণ তোমার অপরের চেয়ে বেশী আছে, তাই তোমার এত নাম। দেখ না এমন লোক আছে যে, একলা একশো লোককে হারাতে পারে; আবার এমন আছে, একজনের ভয়ে পালায়।

যদি শক্তিবিশেষ না হয় লোকে কেশবকে এত মানতো কেন?

গীতায় আছে, যাকে অনেকে গণে-মানে—তা বিদ্যার জন্যই হউক, বা গান-বাজনার জন্যই হউক, বা লেকচার দেবার জন্যই হউক, বা আর কিছুর জন্যই

হউক—নিশ্চিত জেনো যে, তাতে ঈশ্বরের বিশেষ শক্তি আছে।

তোমাদের ঐ এক। কলকাতার লোকগুলো বলে, 'ঈশ্বরের বৈষম্যদোষ।' কেন না, তিনি একজনকে সুখে রেখেছেন, একজনকে দুঃখে রেখেছেন। শালাদের নিজের ভিতরও যেমন, ঈশ্বরের ভিতরও তেমনি দেখে।

ঈশ্বর কি সম্পূর্ণ জ্ঞেয়। ঠিক কে জানবে? আমাদের যতটুকু দরকার, ততটুকু হ'লেই হ'ল। আমার এক পাতকুয়া জলের কি দরকার? এক ঘটি হ'লেই খুব হ'ল। চিনির পাহাড়ের কাছে একটা পিঁপড়ে গিছিল। তার সব পাহাড়টার কি দরকার? একটা, দুটো দানা হ'লেই হেউ ঢেউ হয়।

ঈশ্বরকে খুঁজতে ইচ্ছা : দ্রঃ বিবেক।

ঈশ্বরকে সম্পূর্ণ জানার ইচ্ছা কিভাবে সংশোধন হয়? কতটুকুই বা জানা যায়? সাধুসঙ্গ, তাঁর নাম গুণগান, তাঁকে সর্বদা প্রার্থনা। আমি বলেছিলাম, 'মা, আমি জ্ঞান চাই না; এই নাও তোমার জ্ঞান; এই নাও তোমার অজ্ঞান,—মা আমায় তোমার পাদপদ্মে কেবল শুদ্ধাভক্তি দাও। আমি কিছু চাই না।'

যেমন রোগ, তার তেমনি ঔষধ। গীতায় তিনি বলেছেন, 'হে অর্জুন, তুমি আমার শরণ লও, তোমাকে সব রকম পাপ থেকে আমি মুক্ত ক'রবো।' তাঁর শরণাগত হও, তিনি সদ্‌বুদ্ধি দেবেন। তিনি সব ভার লবেন। তখন সব রকম বিকার দূরে যাবে। এ বুদ্ধি দিয়ে কি তাঁকে বুঝা যায়? এক সের ঘটিতে কি চার সের দুধ ধরে? আর তিনি না বুঝালে কি বুঝা যায়? তাই বলছি—তাঁর শরণাগত হও—তাঁর যা ইচ্ছা তিনি করুন। তিনি ইচ্ছাময়। মানুষের কি শক্তি আছে?

ঈশ্বরকোটি। ঈশ্বরকোটির আলাদা কথা,—যেমন অনুলোম বিলোম। 'নেতি' 'নেতি' করে ছাদে পেঁছে যখন দেখে, ছাদও যে জিনিসে তৈরী,—ইট, চুণ, সুরকি,—সিঁড়িও সেই জিনিসে তৈরী। তখন কখন ছাদেও থাকতে পারে, আবার উঠা নামাও কর্তে পারে।

শুকদেবের সমাধিভঙ্গ—হনুমান, প্রহ্লাদ। শুকদেব সমাধিস্থ ছিলেন। নির্বিকল্প সমাধি—জড় সমাধি। ঠাকুর নারদকে পাঠিয়ে দিলেন,—পরীক্ষিৎকে ভাগবত শুনাতে হবে। নারদ দেখলেন জড়ের ন্যায় শুকদেব বাহ্যশূন্য—বসে আছেন। তখন বীণার সঙ্গে হরির রূপ চার শ্লোকে বর্ণনা করতে লাগলেন। প্রথম শ্লোক বলতে বলতে শুকদেবের রোমাঞ্চ হ'ল। ক্রমে অশ্রু; অন্তরে হৃদয় মধ্যে, চিন্ময়রূপ দর্শন কর্তে লাগলেন। জড় সমাধির পর আবার রূপ দর্শনও হ'ল। শুকদেব ঈশ্বরকোটি।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। 'ঈশ্বর কি বৈষম্য দোষে' দুষ্ট। শক্তিবিশেষ।

ঈশ্বরচিন্তায় কি বেহেড হয়? শিবনাথ বলেছিল, বেশী ঈশ্বর চিন্তা ক'ল্লে বেহেড হ'য়ে যায়। আমি বললুম কি?—চৈতন্যকে চিন্তা করে কি কেউ অচৈতন্য হয়ে যায়? তিনি নিত্যশুদ্ধবোধরূপ। যাঁর বোধে সব বোধ হ'চ্ছে যাঁর চৈতন্যে সব চৈতন্যময়। বলে নাকি কে সাহেবদের হয়েছিল—বেশী চিন্তা ক'রে বেহেড হয়ে গিয়েছিল। তা হ'তে পারে। তারা ঐহিক পদার্থ চিন্তা করে।

'ভাবেতে ভরল তনু, হরল গেয়ান।' এতে যে জ্ঞানের কথা আছে, সে জ্ঞান মানে বাহ্যজ্ঞান।

ঈশ্বর-তত্ত্ব। ক. তিনিই আস্তিক, তিনিই নাস্তিক; তিনিই ভাল, তিনিই সৎ; জাগা, ঘুম এ সব অবস্থা তাঁরই; আবার তিনি এসব অবস্থার পার।

একজন চাষার বেশী বয়সে একটি ছেলে হ'য়েছিল। ছেলেটিকে খুব যত্ন করে। ছেলেটি ক্রমে বড় হ'ল। একদিন চাষা ক্ষেতে কাজ করছে, এমন সময় একজন এসে খবর দিলে যে, ছেলেটির ভারী অসুখ। ছেলে যায় যায়। বাড়ীতে এসে দেখে, ছেলে মারা গেছে। পরিবার খুব কাঁদছে, কিন্তু চাষার চক্ষে একটুও জল নাই। পরিবার প্রতিবেশীদের কাছে তাই আরো দুঃখ করতে লাগলো যে, এমন ছেলেটি গেল এঁর চক্ষে একটু জল পর্যন্ত নাই। অনেকক্ষণ পরে চাষা পরিবারকে সম্বোধন ক'রে বললে, 'কেন কাঁদছি না জান? আমি কাল স্বপন দেখেছিলুম যে, রাজা হয়েছি, আর সাত ছেলের বাপ হয়েছি। স্বপনে দেখলুম যে, ছেলেগুলি রূপে গুণে সুন্দর। ক্রমে বড় হ'ল বিদ্যা ধর্ম উপার্জন ক'ল্লে। এমন সময় আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল; এখন ভাবছি যে, তোমার ঐ এক ছেলের জন্য কাঁদবো, কি আমার সাত ছেলের জন্য কাঁদবো।' জ্ঞানীদের মতে স্বপন অবস্থাও যেমন সত্য, জাগা অবস্থাও তেমনি সত্য।

খ. পুরাণ মতে। পুরাণ মতে ভক্ত একটি, ভগবান একটি; আমি একটি, তুমি একটি; শরীর যেন সরা; এই শরীরমধ্যে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কাররূপ জল র'য়েছে; ব্রহ্ম সূর্যস্বরূপ। তিনি এই জলে প্রতিবিম্বিত হ'চ্ছেন। ভক্ত তাই ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন করে।

গ. বেদান্ত মতে। বেদান্ত (বেদান্ত-দর্শন) মতে ব্রহ্মই বস্তু, আর সমস্ত মায়া, স্বপ্নবৎ, অবস্তু। অহংরূপ একটি লাঠি সচ্চিদানন্দ-সাগরের মাঝখানে প'ড়ে আছে। (মাষ্টারের প্রতি)—তুমি এইটে শুনে যাও—অহং লাঠিটি তুলে নিলে এক সচ্চিদানন্দ সমুদ্র। অহং লাঠিটি থাকলে দুটো দেখায়, এ একভাগ জল ও একভাগ জল। ব্রহ্মজ্ঞান হ'লে সমাধিস্থ হয়। তখন এই অহং পুঁছে যায়।

ঈশ্বর-তত্ত্ব বিচার। 'নেতি নেতি বিচার' দ্রষ্টব্য।

ঈশ্বরদর্শন। ক. সবই ঈশ্বরাধীন—মানুষে কি করবে? তাঁর নাম করতে করতে কখনও ধারা পড়ে, কখনও পড়ে না। তাঁর ধ্যান করতে এক এক দিন বেশী উদ্দীপনা হয়—আবার একদিন কিছুই হ'ল না।

কর্ম চাই, তবে দর্শন হয়। একদিন ভাবে হালদার পুকুর দেখলুম। দেখি, একজন ছোটলোক পানা ঠেলে জল নিচ্চে, আর হাতে তুলে একবার দেখছে। যেন দেখালে, পানা না ঠেললে জল দেখা যায় না—কর্ম না করলে ভক্তি লাভ হয় না, ঈশ্বর দর্শন হয় না। ধ্যান, জপ এই সব কর্ম, তাঁর নাম গুণকীর্তনও কর্ম—আবার দান, যজ্ঞ এ সবও কর্ম।

মাখন যদি চাও, তবে দুধকে দই পাততে হয়। তার পর নির্জনে রাখতে হয়। তারপর দই বসলে পরিশ্রম ক'রে মন্থন ক'রতে হয়। তবে মাখন তোলা হয়।

মহিমাচরণ—আজ্ঞা হাঁ, কর্ম চাই বই কি! অনেক খাটতে হয়, তবে লাভ হয়।

পড়তেই কত হয় ! অনন্ত শাস্ত্র !

শাস্ত্রপাঠ ও ঈশ্বরদর্শন দ্রষ্টব্য।

বেদাদি অনেক শাস্ত্র আছে, কিন্তু সাধন না করলে তপস্যা না করলে—ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না।

ষড়্‌দর্শনে দর্শন মেলে না, আগম নিগম তন্ত্রসারে।

তবে শাস্ত্রে যা আছে, সেই সব জেনে নিয়ে সেই অনুসারে কাজ করতে হয়।

ঈশ্বরদর্শন [যোগাযোগ ও ব্যাকুলতা]। ক. একটা সুযোগ হওয়া চাই। সাধুসঙ্গ, বিবেক, সদ্‌গুরু লাভ। হয় তো একজন বড় ভাই সংসারের ভার নিলে ; হয় তো স্ত্রীটি বিদ্যাশক্তি, বড় ধার্মিক ; কি বিবাহ আদপেই হ'ল না, সংসারে বদ্ধ হ'তে হ'ল না ;—এই সব যোগাযোগ হ'লে হ'য়ে যায়।

একজনের বাড়িতে ভারী অসুখ—যায় যায়। কেউ বললে স্বাতী নক্ষত্রে বৃষ্টি পড়বে, সেই বৃষ্টির জল মড়ার মাথার খুলিতে থাকবে, আর একটা সাপ ব্যাঙকে তেড়ে যাবে, ব্যাঙকে ছোবল মারবার সময় ব্যাঙটা যাই লাফ দিয়ে পালাবে, অমনি সেই সাপের বিষ মড়ার খুলিতে পড়ে যাবে ; সেই বিষের ঔষধ তৈয়ার করে যদি খাওয়াতে পার, তবে বাঁচে। তখন যার বাড়িতে অসুখ, সেই লোক দিন-ক্ষণ-নক্ষত্র দেখে বাড়ি থেকে বেরুলো, আর ব্যাকুল হ'য়ে ঐ সব খুঁজতে লাগলো। মনে মনে ঈশ্বরকে ডাকছে, 'ঠাকুর! তুমি যদি জোট-পাট ক'রে দাও, তবেই হয়!' এইরূপে যেতে যেতে সত্য-সত্যই দেখতে পেলে, একটা মড়ার মাথার খুলি পড়ে রয়েছে। দেখতে দেখতে এক পশলা বৃষ্টিও হ'ল। তখন সে ব্যক্তি বলছে, 'হে গুরুদেব! মড়ার মাথার খুলিও পেলুম, আবার স্বাতীনক্ষত্রে বৃষ্টিও হ'ল, সেই বৃষ্টির জলও ঐ খুলিতে পড়েছে ; কৃপা করে আর কয়টির যোগাযোগ ক'রে দাও ঠাকুর।' ব্যাকুল হয়ে ভাবছে। এমন সময় দেখে একটা বিষধর সাপ আসছে। তখন সে লোকটির ভারী আহ্লাদ হ'ল ; আর সে এত ব্যাকুল হ'ল যে বুক দুরু দুরু করতে লাগলো ; আর সে বলতে লাগলো, 'হে গুরুদেব! এবার সাপও এসেছে ; অনেকগুলির যোগাযোগও হ'ল। কৃপা ক'রে এখন আর যেগুলি বাকী আছে, সেগুলি করিয়ে দাও!' বলতে বলতে ব্যাঙও এলো, সাপটা ব্যাঙ তাড়া ক'রে যেতেও লাগলো ; মড়ার মাথার খুলির কাছে এসে যাই ছোবল দিতে যাবে, ব্যাঙটা লাফিয়ে ওদিকে গিয়ে প'ড়লো আর বিষ অমনি খুলির ভিতর প'ড়ে গেল। তখন লোকটি আনন্দে হাততালি দিয়ে নাচতে লাগলো।

তাই বলছি ব্যাকুলতা থাকলে সব হ'য়ে যায়।

খ. দ্র. সাধনা চাই। ঈশ্বর দেখা।

ঈশ্বরদর্শন ও চিত্তশুদ্ধি। ঈশ্বরদর্শন চিত্তশুদ্ধি না হ'লে হয় না। কামিনী-কাঞ্চনে মন মলিন হ'য়ে আছে, মনে ময়লা প'ড়ে আছে। ছুঁচ কাদা দিয়ে ঢাকা থাকলে আর চুম্বক টানে না। মাটি কাদা ধুয়ে ফেললে তখন চুম্বকে টানে। মনের ময়লা তেমনি চোখের জলে ধুয়ে ফেলা যায়। 'হে ঈশ্বর, আর অমন করবো না' বলে যদি কেউ অনুতাপে কাঁদে, তা'হলে ময়লাটা ধুয়ে যায়। তখন

ঈশ্বররূপ চুম্বক পাথর মনরূপ ছুঁচকে টেনে লন। তখন সমাধি হয়, ঈশ্বর দর্শন হয়।

কিন্তু হাজার চেষ্টা কর, তাঁর কৃপা না হ'লে কিছু হয় না। তাঁর কৃপা না হ'লে তাঁর দর্শন হয় না। কৃপা কি সহজে হয়? অহংকার একেবারে ত্যাগ করতে হবে। 'আমি কর্তা' এ বোধ থাকলে ঈশ্বর দর্শন হয় না। ভাঁড়ারে একজন আছে, তখন বাড়ির কর্তাকে যদি কেউ বলে, মহাশয়, আপনি এসে জিনিস বার ক'রে দিন। তখন কর্তাটি বলে, ভাঁড়ারে একজন রয়েছে, আমি আর গিয়ে কি ক'রব। যে নিজে কর্তা হ'য়ে বসেছে তার হৃদয়মধ্যে ঈশ্বর সহজে আসেন না।

ঈশ্বরদর্শন ও ভক্তি। ভক্তি দ্বারাই তাঁকে দর্শন হয়; কিন্তু পাকা ভক্তি প্রেমাভক্তি, রাগভক্তি চাই। সেই ভক্তি এলেই তাঁর উপর ভালবাসা আসে; যেমন ছেলের মার উপর ভালবাসা, মার ছেলের উপর ভালবাসা, স্ত্রীর স্বামীর উপর ভালবাসা।

এ ভালবাসা, এ রাগভক্তি এলে স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-কুটুম্বের উপর সে মায়ার টান থাকে না। দয়া থাকে। সংসার বিদেশ বোধ হয়, একটি কর্মভূমি মাত্র বোধ হয়। যেমন পাড়াগাঁয়ে বাড়ি কিন্তু কলকাতায় কর্মভূমি; কলকাতায় বাসা ক'রে থাকতে হয়, কর্ম করবার জন্য। ঈশ্বরে ভালবাসা এলে সংসারাসক্তি—বিষয়বুদ্ধি—একেবারে যাবে।

ক. বিষয়বুদ্ধির লেশমাত্র থাকলে তাঁকে দর্শন হয় না। দেশলাইয়ের কাঠি যদি ভিজে থাকে হাজার ঘসো, কোন রকমেই জ্বলবে না—কেবল একরাশ কাঠি লোকসান হয়। বিষয়াসক্ত মন ভিজে দেশলাই।

শ্রীমতী (রাধিকা) যখন বললেন, কৃষ্ণময় দেখছি, সখীরা বললে, কৈ আমরা তো তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না। তুমি কি প্রলাপ বোকচো? শ্রীমতী বললেন, সখি! অনুরাগ-অঞ্জন চক্ষে মাখো, তাঁকে দেখতে পাবে। (বিজয়ের প্রতি) তোমাদের ব্রাহ্মসমাজের গানে আছে—

'প্রভু বিনে অনুরাগ, ক'রে যজ্ঞ যাগ, তোমারে কি যায় জানা।'

এই অনুরাগ, এই প্রেম, এই পাকাভক্তি, এই ভালবাসা যদি একবার হয় তা হ'লে সাকার-নিরাকার দুই সাক্ষাৎকার হয়।

ঈশ্বরদর্শন : কর্ম চাই। ঈশ্বর আছেন ব'লে বসে থাকলে হবে না। যো সো ক'রে তাঁর কাছে যেতে হবে। নির্জনে তাঁকে ডাকো, প্রার্থনা কর, 'দেখা দাও' বলে ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদো। কামিনী-কাঞ্চনের জন্য পাগল হ'য়ে বেড়াতে পারো, তবে তাঁর জন্যে একটু পাগল হও। লোকে বলুক যে ঈশ্বরের জন্য অমুক পাগল হ'য়ে গেছে। দিন কতক না হয় সব ত্যাগ করে তাঁকে একলা ডাকো।

শুধু তিনি আছেন, ব'লে বসে থাকলে কি হবে? হালদার পুকুরে বড় মাছ আছে। পুকুরের পাড়ে শুধু ব'সে থাকলে কি মাছ পাওয়া যায়? চার করো, চার ফেলো। ক্রমে গভীর জল থেকে মাছ আসবে আর জল নড়বে। তখন আনন্দ হবে। হয়তো মাছটার খানিকটা একবার দেখা গেল—মাছটা ধপাঙ করে উঠলো। যখন দেখা গেল, তখন আরো আনন্দ।

দুধকে দই পেতে মন্থন করলে তবে তো মাখন পাবে।

এ তো ভাল বালাই হ'ল। ঈশ্বরকে দেখিয়ে দাও, আর উনি চুপ ক'রে বসে থাকবেন। মাখন তুলে মুখের কাছে ধরো। ভাল বালাই—মাছ ধ'রে হাতে দাও।

ঈশ্বরদর্শন কি অবস্থায় হয়? খুব ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদলে তাঁকে দেখা যায়। মাগছেলের জন্য লোকে এক ঘটি কাঁদে; টাকার জন্য লোকে কেঁদে ভাসিয়ে দেয়; কিন্তু ঈশ্বরের জন্য কে কাঁদছে? ডাকার মতো ডাকতে হয়।

ব্যাকুলতা হ'লেই অরুণ উদয় হ'ল। তারপর সূর্য দেখা দিবেন। ব্যাকুলতার পরই ঈশ্বর দর্শন।

তিন টান একত্র হ'লে তবে তিনি দেখা দেন—বিষয়ীর বিষয়ের উপর, মায়ের সন্তানের উপর আর সতীর পতির উপর টান। এই তিন টান যদি কারও একসঙ্গে হয়, সেই টানের জোরে ঈশ্বরকে লাভ করতে পারে!

কথাটা এই, ঈশ্বরকে ভালবাসতে হবে। মা যেমন ছেলেকে ভালবাসে, সতী যেমন পতিকে ভালবাসে, বিষয়ী যেমন বিষয় ভালবাসে। এই তিনজনের ভালবাসা, এই তিন টান, একত্র করলে যতখানি হয়, ততখানি ঈশ্বরকে দিতে পারলে তাঁর দর্শন লাভ হয়।

ব্যাকুল হ'য়ে তাঁকে ডাকা চাই। বিড়ালের ছানা কেবল মিউ মিউ ক'রে মাকে ডাকতে জানে। মা তাকে যেখানে রাখে, সেইখানেই থাকে—কখনও হেঁশেলে, কখনও মাটির উপর, কখনও বা বিছানার উপর রেখে দেয়। তার কষ্ট হ'লে সে কেবল মিউ মিউ করে ডাকে, আর কিছু জানে না। মা যেখানেই থাকুক, এই মিউ মিউ শব্দ শুনে এসে পড়ে।

ঈশ্বর দর্শন কি এই চক্ষে হয়? তাঁকে চর্মচক্ষে দেখা যায়। সাধনা করতে করতে একটি প্রেমের শরীর হয়—তার প্রেমের চক্ষু, প্রেমের কর্ণ। সেই চক্ষে তাঁকে দ্যাখে,—সেই কর্ণে তাঁর বাণী শুনা যায়। আবার প্রেমের লিঙ্গ যোনি হয়।

এই প্রেমের শরীরে আত্মার সহিত রমণ হয়।

ঈশ্বরের প্রতি খুব ভালবাসা না এলে হয় না। খুব ভালবাসা হ'লে তবেই ত চারিদিকে ঈশ্বরময় দেখা যায়। খুব ন্যাবা হ'লে তবেই চারিদিক হলদে দেখা যায়।

তখন আবার 'তিনিই আমি' এইটি বোধ হয়। মাতালের নেশা বেশী হ'লে বলে, 'আমিই কালী'।

গোপীরা প্রেমোন্মত্ত হয়ে বলতে লাগল, 'আমিই কৃষ্ণ'।

তাঁকে রাতদিন চিন্তা ক'রলে তাঁকে চারিদিকে দেখা যায়,—যেমন প্রদীপের শিখার দিকে যদি একদৃষ্টে চেয়ে থাক, তবে খানিকক্ষণ পরে চারিদিক শিখাময় দেখা যায়।

ঈশ্বরদর্শন কি করা যায়? ক. হাঁ, অবশ্য করা যায়। মাঝে মাঝে নির্জনে বাস; তাঁর নাম গুণগান, বস্তু-বিচার; এইসব উপায় অবলম্বন করতে হয়।

দ্রঃ নিরাকার ব্রহ্মের সাক্ষাৎ হয় কি?

সংসারে থেকে কি ভগবানকে পাওয়া যায় ?

খ. হাঁ, অবশ্য দেখা যায়। নিরাকার, সাকার, দুই দেখা যায়। সাকার চিন্ময়-রূপ দর্শন হয়। আবার সাকার মানুষ তাতেও তিনি প্রত্যক্ষ। অবতারকে দেখাও যা ঈশ্বরকে দেখাও তা। ঈশ্বরই যুগে যুগে মানুষরূপে অবতীর্ণ হন।

ঈশ্বরদর্শন হবার লক্ষণ। ঈশ্বরদর্শনের লক্ষণ আছে। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে, যে ব্যক্তি ঈশ্বরদর্শন ক'রেছে, তার চারিটি লক্ষণ হয়, (১) বালকবৎ (২) পিশাচবৎ (৩) জড়বৎ (৪) উন্মাদবৎ।

যার ঈশ্বর দর্শন হয়েছে, তার বালকের স্বভাব হয়। সে ত্রিগুণাতীত—কোন গুণের আঁট নাই। আবার শুচি অশুচি তার কাছে দুই সমান—তাই পিশাচবৎ। আবার পাগলের মতো 'কভু হাসে, কভু কাঁদে'; এই বাবুর মতো সাজে-গোজে, আবার খানিক পরে ন্যাংটা; বগলের নীচে কাপড় রেখে বেড়াচ্ছে—তাই উন্মাদ-বৎ। আবার কখনও বা জড়ের ন্যায় চুপ ক'রে বসে আছে—জড়বৎ।

কখন কখন তিনি অহংকার একেবারে পুঁছে ফেলেন—যেমন সমাধি অবস্থায়। আবার প্রায় অহংকার একটু রেখে দেন। কিন্তু সে অহংকারে দোষ নাই। যেমন বালকের অহংকার। পাঁচবছরের বালক 'আমি' 'আমি' করে, কিন্তু কারু অনিষ্ট করতে জানে না।

পরশমণি ছুঁলে লোহা সোনা হয়ে যায়। লোহার তরোয়াল সোনার তরোয়াল হ'য়ে যায়। তরোয়ালের আকার থাকে, কারু অনিষ্ট করে না। সোনার তরোয়ালে মারা কাটা চলে না।

ঈশ্বরদর্শনের উপায়। ক. তীব্র বৈরাগ্য হ'লে তাঁকে পাওয়া যায়। প্রাণ ব্যাকুল হওয়া চাই। শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করেছিল, কেমন ক'রে ভগবানকে পাবো। গুরু বললেন, আমার সঙ্গে এসো,—এই ব'লে একটা পুকুরে লয়ে গিয়ে তাকে চুবিয়ে ধরলেন। খানিক পরে জল থেকে উঠিয়ে আনলেন ও বললেন, তোমার জলের ভিতর কি রকম হয়েছিল? শিষ্য বললে, প্রাণ আটুবাটু করছিল—যেন প্রাণ যায়! গুরু বললেন, দেখ, এইরূপ ভগবানের জন্য যদি তোমার প্রাণ আটুবাটু করে তবেই তাঁকে লাভ করবে।

খ. তাই বলি, তিন টান একসঙ্গে হ'লে তবে তাঁকে লাভ করা যায়। বিষয়ীর বিষয়ের প্রতি টান, সতীর পতিতে টান, আর মায়ের সন্তানেতে টান, এই তিন ভালবাসা একসঙ্গে ক'রে কেউ যদি ভগবানকে দিতে পারে তাহ'লে তৎক্ষণাৎ সাক্ষাৎকার হয়।

গ. 'ডাক দেখি মন ডাকার মতো কেমন শ্যামা থাকতে পারে'। তেমন ব্যাকুল হ'য়ে ডাকতে পারলে তাঁর দেখা দিতেই হবে।

ঈশ্বরদর্শনের পর শরীর থাকে? কারু কারু কিছু কর্মের জন্য থাকে,—লোক-শিক্ষার জন্য। গঙ্গাস্নানে পাপ যায় আর মুক্তি হয়—কিন্তু চক্ষু অন্ধ যায় না। তবে পাপের জন্য যে কয় জন্ম কর্মভোগ করতে হয় সে কয় জন্মে আর হয় না। যে পাক দিয়েছে সেই পাকটাই কেবল ঘুরে যাবে। বাকীগুলো আর হবে না। কাম-ক্রোধাদি সব দগ্ধ হ'য়ে যায়,—তবে শরীরটা থাকে কিছু কর্মের জন্য।

ঈশ্বর দর্শনের লক্ষণ। ক. ঈশ্বর দর্শনের একটি লক্ষণ,—ভিতর থেকে মহাবায়ু গর্ গর্ ক'রে উঠে মাথার দিকে যায়। তখন যদি সমাধি হয়, ভগবানের দর্শন হয়।

খ. যখন দেখবে ঈশ্বরের নাম ক'রতেই অশ্রু আর পুলক হয়, তখন জানবে, কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি চলে গেছে, ঈশ্বর লাভ হ'য়েছে। দেশলাই যদি শুকনো হয়, একটা ঘষলেই দপ্ ক'রে জ্বলে উঠে। আর যদি ভিজে হয়, পঞ্চাশটা ঘষলেও কিছু হয় না। কেবল কাঠিগুলো ফেলা যায়। বিষয়-রসে রোসে থাকলে, কামিনী-কাঞ্চন-রসে মন ভিজে থাকলে, ঈশ্বরের উদ্দীপনা হয় না। হাজার চেষ্টা কর, কেবল পণ্ডশ্রম। বিষয়-রস শুকুলে তৎক্ষণাৎ উদ্দীপন হয়।

গ. তাঁকে দর্শন না করলে এরূপ অবস্থা হয় না, কিন্তু দর্শন করছে কি না তার লক্ষণ আছে। কখনও সে উন্মাদবৎ—হাসে কাঁদে নাচে গায়। কখনও বা বালকবৎ—পাঁচ বৎসরের বালকের অবস্থা। সরল উদার, অহংকার নাই, কোন জিনিসেআসক্তি নাই, কোন গুণের বশ নয়, সদা আনন্দময়। কখনও পিশাচবৎ—শুচি অশুচি ভেদ-বুদ্ধি থাকে না, আচার অনাচার এক হয়ে যায়। কখনও বা জড়বৎ, কি যেন দেখেছে। তাই কোনরূপ কর্ম করতে পারে না। কোনরূপ চেষ্টা করতে পারে না।

ঘ. যে ঈশ্বর লাভ করেছে, তার লক্ষণ আছে। সে হয়ে যায় বালকবৎ, উন্মাদবৎ, জড়বৎ, পিশাচবৎ। আর তার ঠিক বোধ হয় 'আমি যন্ত্র আর তিনি যন্ত্রী; তিনিই কর্তা, আর সকলেই অকর্তা। শিখরা যেমন বলেছিল, পাতাটি নড়ছে সেও ঈশ্বরের ইচ্ছা। রামের ইচ্ছাতেই সব হচ্ছে; এই বোধ। তাঁতী যেমন বলেছিল, রামের ইচ্ছাতেই কাপড়ের দাম এক টাকা ছয় আনা, রামের ইচ্ছাতেই ডাকাতি হলো; রামের ইচ্ছাতেই ডাকাত ধরা পড়লো। রামের ইচ্ছাতেই আমাকে পুলিশে নিয়ে গেল, আবার রামের ইচ্ছাতেই আমাকে ছেড়ে দিল।

ঈশ্বরদর্শনের সুখ। উন্মাদিনী!—ইয়া! ঈশ্বরকে লাভ করতে গেলে পাগল হতে হয়।

কামিনী-কাঞ্চনে মন থাকলে হয় না। কামিনীর সঙ্গে রমণ,—তাতে কি সুখ! ঈশ্বরদর্শন হলে রমণ-সুখের কোটিগুণ আনন্দ হয়। গৌরী বলত, মহাভাব হ'লে শরীরের সব ছিদ্র—লোমকূপ পর্যন্ত—মহাযোনি হয়ে যায়। এক একটি ছিদ্রে আত্মার সহিত রমণ-সুখ বোধ হয়।

ঈশ্বর ধারণা। ক. বাগানে কত গাছ, গাছে কত ডাল—এ সব হিসাবে তোমার কাজ কি? তুমি বাগানে আম খেতে এসেছ, আম খেয়ে যাও। তাঁতে ভক্তি প্রেম হবার জন্যই মানুষ-জন্ম। তুমি আম খেয়ে চলে যাও।

তুমি মদ খেতে এসেছ, শুঁড়ির দোকানে কত মণ মদ এ খপরে তোমার কাজ কি। এক গেলাস হ'লেই তোমার হ'য়ে যায়।

তোমার অনন্ত কান্ড জানবার কি দরকার।

তাঁর গুণ কোটি বৎসর বিচার করলেও কিছু জানতে পারবে না।

খ. অধম ভক্ত বলে, ঈশ্বর আছেন—ঐ আকাশের ভিতর অনেক দূরে। মধ্যম ভক্ত

বলে, ঈশ্বর সর্বভূতে চৈতন্যরূপে—প্রাণরূপে আছে। উত্তম ভক্ত বলে, ঈশ্বরই নিজে সব হয়েছেন, যা কিছু দেখি ঈশ্বরের এক একটি রূপ। তিনিই মায়া, জীব জগৎ এই সব হয়েছেন—তিনি ছাড়া আর কিছু নাই।

ঈশ্বর নির্লিপ্ত। পাপপুণ্য আছে, কিন্তু তিনি নিজে নির্লিপ্ত। বায়ুতে সুগন্ধ দুর্গন্ধ সব রকমই থাকে, কিন্তু বায়ু নিজে নির্লিপ্ত। তাঁর সৃষ্টিই এই রকম ; ভাল মন্দ, সৎ অসৎ ; যেমন গাছের মধ্যে কোনওটা আমগাছ, কোনওটা কাঁঠাল-গাছ, কোনওটা আমড়াগাছ। দেখ না, দুষ্ট লোকেরও প্রয়োজন আছে। যে তালুকের প্রজারা দুর্দান্ত, সে তালুকে একটা দুষ্ট লোককে পাঠাতে হয়, তবে তালুকের শাসন হয়।

ঈশ্বরবিশ্বাসী দম্পতি। আছে, অতি বিরল। বিষয়ী লোকেরা তাদের চিনতে পারে না। তবে এরূপটি হ'তে গেলে দুজনেরই ভাগ্য হওয়া চাই। দুজনেই যদি সেই ঈশ্বরানন্দ পেয়ে থাকে, তা হ'লেই এটি সম্ভব হয়। ভগবানের বিশেষ কৃপা চাই। না হ'লে সর্বদা অমিল হয়। একজনকে তফাতে যেতে হয়। যদি না মিল হয়, তা হ'লে বড় যন্ত্রণা। স্ত্রী হয়তো রাতদিন বলে, 'বাবা কেন এখানে বিয়ে দিলে। না খেতে পেলুম, না বাছাদের খাওয়াতে পারলুম ; না পরতে পেলুম, না বাছাদের পরাতে পেলুম, না একখানা গয়না। তুমি আমায় কি সুখে রেখেছো। চক্ষু বুজে ঈশ্বর ঈশ্বর করছো। ওসব পাগলামী ছাড়ো।'

ঈশ্বর-ব্যাকুলতা। কি জান, যতক্ষণ ভোগ-বাসনা থাকে ততক্ষণ ঈশ্বরকে জানতে বা দর্শন করতে প্রাণ ব্যাকুল হয় না। ছেলে খেলা নিয়ে ভুলে থাকে। সন্দেশ দিয়ে ভুলোও খানিক সন্দেশ খাবে। যখন খেলাও ভাল লাগে না, সন্দেশও ভাল লাগে না, তখন বলে, 'মা যাব!' আর সন্দেশ চায় না। যাকে চেনে না, কোনও কালে দেখে নাই, সে যদি বলে, আয় মার কাছে নিয়ে যাই—তারই সঙ্গে যাবে। যে কোলে করে নিয়ে যায় তারই সঙ্গে যাবে।

সংসারের ভোগ হ'য়ে গেলে ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়। কি করে তাঁকে পাবো, কেবল এই চিন্তা হয়। যে যা বলে তাই শুনে।

দ্র. 'সময় হলেই হয়।'

ঈশ্বরভক্ত। যার ঠিক্ ঠিক্ ঈশ্বরে ভক্তি আছে, সে শরীর, টাকা—এ সব গ্রাহ্য করে না। সে ভাবে, দেহ সুখের জন্য, কি লোকমান্যের জন্য, কি টাকার জন্য, আবার তপ জপ কি। এ সব অনিত্য, দিন দুই তিনের জন্য।

ঈশ্বর ভক্ত-বৎসল—ঈশ্বরের হাসি

ঈশ্বর ভক্ত-বৎসল। যে অকিঞ্চন, যে দীন, তার ভক্তি ঈশ্বরের প্রিয় জিনিস। খোল মাখান জাব যেমন গরুর প্রিয়। দুর্যোধন অত টাকা অত ঐশ্বর্য দেখাতে লাগল ; কিন্তু তার বাটীতে ঠাকুর গেলেন না। তিনি বিদুরের বাটী গেলেন।

তিনি ভক্তবৎসল, বৎসের পাছে যেমন গাভী ধায় সেইরূপ তিনি ভক্তের পাছে পাছে যান।

ঈশ্বর রসের সাগর। ।আমি নরেন্দ্রকে বলেছিলুম, দেখ, ঈশ্বর রসের সাগর। তোর ইচ্ছা হয় না কি যে, এই রসের সাগরে ডুব দিই ? আচ্ছা মনে কর, এক খুলি রস আছে, তুই মাছি হয়েছিস্ ; তা কোন্‌খানে ব'সে রস খাবি ? নরেন্দ্র বললে, 'আমি খুলির কিনারায় ব'সে মুখ বাড়িয়ে খাব।' আমি জিজ্ঞাসা কল্লুম, কেন ? কিনারায় বসবি কেন ? সে বললে, 'বেশী দূরে গেলে ডুবে যাব, আর প্রাণ হারাব।' তখন আমি বললুম, 'বাবা। সচ্চিদানন্দ সাগরে সে ভয় নাই। এ যে অমৃতের সাগর, ঐ সাগরে ডুব দিলে মৃত্যু হয় না, মানুষ অমর হয়। ঈশ্বরেতে পাগল হ'লে মানুষ বেহেড হয় না।'

ঈশ্বরলাভ। দ্রঃ 'কর্ম কতদিন'। ত্যাগ। এগিয়ে পড়।

ঈশ্বরলাভে ভাবাশ্রয়। দাস্য—যেমন হনুমানের। রামের কাজ করবার সময় সিংহ-তুল্য। স্ত্রীরও দাস্য ভাব থাকে,—স্বামীকে প্রাণপণে সেবা করে। মার কিছু কিছু থাকে—যশোদারও ছিল।

সখ্য—বন্ধুর ভাব ; এস, এস, কাছে এসে বস। শ্রীদামাদি কৃষ্ণকে কখন এঁটো ফল খাওয়াচ্ছে, কখনও ঘাড়ে চড়ছে।

বাৎসল্য—যেমন যশোদার। স্ত্রীরও কতকটা থাকে, স্বামীকে প্রাণ দিয়ে খাওয়ায়। ছেলেটি পেট ভ'রে খেলে তবেই মা সন্তুষ্ট। যশোদা, কৃষ্ণ খাবে বলে ননী হাতে করে বেড়াতেন।

মধুর—যেমন শ্রীমতীর। স্ত্রীরও মধুর ভাব। এ ভাবের ভিতরে সকল ভাবই আছে—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য '

ঈশ্বরলাভের উপায়। ব্যাকুল হ'য়ে তাঁর জন্য কাঁদতে পার ? লোকে ছেলের জন্য, স্ত্রীর জন্য, টাকার জন্য, এক ঘটি কাঁদে। কিন্তু ঈশ্বরের জন্য কে কাঁদছে ? যতক্ষণ ছেলে চুষি নিয়ে ভুলে থাকে, মা রান্না-বান্না বাড়ির সব কাজ করে। ছেলের যখন চুষি আর ভাল লাগে না—চুষি ফেলে চীৎকার ক'রে কাঁদে, তখন মা ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে দুড়্ দুড়্ ক'রে এসে ছেলেকে কোলে লয়।
দ্র : সুতোর আঁশ

ঈশ্বরলাভের পূর্ব লক্ষণ দেখে চেনা যায়। ঈশ্বর লাভের কতকগুলি লক্ষণ আছে : যার ভিতর অনুরাগের ঐশ্বর্য প্রকাশ হচ্চে তার ঈশ্বরলাভের আর দেরি নাই।

'অনুরাগের ঐশ্বর্য কি কি ? বিবেক, বৈরাগ্য, জীবে দয়া, সাধুসেবা, সাধুসঙ্গ, ঈশ্বরের নাম-গুণ কীর্তন, সত্য কথা এই সব।

'এই সকল অনুরাগের লক্ষণ দেখলে ঠিক বলতে পারা যায় ঈশ্বর দর্শনের আর দেরি নাই।] বাবু কোনও খানসামার বাড়ী যাবেন, এরূপ যদি ঠিক হয়ে থাকে, খানসামার বাড়ীর অবস্থা দেখে ঠিক বুঝতে পারা যায়। প্রথমে বন-জঙ্গল কাটা হয়, ঝুলঝাড়া হয় ; ঝাঁটপাট দেওয়া হয়। বাবু নিজেই সতরঞ্চ গুড়গুড়ি এই সব পাঁচ রকম জিনিস পাঠিয়ে দেন। এই সব আসতে দেখলেই লোকের বুঝতে

বাকি থাকে না, বাবু এসে পড়লেন ব'লে।'

ঈশ্বর সব জানাবেন। ঈশ্বরকে বল, আন্তরিক ডাক; তিনি জানিয়ে দেন, দেবেন। যদু মল্লিকের সঙ্গে আলাপ কর, যদু মল্লিকই বলে দেবে, তার ক'খানা বাড়ী, কত টাকার কোম্পানীর কাগজ। আগে সে সব জানবার চেষ্টা করা ঠিক নয়। আগে ঈশ্বরকে লাভ কর, তার পর যা ইচ্ছা, তিনিই জানিয়ে দেবেন।

ঈশ্বর সম্পর্কে সব ধারণাই আপাত সত্য। মৌলিক ভেদ নেই। একজন লোক বাহ্যে থেকে ফিরে এসে বললে, গাছতলায় একটি সুন্দর লাল গিরগিটি দেখে এলুম। আর একজন বললে, আমি তোমার আগে সেই গাছতলায় গিছলুম— লাল কেন হবে? সে সবুজ আমি স্বচক্ষে দেখেছি। আর একজন বললে, ও আমি বেশ জানি, তোমাদের আগে গিছিলাম, সে গিরগিটি আমিও দেখেছি। সে লালও নয়, সবুজও নয়, স্বচক্ষে দেখেছি নীল। আর দুইজন ছিল তারা বললে, হল্‌দে, পাঁস্‌টে—নানা রং। শেষে সব ঝগড়া বেধে গেল। সকলে জানে, আমি যা দেখেছি, তাই ঠিক। তাদের ঝগড়া দেখে একজন লোক জিজ্ঞাসা করলে, ব্যাপার কি? যখন সব বিবরণ শুনলে, তখন বললে, আমি ঐ গাছতলাতেই থাকি; আর ঐ জানোয়ার কি আমি চিনি। তোমরা প্রত্যেকে যা বলছ, তা সব সত্য; ও গিরগিটি,—কখন সবুজ, কখন নীল, এইরূপ নানা রং হয়। আবার কখন দেখি, একেবারে কোন রং নাই। নির্গুণ।

'অন্ধের হস্তি দর্শন' দ্রষ্টব্য।

ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন। সর্বভূতে আছেন। তবে ভাল লোকের সঙ্গে মাখামাখি চলে; মন্দ লোকের কাছ থেকে তফাত থাকতে হয়। বাঘের ভিতরেও নারায়ণ আছেন; তা বলে বাঘকে আলিঙ্গন করা চলে না। (সকলের হাস্য)। যদি বল বাঘ তো নারায়ণ, তবে কেন পালাবো। তার উত্তর—যারা বলছে 'পালিয়ে এসো' তারাও নারায়ণ, তাদের কথা কেন না শুনি?

একটা গল্প শোন। কোন এক বনে একটি সাধু থাকেন। তাঁর অনেকগুলি শিষ্য। তিনি একদিন শিষ্যদের উপদেশ দিলেন যে, সর্বভূতে নারায়ণ আছেন, এইটি জেনে সকলকে নমস্কার করবে। একদিন একটি শিষ্য হোমের জন্য কাঠ আনতে বনে গিছলো। এমন সময়ে একটা রব উঠলো, কে কোথায় আছ পালাও —একটা পাগলা হাতী যাচ্ছে। সবাই পালিয়ে গেল, কিন্তু শিষ্য পালাল না। সে জানে যে, হাতীও নারায়ণ, তবে কেন পালাব? এই বলে দাঁড়িয়ে রইল। নমস্কার ক'রে স্তব-স্তুতি করতে লাগলো। এদিকে মাহুত চেঁচিয়ে বলছে 'পালাও, পালাও'; শিষ্যটি তবুও নড়লো না। শেষে হাতীটা শুঁড়ে ক'রে তুলে নিয়ে তাকে একধারে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে গেল। শিষ্য ক্ষতবিক্ষত হ'য়েও অচৈতন্য হয়ে পড়ে রইল।

এই সংবাদ পেয়ে গুরু ও অন্যান্য শিষ্যেরা তাকে আশ্রমে ধরাধরি ক'রে নিয়ে গেল। আর ঔষধ দিতে লাগলো। খানিকক্ষণ পরে চেতনা হ'লে ওকে কেউ জিজ্ঞাসা করলে, তুমি কেন হাতী আসছে শুনে চলে গেলে না? সে বলল, গুরুদেব যে আমায় বলে দিয়েছিলেন, নারায়ণই মানুষ জীব-জন্তু সব

হয়েছেন। তাই আমি হাতী নারায়ণ আসছে দেখে সেখান থেকে সরে যাই নাই। গুরু তখন বললেন, বাবা, হাতী নারায়ণ আসছিলেন বটে, তা সত্য ; কিন্তু বাবা, মাহুত নারায়ণ তো তোমায় বারণ করেছিলেন। যদি সবই নারায়ণ তবে তার কথা বিশ্বাস করলে না কেন ? মাহুত নারায়ণের কথাও শুনতে হয়।

শাস্ত্রে আছে 'আপো নারায়ণঃ'—জল নারায়ণ। কিন্তু কোনও জল ঠাকুরসেবায় চলে ; আবার কোন জলে আঁচানো, বাসন মাজা, কাপড় কাচা কেবল চলে ; কিন্তু খাওয়া বা ঠাকুরসেবা চলে না। তেমনি সাধু, অসাধু, ভক্ত, অভক্ত, সকলেরি হৃদয়ে নারায়ণ আছেন। কিন্তু অসাধু, অভক্ত, দুষ্ট লোকের সঙ্গে ব্যবহার চলে না। মাখামাখি চলে না। কারও সঙ্গে কেবল মুখের আলাপ পর্যন্ত চলে, আবার কারও সঙ্গে তাও চলে না। ঐরূপ লোকের কাছ থেকে তফাতে থাকতে হয়।

ঈশ্বর সাকার না নিরাকার। তিনি সাকার আবার নিরাকার। একজন সন্ন্যাসী জগন্নাথ দর্শন ক'রতে গিছিল। জগন্নাথ দর্শন ক'রে সন্দেহ হ'ল ঈশ্বর সাকার না নিরাকার। হাতে দণ্ড ছিল, সেই দণ্ড দিয়ে দেখতে লাগল, জগন্নাথের গায়ে ঠেকে কি না। একবার এ-ধার থেকে ও-ধারে দণ্ডটি নিয়ে যাবার সময় দেখলে যে, জগন্নাথের গায়ে ঠেকল না—দেখে যে সেখানে ঠাকুরের মূর্তি নাই। আবার দণ্ড এ-ধার থেকে ও-ধারে লয়ে যাবার সময় বিগ্রহের গায়ে ঠেকল তখন সন্ন্যাসী বুঝল ঈশ্বর নিরাকার, আবার সাকার।

কিন্তু এটি ধারণা করা বড় শক্ত। যিনি নিরাকার, তিনি আবার সাকার কিরূপে হবেন। এ সন্দেহ মনে উঠে। আবার যদি সাকার হন, তো নানা রূপ কেন ?

ঈশ্বরকে লাভ না ক'রতে পারলে, এ সব বুঝা যায় না। সাধকের জন্য তিনি নানাভাবে নানারূপে দেখা দেন। একজনের এক গামলা রঙ ছিল। অনেকে তাঁর কাছে কাপড় রঙ করাতে আসতো। সে লোকটি জিজ্ঞাসা ক'রতো, তুমি কি রঙে ছোপাতে চাও। একজন হয়তো বললে, 'আমি লাল রঙে ছোপাতে চাই।' অমনি সেই লোকটি গামলার রঙে সেই কাপড়খানি ছুপিয়ে বলতো, 'এই লও, তোমার লাল রঙে ছোপান কাপড়।' আর একজন হয়তো বললে, 'আমার হলদে রঙে ছোপান চাই।' অমনি সেই লোকটি সেই গামলায় কাপড়খানি ডুবিয়ে বলতো, 'এই লও তোমার হলদে রঙে ছোপান কাপড়।' নীল রঙে ছোপাতে চাইলে আবার সেই একই গামলায় ডুবিয়ে সেই কথা, 'এই লও তোমার নীল রঙে ছোপান কাপড়।' এই রকমে যে যে-রঙে ছোপাতে চাইতো, তার কাপড় সেই রঙে সেই একই গামলা হতে ছোপান হ'ত। একজন লোক এই আশ্চর্য ব্যাপার দেখেছিল। যার গামলা, সে জিজ্ঞাসা ক'রলে, 'কেমন হে ! তোমার কি রঙে ছোপাতে হবে ?' তখন সে বললে, 'ভাই। তুমি যে রঙে রঙেছ, আমায় সেই রঙ দাও।'

ঈশ্বর স্বরূপ : ['জ্ঞানের আলো', 'সাকার নিরাকার দ্বন্দ্ব', 'সচ্চিদানন্দ সমুদ্র' 'সচ্চিদানন্দ সমুদ্রে মগ্ন হও' দ্রষ্টব্য।]

ঈশ্বর স্বরূপ নিয়ে মতভেদ। যে ভক্ত যেরূপ দেখে, সে সেইরূপ মনে করে।

বাস্তবিক কোনও গণ্ডগোল নাই। তাঁকে কোন রকমে যদি একবার লাভ করতে পারা যায়, তা হ'লে তিনি সব বুঝিয়ে দেন। সে পাড়াতেই গেলে না—সব খবর পাবে কেমন করে?

একটা গল্প শোন—

একজন বাহ্যে গিছিল। সে দেখলে যে গাছের উপর একটি জানোয়ার রয়েছে। সে এসে আর একজনকে বললে—দেখ, অমুক গাছে একটি সুন্দর লাল রঙের জানোয়ার দেখে এলাম। লোকটি উত্তর করলে, 'আমি যখন বাহ্যে গিছিলাম আমিও দেখেছি—তা সে লাল রঙ হ'তে যাবে কেন? সে যে সবুজ রঙ।' আর একজন বললে, 'না না—আমি দেখেছি, হলদে।' এইরূপে আরও কেউ কেউ বললে, 'না সাদা, বেগুনী, নীল' ইত্যাদি। শেষে ঝগড়া। তখন তারা গাছতলায় গিয়ে দেখে, একজন লোক বসে আছে। তাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বললে, 'আমি এই গাছতলায় থাকি, আমি সে জানোয়ারটিকে বেশ জানি—তোমরা যা যা বলছ, সব সত্য—সে কখন লাল, কখন সবুজ, কখন হলদে, কখন নীল আরও সব কত কি হয়। বহুরূপী। আবার কখনও দেখি, কোনও রঙই নাই। কখনও সগুণ, কখনও নির্গুণ।'

অর্থাৎ যে ব্যক্তি সদা-সর্বদা ঈশ্বর-চিন্তা করে সে-ই জানতে পারে তাঁর স্বরূপ কি। সে ব্যক্তিই জানে যে তিনি নানারূপে দেখা দেন, নানাভাবে দেখা দেন—তিনি সগুণ, আবার তিনি নির্গুণ। যে গাছতলায় থাকে, সে-ই জানে বহুরূপীর নানা রঙ—আবার কখন কখন কোন রঙই থাকে না। অন্য লোকে কেবল তর্ক ঝগড়া করে কষ্ট পায়।

কবীর বলতো, 'নিরাকার আমার বাপ, সাকার আমার মা।'

ভক্ত যে রূপটি ভালবাসে, সেইরূপে তিনি দেখা দেন—তিনি যে ভক্তবৎসল। পুরাণে আছে, বীরভক্ত হনুমানের জন্য তিনি রামরূপ ধ'রেছিলেন।

ঈশ্বরাধীন। দ্রঃ 'স্বাধীন ইচ্ছা'

ঈশ্বরীয় শক্তি। ঈশ্বরীয় শক্তির কাছে মানুষ কি করবে? অর্জুন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে বললেন, আমি যুদ্ধ ক'রতে পারবো না, জ্ঞাতি বধ করা আমার কর্ম নয়। শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'অর্জুন! তোমায় যুদ্ধ করতেই হবে, তোমার স্বভাবে করাবে।' শ্রীকৃষ্ণ সব দেখিয়ে দিলেন, এই এই সব লোক মরে রয়েছে।

শিখরা ঠাকুর বাড়িতে এসেছিল; তাঁদের মতে অশ্বত্থ গাছে যে পাতা নড়ছে, সেও ঈশ্বরের ইচ্ছায়—তাঁর ইচ্ছা বই একটি পাতাও নড়বার যো নাই।

ঈশ্বরে অনুরাগ। দ্রঃ 'কর্মনাশা নদী'

ঈশ্বরে কি করে মন হয়। ঈশ্বরের নাম গুণ গান সর্বদা ক'রতে হয়। আর সৎসঙ্গ—ঈশ্বরের ভক্ত বা সাধু, এঁদের কাছে মাঝে মাঝে যেতে হয়। সংসারের ভিতর ও বিষয় কাজের ভিতর রাতদিন থাকলে ঈশ্বরে মন হয় না। মাঝে মাঝে নির্জনে গিয়ে তাঁর চিন্তা করা বড় দরকার। প্রথম অবস্থায় মাঝে মাঝে নির্জন না হ'লে ঈশ্বরে মন রাখা বড়ই কঠিন।

যখন চারাগাছ থাকে, তখন তার চারিদিকে বেড়া দিতে হয়। বেড়া না দিলে

ছাগল-গরুতে খেয়ে ফেলে।

ধ্যান ক'রবে মনে, কোণে ও বনে। আর সর্বদা সদসৎ বিচার ক'রবে। ঈশ্বরই সৎ, কিনা নিত্যবস্তু, আর সব অসৎ, কিনা অনিত্য। এই বিচার ক'রতে ক'রতে অনিত্য বস্তু মন থেকে ত্যাগ ক'রবে।

['মন মত্ত করী' দ্রষ্টব্য]

ঈশ্বরের আলো। না গো! ভক্ত কিন্তু বাদলে পোকার মতো পুড়ে মরে না। ভক্ত যে আলো দেখে ছুটে যায়, সে যে মণির আলো! মণির আলো খুব উজ্জ্বল বটে, কিন্তু স্নিগ্ধ আর শীতল। এ আলোতে গা পুড়ে না, এ আলোতে শান্তি হয়, আনন্দ হয়।

[বাদলে পোকার সূত্রের জন্যে, 'ভক্তি যদি একবার হয়' দ্রষ্টব্য।]

ঈশ্বরেচ্ছা। তাঁর আবার ইচ্ছা কি? তাঁর কি কিছু অভাব আছে?

তাতেই বা দোষ কি? জল স্থির থাকলেও জল—তরঙ্গ হ'লেও জল।

সাপ চুপ করে কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকলেও সাপ—আবার তির্যক্‌গতি হয়ে এঁকে বেঁকে চললেও সাপ।

বাবু যখন চুপ করে আছে তখনও যে ব্যক্তি—যখন কাজ ক'রছে তখনও সেই ব্যক্তি।

ব্রহ্ম নির্লিপ্ত। বায়ুতে সুগন্ধ দুর্গন্ধ পাওয়া যায়, কিন্তু বায়ু নির্লিপ্ত। ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। সেই আদ্যাশক্তিতেই জীব জগৎ হয়েছে।

দ্রঃ কর্তব্য।

খ. সময় না হলে হয় না। যখন রোগ ভাল হয়ে এল, তখন কবিরাজ বললে, এই পাতাটি মরিচ দিয়ে বেটে খেও। তারপর রোগ ভাল হ'ল। তা মরিচ দিয়ে ঔষধ খেয়ে ভাল হ'ল, না আপনি ভাল হ'ল, কে বলবে?

লক্ষ্মণ লবকুশকে বললেন, তোরা ছেলেমানুষ, তোরা রামচন্দ্রকে জানিস না। তাঁর পাদস্পর্শে অহল্যা পাষাণী মানবী হয়ে গেল। লব কুশ বললে, ঠাকুর সব জানি, সব শুনেছি। পাষাণী যে মানবী হ'ল সে মুনিবাক্য ছিল। গৌতমমুনি বলেছিলেন যে, ত্রেতাযুগে রামচন্দ্র ঐ আশ্রমের কাছ দিয়ে যাবেন; তাঁর পাদস্পর্শে তুমি আবার মানবী হবে। তা এখন রামের গুণে না মুনিবাক্যে, কে বলবে বল।

সবই ঈশ্বরের ইচ্ছায় হচ্ছে। এখানে যদি তোমার চৈতন্য হয়, আমাকে জানবে হেতুমাত্র। চাঁদমামা সকলের মামা। ঈশ্বর-ইচ্ছায় সব হচ্ছে।'

ঈশ্বরে বিশ্বাস। 'বিশ্বাস' দ্রষ্টব্য।

ঈশ্বরের ঐশ্বর্য। ঈশ্বর কত কি করেছেন। তাঁর অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড—তাঁর অনন্ত ঐশ্বর্যের জ্ঞানে আমার দরকার কি। আর যদি জানতে ইচ্ছা করে, আগে তাঁকে লাভ করতে হয়, তারপর তিনি বলে দেবেন। যদু মল্লিকের ক'খানা বাড়ি, কত কোম্পানীর কাগজ আছে এ সবে আমার কি দরকার! আমার দরকার, যো সো করে বাবুর সঙ্গে আলাপ করা! তা পগার ডিঙ্গিয়েই হোক!—প্রার্থনা ক'রেই হোক। বা দ্বারবানের ধাক্কা খেয়েই হোক—আলাপের পর কত কি আছে

একবার জিজ্ঞাসা করলে বাবুই ব'লে দেন। আবার বাবুর সঙ্গে আলাপ হ'লে আমলারাও মানে।

কেউ কেউ ঐশ্বর্যের জ্ঞান চায় না। শুঁড়ীর দোকানে কত মণ মদ আছে আমার কি দরকার। আমার এক বোতলেই হয়ে যায়। ঐশ্বর্য জ্ঞান চাইবে কি, যেটুকু মদ খেয়েছে তাতেই মত্ত।

ঈশ্বরের ঐশ্বর্য বর্ণনা। হ্যাঁ গা, তোমরা অত ঈশ্বরের ঐশ্বর্য বর্ণনা কর কেন? আমি কেশব সেনকে ঐ কথা বলেছিলাম। একদিন তারা সব ওখানে (কালী-বাড়ীতে) গিছিল। আমি বললুম, তোমরা কি রকম লেকচার দাও, আমি শুনবো। তা গঙ্গার ঘাটের চাঁদনীতে সভা হ'ল, আর কেশব বলতে লাগল। বেশ বললে, আমার ভাব হ'য়ে গিছিল। পরে কেশবকে আমি বললুম, তুমি এগুলো এত বল কেন?—হে ঈশ্বর, তুমি কি সুন্দর ফুল করিয়াছ, তুমি আকাশ করিয়াছ, তুমি তারা করিয়াছ, তুমি সমুদ্র করিয়াছ, এই সব? যারা নিজে ঐশ্বর্য ভালবাসে তারা ঈশ্বরের ঐশ্বর্য বর্ণনা করতে ভালবাসে। যখন রাধা-কান্তের গয়না চুরি গেল, সেজোবাবু (রাসমণির জামাই) রাধাকান্তের মন্দিরে গিয়ে ঠাকুরকে বলতে লাগল, 'ছি ঠাকুর! তুমি তোমার গয়না রক্ষা করতে পারলে না!' আমি সেজোবাবুকে বললাম, ও তোমার কি বুদ্ধি! স্বয়ং লক্ষ্মী যাঁর দাসী, পদসেবা করেন, তাঁর কি ঐশ্বর্যের অভাব! এ গয়না তোমার পক্ষেই ভারী একটা জিনিস, কিন্তু ঈশ্বরের পক্ষে কতকগুলো মাটির ঢ্যালা! ছি! অমন হীনবুদ্ধির কথা বলতে নাই; কি ঐশ্বর্য তুমি তাঁকে দিতে পার? তাই বলি, যাঁকে নিয়ে আনন্দ হয়, তাঁকেই লোকে চায়; তার বাড়ি কোথায়, ক'খানা বাড়ি, ক'টা বাগান, কত ধন-জন, দাস-দাসী এ খবরে কাজ কি? নরেন্দ্রকে যখন দেখি, তখন আমি সব ভুলে যাই। তার কোথা বাড়ি, তার বাবা কি করে, ক'টি ভাই এসব কথা একদিন ভুলেও জিজ্ঞাসা করি নাই। ঈশ্বরের মাধুর্যরসে ডুবে যাও! তাঁর অনন্ত সৃষ্টি, অনন্ত ঐশ্বর্য! অত খবরে আমাদের কাজ কি!

ঈশ্বরের কাজ। ঈশ্বর তিনটি কাজ করছেন: সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়। মৃত্যু আছেই। প্রলয়ের সময় সব ধ্বংস হয়ে যাবে, কিছুই থাকবে না। মা কেবল সৃষ্টির বীজগুলি কুড়িয়ে রেখে দেবেন। আবার নূতন সৃষ্টির সময় সেই বীজ-গুলি বার করবেন। গিন্নীদের যেমন ন্যাতা কাঁতার হাঁড়ি থাকে। তাতে শশা-বীচি, সমুদ্রের ফেনা, নীলবড়ি ছোট ছোট পুঁটলিতে বাঁধা থাকে।

ঈশ্বরের কাজ বোঝা যায় না। ঈশ্বরের কার্য কিছু বোঝা যায় না। ভীষ্মদেব শরশয্যায় শুয়ে; পাণ্ডবেরা দেখতে এসেছেন। সঙ্গে কৃষ্ণ। এসে খানিকক্ষণ পরে দেখেন, ভীষ্মদেব কাঁদছেন। পাণ্ডবেরা কৃষ্ণকে বললেন, কৃষ্ণ কি আশ্চর্য! পিতামহ অষ্টবসুর একজন বসু; এঁর মতন জ্ঞানী দেখা যায় না; ইনিও মৃত্যুর সময় মায়াতে কাঁদছেন! কৃষ্ণ বললেন, ভীষ্ম সে জন্য কাঁদছেন না। ওঁকে জিজ্ঞাসা কর দেখি। জিজ্ঞাসা করাতে ভীষ্ম বললেন, কৃষ্ণ! ঈশ্বরের কার্য কিছু বুঝতে পারলাম না! আমি এই জন্য কাঁদছি যে সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষাৎ নারায়ণ ফিরছেন কিন্তু পাণ্ডবদের বিপদের শেষ নাই! এই কথা যখন ভাবি, দেখি যে

তাঁর কার্য কিছুই বোঝার যো নাই।

ঈশ্বরের ইচ্ছা। 'ভক্তের ইচ্ছা অনিচ্ছা' দ্রষ্টব্য।

ঈশ্বরের দাস। নিবৃত্তিই ভাল—প্রবৃত্তি ভাল নয়। এই অবস্থার পর আমার মাইনে সই করাতে ডেকেছিল—যেমন সবাই খাজাঞ্চির কাছে সই করে। আমি বল্লাম—তা আমি পারবো না। আমি ত চাচ্ছি না। তোমাদের ইচ্ছা হয় আর কারুকে দাও।

এক ঈশ্বরের দাস—আবার কার দাস হবো?

ঈশ্বরের দেখা। ঈশ্বরের কথা যদি কেউ বলে, লোকে বিশ্বাস করে না। যদি কোন মহাপুরুষ বলেন, আমি ঈশ্বরকে দেখেছি তবুও সাধারণ লোকে সেই মহাপুরুষের কথা লয় না। লোকে মনে করে, ও যদি ঈশ্বর দেখেছে, আমাদের দেখিয়ে দিগ্। কিন্তু একদিনে কি নাড়ী দেখতে শেখা যায়? বৈদ্যের সঙ্গে অনেকদিন ধরে ঘুরতে হয়; তখন কোনটা কফের কোনটা বায়ুর কোনটা পিত্তের নাড়ী বলা যেতে পারে। যাদের নাড়ী দেখা ব্যবসা, তাদের সঙ্গ করতে হয়।

অমুক নম্বরের সুতা, যে সে কি চিনতে পারে? সুতোর ব্যবসা করো, যারা ব্যবসা করে, তাদের দোকানে কিছু দিন থাক, তবে কোনটা চল্লিশ নম্বর, কোনটা একচল্লিশ নম্বরের সুতা ঝাঁ করে বলতে পারবে।

ঈশ্বরের পক্ষে। ঈশ্বরের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। তাঁর স্বরূপ কেউ মুখে বলতে পারে না। সকলই সম্ভব। দুজন যোগী ছিল; ঈশ্বরের সাধনা করে। নারদ ঋষি যাচ্ছিলেন। একজন পরিচয় পেয়ে বললেন—'তুমি নারায়ণের কাছ থেকে আসছ; তিনি কি করছেন?' নারদ বললেন, 'দেখে এলাম, তিনি ছুঁচের ভিতর দিয়ে উট হাতী প্রবেশ করাচ্ছেন, আবার বার করছেন।' একজন বললে 'তার আর আশ্চর্য কি। তাঁর পক্ষে সবই সম্ভব।' কিন্তু অপরটি বললে, 'তাও কি হতে পারে। তুমি কখনও সেখানে যাও নাই।'

ঈশ্বরের সত্য। তা ঈশ্বর শুধু সাকার বললে কি হবে। তিনি শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় মানুষের মতো দেহ ধারণ ক'রে আসেন, এও সত্য, নানা রূপ ধরে ভক্তকে দেখা দেন, এও সত্য। আবার তিনি নিরাকার, অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, এও সত্য। বেদে তাঁকে সাকার নিরাকার দুই বলেছে, সগুণ বলেছে, নির্গুণও বলেছে।

কি রকম জান? সচ্চিদানন্দ যেন অনন্ত সাগর। ঠাণ্ডার গুণে যেমন সাগরের জল বরফ হয়ে ভাসে, নানারূপ ধরে বরফের চাঁই সাগরের জলে ভাসে; তেমনি ভক্তিহিম লেগে সচ্চিদানন্দ সাগরে সাকার মূর্তি দর্শন হয়। ভক্তের জন্য সাকার। আবার জ্ঞানসূর্য উঠলে বরফ গলে যায়, আগেকার যেমন জল, তেমনি জল। অধঃ উর্ধ্ব পরিপূর্ণ। জলে জল। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে সব স্তব করেছে—ঠাকুর, তুমিই সাকার তুমিই নিরাকার; আমাদের সামনে তুমি মানুষ হয়ে বেড়াচ্চ, কিন্তু বেদে তোমাকেই বাক্য-মনের অতীত বলেছে।

তবে বলতে পার, কোন কোন ভক্তের পক্ষে তিনি নিত্য সাকার। এমন জায়গা আছে, যেখানে বরফ গলে না, স্ফটিকের আকার ধারণ করে।

ঈশ্বরের হাত। মানুষ গুরু হতে পারে না। ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই সব হচ্ছে। মহাপাতক, অনেক দিনের পাতক, অনেক দিনের অজ্ঞান, তাঁর কৃপা হ'লে এক-ক্ষণে পালিয়ে যায়।

হাজার বছরের অন্ধকার ঘরের ভিতর যদি হঠাৎ আলো আসে, তা হ'লে সেই হাজার বছরের অন্ধকার কি একটু একটু ক'রে যায়, না একক্ষণে যায়? অবশ্য আলো দেখালেই সমস্ত অন্ধকার পালিয়ে যায়।

মানুষ কি ক'রবে। মানুষ অনেক কথা বলে দিতে পারে, কিন্তু শেষে সব ঈশ্বরের হাত। উকিল বলে, আমি যা বলবার সব বলেছি, এখন হাকিমের হাত।

ঈশ্বরের হাসি। ভগবান দুই কথায় হাসেন। কবিরাজ যখন রোগীর মাকে বলে, মা! ভয় কি? আমি তোমার ছেলেকে ভাল ক'রে দিব—তখন একবার হাসেন; এই বলে হাসেন, আমি মারছি, আর এ কি না বলে আমি বাঁচাব। কবিরাজ ভাবছে, আমি কর্তা, ঈশ্বর যে কর্তা, এ কথা ভুলে গেছে। তারপর যখন দুই ভাই দড়ি ফেলে জায়গা ভাগ করে, আর বলে 'এ দিকটা আমার, ওদিকটা তোমার,' তখন ঈশ্বর আর একবার হাসেন; এই মনে ক'রে হাসেন, আমার জগৎ ব্রহ্মাণ্ড, কিন্তু ওরা বলছে, 'এ জায়গা আমার আর তোমার।'

উঁচু নীচু। নীচু হ'লে তবে উঁচু হওয়া যায়। চাতক পাখীর বাসা নীচে; কিন্তু ওঠে খুব উঁচুতে। উঁচু জমিতে চাষ হয় না। খাল জমি চাই, তবে জল জমে, তবে চাষ হয়।

উত্তম ভক্ত। উত্তম ভক্ত কে? যে ব্রহ্মজ্ঞানের পর দেখে, তিনিই জীবজগৎ, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন। প্রথমে 'নেতি' 'নেতি' বিচার করে ছাদে পেঁছিতে হ'ল। তারপর সে দেখে, ছাদও যে জিনিসে তৈয়ারি—ইট, চূণ, শুরকি—সিঁড়িও সেই জিনিসে তৈয়ারি। তখন দেখে ব্রহ্মই জীব-জগৎ সমস্ত হয়েছেন।

উদ্দীপন। চৈতন্যদেব যখন দক্ষিণে তীর্থভ্রমণ করছিলেন—দেখলেন একজন গীতা পড়ছে। আর একজন একটু দূরে বসে শুনছে, আর কাঁদছে—কেঁদে চোখ ভেসে যাচ্ছে। চৈতন্যদেব জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এ সব বুঝতে পারছো? সে বল্লে, ঠাকুর! আমি শ্লোক এ সব কিছুই বুঝতে পারছি না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তবে কেন কাঁদছো? ভক্তটি বল্লে, আমি দেখছি অর্জুনের রথ, আর তার সামনে ঠাকুর আর অর্জুন কথা কচ্চেন। তাই দেখে আমি কাঁদছি।'

দ্রঃ মন্দির প্রণাম।

উন্মাদের প্রকারভেদ। শ্রীমতী প্রেমোন্মাদ। আবার ভক্তি-উন্মাদ আছে। যেমন হনুমানের। সীতা আগুনে প্রবেশ করছে দেখে রামকে মারতে যায়। আবার আছে জ্ঞানোন্মাদ। একজন জ্ঞানী পাগলের মতো দেখেছিলাম। কালীবাড়ীর সবে প্রতিষ্ঠার পর। লোকে বললে, রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মসভার একজন। এক পায়ে ছেঁড়া জুতা, হাতে কঞ্চি আর একটি ভাঁড়, আঁবচারা। গঙ্গায় ডুব দিলে।

তারপর কালীঘরে গেল। হলধারী তখন কালীঘরে বসে আছে। তারপর মত্ত হয়ে স্তব করতে লাগলো—ক্ষ্রোং ক্ষ্রোং খট্টাঙ্গধারিণীং ইত্যাদি।

কুকুরের কাছে গিয়ে কাণ ধরে তার উচ্ছিষ্ট খেলে—কুকুর কিছু বলে নাই।

উপকার। হ্যাঁ গা তুমি কে? আর কি উপকার করবে? আর জগৎ কতটুকু গা, যে তুমি উপকার করবে?

উপগুরু। যাঁর কাছে যে কিছু শিক্ষা পাই, তাঁকে গুরু না বলে নির্দিষ্ট এক ব্যক্তিকে গুরু বলবার প্রয়োজন কি? ব্যাকুল প্রাণে যে তাঁকে ডাকে, তার কিছুই দরকার নাই। কিন্তু সচরাচর সে রকম ব্যাকুলতা দেখা যায় না বলেই গুরুর দরকার হয়। গুরু এক, কিন্তু উপগুরু অনেক হতে পারে। যাঁর কাছে কিছু শিক্ষা পাই—তিনিই উপগুরু। অবধূত এই রকম চব্বিশটি উপগুরু করেছিলেন। যেমন কোন অচেনা জায়গায় যেতে হলে যে জানে এমন একজনের কথামত চলতে হয়, অনেককে জিজ্ঞাসা করলে পথ গোল হয়ে যায়, সেই রকম ঈশ্বরের নিকট যেতে গেলে গুরুর কথামত চলতে হয়। এ নিমিত্ত একজন গুরুর দরকার।

দ্রঃ 'গুরু'।

উপদেশ দেওয়া কখন? আবার মনে মনে আদেশ হলে হয় না। তিনি সত্য সত্যই সাক্ষাৎকার হন আর কথা কন। তখন আদেশ হতে পারে। সে কথার জোর কত? পর্বত টলে যায়। শুধু লেকচার? দিনকতক লোক শুনবে, তারপর ভুলে যাবে। সে কথা অনুসারে কাজ করবে না। লোকশিক্ষা দেবে তার চাপরাশ চাই, না হলে হাসির কথা হয়ে পড়ে। আপনারই হয় না আবার অন্য লোক। কানা কানাকে পথ দেখিয়ে যাচ্ছে। হিতে বিপরীত। ভগবান লাভ হলে অন্তর্দৃষ্টি হয়, কার কি রোগ বোঝা যায়। উপদেশ দেওয়া যায়।

উপবাস ঃ দ্রঃ মেয়েরা।

উপাধি ও মায়া। জীব তো সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। কিন্তু এই মায়া বা অহংকারে তাদের সব নানা উপাধি হয়ে পড়েছে, আর তারা আপনার স্বরূপ ভুলে গেছে। এক একটি উপাধি হয়, আর জীবের স্বভাব বদলে যায়। যে কালাপেড়ে কাপড় প'রে আছে, অমনি দেখবে, তার নিধুর টপ্পার তাপ এসে জোটে; আর তাস খেলা, বেড়াতে যাবার সময় হাতে ছড়ি (stick) এই সব এসে জোটে। রোগা লোকও যদি বুট জুতা পরে সে অমনি শিস দিতে আরম্ভ করে, সিঁড়ি উঠবার সময় সাহেবদের মতো লাফিয়ে উঠতে থাকে। মানুষের হাতে যদি কলম থাকে, এমনি কলমের গুণ যে, সে অমনি একটা কাগজ-টাগজ পেলেই তার উপর ফ্যাস্ ফ্যাস্ ক'রে টান দিতে থাকবে।

উমেদার। একজন উমেদার বড়বাবুর কাছে আনাগোনা ক'রে হায়রান হ'য়েছে। কর্ম আর হয় না। অফিসের বড়বাবু। তিনি বলেন, এখন খালি নাই, মাঝে মাঝে এসে দেখা ক'রো। এইরূপে কতকাল কেটে গেল—উমেদার হতাশ হ'য়ে গেল। সে একজন বন্ধুর কাছে দুঃখ করছে। বন্ধু বললে, তোর যেমন বুদ্ধি।

ওটার কাছে আনাগোনা ক'রে পায়ের বাঁধন ছেঁড়া কেন? তুই গোলাপকে ধর,

কালই তোর কর্ম হবে। উমেদার বললে, বটে!—আমি এক্ষুণি চললুম। গোলাপ বড়বাবুর রাঁড়। উমেদার দেখা ক'রে বললে, মা, তুমি এটি না করলে হবে না—আমি মহা বিপদে পড়েছি। ব্রাহ্মণের ছেলে আর কোথায় যাই। মা, অনেকদিন কর্মকাজ নাই, ছেলেপুলে না খেতে পেয়ে মারা যায়। তুমি একটি কথা ব'লে দিলেই আমার একটি কাজ হয়। গোলাপ ব্রাহ্মণের ছেলেকে বললে, বাছা, কাকে বললে হয়? আর ভাবতে লাগলো, আহা ব্রাহ্মণের ছেলে বড় কষ্ট পাচ্ছে! উমেদার বললে, বড়বাবুকে একটি কথা বললে আমার নিশ্চয় একটা কর্ম হয়। গোলাপ বললে, আমি আজই বড়বাবুকে বলে ঠিক ক'রে রাখবো। তার পর দিন সকালে উমেদারের কাছে একটি লোক গিয়ে উপস্থিত; সে বললে, তুমি আজ থেকেই বড়বাবুর আফিসে বেরুবে। বড়বাবু সাহেবকে বললে, 'এ ব্যক্তি বড় উপযুক্ত লোক। একে নিযুক্ত করা হ'য়েছে, এর দ্বারা আফিসের বিশেষ উপকার হবে।'

ঊর্জিতা ভক্তি। অধ্যাত্মে আছে, লক্ষ্মণ রামকে জিজ্ঞাসা করলেন, রাম! তুমি কত ভাবে কত রূপে থাক, কিরূপে তোমায় চিনতে পারবো? রাম বললেন, ভাই! একটা কথা জেনে রাখ, যেখানে উর্জ্জিতা (ঊর্জিতা) ভক্তি সেখানে নিশ্চয়ই আমি আছি। উর্জ্জিতা (ঊর্জিতা) ভক্তিতে হাসে কাঁদে নাচে গায়। যদি কারু এরূপ ভক্তি হয়, নিশ্চয় জেনো, ঈশ্বর সেখানে স্বয়ং বর্তমান। চৈতন্যদেবের ঐরূপ হ'য়েছিল।

ঊর্ধ্বদৃষ্টি। মাছ ধরে শট্‌কা কল দিয়ে। বাঁশ সোজা থাকবার কথা; তবে নোয়ান রয়েছে কেন? মাছ ধরবে ব'লে। বাসনা মাছ। তাই মন সংসারে নোয়ান রয়েছে। বাসনা না থাকলে মনের সহজে ঊর্ধ্বদৃষ্টি হয়। ঈশ্বরের দিকে।
কি রকম জানো? নিক্তির কাঁটা যেমন। কামিনীকাঞ্চনের ভার আছে ব'লে উপরের কাঁটা নীচের কাঁটা এক হয় না। তাই যোগ ভ্রষ্ট হয়। দীপশিখা দেখ নাই? একটু হাওয়া লাগলেই চঞ্চল হয়। যোগাবস্থা দীপ-শিখার মতো—যেখানে হাওয়া নাই।

ঋণ। কতকগুলি ঋণ আছে। দেবঋণ, ঋষিঋণ, আবার মাতৃঋণ, পিতৃঋণ, স্ত্রীঋণ। মা বাপের ঋণ পরিশোধ না করলে কোন কাজই হয় না।
স্ত্রীর কাছেও ঋণ আছে। হরিশ স্ত্রীকে ত্যাগ করে এখানে এসে রয়েছে। যদি তার স্ত্রীর খাবার যোগাড় না থাকত, তা'লে বলতুম ঢ্যামনা শ্যালা!
জ্ঞানের পর ঐ স্ত্রীকে দেখবে সাক্ষাৎ ভগবতী। চণ্ডীতে আছে 'যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।' তিনিই মা হয়েছেন।
যত স্ত্রী দেখ, সব তিনিই। আমি তাই বৃন্দেকে কিছু বলতে পারি না। কেউ কেউ শোলক ঝাড়ে, লম্বা লম্বা কথা কয়, কিন্তু ব্যবহার আর এক রকম। রাম-প্রসন্ন। ঐ হঠযোগীর কিসে আফিম আর দুধের যোগাড় হয়, এই ক'রে ক'রে বেড়াচ্চে। আবার বলে, মনুতে সাধু সেবার কথা আছে। এদিকে বুড়ো মা

খেতে পায় না, নিজে হাট বাজার করতে যায়। এমনি রাগ হয়। ✓

ঋণ (গৃহস্থের)। গৃহস্থের ঋণ আছে। দেবঋণ, পিতৃঋণ, ঋষিঋণ ; আবার মাগঋণও আছে, একটি দুটি ছেলে হওয়া আর সতী হলে প্রতিপালন করা।

ঋণমুক্ত। তবে একটি কথা আছে। যদি প্রেমোন্মাদ হয় তা হ'লে কে বা বাপ, কে বা মা, কে বা স্ত্রী। ঈশ্বরকে এত ভালবাসা যে পাগলের মতো হ'য়ে গেছে! তার কিছুই কর্তব্য নাই, সব ঋণ থেকে মুক্ত। প্রেমোন্মাদ কি রকম? সে অবস্থা হ'লে জগৎ ভুল হয়ে যায়। নিজের দেহ যে এত প্রিয় জিনিস, তাও ভুল হয়ে যায়। চৈতন্যদেবের হয়েছিল। সাগরে ঝাঁপ দিয়ে পড়ছেন, সাগর ব'লে বোধ নাই। মাটিতে বার বার আছাড় খেয়ে পড়ছেন—ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই, নিদ্রা নাই ; শরীর বলে বোধই নাই।

ঋষি। ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি, রাজর্ষি। ব্রহ্মর্ষি, যেমন শুকদেব—একখানি বইও কাছে নাই। দেবর্ষি, যেমন নারদ। রাজর্ষি জনক—নিষ্কাম কর্ম করে।

ঋষিরা ভয়তরাসে। ঋষিরা ভয়তরাসে। তাদের ভাব কি জান? আমি যো সো ক'রে যাচ্ছি আবার কে আসে? খাদি কাঠ আপনি যো সো ক'রে ভেসে যায়—কিন্তু তার উপর একটি পাখী বসলে ডুবে যায়। নারদাদি বাহাদুরী কাঠ, আপনিও ভেসে যায়, আবার অনেক জীবজন্তুকেও নিয়ে যেতে পারে। স্টীম-বোট্—আপনিও পার হ'য়ে যায় এবং অপরকে পার ক'রে নিয়ে যায়।

নারদাদি আচার্য বিজ্ঞানী—অন্য ঋষিদের চেয়ে সাহসী। যেমন পাকা খেলোয়াড় ছকবাঁধা খেলা খেলতে পারে। কি চাও, ছয় না পাঁচ? ফি বারেই ঠিক পড়ছে! —এমনি খেলোয়াড়! —সে আবার মাঝে মাঝে গোঁপে তা দেয়।

শুধু জ্ঞানী যারা, তারা ভয়তরাসে। যেমন শতরঞ্চ খেলায় কাঁচা লোকেরা ভাবে, যো সো ক'রে একবার ঘুঁটি উঠলে হয়। বিজ্ঞানীর কিছুতেই ভয় নাই। সে সাকার-নিরাকার সাক্ষাৎকার করেছে!—ঈশ্বরের সঙ্গে আলাপ করেছে!—ঈশ্বরের আনন্দ সম্ভোগ করেছে!

তাঁকে চিন্তা ক'রে অখণ্ডে মন লয় হ'লেও আনন্দ,—আবার মন লয় না হ'লেও লীলাতে মন রেখেও আনন্দ।

একাদশী। ক. একাদশী তিন প্রকার। প্রথম—নির্জলা একাদশী, জল পর্যন্ত খাবে না। তেমনি ফকির পূর্ণত্যাগী, একেবারে সব ভোগ ত্যাগ। দ্বিতীয়—দুধ সন্দেশ খায়—ভক্ত যেমন গৃহে সামান্য ভোগ রেখে দিয়েছে। তৃতীয়—লুচি ছক্কা খেয়ে একাদশী—পেট ভরে খাচ্ছে ; হ'ল দু'খানা রুটি দুধে ভিজছে, পরে খাবে।

খ. একাদশী করা ভাল। ওতে মন বড় পবিত্র হয়, আর ঈশ্বরেতে ভক্তি হয়। কেমন?

দ্রষ্টব্য ঃ বীর্যপাত (সন্ন্যাসীর)

এগিয়ে পড়। একজন কাঠুরে বনে কাঠ কাটতে গিছিলো। হঠাৎ এক ব্রহ্মচারীর সঙ্গে দেখা হ'ল। ব্রহ্মচারী বললেন, ওহে, এগিয়ে পড়ো! কাঠুরে

বাড়িতে ফিরে এসে ভাবতে লাগলো ব্রহ্মচারী এগিয়ে যেতে বললেন কেন ?
এই রকমে কিছুদিন যায়। একদিন সে বসে আছে, এমন সময় এই ব্রহ্মচারীর কথাগুলি মনে পড়লো। তখন সে মনে মনে বললে, আজ আমি আরো এগিয়ে যাবো। বনে গিয়ে আরো এগিয়ে দেখে যে, অসংখ্য চন্দনের গাছ। তখন আনন্দে গাড়ি গাড়ি চন্দনের কাঠ নিয়ে এলো, আর বাজারে বেচে খুব বড় মানুষ হয়ে গেল।
এই রকমে কিছুদিন যায়। আর একদিন মনে পড়লো ব্রহ্মচারী বলেছেন, 'এগিয়ে পড়।' তখন আবার বনে গিয়ে এগিয়ে দেখে নদীর ধারে রুপোর খনি। এ কথা সে কখন স্বপ্নেও ভাবে নাই। তখন খনি থেকে কেবল রুপো নিয়ে গিয়ে বিক্রি করতে লাগলো। এত টাকা হ'ল যে আণ্ডিল হয়ে গেল।
আবার কিছুদিন যায়। একদিন ব'সে ভাবছে ব্রহ্মচারী তো আমাকে রুপোর খনি পর্যন্ত যেতে বলেন নাই—তিনি যে আমাকে এগিয়ে যেতে বলেছেন। এবার নদীর পারে গিয়ে দেখে, সোনার খনি। তখন সে ভাবলে, ওহো! তাই ব্রহ্মচারী ব'লেছিলেন, এগিয়ে পড়।
আবার কিছুদিন পরে এগিয়ে দেখে, হীরে মানিক রাশিকৃত পড়ে আছে। তখন তার কুবেরের মতো ঐশ্বর্য হ'ল।
তাই বলছি যে, যা কিছু কর না কেন, এগিয়ে গেলে আরো ভালো জিনিষ পাবে। একটু জপ ক'রে উদ্দীপন হ'য়েছে বলে মনে করো না, যা হবার তা হয়ে গেছে। কর্ম কিন্তু জীবনের উদ্দেশ্য নয়। আরো এগোও, কর্ম নিষ্কাম করতে পারবে। তবে নিষ্কাম কর্ম বড় কঠিন, তাই ভক্তি ক'রে ব্যাকুল হ'য়ে তাঁকে প্রার্থনা কর, হে ঈশ্বর, তোমার পাদপদ্মে ভক্তি দাও, আর কর্ম কমিয়ে দাও। আর যেটুকু রাখবে, সেটুকু কর্ম যেন নিষ্কাম হ'য়ে করতে পারি।
আরও এগিয়ে গেলে ঈশ্বরকে লাভ হবে। তাঁকে দর্শন হবে। ক্রমে তাঁর সঙ্গে আলাপ কথাবার্তা হবে।

ঐশ্বর্য ও ঈশ্বর। যখন বিষ্ণুঘরের গয়না সব চুরি গেল, তখন সেজোবাবু আর আমি ঠাকুরকে দেখতে গেলাম। সেজোবাবু বললে, 'দূর ঠাকুর! তোমার কোন যোগ্যতা নাই। তোমার গা থেকে সব গয়না নিয়ে গেল, আর তুমি কিছু করতে পারলে না!' আমি তাঁকে বললাম, 'এ তোমার কি কথা! তুমি যাঁর গয়না গয়না কোরছো, তাঁর পক্ষে এগুলো মাটির ডেলা! লক্ষ্মী যাঁর শক্তি, তিনি তোমার গুটিকতক টাকা চুরি গেল কি না, এই নিয়ে কি হাঁ করে আছেন? এ রকম কথা বলতে নাই।'
ঈশ্বর কি ঐশ্বর্যের বশ? তিনি ভক্তির বশ। তিনি কি চান? টাকা নয়। ভাব, প্রেম, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য এই সব চান।
ঐশ্বর্য-প্রীতি। ব্রহ্মজ্ঞানীরা অতো মহিমা বর্ণনা করে কেন? 'হে ঈশ্বর, তুমি চন্দ্র করিয়াছ, সূর্য করিয়াছ, নক্ষত্র করিয়াছ!' এ সব কথা এত কি দরকার? অনেকে বাগান দেখেই তারিফ করে। বাবুকে দেখতে চায় ক'জন। বাগান বড়

না বাবু বড়।

মদ খাওয়া হ'লে শুঁড়ির দোকানে কত মণ মদ আছে, তার হিসাবে আমার কি দরকার ? আমার এক বোতলেই কাজ হয়ে যায়।

নরেন্দ্রকে যখন দেখি, কখনও জিজ্ঞাসা করি নাই, 'তোর বাপের নাম কি ? তোর বাপের কখানা বাড়ী ?'

কি জান ? মানুষ নিজে ঐশ্বর্যের আদর করে ব'লে, ভাবে ঈশ্বরও ঐশ্বর্যের আদর করেন। ভাবে, তাঁর ঐশ্বর্যের প্রশংসা করলে তিনি খুশি হবেন। শম্ভু বলেছিল—আর এখন এই আশীর্বাদ কর, যাতে এই ঐশ্বর্য তাঁর পাদপদ্মে দিয়ে মরতে পারি। আমি বললুম, এ তোমার পক্ষেই ঐশ্বর্য ; তাঁকে তুমি কি দিবে ? তাঁর পক্ষে এগুলো কাঠ মাটি।

ওঙ্কার ধ্বনি। আমি উপমা দিই ঘণ্টার টং শব্দ। ট-অ-অ-ম-ম-। লীলা থেকে নিত্যে লয় ; স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ থেকে মহাকারণে লয়। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি থেকে তুরীয়ে লয়। আবার ঘণ্টা বাজলো, যেন মহাসমুদ্রে একটা গুরু জিনিস পড়লো আর ঢেউ আরম্ভ হ'ল। নিত্য থেকে লীলা আরম্ভ হ'ল, মহাকারণ থেকে স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ শরীর দেখা দিল—সেই তুরীয় থেকেই জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি সব অবস্থা এসে পড়লো। আবার মহাসমুদ্রের ঢেউ মহাসমুদ্রেই লয় হ'ল। নিত্য ধ'রে ধ'রে লীলা, আবার লীলা ধরে নিত্য। আমি টং শব্দ উপমা দিই। আমি ঠিক এই সব দেখেছি। আমায় দেখিয়ে দিয়েছে চিৎসমুদ্র, অন্ত নাই। তাই থেকে এই সব লীলা উঠলো, আর ঐতেই লয় হয়ে গেল। চিদাকাশে কোটি ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, আবার ঐতেই লয় হয়, তোমাদের বইয়ে কি আছে, অত আমি জানি না।

ওঠা-নামা। গাড়ীতে বা নৌকায় যাবার সময় আগে গিয়ে উঠবে, আর নামবার সময় কোনও জিনিসটা নিতে ভুল হয়েছে কিনা দেখে শুনে সকলের শেষে নামবে।

কপট সাধনা। এক জেলে রাত্রে এক বাগানে জাল ফেলে মাছ চুরি করছিল। গৃহস্থ জানতে পেরে তাকে লোকজন দিয়ে ঘিরে ফেললে। মশাল-টশাল নিয়ে চোরকে খুঁজতে এলো। এদিকে জেলেটা খানিকটা ছাই মেখে একটা গাছতলায় সাধু হয়ে বসে আছে। ওরা অনেক খুঁজে দেখে, জেলে-টেলে কেউ নেই, কেবল গাছতলায় একটি সাধু ভস্মমাখা ধ্যানস্থ। পরদিন পাড়ায় খবর হ'ল, একজন ভারী সাধু ওদের বাগানে এসেছে। এই যত লোক ফল ফুল সন্দেশ মিষ্টান্ন দিয়ে সাধুকে প্রণাম করতে এলো। অনেক টাকা-পয়সাও সাধুর সামনে পড়তে লাগলো। জেলেটা ভাবল, কি আশ্চর্য ! আমি সত্যকার সাধু নই, তবু আমার উপর লোকের এত ভক্তি। তবে সত্যকার সাধু হ'লে নিশ্চয়ই ভগবানকে পাব, সন্দেহ নাই।

কপট সাধনাতেই এতদূর চৈতন্য হ'ল। সত্য সাধন হলে ত কথাই নাই।

কোন্‌টা সৎ কোন্‌টা অসৎ বুঝতে পারবে। ঈশ্বরই সত্য, সংসার অনিত্য।

কন্যা শক্তিরূপা। মেয়েরা এক একটি শক্তির রূপ। পশ্চিমে বিবাহের সময় বরের হাতে ছুরি থাকে, বাঙ্গালা দেশে জাঁতি থাকে ;—অর্থাৎ ওই শক্তিরূপা কন্যার সাহায্যে বর মায়াপাশ ছেদন ক'রবে। এটি বীরভাব। আমি বীরভাবে পূজা করি নাই। আমার সন্তানভাব।

কন্যা শক্তিরূপা। বিবাহের সময় দেখ নাই—বর বোকাটি পিছনে বসে থাকে ? কন্যা কিন্তু নিঃশঙ্ক।

কবীর দাস। কবীর দাস নিরাকারবাদী। শিব, কালী, কৃষ্ণ এদের মানত না। কবীর বলত, কালী চাল কলা খান, কৃষ্ণ গোপীদের হাততালিতে বাঁদর নাচ নাচতেন।

কর্তব্য-১। কোন রকম ক'রে তাঁর সঙ্গে যোগ হয়ে থাকা। দুই পথ আছে—কর্ম-যোগ আর মনোযোগ।

যারা আশ্রমে আছে, তাদের যোগ কর্মের দ্বারা। ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস। সন্ন্যাসীরা কাম্য কর্ম ত্যাগ ক'রবে কিন্তু নিত্যকর্ম কামনাশূন্য হয়ে করবে। দণ্ডধারণ, ভিক্ষা করা, তীর্থযাত্রা, পূজা, জপ—এ সব কর্মের দ্বারা তাঁর সঙ্গে যোগ হয়।

আর যে কর্মই কর, ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ ক'রে কামনাশূন্য হ'য়ে করতে পারলে তাঁর সঙ্গে যোগ হয়।

আর এক পথ মনোযোগ। এরূপ যোগীর বাহিরের কোন চিহ্ন নাই। অন্তরে যোগ। যেমন জড়ভরত, শুকদেব। আরও কত আছে—এঁরা নামজাদা। এঁদের শরীরে চুল দাড়ি, যেমন তেমনই থাকে।

পরমহংস অবস্থায় কর্ম উঠে যায়। স্মরণ মনন থাকে। সর্বদাই মনের যোগ। যদি কর্ম করে সে লোকশিক্ষার জন্য।

কর্মের দ্বারাই যোগ হউক, আর মনের দ্বারাই যোগ হউক, ভক্তি হ'লে সব জানতে পারা যায়।

কর্তব্য-২। একজন লোকের পাহাড়ের উপর একখানা ঘর ছিল। কুঁড়েঘর। অনেক মেহনত ক'রে ঘরখানি ক'রেছিল। কিছুদিন পরে একদিন ভারী ঝড় এলো। কুঁড়েঘর টলমল ক'রতে লাগলো। তখন ঘর রক্ষার জন্য সে ভারী চিন্তিত হ'ল। বললে, হে পবনদেব, দেখো ঘরটি ভেঙ্গো না বাবা। পবনদেব কিন্তু শুনছেন না। ঘর মড়মড় ক'রতে লাগলো ; তখন লোকটা একটা ফিকির ঠাওরালে ;—তার মনে পড়লো যে, হনুমান পবনের ছেলে। যাই মনে পড়া অমনি ব্যস্ত হ'য়ে ব'লে উঠলো—বাবা ! ঘর ভেঙ্গো না, হনুমানের ঘর, দোহাই তোমার। ঘর তবুও মড়মড় করে। কেবা তার কথা শুনে। অনেকবার 'হনু-মানের ঘর' 'হনুমানের ঘর' করার পর দেখলে যে কিছুই হ'ল না। তখন বলতে লাগলো, 'বাবা লক্ষ্মণের ঘর' 'লক্ষ্মণের ঘর'। তাতেও হ'ল না। তখন বলে, বাবা 'রামের ঘর ! রামের ঘর !' দেখো বাবা ভেঙ্গো না, দোহাই তোমার। তাতেও কিছু হ'ল না', ঘর মড়মড় ক'রে ভাঙ্গতে আরম্ভ হ'ল। তখন প্রাণ বাঁচাতে

হবে, লোকটা ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার সময় ব'লছে—যা শালার ঘর!

যা কিছু হয়েছে, জানবে—ঈশ্বরের ইচ্ছায়। তাঁর ইচ্ছাতে হ'ল আবার তাঁর ইচ্ছাতে যাচ্ছে ; তুমি কি করবে ? তোমার এখনও কর্তব্য যে, ঈশ্বরেতে সব মন দাও—তাঁর প্রেমের সাগরে ঝাঁপ দাও।

কর্তা। গুরু-বাবা-কর্তা দ্রষ্টব্য।

কর্তাভজা। এক মতে আছে, মেয়েমানুষ নিয়ে সাধন করা। কর্তাভজা মাগীদের ভিতর আমায় একবার নিয়ে গিছিল। সব আমার কাছে এসে বসলো। আমি তাদের মা, মা বলাতে পরস্পর বলাবলি করতে লাগল, ইনি প্রবর্তক, এখনও ঘাট চিনেন নাই! ওদের মতে কাঁচা অবস্থাকে বলে প্রবর্তক ; তার পরে সাধক ; তার পর সিদ্ধের সিদ্ধ।

একজন মেয়ে বৈষ্ণবচরণের কাছে গিয়ে ব'সলো। বৈষ্ণবচরণকে জিজ্ঞাসা করাতে বললে, এর বালিকা ভাব!

স্ত্রীভাবে শীঘ্র পতন হয়। মাতৃভাব শুদ্ধভাব।

দ্রঃ ভগিতেলী।

কর্তাভজা মত : দ্রঃ ঘোষপাড়ার মত।

কর্তাভজা রীতি। কর্তাভজারা বলে প্রবর্তক, সাধক, সিদ্ধ, সিদ্ধের সিদ্ধ। প্রবর্তক ফোঁটা কাটে, গলায় মালা রাখে ; আর আচারী। সাধক—তাদের অত বাহিরের আড়ম্বর থাকে না, যেমন বাউল। সিদ্ধ—যার ঠিক বিশ্বাস যে ঈশ্বর আছেন। সিদ্ধের সিদ্ধ—যেমন চৈতন্যদেব। ঈশ্বরকে দর্শন করেছেন আর সর্বদা কথাবার্তা আলাপ। সিদ্ধের সিদ্ধকেই ওরা সাঁই বলে। সাঁইয়ের পর আর নাই।

কর্ম। সংসার কর্মভূমি। এখানে কর্ম করতে আসা। যেমন দেশে বাড়ী, কলকাতায় গিয়ে কর্ম করে।

কিছু কর্ম করা দরকার। সাধন। তাড়াতাড়ি কর্মগুলি শেষ করে নিতে হয়। স্যাকরারা সোনা গলাবার সময় হাপর, পাখা, চোঙ সব দিয়ে হাওয়া করে যাতে আগুনটা খুব হয়ে সোনাটা গলে। সোনা গলার পর তখন বলে, তামাক সাজ্। এতক্ষণ কপাল দিয়ে ঘাম পড়ছিল। তারপর তামাক খাবে।

খুব রোক চাই। তবে সাধন হয়। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

দ্রঃ 'নারদীয়ভক্তি', 'কলিতে ভক্তিযোগ', 'বিষয়কর্ম', 'জীবনের উদ্দেশ্য', 'কর্ম ও ভক্তি,' 'ভক্ত ও কর্ম' 'বিশ্বাস-আনন্দ-কর্ম'।

কর্ম আর কেন ? না গো, কর্ম ভাল। জমি পাট করা হ'লে যা রুইবে, তাই জন্মাবে। তবে কর্ম নিষ্কামভাবে করতে হয়।

পরমহংস দুই প্রকার। জ্ঞানী পরমহংস। যিনি জ্ঞানী তিনি আপ্তসার—আমার হ'লেই হ'ল। যিনি প্রেমী যেমন শুকদেবাদি, ঈশ্বরকে লাভ ক'রে আবার লোক-শিক্ষা দেন। কেউ আম খেয়ে মুখটি পুঁছে ফেলে, কেউ পাঁচজনকে দেয়। কেউ পাতকুয়া খুঁড়বার সময়—ঝুড়ি-কোদাল আনে, খোঁড়া হয়ে গেলে ঝুড়ি-কোদাল রেখে দেয় যদি পাড়ার লোকের কারুর দরকার লাগে। শুকদেবাদি পরের জন্য ঝুড়ি-কোদাল তুলে রেখেছিলেন। তুমি পরের জন্য রাখবে।

কর্ম ও ভক্তি। ফল হ'লেই ফুল প'ড়ে যায়। ভক্তি—ফল ; কর্ম—ফুল। গৃহস্থের বউ পেটে ছেলে হ'লে বেশী কর্ম করতে পারে না। শাশুড়ী দিন দিন তার কর্ম কমিয়ে দেয়। দশমাস পড়লে শাশুড়ী প্রায় কর্ম করতে দেয় না। ছেলে হ'লে সে ঐটিকে নিয়ে কেবল নাড়াচাড়া করে, আর কর্ম করতে হয় না। সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয় হয়। গায়ত্রী প্রণবে লয় হয়। প্রণব সমাধিতে লয় হয়। যেমন ঘণ্টার শব্দ…টং…ট-অ-ম। যোগী নাদ ভেদ ক'রে পরব্রহ্মে লয় হন। সমাধি মধ্যে সন্ধ্যাদি কর্মের লয় হয়। এই রকমে জ্ঞানীদের কর্মত্যাগ হয়।

কর্ম কতদিন। ক. ঈশ্বরলাভ না হ'লে কেউ একেবারে কর্মত্যাগ করতে পারে না। সন্ধ্যাদি কর্ম কতদিন ? যতদিন না ঈশ্বরের নামে অশ্রু আর পুলক হয়। একবার 'ওঁ রাম,' বলতে যদি চোখে জল আসে, নিশ্চয় জেনো তোমার কর্ম শেষ হ'য়েছে। আর সন্ধ্যাদি কর্ম ক'রতে হবে না।

খ. কর্ম যে বরাবরই ক'রতে হয়, তা' নয়। ঈশ্বর লাভ হ'লে আর কর্ম থাকে না। ফল হলে ফুল আপনিই ঝরে যায়।

গ. যার লাভ হয়, তার সন্ধ্যাদি কর্ম থাকে না। সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লীন হয়। তখন গায়ত্রী জপলেই হয়। আর গায়ত্রী ওঁকারে লয়। তখন গায়ত্রীও বলতে হয় না। তখন শুধু 'ওঁ'বললেই হয়। সন্ধ্যাদি কর্মকত দিন ? যতদিন হরিনামে কি রামনামে পুলক না হয়, আর ধারা না পড়ে।

কর্ম কত দিন করতে হবে ? ফল লাভ হলে আর ফুল থাকে না। ঈশ্বর লাভ হলে কর্ম আর করতে হয় না। মনও লাগে না।

মাতাল বেশী মদ খেয়ে হুঁশ রাখতে পারে না—দু'আনা খেলে কাজকর্ম চলতে পারে। ঈশ্বরের দিকে যতই এগুবে ততই তিনি কর্ম কমিয়ে দেবেন। ভয় নাই। গৃহস্থের বউ অন্তঃসত্ত্বা হলে শাশুড়ী ক্রমে ক্রমে কর্ম কমিয়ে দেয়। দশ মাস হ'লে আদপে কর্ম করতে দেয় না। ছেলেটি হ'লে ঐটিকে নিয়ে নাড়াচাড়া করে।

যে কটা কর্ম আছে, সে কটা শেষ হয়ে গেলে নিশ্চিন্ত। গৃহিণী বাড়ির রাঁধা-বাড়া আর কাজকর্ম সেরে যখন নাইতে গেল, তখন আর ফেরে না—তখন ডাকা-ডাকি করলেও আর আসবে না।

কর্মকাণ্ড। দ্রঃ ধর্মাধর্ম।

কর্মক্ষয়। 'অবধূতের গুরু' দ্রষ্টব্য।

কর্ম চাই। 'ঈশ্বরদর্শন কর্ম' চাই দ্রষ্টব্য।

কর্মত্যাগ। কর্ম ত্যাগ করবে কেন ? ঈশ্বরের চিন্তা, তাঁর নাম গুণ গান, নিত্যকর্ম এ সব করতে হবে।

বিষয়-কর্ম ? হাঁ, তাও ক'রবে, সংসারযাত্রার জন্য যেটুকু দরকার। কিন্তু কেঁদে নির্জনে তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হবে, যাতে ঐ কর্মগুলি নিষ্কামভাবে করা যায়। আর বলবে, হে ঈশ্বর, আমার বিষয়-কর্ম কমিয়ে দাও, কেন না, ঠাকুর, দেখছি যে বেশী কর্ম জুটলে তোমায় ভুলে যাই। মনে করছি, নিষ্কাম কর্ম করছি, কিন্তু সকাম হ'য়ে পড়ে। হয়তো দান সদাব্রত বেশী করতে গিয়ে লোকমান্য হ'য়ে পড়ে।

কর্ম-ত্যাগের অধিকার। যখন একবার হরি বা একবার রাম নাম করলে রোমাঞ্চ হয়, অশ্রুপাত হয়, তখন নিশ্চয়ই জেনো যে, সন্ধ্যাদি কর্ম আর করতে হবে না। তখন কর্মত্যাগের অধিকার হয়েছে—কর্ম আপনা-আপনি ত্যাগ হ'য়ে যাচ্ছে। তখন কেবল রামনাম, কি হরিনাম কি শুদ্ধ ওঁকার জপলেই হ'ল।

কর্মনাশা নদী। দেখ কর্মনাশা বলে একটি নদী আছে। সে নদীতে ডুব দেওয়া এক মহাবিপদ। ডুব দিলে কর্মনাশ হ'য়ে যায়—সে ব্যক্তি আর কোন কর্ম করতে পারে না।

কর্মফল। তিনি সব করাচ্ছেন বটে ; তিনিই কর্তা, মানুষ যন্ত্রের স্বরূপ। আবার এও ঠিক যে কর্মফল আছেই আছে। লংকামরিচ খেলেই পেট জ্বালা করবে ; তিনিই ব'লে দিয়েছেন যে, খেলে পেট জ্বালা করবে। পাপ করলেই তার ফলটি পেতে হবে।

যে ব্যক্তি সিদ্ধি লাভ করেছে, যে ঈশ্বর দর্শন করেছে, সে কিন্তু পাপ করতে পারে না। সাধা-লোকের বেতালে পা পড়ে না। যার সাধা গলা, তার সুরেতে সা, রে, গা, মা'ই এসে পড়ে।

খানিকটা কর্মফল ভোগ হয়। কিন্তু তাঁর নামের গুণে অনেক কর্মপাশ কেটে যায়। একজন পূর্বজন্মের কর্মের দরুণ সাত জন্ম কানা হ'ত ; কিন্তু সে গঙ্গাস্নান করলে। গঙ্গাস্নানে মুক্তি হয়। সে ব্যক্তির চক্ষু যেমন কানা সেই রকম রইলো, কিন্তু তার যে ছ'জন্ম সেটা হ'ল না।

কর্মভোগ। ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই ; তাই এতো কর্মভোগ। লোকে বলে যে, গঙ্গাস্নানের সময় তোমার পাপগুলো তোমায় ছেড়ে গঙ্গার তীরের গাছের উপর ব'সে থাকে। যাই তুমি গঙ্গাস্নান ক'রে তীরে উঠছো অমনি পাপগুলো তোমার ঘাড়ে আবার চেপে বসে। দেহত্যাগের সময় যাতে ঈশ্বর-চিন্তা হয়, তাই তার আগে থাকতে উপায় করতে হয়। উপায়—অভ্যাসযোগ। ঈশ্বর-চিন্তা অভ্যাস করলে শেষের দিনও তাঁকে মনে পড়বে।

কর্মযোগ। কর্মযোগ বড় কঠিন। শাস্ত্রে যে কর্ম করতে বলেছে, কলিকালে করা বড় কঠিন। অন্নগত প্রাণ। বেশী কর্ম চলে না। জ্বর হ'লে কবিরাজী চিকিৎসা করতে গেলে এদিকে রোগীর হ'য়ে যায়। বেশী দেরী সয় না। এখন ডি. গুপ্ত। কলিযুগে ভক্তিযোগ, ভগবানের নাম গুণ গান আর প্রার্থনা। ভক্তিযোগই যুগধর্ম।

দ্র : 'যোগের প্রকাব'

কর্মযোগ বড় কঠিন। 'যোগের প্রকার' দ্রষ্টব্য।

কর্মক্ষেত্র। সংসার কর্মক্ষেত্র, কর্ম করতে করতে তবে জ্ঞান হয়। গুরু বলেছেন, এই সব কর্ম করো, আর এই সব কর্ম ক'রো না। তিনি আবার নিষ্কাম কর্মের উপদেশ দেন। কর্ম করতে করতে মনের ময়লা কেটে যায়। ভাল ডাক্তারের হাতে পড়লে ঔষধ খেতে খেতে যেমন রোগ হোক না. সেরে যায়।

কলকাতার হুজুগ। কলকাতার হুজুগ তো জানো। যতক্ষণ কাঠে জ্বাল, দুধ ফোঁস ক'রে ফোলে। কাঠ টেনে নিলে কোথাও কিছু নাই। কলকাতার লোক

হুজুগে। এই এখানটায় কুয়া খুঁড়ছে—বলে জল চাই। সেখানে পাথর হ'ল তো ছেড়ে দিলে। আবার এক জায়গায় খুঁড়তে আরম্ভ করলে। সেখানে বালি মিলে গেল ; ছেড়ে দিলে। আর এক জায়গায় খুঁড়তে আরম্ভ হ'ল। এই রকম।

কলকাতা। 'ভক্তের ইচ্ছা-অনিচ্ছা দ্রষ্টব্য।

কলাইয়ের ডালের খদ্দের। কি বলব, সব দেখছি কলাইয়ের ডালের খদ্দের। কামিনী-কাঞ্চন ছাড়তে চায় না। লোকে মেয়েমানুষের রূপে ভুলে যায়, টাকা ঐশ্বর্য দেখলে ভুলে যায়, কিন্তু ঈশ্বরের রূপদর্শন করলে ব্রহ্মপদ তুচ্ছ হয়। রাবণকে একজন বলেছিলো, তুমি সব রূপ ধরে সীতার কাছে যাও, রামরূপ ধর না কেন ? রাবণ বললে, রামরূপ হৃদয়ে একবার দেখলে রম্ভা তিলোত্তমা এদের চিতার ভস্ম বলে বোধ হয়। ব্রহ্মপদ তুচ্ছ হয়, পরস্ত্রীর কথা ত দূরে থাক্।

সব কলাই-এর ডালের খদ্দের। শুদ্ধ আধার না হলে ঈশ্বরে শুদ্ধা ভক্তি হয় না—এক লক্ষ্য হয় না, নানা দিকে মন থাকে।

কলিতে ভক্তিযোগ। কলিতে ভক্তিযোগ। নারদীয় ভক্তি। ঈশ্বরের নাম গুণ গান করা ও ব্যাকুল হ'য়ে প্রার্থনা করা : 'হে ঈশ্বর, আমায় জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, আমায় দেখা দাও।' কর্মযোগ বড় কঠিন। তাই প্রার্থনা করতে হয়, 'হে ঈশ্বর, আমার কর্ম কমিয়ে দাও। আর যেটুকু কর্ম রেখেছো, সেটুকু যেন তোমার কৃপায় অনাসক্ত হ'য়ে করতে পারি। আর যেন বেশী কর্ম জড়াতে না ইচ্ছা হয়।' কর্ম ছাড়বার যো নাই। আমি চিন্তা ক'রছি আমি ধ্যান ক'রছি, এও কর্ম। ভক্তিলাভ ক'রলে বিষয়-কর্ম আপনা-আপনি কমে যায়। আর ভাল লাগে না। ওলা মিছরীর পানা পেলে চিটে-গুড়ের পানা কে খেতে চায় ?

দ্রঃ নারদীয় ভক্তি।

কাঁচা আমি। কেশব সেনকে বললাম যে, 'আমি' ত্যাগ না করলে হবে না। সে বললে, তা হলে মহাশয় দলটল থাকে না। তখন আমি বললাম, 'কাঁচা আমি', 'বজ্জাৎ আমি'—ত্যাগ করতে বলছি ; কিন্তু 'পাকা আমি'—'বালকের আমি', 'ঈশ্বরের দাস আমি', 'বিদ্যার আমি'—এতে দোষ নাই। 'সংসারীর আমি'—'অবিদ্যার আমি'—'কাঁচা আমি'—একটা মোটা লাঠির ন্যায়। সচ্চিদানন্দ-সাগরের জল ঐ লাঠি যেন দুই ভাগ করেছে। কিন্তু 'ঈশ্বরের দাস আমি,' 'বালকের আমি,' 'বিদ্যার আমি' জলের উপর রেখার ন্যায়। জল এক, বেশ দেখা যাচ্ছে—শুধু মাঝখানে একটি রেখা, যেন দু'ভাগ জল। বস্তুতঃ এক জল—দেখা যাচ্ছে।

শঙ্করাচার্য 'বিদ্যার আমি' রেখেছিলেন— লোকশিক্ষার জন্য।

কাজের রীতি। সর্বদা তাঁর নাম করতে হয়। কাজের সময় মনটা তাঁর কাছে ফেলে রাখতে হয়। যেমন আমার পিঠে ফোঁড়া হয়েছে, সব কাজ করছি, কিন্তু মন ফোঁড়ার দিকে রয়েছে।

কাম আর কামনায় তফাত। কাম যেন গাছের মূল, কামনা যেন ডালপালা।

এই কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি ছয় রিপু একেবারে তো যাবে না ; তাই ঈশ্বরের দিকে মোড় ফিরিয়ে দিতে হবে। যদি কামনা করতে হয়, লোভ করতে হয়, তবে ঈশ্বরে ভক্তি কামনা করতে হয়, আর তাঁকে পাবার লোভ করতে হয়। যদি মদ অর্থাৎ মত্ততা করতে হয়, অহঙ্কার করতে হয়, তাহলে আমি ঈশ্বরের দাস, ঈশ্বরের সন্তান, এই বলে মত্ততা, অহঙ্কার করতে হয়।

সব মন তাঁকে না দিলে তাঁকে দর্শন হয় না।

কামনা থাকতে। কামনা থাকতে—ভোগ লালসা থাকতে—মুক্তি নাই। তাই খাওয়া-পরা, রমণ-ফমন সব ক'রে নেবে। তুমি কি বল?—স্বদারায় না পরদারায়?

কামাদি রিপু দগ্ধ হয়। জ্ঞানীর শরীর যেমন তেমনিই থাকে ; তবে জ্ঞানাগ্নিতে কামাদি রিপু দগ্ধ হ'য়ে যায়। কালীবাড়ীতে অনেক দিন হ'ল ঝড়-বৃষ্টি হ'য়ে কালীঘরে বজ্রপাত হয়েছিল। আমরা গিয়ে দেখলাম, কপাটগুলির কিছু হয় নাই ; তবে ইস্ক্রুগুলির মাথা ভেঙ্গে গিছিলো। কপাটগুলি যেন শরীর, কামাদি আসক্তি যেন ইস্ক্রুগুলি।

জ্ঞানী কেবল ঈশ্বরের কথা ভালবাসে। বিষয়ের কথা হ'লে তার বড় কষ্ট হয়। বিষয়ীরা আলাদা লোক। তাদের অবিদ্যা-পাগড়ি খসে না। তাই ফিরে-ঘুরে ঐ বিষয়ের কথা এনে ফেলে।

বেদেতে সপ্ত ভূমির কথা আছে। পঞ্চম ভূমিতে যখন জ্ঞানী উঠে, তখন ঈশ্বর-কথা বই শুনতেও পারে না, আর বলতেও পারে না। তখন তার মুখ থেকে কেবল জ্ঞান উপদেশ বেরোয়!

কামিনী। বৈরাগ্য ও কামিনী দ্রষ্টব্য।

কামিনী কাঞ্চন। সন্ন্যাসীর পক্ষে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ। স্ত্রীলোকের পট পর্যন্ত সন্ন্যাসী দেখবে না। স্ত্রীলোক কিরূপ জান? যেমন আচার তেঁতুল। মনে করলে, মুখে জল সরে। আচার তেঁতুল সম্মুখে আনতে হয় না।

কিন্তু এ কথা আপনাদের পক্ষে নয়, এ সন্ন্যাসীর পক্ষে। আপনারা যতদূর পার স্ত্রীলোকের সঙ্গে অনাসক্ত হ'য়ে থাকবে। মাঝে মাঝে নির্জন স্থানে গিয়ে চিন্তা করবে। সেখানে যেন ওরা কেউ না থাকে। ঈশ্বরেতে বিশ্বাস ভক্তি এলে, অনেকটা অনাসক্ত হ'য়ে থাকতে পারবে। দুই-একটি ছেলে হ'লে স্ত্রী-পুরুষ দুইজনে ভাই-বোনের মতো থাকবে, আর ঈশ্বরকে সর্বদা প্রার্থনা করবে, যাতে ইন্দ্রিয় সুখেতে মন না যায়—ছেলেপুলে আর না হয়।

ত্যাগী দ্রষ্টব্য।

কায়মনোবাক্যে ভক্তি। সেদিন তোমায় যা বললুম ভক্তির মানে কি—না কায়-মন-বাক্যে তাঁর ভজনা। কায়—অর্থাৎ হাতের দ্বারা তাঁর পূজা ও সেবা, পায়ে তাঁর স্থানে যাওয়া, কানে তাঁর ভাগবত শোনা, নামগুণ কীর্তন শোনা, চক্ষে তাঁর বিগ্রহ দর্শন। মন—অর্থাৎ সর্বদা তাঁর ধ্যান চিন্তা করা, তাঁর লীলা স্মরণ করা। বাক্য—অর্থাৎ তাঁর স্তব-স্তুতি, তাঁর নাম গুণ কীর্তন, এই সব করা।

কালী। ক. কালই ব্রহ্ম। যিনি কালের সহিত রমণ করেন, তিনিই কালী—আদ্যাশক্তি। অটলকে টলিয়ে দেন।

খ. আর কেউ নয়, যিনিই ব্রহ্ম, তিনিই কালী। কালী—আদ্যাশক্তি। যখননিষ্ক্রিয়, তখন ব্রহ্ম ব'লে কই ; যখন সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করেন তখন শক্তি ব'লে কই, কালী বলে কই। যাঁকে তুমি ব্রহ্ম বলছো তাঁকেই কালী বলছি।

ব্রহ্ম আর কালী অভেদ। যেমন অগ্নিআর দাহিকাশক্তি। অগ্নি ভাবলেই দাহিকা-শক্তি ভাবতে হয়। কালী মানলেই ব্রহ্ম মানতে হয়, আবার ব্রহ্ম মানলেই কালী মানতে হয়।

ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। ওকেই শক্তি, ওকেই কালী আমি বলি।

দ্র: ব্রহ্মা ও কালী।

কালী নামে দাও রে বেড়া। 'কালীনামে দাও রে বেড়া ফসলে তছরূপ হবে না!' ঈশ্বরের শরণাগত হও, সব পাবে। সে যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া, তাঁর কাছেতে যম ঘেঁসে না। শক্ত বেড়া। তাঁকে যদি লাভ করতে পারো, সংসার অসার বলে বোধ হবে না। যে তাঁকে জেনেছে, সে দেখে যে জীব-জগৎ সে তিনিই হয়েছেন। ছেলেদের খাওয়াবে, যেন গোপালকে খাওয়াচ্ছো। পিতা-মাতাকে ঈশ্বর-ঈশ্বরী দেখবে ও সেবা করবে। তাঁকে জেনে সংসার করলে বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গে প্রায় ঐহিক সম্বন্ধ থাকে না। দুজনেই ভক্ত, কেবল ঈশ্বরের কথা কয়, ঈশ্বরের প্রসঙ্গ লয়ে থাকে। ভক্তের সেবা করে। সর্বভূতে তিনি আছেন, তাঁর সেবা দুজনে করে।

কালীমাহাত্ম্য। কাশীতে ব্রাহ্মণই মরুক আর বেশ্যাই মরুক শিব হয়।

কালীর নানারূপ। তিনি নানাভাবে লীলা করছেন। তিনিই মহাকালী, নিত্য-কালী, শ্মশানকালী, রক্ষাকালী, শ্যামাকালী। মহাকালী নিত্যকালীর কথা তন্ত্রে আছে। যখন সৃষ্টি হয় নাই, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, পৃথিবী ছিল না, নিবিড় আঁধার, তখন কেবল মা নিরাকারা মহাকালী, মহাকালের সঙ্গে বিরাজ করছিলেন। শ্যামাকালীর অনেকটা কোমল ভাব—বরাভয়দায়িনী। গৃহস্থ বাড়িতে তাঁরই পূজা হয়। যখন মহামারী, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি হয় তখন রক্ষাকালী পূজা করতে হয়। শ্মশানকালীর সংহার মূর্তি। শব শিবা ডাকিনী যোগিনী মধ্যে শ্মশানের উপর থাকেন। রুধির ধারা, গলায় মুণ্ডমালা, কটিতে নরহস্তের কোমরবন্ধ।

কালীর রং। কালী কি কালো? দূরে তাই কালো, জানতে পারলে আর কালো নয়।

আকাশ দূর থেকে নীলবর্ণ। কাছে দেখ, কোনো রঙ নাই। সমুদ্রের জল দূর থেকে নীল, কাছে গিয়ে হাতে তুলে দেখ, কোন রঙ নাই।

কালীর রূপ। তিনি নানাভাবে লীলা করছেন। তিনিই মহাকালী, নিত্যকালী, শ্মশানকালী, রক্ষাকালী, শ্যামাকালী। মহাকালী, নিত্যকালীর কথা তন্ত্রে আছে। যখন সৃষ্টি হয় নাই ; চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, পৃথিবী ছিল না; নিবিড় আঁধার; তখন কেবল মা নিরাকারা মহাকালী—মহাকালের সংগে বিরাজ করছিলেন।

শ্যামাকালীর অনেকটা কোমল ভাব—বরাভয়দায়িনী। গৃহস্থ-বাড়িতে তাঁরই পূজা হয়। যখন মহামারী, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি হয় ;

রক্ষাকালী পূজা করতে হয়। শ্মশানকালীর সংহার মূর্তি। শব, শিবা, ডাকিনী, যোগিনী মধ্যে, শ্মশানের উপর থাকেন। রুধিরধারা, গলায় মুণ্ডমালা, কটিতে নরহস্তের কোমরবন্ধ। যখন জগৎ নাশ হয়, মহাপ্রলয় হয়, তখন মা সৃষ্টির বীজ সকল কুড়িয়ে রাখেন। গিন্নীর কাছে যেমন একটা ন্যাতা-ক্যাতার হাঁড়ি থাকে, আর সেই হাঁড়িতে গিন্নী পাঁচ রকম জিনিস তুলে রাখে।

হ্যাঁ গো! গিন্নীদের ঐরকম একটা হাঁড়ি থাকে। ভিতরে সমুদ্রের ফেনা, নীল বড়ি, ছোট ছোট পুঁটলি বাঁধা শশা বীচি, কুমড়া বীচি, লাউ বীচি এই সব রাখে, দরকার হ'লে বার করে। মা ব্রহ্মময়ী সৃষ্টিনাশের পর ঐ রকম সব বীজ কুড়িয়ে রাখেন। সৃষ্টির পর আদ্যাশক্তি জগতের ভিতরেই থাকেন! জগৎ প্রসব করেন, আবার জগতের মধ্যে থাকেন। বেদে আছে 'ঊর্ণনাভির' কথা; মাকড়সা আর তার জাল। মাকড়সা ভিতর থেকে জাল বার করে, আবার নিজে সেই জালের উপর থাকে। ঈশ্বর জগতের আধার আধেয় দুই।

কালীরূপ ও বর্ণ। কালীরূপ কি শ্যামরূপ চৌদ্দ পোয়া কেন? দূরে ব'লে। দূরে ব'লে সূর্য ছোট দেখায়। কাছে যাও তখন এত বৃহৎ দেখাবে যে, ধারণা করতে পারবে না। আবার কালীরূপ কি শ্যামরূপ শ্যামবর্ণ কেন? সেও দূরে ব'লে। যেমন দীঘির জল দূরে থেকে সবুজ, নীল বা কালবর্ণ দেখায়, কাছে গিয়ে হাতে ক'রে জল তুলে দেখ, কোন রঙই নাই। আকাশ দূরে দেখলে নীল বর্ণ, কাছে দেখ, কোন রঙ নাই।

কালের জন্য প্রস্তুতি। এই কালের জন্য প্রস্তুত হও। কাল ঘরে প্রবেশ ক'রেছে, তাঁর নাম রূপ অস্ত্র লয়ে যুদ্ধ করতে হবে, তিনিই কর্তা। আমি বলি, যেমন করাও তেমনি করি; যেমন বলাও, তেমনি বলি; আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী; আমি ঘর, তুমি ঘরণী; আমি গাড়ী, তুমি ইঞ্জিনীয়ার।

কুইন ভিক্টোরিয়া। । দ্রঃ শক্তিবেশেষ খ.

কুবীর গোঁসাই (সাহেব ধনী সম্প্রদায়ের প্রবর্তক)। কুবীর বলতো, সাকার আমার মা, নিরাকার আমার বাপ। কাকো নিন্দো, কাকো বন্দো, দোনো পাল্লা ভারী।

কুমড়োকাটা বড়ঠাকুর। তুমি না সংসারী, না হরিভক্ত। এ ভাল নয়। এক একজন বাড়িতে পুরুষ থাকে—মেয়েছেলেদের নিয়ে রাতদিন থাকে, আর বাহিরের ঘরে ব'সে ভুড়ুর ভুড়ুর করে তামাক খায়, নিষ্কর্মা হয়ে ব'সে থাকে। তবে বাড়ির ভিতরে কখনও গিয়ে কুমড়ো কেটে দেয়। মেয়েদের কুমড়ো কাটতে নাই, তাই ছেলেদের দিয়ে তারা বলে পাঠায়, বড়ঠাকুরকে ডেকে আন। তিনি কুমড়োটাকে দু-খানা করে দিবেন। তখন সে কুমড়োটা দুখানা করে দেয়, এই পর্যন্ত পুরুষের ব্যবহার। তাই নাম হয়েছে 'কুমড়োকাটা বড়ঠাকুর'।

তুমি এ-ও কর—ও-ও কর। ঈশ্বরের পাদপদ্মে মন রেখে সংসারের কাজ কর। আর যখন একলা থাকবে তখন পড়বে ভক্তিশাস্ত্র—শ্রীমদ্ভাগবত বা চৈতন্যচরিতামৃত—এই সমস্ত পড়বে।

কুম্ভক। ক. মন স্থির হলে বায়ু স্থির হয়—কুম্ভক হয়। এই কুম্ভক ভক্তি-যোগেতেও হয়; ভক্তিতে বায়ু স্থির হয়ে যায়। 'নিতাই আমার মাতা হাতী',

'নিতাই আমার মাতা হাতী!' এই কথা বলতে বলতে যখন ভাব হয়ে যায়, সব কথাগুলো বলতে পারে না, কেবল 'হাতী' 'হাতী'। তারপর শুধু 'হা!' ভাবে বায়ু স্থির হয়; কুম্ভক হয়।

খ. ভক্তিতে কুম্ভক আপনি হয়—একাগ্র মন হ'লেই বায়ু স্থির হয়ে যায়, আর বায়ু স্থির হলেই মন একাগ্র হয়, বুদ্ধি স্থির হয়। যার হয় সে নিজে টের পায় না।

সুষুম্না-কুলকুণ্ডলিনী। ঈড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্নার ভিতর সব পদ্ম আছে—চিন্ময়। যেমন মোমের গাছ—ডাল, পালা, ফল—সব মোমের। মূলাধার পদ্মে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি আছে। চতুর্দল পদ্ম। যিনি আদ্যাশক্তি তিনিই সকলের দেহে কুলকুণ্ডলিনীরূপে আছেন। যেমন ঘুমন্ত সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে! 'প্রসুপ্ত ভুজগাকারা আধার-পদ্মবাসিনী!'

ভক্তিযোগে কুলকুণ্ডলিনী শীঘ্র জাগ্রত হয়। কিন্তু ইনি জাগ্রত না হলে ভগবান দর্শন হয় না। গান ক'রে ক'রে একাগ্রতার সহিত গাইবে—নির্জনে গোপনে—

'জাগো মা কুলকুণ্ডলিনী! তুমি নিত্যানন্দ স্বরূপিণী,
প্রসুপ্ত-ভুজগাকারা আধার-পদ্মবাসিনী।'

কুলকুণ্ডলিনী জাগরণ। কুলকুণ্ডলিনী যতক্ষণ নিদ্রিত থাকেন, ততক্ষণ জ্ঞান হয় না। বসে বসে বই পড়ে যাচ্ছি, বিচার করছি, কিন্তু ভিতরে ব্যাকুলতা নাই, সেটি জ্ঞানের লক্ষণ নয়।

কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ হলে ভাব ভক্তি প্রেম এই সব হয়। এরই নাম ভক্তিযোগ।

কৃপাসিন্ধ। 'সিন্ধ' দ্রষ্টব্য।

কৃপণের ধন। কৃপণের জিনিষ খাই না। তাদের ধন এই কয় রকমে উড়ে যায়: ১ম—মামলা মোকদ্দমায়; ২য়—চোর ডাকাতে; ৩য়—ডাক্তার খরচে; ৪র্থ—আবার বদ ছেলেরা সেই সব টাকা উড়িয়ে দেয়; এই সব।

কৃষ্ণকিশোর। কৃষ্ণকিশোরের কি বিশ্বাস! বৃন্দাবনে গিছিল, সেখানে একদিন জলতৃষ্ণা পেয়েছিল। কুয়ার কাছে গিয়ে দেখে, একজন দাঁড়িয়ে রয়েছে। জিজ্ঞাসা করাতে সে বললে 'আমি নীচ জাতি, আপনি ব্রাহ্মণ; কেমন করে আপনার জল তুলে দেব?' কৃষ্ণকিশোর বললে, তুই বল 'শিব'। 'শিব' 'শিব' বললেই তুই শুদ্ধ হয়ে যাবি। সে 'শিব' 'শিব' ব'লে জল তুলে দিলে। অমন আচারী ব্রাহ্মণ সেই জল খেলে। কি বিশ্বাস!

কৃষ্ণদাস পাল। কৃষ্ণদাস পাল এসেছিল। দেখলাম রজোগুণ। তবে হিন্দু, জুতো বাইরে রাখলে। একটু কথা কয়ে দেখলুম, ভিতরে কিছুই নাই। জিজ্ঞাসা করলুম, মানুষের কি কর্তব্য? তা বলে, 'জগতের উপকার ক'রবো।' আমি বললুম, হ্যাঁগা তুমি কে? আর কি উপকার ক'রবে? আর জগৎ কতটুকু গা, যে তুমি উপকার করবে?

কেশব সেন। ক. আর একদিন নিমাই সন্ন্যাস, কেশবের বাড়িতে দেখতে গিছিলাম। যাত্রাটি কেশবের কতকগুলো খোসামুদে শিষ্য জুটে খারাপ করেছিল। একজন

বললে, 'কলির চৈতন্য হচ্ছেন আপনি।' কেশব আবার আমার দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে বললে, 'তা হলে ইনি কি হলেন?' আমি বললুম, 'আমি তোমাদের দাসের দাস। রেণুর রেণু।' কেশবের লোকমান্য হবার ইচ্ছা ছিল।

খ. 'ব্রহ্মজ্ঞান/কেশব সেন' দ্রষ্টব্য।

গ. দলগড়া দ্রষ্টব্য। চেষ্টা দ্বারা আয়ত্ত করতে হয়।

ঘ. আর কেশবকে বলেছিলাম, তুমি আদ্যাশক্তিকে মানো। ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ—যিনিই ব্রহ্ম তিনিই শক্তি। যতক্ষণ দেহবুদ্ধি, ততক্ষণ দুটো ব'লে বোধ হয়। বলতে গেলেই দুটো। কেশব কালী (শক্তি) মেনেছিল।

একদিন কেশব শিষ্যদের সঙ্গে এখানে এসেছিল। আমি বললাম, তোমার লেকচার শুনবো। চাঁদনীতে ব'সে লেকচার দিলে। তারপর ঘাটে এসে বসে অনেক কথা-বার্তা হ'ল। আমি বললাম, যিনিই ভগবান তিনিই একরূপে ভক্ত। তিনিই একরূপে ভাগবত। তোমরা বলো ভাগবত-ভক্ত-ভগবান। কেশব বললে, আর শিষ্যেরা সব একসঙ্গে বললে, ভাগবত-ভক্ত-ভগবান। যখন বললাম, 'বলো গুরু-কৃষ্ণ-বৈষ্ণব', তখন কেশব বললে, মহাশয়, এখন অত দূর নয়; তা হ'লে লোকে গোঁড়া বলবে।

'ল্যাজখসা' আদিকান্ড।

ঙ. কেশব সেনকে প্রথম দেখি আদি সমাজে। তাকের (বেদীর) উপর ক'জন বসেছে, কেশব মাঝখানে বসেছে। দেখলাম যেন কাষ্ঠবৎ। সেজোবাবুকে বললুম, দেখ ওর ফাতনায় মাছ খেয়েছে। ঐ ধ্যানটুকু ছিল ব'লে ঈশ্বরের ইচ্ছায় যেগুনো মনে করেছিল (মান টানগুনো) হয়ে গেল।

চ. কেশব সেন কি সরল ছিল। একদিন ওখানে(রাসমণির কালীবাড়িতে) গিছিল। অতিথিশালা দেখে বেলা চারটের সময় বলে, হাঁগা অতিথি কাঙ্গালদের কখন খাওয়া হবে?

ছ. কিছু সার আছে বৈকি। তা না হ'লে এত লোকে কেশবকে মানে কেন? শিবনাথকে কেন লোকে চেনে না? ঈশ্বরের ইচ্ছা না থাকলে এ রকম একটা হয় না।

তবে সংসার ত্যাগ না করলে আচার্যের কাজ হয় না, লোকে মানে না। লোকে বলে, এ সংসারী লোক, এ নিজে কামিনীকাঞ্চন লুকিয়ে ভোগ করে; আমাদের বলে, ঈশ্বর সত্য, সংসার স্বপ্নবৎ অনিত্য। সর্বত্যাগী না হ'লে তার কথা সকলে লয় না। ঐহিক যারা কেউ কেউ নিতে পারে। কেশবের সংসার ছিল, কাজে কাজেই সংসারের উপর মনও ছিল। সংসারটিকে ত রক্ষা কর্তে হবে। তাই অত লেকচার দিয়েছে; কিন্তু সংসারটি বেশ পাকা ক'রে রেখে গেছে। অমন জামাই! বাড়ীর ভিতরে গেলুম, বড় বড় খাট। সংসার করতে গেলে ক্রমে সব এসে জোটে। ভোগের জায়গায়ই সংসার।

জ. কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ না করলে লোকশিক্ষা দেওয়া যায় না। দেখ না, কেশব সেন ঐটি পারল না বলে, কি হ'ল শেষটা। তুমি নিজে ঐশ্বর্যের ভিতর, কামিনী-কাঞ্চনের ভিতর থেকে যদি বল 'সংসার অনিত্য, ঈশ্বরই বস্তু,' অনেকে

তোমার কথা শুনবে না। আপনার কাছে গুড়ের নাগরী রয়েছে, পরকে বলছো গুড় খেও না। তাই ভেবে চিন্তে চৈতন্যদেব সংসার ত্যাগ করলেন। তা না হ'লে জীবের উদ্ধার হয় না।

কেশব যদি ত্যাগী হতো অনেক কাজ হতো। ছাগলের গায়ে ক্ষত থাকলে আর ঠাকুরসেবা হয় না। বলি দেওয়া হয় না। ত্যাগী না হলে লোকশিক্ষার অধিকারী হয় না। গৃহস্থ হলে কজন তার কথা শুনবে?

ঝ. কেশব সেন বাপের ধার মেনেছিল, অন্য লোক হ'লে কখনও মানতো না, একে লেখাপড়া নাই। জোড়াসাঁকোর দেবেন্দ্রের সমাজে গিয়ে দেখলাম, কেশব সেন বেদীতে বসে ধ্যান করছে। তখন ছোকরা বয়েস। আমি সেজোবাবুকে বললাম, যতগুলি ধ্যান করছে এই ছোকরার ফতা (ফাতনা) ডুবেছে—বঁড়শীর কাছে মাছ এসে ঘুরছে।

ঞ. কেশব আগে খৃষ্টান ধর্ম, খৃষ্টানি মত খুব চিন্তা করেছিলেন।—সেই সময় ও তার আগে দেবেন্দ্র ঠাকুরের ওখানে ছিলেন।

কেশব এখন কালী মানেন—চিন্ময়ী কালী—আদ্যাশক্তি। আর মা মা বলে তাঁর নামগুণ কীর্তন করেন।

দ্রঃ আত্মকথা : কেশবদর্শন।

কেশব সেন প্রথম জ্ঞান ও ভক্তির সামঞ্জস্য করেছেন (শিষ্যদের অভিমত)। সে কি গো! অধ্যাত্ম (রামায়ণ) তবে কি? নারদ রামচন্দ্রকে স্তব করতে লাগলেন, 'হে রাম! বেদে যে পরব্রহ্মের কথা আছে, সে তুমিই। তুমিই মানুষরূপে আমাদের কাছে রয়েছো; তুমিই মানুষ বলে বোধ হচ্ছে, বস্তুত তুমি মানুষ নও, সেই পরব্রহ্ম।' রামচন্দ্র বললেন, 'নারদ! তোমার উপর বড় প্রসন্ন হয়েছি, তুমি বর নাও।' নারদ বললেন, 'রাম! আর কি বর চাহিব? তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি দাও। আর তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় যেন মুগ্ধ ক'রো না।' অধ্যাত্মে কেবল জ্ঞান-ভক্তিরই কথা।

ক্রোধ। সংসারে শুধু যে কামের ভয়, তা' নয়। আবার ক্রোধ আছে। কামনার পথে কাঁটা পড়লেই ক্রোধ।

ক্ষীরের পোর। মানুষ সব দেখতে এক রকম, কিন্তু কারুর ভিতর ক্ষীরের পোর! যেমন পুলির ভিতর কলাইয়ের ডালের পোরও থাকতে পারে, ক্ষীরের পোরও থাকতে পারে, কিন্তু দেখতে এক রকম। ঈশ্বর জানবার ইচ্ছা, তাঁর উপর প্রেমভক্তি, এরই নাম ক্ষীরের পোর।

খণ্ডজ্ঞানী। একটুর ভিতরে যে ঈশ্বরকে দ্যাখে তার নাম খণ্ডজ্ঞানী—সে মনে করে যে, তার ওদিকে আর তিনি নাই।

খপরের কাগজ। 'অবতার তত্ত্বে অবিশ্বাসের কারণ' দ্রষ্টব্য।

খবরের কাগজে লেখ নাই। ও সব কথা যে খবরের কাগজে নাই, কেমন করে মানা যায়!

একজন তার বন্ধুকে এসে বললে, 'ওহে! কাল ওপাড়া দিয়ে যাচ্ছি, এমন সময়

দেখলাম, সে বাড়িটা হুড়মুড় করে পড়ে গেল।' বন্ধু বললে, দাঁড়াও হে, একবার খবরের কাগজখানা দেখি। এখন বাড়ি হুড়মুড় করে পড়ার কথা খবরের কাগজে কিছুই নাই। তখন সে ব্যক্তি বললে, 'কই খবরের কাগজে ত কিছুই নাই।— ও সব কাজের কথা নয়।' সে লোকটা বললে, আমি যে দেখে এলাম। ও বললে, 'তা হোক্, যেকালে খবরের কাগজে নাই, সেকালে ওকথা বিশ্বাস করলুম না।' ঈশ্বর মানুষ হয়ে লীলা করেন, একথা কেমন ক'রে বিশ্বাস করবে? একথা যে ওদের ইংরেজী লেখাপড়ার ভিতরে নাই! পূর্ণ অবতার বোঝান বড় শক্ত, কি বল? চৌদ্দ পোয়ার ভিতর অনন্ত আসা!'

দ্রঃ অবতারতত্ত্বে অবিশ্বাসের মূল।

খাওয়া-দাওয়া। খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে যদৃচ্ছালাভই ভাল। অবস্থা বিশেষে উটি হয়। জ্ঞানীর পক্ষে কিছুতেই দোষ নাই। গীতার মতে জ্ঞানী আপনি খায় না, কুণ্ডলিনীকে আহুতি দেয়। ভক্তের পক্ষে উটি নয়। আমার এখানকার অবস্থা—বামুনের দেওয়া ভোগ না হলে খেতে পারি না। পারি না বটে, আবার এক একবার হয়ও। কেশবসেনের ওখানে থিয়েটারে আমায় নিয়ে গিয়েছিল। লুচি ছক্কা আনলে। তা ধোপা কি নাপিত আনলে জানি না। বেশ খেলুম। রাখাল বললে, 'একটু খাও।'

খাওয়ার রীতি। দিনের বেলা বারুদ ঠাসা করে খেতে হয়, আর রাত্রে এক কোণ খালি রেখে খেতে হয়। ছোলার ডাল খেয়ে রাখালের অসুখ হয়েছে। সাত্ত্বিক আহার করা ভাল। শ্রাদ্ধের অন্ন খেও না।

খৃষ্টসমাজ ও পাপ। 'পাপ' দেখ।

খৃষ্টানী মত। ঐ তোমাদের পাপ আর পাপ! এ সব বুঝি খৃষ্টানী মত? আমায় একজন একখানি বই (বাইবেল) দিলে। একটু পড়া শুনলাম; তা তাতে কেবল ঐ এক কথা—পাপ আর পাপ! আমি তাঁর নাম করেছি; ঈশ্বর, কি রাম, কি হরি ব'লেছি—আমার আবার পাপ! এমন বিশ্বাস থাকা চাই। নামমাহাত্ম্যে বিশ্বাস থাকা চাই।

['পাপ দ্রষ্টব্য']

খোসামুদের কথায় ভুলো না। তুমি খোসামুদের কথায় ভুলো না। বিষয়ী লোক দেখলেই খোসামুদে এসে জুটে। মরা গরু একটা পেলে যত শকুনি সেখানে এসে পড়ে। বিষয়ী লোকগুলোর পদার্থ নাই। যেন গোবরের ঝোড়া। খোসামুদেরা এসে বলবে, আপনি দানী, জ্ঞানী, ধ্যানী। বলা ত নয়, অমনি বাঁশ।

গঙ্গাজল। গঙ্গাজল জলের মধ্যে নয়, শ্রীবৃন্দাবনের রজঃ ধুলোর মধ্যে নয়, আর শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ অন্নের মধ্যে নয়। এই তিনই ব্রহ্মের স্বরূপ।

গঙ্গাস্নান করতে এসে। কেউ হয়ত গঙ্গাস্নান করতে এসেছে। সে সময় কোথা ভগবান চিন্তা করবে, গল্প করতে ব'সে গেল। যত রাজ্যের গল্প! 'তোর ছেলের বিয়ে হ'ল, কি গয়না দিলে?' 'অমুকের বড় ব্যামো', 'অমুক শ্বশুরবাড়ি থেকে এসেছে কিনা', 'অমুক কনে দেখতে গিছলো, তা দেওয়া-থোওয়া সাধ

আহ্লাদ খুব করবে', 'হরিশ আমার বড় ন্যাওটা, আমায় ছেড়ে একদণ্ড থাকতে পারে না', 'এতো দিন আসতে পারি নি মা—অমুকের মেয়ের পাকা দেখা, বড় ব্যস্ত ছিলাম।'

দেখ দেখি, কোথায় গঙ্গাস্নানে এসেছে ! যত সংসারের কথা !

গর্ভযোগ। 'গর্ভে ছিলাম, যোগে ছিলাম, ভূমে পড়ে খেলাম মাটি। ওরে ধাত্রীতে কেটেছে নাড়ী, মায়ার বেড়ী কিসে কাটি।' ছেলে ভূমিষ্ঠ হয়ে কেন কাঁদে ? 'গর্ভে ছিলাম যোগে ছিলাম।' ভূমিষ্ঠ হয়ে এই বলে কাঁদে—'কাঁহা এ, কাঁহা এ, এ কোথায় এলাম, ঈশ্বরের পাদপদ্ম চিন্তা করছিলাম, এ আবার কোথায় এলাম !'

গালাগাল : 'গিরিশ 'দ্রষ্টব্য'।

গিরিশ ঘোষ। সে খুব ভাল। তবে এত গালাগাল মুখখারাপ করে কেন ?

দ্রঃ গিরিশের প্রশ্নের উত্তরে রামকৃষ্ণের বক্তব্য থিয়েটার আর করা কেন ? কর্ম আর কেন ?

তুমি গালাগাল, খারাপ কথা, অনেক বলো ; তা হউক ওসব বেরিয়ে যাওয়াই ভাল। বদরক্ত রোগ কারু কারুর আছে। যত বেরিয়ে যায় ততই ভাল।

উপাধি নাশের সময়ই শব্দ হয়। কাঠ পোড়াবার সময় চড়্ চড়্ শব্দ করে। সব পুড়ে গেলে আর শব্দ থাকে না।

তুমি দিন দিন শুদ্ধ হবে। তোমার দিন দিন খুব উন্নতি হবে। লোকে দেখে অবাক হবে। আমি বেশী আসতে পারবো না—তা হউক, তোমার এমনিই হবে।

গীতা। গীতা সব শাস্ত্রের সার। সন্ন্যাসীর কাছে আর কিছু না থাকে, গীতা একখানি ছোট থাকবে।

গীতার শিক্ষা। গীতার অর্থ কি ? দশবার বললে যা হয়। 'গীতা' 'গীতা', দশবার বলতে গেলে, 'ত্যাগী' 'ত্যাগী' হয়ে যায়। গীতায় এই শিক্ষা—হে জীব, সব ত্যাগ করে ভগবানকে লাভ করবার চেষ্টা কর। সাধুই হোক্, সংসারীই হোক্, মন থেকে সব আসক্তি ত্যাগ করতে হয়।

গীতার সার। গীতার সার, দশবার গীতা বল্লে যা হয়, অর্থাৎ 'ত্যাগী, ত্যাগী'।

গুণ ও রং। সত্ত্বগুণে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় ; রজঃ, তমোগুণে ঈশ্বর থেকে তফাৎ করে। সত্ত্বগুণকে সাদা রঙের সঙ্গে উপমা দিয়েছে, রজোগুণকে লাল রঙের সঙ্গে, আর তমোগুণকে কাল রঙের সঙ্গে।

গুরু। গুরু এক সচ্চিদানন্দ। তিনিই শিক্ষা দিবেন। আমার সন্তান ভাব। মানুষ গুরু মেলে লাখ লাখ। সকলেই গুরু হতে চায়। শিষ্য কে হ'তে চায় ?

দ্রঃ ঈশ্বরের হাত। গুরু-বাবা-কর্তা। বৈদ্য ও আচার্য।

গুরু (সদ্ ও কাঁচা)। আমি একদিন পঞ্চবটীর কাছ দিয়ে ঝাউতলায় বাহ্যে যাচ্ছিলাম। শুনতে পেলুম যে, একটা কোলা ব্যাঙ খুব ডাকছে। বোধ হ'ল সাপে ধরেছে। অনেকক্ষণ পরে যখন ফিরে আসছি, তখনও দেখি, ব্যাঙটা খুব ডাকছে। একবার উঁকি মেরে দেখলুম কি হ'য়েছে। দেখি একটা ঢোঁড়ায়

ব্যাঙটাকে ধ'রেছে—ছাড়তেও পাচ্ছে না—গিলতেও পাচ্ছে না—ব্যাঙটার যন্ত্রণা ঘুচছে না। তখন ভাবলাম, ওরে! যদি জাতসাপে ধ'রতো, তিন ডাকের পর ব্যাঙটা চুপ হয়ে যেতো। এ একটা ঢোঁড়ায় ধরেছে কি না, তাই সাপটারও যন্ত্রণা ব্যাঙটারও যন্ত্রণা।

যদি সদ্‌গুরু হয়, তাহলে জীবের অহঙ্কার তিন ডাকে ঘুচে। গুরু কাঁচা হ'লে গুরুরও যন্ত্রণা শিষ্যেরও যন্ত্রণা। শিষ্যের অহংকার আর ঘুচে না, সংসার বন্ধন আর কাটে না। কাঁচা গুরুর পাল্লায় পড়লে শিষ্য মুক্ত হয় না।

দ্রঃ গোখরোর পাল্লা।

গুরু-উপদেশ। সকলেরই মুক্তি হবে, তবে গুরুর উপদেশ অনুসারে চলতে হয়। বাঁকা পথে গেলে ফিরে আসতে কষ্ট হবে। মুক্তি অনেক দেরিতে হয়। হয়তো এ জন্মেও হল না, আবার হয়তো অনেক জন্মের পর হ'ল। গুরুর কাছে সন্ধান নিতে হয়। একজন বাণলিঙ্গ শিব খুঁজতেছিল। কেউ তাকে বলে দেয় অমুক নদীর ধারে যাও, সেখানে একটি গাছ দেখবে; সেই গাছের কাছে একটি ঘুরণী জল আছে, সেইখানে ডুব মারতে হবে, তবে বাণলিঙ্গ শিব পাওয়া যাবে। তাই গুরুর কাছে সন্ধান জেনে নিতে হয়।

গুরু ও মন। সর্বদা ত্যাগ ও সংযম অভ্যাস করতে করতে সাধক যখন নিজের মনকে সম্পূর্ণ বশে এনে শুদ্ধ হয়, ঐ মনই তখন তার গুরু হয়ে থাকে।

গুরু ও সিদ্ধি। সচ্চিদানন্দই গুরুরূপে আসেন। মানুষ গুরুর কাছে যদি কেউ দীক্ষা লয়, তাঁকে মানুষ ভাবলে কিছু হবে না। তাঁকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর ভাবতে হয়, তবে ত মন্ত্রে বিশ্বাস হবে? বিশ্বাস হ'লেই সব হ'য়ে গেল। শূদ্র (একলব্য) মাটির দ্রোণ তৈয়ার করে বনেতে বাণশিক্ষা করেছিল। মাটির দ্রোণকে পূজা করতো, সাক্ষাৎ দ্রোণাচার্য জ্ঞানে; তাইতেই বাণশিক্ষায় সিদ্ধ হ'ল।

গুরু-কৃপা। কেউ কেউ মনে করে, আমার বুঝি জ্ঞানভক্তি হবে, আমি বুঝি বদ্ধজীব। গুরুর কৃপা হলে কিছুই ভয় নাই। একটা ছাগলের পালে বাঘ পড়েছিল। লাফ দিতে গিয়ে বাঘের প্রসব হয়ে ছানা হয়ে গেল। বাঘটা ম'রে গেল, ছানাটি ছাগলের সঙ্গে মানুষ হ'তে লাগল। তারাও ঘাস খায় বাঘের ছানাও ঘাস খায়। তারাও 'ভ্যা ভ্যা' করে, সেও 'ভ্যা ভ্যা' করে। ক্রমে ছানাটা খুব বড় হ'ল। একদিন ঐ ছাগলের পালে আর একটা বাঘ এসে পড়ল। সে ঘাসখেকো বাঘটাকে দেখে অবাক। তখন দৌড়ে এসে তাকে ধরলে। সেটাও 'ভ্যা ভ্যা' কর্তে লাগলো। তাকে টেনে হিঁচড়ে জলের কাছে নিয়ে গেল। বললে, দেখ, জলের ভিতর তোর মুখ দেখ—ঠিক আমার মতো দেখ। আর এই নে খানিকটা মাংস—এইটে খা। এই বলে তাকে জোর করে খাওয়াতে লাগল। সে কোন মতে খাবে না—'ভ্যা ভ্যা' করছিল। রক্তের আস্বাদ পেয়ে খেতে আরম্ভ করলে। নূতন বাঘটা বললে, এখন বুঝিছিস, আমিও যা তুইও তা; এখন আয়, আমার সঙ্গে বনে চলে আয়।

তাই গুরুর কৃপা হলে আর কোন ভয় নাই। তিনি জানিয়ে দেবেন, তুমি কে, তোমার স্বরূপ কি।

একটু সাধন করলেই গুরু বুঝিয়ে দেন, এই এই। তখন সে নিজেই বুঝতে পারবে, কোনটা সৎ, কোনটা অসৎ। ঈশ্বরই সত্য, এ সংসার অনিত্য।
দ্রঃ অষ্টপাশ।

গুরুকে বিশ্বাস। তাঁর বাক্য অবলম্বন; তাঁর বাক্যরূপ খুঁটি ধরে ঘোরো, সংসারের কাজ করো।

গুরুকে মানুষবুদ্ধি করতে নাই। সচ্চিদানন্দই গুরুরূপে আসেন। গুরুর কৃপায় ইষ্টকে দর্শন হয়, তখন গুরু ইষ্টতে লীন হয়ে যান।

সরল বিশ্বাসে কি না হয়। গুরুপুত্রের অন্নপ্রাশনে—শিষ্যেরা যে যেমন পারে, উৎসবের আয়োজন করছে। একটি গরীব বিধবা সেও শিষ্যা। তার একটি গরু আছে, সে একঘটি দুধ এনেছে। গুরু মনে করেছিলেন যে দুধ দধির ভার ঐ মেয়েটি লবে। বিরক্ত হয়ে সে যা এনেছিল ফেলে দিলে আর বললে—তুই জলে ডুবে মরতে পারিস্ নি? মেয়েটি এই গুরুর আজ্ঞা মনে করে নদীর ধারে ডুবতে গেল। তখন নারায়ণ দর্শন দিলেন; আর প্রসন্ন হয়ে বললেন—এই পাত্রটিতে দধি আছে, যতই ঢালবে ততই বেরুবে, গুরু সন্তুষ্ট হবেন। এবং সেই পাত্রটি দেওয়া হলে গুরু অবাক। আর সমস্ত বিবরণ শুনে নদীর ধারে এসে মেয়েটিকে বললেন—নারায়ণকে যদি আমাকে দর্শন না করাও তবে আমি এই জলেতে প্রাণত্যাগ করবো। নারায়ণ দর্শন দিলেন, কিন্তু গুরু দেখতে পেলেন না। মেয়েটি তখন বললে, প্রভু গুরুদেবকে যদি দর্শন না দেন আর তাঁর শরীর যদি যায় ত আমিও শরীর ত্যাগ করব। তখন নারায়ণ একবার গুরুকে দেখা দিলেন। দেখ, গুরুভক্তি থাকলে নিজের দর্শন হ'ল আবার গুরুদেবেরও হ'ল। তাই বলি—যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ীবাড়ি যায়,
তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়।

সকলেই গুরু হতে চায়, শিষ্য হতে বড় কেহ চায় না। কিন্তু দেখ উঁচু জমিতে বৃষ্টির জল জমে না। নীচু জমিতে—খাল জমিতে জমে।

গুরু যে নামটি দেবেন বিশ্বাস করে সে নামটি লয়ে সাধন ভজন করতে হয়। যে শামুকের ভেতর মুক্তা তয়ের হয়, এমনি আছে, সেই শামুক স্বাতিনক্ষত্রের বৃষ্টির জলের জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকে। সেই জল পড়লে একেবারে অতল জলে ডুবে চলে যায়, যতদিন না মুক্তা হয়।

গুরুগিরি। ক.'গুরুগিরি বেশ্যাগিরির মতো—ছাড় টাকা কড়ি, লোকমান্য হওয়া, শরীরের সেবা, এই সবের জন্য আপনাকে বিক্রি করা। যে শরীর মন আত্মার দ্বারা ঈশ্বরকে লাভ করা যায়, সেই শরীর মন আত্মাকে সামান্য জিনিসের জন্য এরূপ ক'রে রাখা ভাল নয়। একজন বলেছিল, সাবির এখন খুব সময়—এখন তার বেশ হয়েছে—একখানা ঘর ভাড়া নিয়েছে—ঘুঁটে রে, গোবর রে, তক্তা-পোশ, দুখানা বাসন হয়েছে, বিছানা, মাদুর, তাকিয়া—কত লোক বশীভূত, যাচ্ছে আসছে। অর্থাৎ সাবি এখন বেশ্যা হয়েছে তাই সুখ ধরে না। আগে সে ভদ্রলোকের বাড়ির দাসী ছিল, এখন বেশ্যা হয়েছে। সামান্য জিনিসের জন্য নিজের সর্বনাশ।

খ. গুরুগিরি করা ভাল নয়। ঈশ্বরের আদেশ না পেলে আচার্য হওয়া যায় না। যে নিজে বলে, 'আমি গুরু' সে হীনবুদ্ধি। দাঁড়িপাল্লা দেখ নাই! হালকা দিকটা উঁচু হয়, যে ব্যক্তি নিজে উঁচু হয়, সে হালকা। সকলেই গুরু হ'তে যায়!—শিষ্য পাওয়া যায় না!

গুরু না হ'লে জ্ঞান হবে না কি? সচ্চিদানন্দই গুরু; যদি মানুষ গুরুরূপে চৈতন্য করে তো জানবে যে সচ্চিদানন্দই ঐ রূপ ধারণ করেছেন। গুরু যেমন সেথো; হাত ধরে নিয়ে যান। ভগবান দর্শন হলে আর গুরু-শিষ্য বোধ থাকে না। 'সে বড় কঠিন ঠাঁই, গুরু-শিষ্যে দেখা নাই'। তাই জনক শুকদেবকে বললেন, 'যদি ব্রহ্মজ্ঞান চাও আগে দক্ষিণা দাও।' কেন না, ব্রহ্মজ্ঞান হ'লে আর গুরু-শিষ্য ভেদবুদ্ধি থাকবে না। যতক্ষণ ঈশ্বর দর্শন না হয়, ততদিনই গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ।

গুরুপ্রাপ্তি। যে সে লোক গুরু হ'তে পারে না। বাহাদুরী কাঠ নিজেও ভেসে চলে যায়, অনেক জীবজন্তুও তাতে চ'ড়ে যেতে পারে। হাবাতে কাঠের উপর চড়লে, কাঠও ডুবে যায়, যে চড়ে সেও ডুবে যায়। তাই ঈশ্বর যুগে যুগে লোকশিক্ষার জন্য নিজে গুরুরূপে অবতীর্ণ হন। সচ্চিদানন্দই গুরু।

গুরুবাক্য। গুরুবাক্যে বিশ্বাস করা উচিত। গুরুর চরিত্রের দিকে দেখবার দরকার নাই! 'যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ী বাড়ি যায়। তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়।'

একজন চন্ডী ভাগবৎ শোনাতো। সে বললে, ঝাড়ু অস্পৃশ্য বটে কিন্তু স্থানকে শুদ্ধ করে!

গুরু-বাক্যে বিশ্বাস। গুরুবাক্যে বিশ্বাস করা উচিত। গুরুর চরিত্রের দিকে দেখবার দরকার নাই। 'যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ি বাড়ি যায়, তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়।' ঝাড়ু অস্পৃশ্য বটে কিন্তু স্থানকে শুদ্ধ করে। নইলে মানুষের ত দোষগুণ আছেই। সে তার ভক্তিতে কিন্তু তখন আর মানুষকে মানুষ দেখে না, ভগবান বলেই দেখে। যেমন ন্যাবা লাগা চোখে সব হলুদবর্ণ দেখে—সেই রকম। তখন তার ভক্তি তাকে দেখিয়ে দেয় যে, ঈশ্বরই সব—তিনিই গুরু, পিতা, মাতা, মানুষ, গরু, জড়, চেতন সব হয়েছেন।

গুরু-বাবা-কর্তা। গুরু বাবা ও কর্তা, এই তিন কথায় আমার গায়ে কাঁটা বেঁধে। আমি তাঁর ছেলে, আমি চিরকাল বালক, আমি আবার 'বাবা' কি? ঈশ্বর কর্তা, আমি অকর্তা; তিনি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র।

যদি কেউ আমায় গুরু বলে, আমি বলি, 'দূর শালা', গুরু কি রে? এক সচ্চিদানন্দ বই আর গুরু নাই। তিনি বিনা আর কোন উপায় নাই। তিনিই একমাত্র ভবসাগরের কান্ডারী।

গুরুমন্ত্রে বিশ্বাস। গুরু যে নামটি দেবেন বিশ্বাস করে সে নামটি লয়ে সাধন ভজন করতে হয়। যে শামুকের ভিতর মুক্তা তৈয়ারী হয়, এমনি আছে, সেই শামুক স্বাতি-নক্ষত্রের বৃষ্টির জলের জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকে। সেই জল পড়লে একেবারে অতল জলে ডুবে চলে যায়, যতদিন না মুক্তা হয়।

গুরু মানুষ। সচ্চিদানন্দই গুরুরূপে আসেন। মানুষ-গুরুর কাছে যদি কেউ দীক্ষা লয়, তাঁকে মানুষ ভাবলে কিছু হবে না। তাঁকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর ভাবতে হয়, তবে ত মন্ত্রে বিশ্বাস হবে। বিশ্বাস হলেই সব হয়ে গেল। শূদ্র (একলব্য) মাটির দ্রোণ তৈয়ার করে বনেতে বাণ-শিক্ষা করেছিলেন। মাটির দ্রোণকে পূজা করত, সাক্ষাৎ দ্রোণাচার্য জ্ঞানে, তাতেই বাণ-শিক্ষায় সিদ্ধ হ'ল।

দ্রঃ উপগুরু।

গুরুলাভ। যদি কারও ঠিক ঠিক অনুরাগ আসে ও সাধনভজনের প্রয়োজন মনে করে, তাহলে নিশ্চয় তিনি তার সদ্‌গুরু জুটিয়ে দেন; গুরুর জন্য সাধকের চিন্তা করবার দরকার নাই। অতি ভাগ্যবলে স্বপ্নে দীক্ষা পায়।

গুরুশিষ্যবোধ। শুকদেব ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য জনকের কাছে গিয়েছিল। জনক বললে, আগে দক্ষিণা দাও। শুকদেব বললে, আগে উপদেশ না পেলে কেমন ক'রে দক্ষিণা হয়! জনক হাসতে হাসতে বললে, তোমার ব্রহ্মজ্ঞান হ'লে আর কি গুরুশিষ্য বোধ থাকবে? তাই আগে দক্ষিণার কথা বললাম।

গৃহ-কেল্লা। সংসারে কাম, ক্রোধ এই সবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়, নানা বাসনার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রতে হয়, আসক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়। যুদ্ধ কেল্লা থেকে হলেই সুবিধা। গৃহ থেকে যুদ্ধই ভাল;—খাওয়া মেলে, ধর্মপত্নী অনেক রকম সাহায্য ক'রে। কলিতে অন্নগত প্রাণ—অন্নের জন্য; সাত জায়গায় ঘুরার চেয়ে এক জায়গায় ভাল। গৃহ-কেল্লার ভিতরে থেকে যেন যুদ্ধ করা।

গৃহত্যাগ প্রয়োজন কি? একেবারে নয়। যখন অবসর পাবে, কোন নির্জন স্থানে গিয়ে একদিন-দুদিন থাকবে, যেন কোন বিষয়ী লোকদের সঙ্গে সাংসারিক বিষয় লয়ে আলাপ না ক'রতে হয়। হয় নির্জনে বাস, নয় সাধুসঙ্গ।

গৃহবাসে সাধনা। ত্যাগ তোমাদের কেন করতে হবে? যে কালে যুদ্ধ করতেই হবে, কেল্লা থেকেই যুদ্ধ ভাল। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুদ্ধ, খিদে-তৃষ্ণা এ সবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। এ যুদ্ধ সংসার থেকেই ভাল। আবার কলিতে অন্নগত প্রাণ, হয়তো খেতেই পেলে না। তখন ঈশ্বর-টীশ্বর সব ঘুরে যাবে। একজন তার মাগকে বলেছিল, আমি সংসার ত্যাগ করে চললুম। মাগটি একটু জ্ঞানী ছিল। সে বললে, কেন তুমি ঘুরে ঘুরে বেড়াবে? যদি পেটের ভাতের জন্য দশ ঘরে যেতে না হয় তবে যাও। তা যদি হয়, তাহ'লে এই এক ঘরই ভাল।

তোমরা ত্যাগ কেন করবে? বাড়িতে বরং সুবিধা। আহারের জন্য ভাবতে হবে না। সহবাস স্বদারা সঙ্গে, তাতে দোষ নাই। শরীরের যখন যেটি দরকার কাছেই পাবে। রোগ হ'লে সেবা করবার লোক কাছে পাবে।

জনক, ব্যাস, বশিষ্ঠ জ্ঞানলাভ ক'রে সংসারে ছিলেন। এঁরা দু'খানা তরবার ঘুরাতেন। একখানা জ্ঞানের, একখানা কর্মের।

দ্রঃ দাসীভাব।

গৃহস্থ সন্ন্যাস। সব কাজ করবে কিন্তু মন ঈশ্বরেতে রাখবে। স্ত্রী, পুত্র, বাপ, মা, সকলকে নিয়ে থাকবে ও সেবা করবে। যেনকত আপনার লোক। কিন্তু মনে জানবে যে তারা তোমার কেউ নয়।

বড় মানুষের বাড়ির দাসী, সব কাজ করে যাচ্ছে, কিন্তু দেশে নিজের বাড়ির দিকে মন প'ড়ে আছে। আবার সে মনিবের ছেলেদের আপনার ছেলের মতো মানুষ করে। বলে 'আমার রাম' 'আমার হরি' কিন্তু মনে বেশ জানে—এরা আমার কেউ নয়।

কচ্ছপ জলে চ'রে বেড়ায় কিন্তু তার মন কোথায় পড়ে আছে জান?—আড়ায় পড়ে আছে। যেখানে তার ডিমগুলি আছে। সংসারের সব কর্ম করবে কিন্তু ঈশ্বরে মন ফেলে রাখবে।

ঈশ্বরে ভক্তি লাভ না ক'রে যদি সংসার করতে যাও তা'হলে আরও জড়িয়ে পড়বে। বিপদ, শোক, তাপ এ সবে অধৈর্য হ'য়ে যাবে। আর যত বিষয় চিন্তা করবে ততই আসক্তি বাড়বে।

তেল হাতে মেখে তবে কাঁঠাল ভাঙ্গতে হয়। তা না হ'লে হাতে আঠা জড়িয়ে যায়। ঈশ্বরে ভক্তিরূপ তেল লাভ ক'রে তবে সংসারের কাজে হাত দিতে হয়।

কিন্তু এই ভক্তি লাভ করতে হলে নির্জন হওয়া চাই। মাখন তুলতে গেলে নির্জনে দই পাততে হয়। দইকে নাড়ানাড়ি করলে দই বসে না। তারপর নির্জনে বসে সব কাজ ফেলে দই মন্থন করতে হয়। তবে মাখন তোলা যায়।

আবার দেখ, এই মনে নির্জনে ঈশ্বরের চিন্তা করলে জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তি লাভ হয়। কিন্তু সংসারে ফেলে রাখলে ঐ মন নীচ হ'য়ে যায়। সংসারে কেবল কামিনীকাঞ্চন চিন্তা।

সংসার জল, আর মনটি যেন দুধ। যদি জলে ফেলে রাখ, তা'হলে দুধে-জলে মিশে এক হ'য়ে যায়, খাঁটি দুধ খুঁজে পাওয়া যায় না। দুধকে দই পেতে মাখন তুলে যদি জলে রাখা যায়, তাহলে ভাসে। তাই নির্জনে সাধনা দ্বারা আগে জ্ঞানভক্তিরূপ মাখন লাভ করবে। সেই মাখন সংসার জলে ফেলে রাখলেও মিশবে না; ভেসে থাকবে।

সঙ্গে সঙ্গে বিচার করা খুব দরকার। কামিনী-কাঞ্চন অনিত্য। ঈশ্বরই একমাত্র বস্তু। টাকায় কি হয়? ভাত হয়, ডাল হয়, কাপড় হয়, থাকবার জায়গা হয়, এই পর্যন্ত। কিন্তু এতে ভগবান লাভ হয় না। তাই টাকা জীবনের উদ্দেশ্য হ'তে পারে না—এর নাম বিচার; বুঝেছ?

গৃহস্থাশ্রমে কি ভগবান লাভ হয়? কেন হবে না? পাঁকাল মাছের মতো থাকো। সে পাঁকে থাকে কিন্তু গায়ে পাঁক নাই। আর ঘুসকির মতো থাকো। সে ঘরকন্নার সব কাজ করে, কিন্তু মন উপপতির উপর পড়ে থাকে। ঈশ্বরের উপর মন ফেলে রেখে সংসারের সব কাজ কর। কিন্তু বড় কঠিন। আমি ব্রহ্মজ্ঞানীদের বলেছিলুম, যে ঘরে আচার, তেঁতুল আর জলের জালা সেই ঘরেই বিকারের রোগী। কেমন করে রোগ সারবে? আচার তেঁতুল মনে করলে মুখে জল সরে। পুরুষের পক্ষে স্ত্রীলোক আচার তেঁতুলের মতো। আর বিষয়তৃষ্ণা সর্বদাই লেগে আছে; ঐটি জলের জালা। এ তৃষ্ণার শেষ নাই। বিকারের রোগী বলে, এক জালা জল খাব। বড় কঠিন। সংসারে নানা গোল। এদিকে যাবি, কোঁস্তা ফেলে মারবো; ওদিকে যাবি, ঝাঁটা ফেলে মারবো; এদিকে যাবি জুতো ফেলে মারবো। আর নির্জন

না হলে ভগবান চিন্তা হয় না। সোনা গলিয়ে গয়না গড়বো, তা' যদি গলাবার সময় পাঁচবার ডাকে, তাহলে সোনা গলান কেমন করে হয় ? চাল কাঁড়ছো, একলা বসে কাঁড়তে হয়। এক একবার চাল হাতে করে তুলে দেখতে হয়, কেমন সাফ হ'ল। কাঁড়তে কাঁড়তে যদি পাঁচবার ডাকবে, ভাল কাঁড়া কেমন করে হয় ?

গৃহস্থের অকল্যাণ। সাধু সন্ন্যাসী গেরস্থর বাড়ী থেকে অভুক্ত ফিরে গেলে গেরস্থর বড় অকল্যাণ হয়।

গৃহাশ্রমে কিভাবে ঈশ্বরলাভ সম্ভব। যদি তীব্র বৈরাগ্য হয়, তা'হলে হয়। যা মিথ্যা বলে জানছি, রোক করে তৎক্ষণাৎ ত্যাগ কর। যখন আমার ভারী ব্যামো, গঙ্গাপ্রসাদ সেনের কাছে লয়ে গেল। গঙ্গাপ্রসাদ বললে, স্বর্ণপটপটি খেতে হবে, কিন্তু জল খেতে পাবে না ; বেদানার রস খেতে পার। সকলে মনে করলে, জল না খেয়ে কেমন করে আমি থাকবো। আমি রোক কল্লুম, আর জল খাব না। 'পরমহংস'। আমি ত পাতিহাঁস নই—রাজহাঁস। দুধ খাব।

কিছুদিন নির্জনে থাকতে হয়। বুড়ী ছুঁয়ে ফেললে আর ভয় নাই। সোনা তার পরে যেখানেই থাক। নির্জনে থেকে যদি ভক্তিলাভ হয়, যদি ভগবান লাভ হয়, তা হলে সংসারেও থাকা যায়।

গৃহী ও সচ্চিদানন্দ সাগর। তোমরা গৃহী, একেবারে সচ্চিদানন্দ সাগরে কি ক'রে গিয়ে পড়বে ? সেই নেউলের মতো পেছনে বাঁধা ইট, কোনো কিছু হ'লে কুলঙ্গায় উঠে বসলো, কিন্তু থাকবে কেমন ক'রে। ইটে টানে আর ধুপ ক'রে নেবে পড়ে। তোমরাও একটু ধ্যান-ট্যান করতে পার কিন্তু দারা-সুত ইট টেনে আবার নামিয়ে ফেলে। তোমরা ভক্তি নদীতে একবার ডুব দেবে আবার উঠবে, আবার ডুব দেবে আবার উঠবে। এমনি চলবে। তোমরা একেবারে ডুবে যাবে কি ক'রে ?

গৃহীর পক্ষে (কামিনীকাঞ্চন) : 'কামিনী কাঞ্চন' দ্রষ্টব্য।

গৃহীর প্রথম কর্তব্য। তোমাদের কর্তব্য আছে বৈ কি ? ছেলেদের মানুষ করা ; স্ত্রীকে ভরণপোষণ করতে, তোমার অবর্তমানে স্ত্রীর ভরণপোষণের যোগাড় ক'রে রাখতে হবে। তা যদি না কর, তুমি নির্দয়। শুকদেবাদি দয়া রেখেছিলেন। দয়া যার নাই সে মানুষই নয়।

গোখরোর পাল্লা। একটা কোলাব্যাঙ হেলে সাপের পাল্লায় পড়েছিল। সে ওটাকে গিলতেও পারছে না, ছাড়তেও পারছে না। আর কোলাব্যাঙটার যন্ত্রণা—সেটা ক্রমাগত ডাকছে। ঢোঁড়া সাপটারও যন্ত্রণা। কিন্তু গোখরো সাপের পাল্লায় যদি পড়তো তা হ'লে দু-এক ডাকেই শান্তি হয়ে যেত।

দ্র. গুরু (সদ্ ও কাঁচা)

'গোপাল গোপাল'-বলা। 'মেকীভক্ত' দ্রষ্টব্য।

গোপী অনুরাগ : 'অনুরাগ (গোপীদের)' দ্রষ্টব্য।'

গোপীদের কামনা। গোপীদের ব্রহ্মজ্ঞান ছিল। কিন্তু তারা ব্রহ্মজ্ঞান চাইত না। তারা কেউ বাৎসল্যভাবে, কেউ সখ্যভাবে, কেউ মধুরভাবে, কেউ দাসীভাবে ঈশ্বরকে সম্ভোগ ক'রতে চাইত।

গোপীদের প্রেম। গোপীদের প্রেমাভক্তি। প্রেমাভক্তিতে দুটি জিনিস থাকে—অহংতা আর মমতা। আমি কৃষ্ণকে সেবা না ক'রলে কৃষ্ণের অসুখ হবে—এর নাম অহংতা। এতে ঈশ্বরবোধ থাকে না।

মমতা—'আমার আমার' করা। পাছে পায়ে কিছু আঘাত লাগে, গোপীদের এত মমতা, তাদের সূক্ষ্ম শরীর শ্রীকৃষ্ণের চরণতলে থাকত।

যশোদা বল্লেন. তোদের চিন্তামণি-কৃষ্ণ জানি না—আমার গোপাল। গোপীরাও বলছে, কোথায় আমার প্রাণবল্লভ। আমার হৃদয়বল্লভ। ঈশ্বরবোধ নাই।

যেমন ছোট ছেলেরা, দেখেছি বলে, 'আমার বাবা'। যদি কেউ বলে, 'না, তোর বাবা নয়' ;—তাহলে বলবে 'না, আমার বাবা।'

দ্র. **জীবনের উদ্দেশ্য**।

গোপীর নিষ্ঠা। গোপীদের কি নিষ্ঠা। মথুরায় দ্বারীকে অনেক কাকুতি-মিনতি ক'রে সভায় ঢুকলো। দ্বারী কৃষ্ণের কাছে তাদের লয়ে গেল। কিন্তু পাগড়ী বাঁধা শ্রীকৃষ্ণকে দেখে তারা হেঁটমুখ হয়ে রইল। পরস্পর বলতে লাগলো, এ পাগড়ী-বাঁধা আবার কে। এঁর সঙ্গে আলাপ ক'ল্লে আমরা কি শেষে দ্বিচারিণী হবো। আমাদের পীতধড়া মোহনচূড়াপরা সেই প্রাণবল্লভ কোথায়।

দেখেছ, এদের কি নিষ্ঠা। বৃন্দাবনের ভাবই আলাদা। শুনেছি, দ্বারকার কাছে লোকেরা অর্জুনের কৃষ্ণকে পূজা করে। তারা রাধা চায় না।

গোপীরা কে? গোপীরা কে জান? রামচন্দ্র বনে বনে ভ্রমণ করতে করতে—ষষ্টি সহস্র ঋষি বসেছিলেন, তাদের দিকে একবার চেয়ে দেখেছিলেন, সস্নেহে। তাঁরা রামচন্দ্রকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়েছিলেন। কোন কোন পুরাণে আছে, তারাই গোপী।

গোবিন্দ অধিকারী (যাত্রাওয়ালা)। গোবিন্দ অধিকারী যাত্রার দলে ভাল লোক রাখত না ; ভাগ দিতে হবে ব'লে।

গোস্বামীর কাজ। তোমরা গোস্বামী, তোমাদের ঠাকুর সেবা আছে, তোমাদের সংসার ত্যাগ করলে চলবে না। তা হ'লে ঠাকুর সেবা কে করবে? তোমরা মনে ত্যাগ করবে।

তিনিই লোকশিক্ষার জন্য তোমাদের সংসারে রেখেছেন—তুমি হাজার মনে করো, ত্যাগ করতে পারবে না—তিনি এমন প্রকৃতি তোমায় দিয়েছেন যে, তোমার সংসারের কাজই করতে হবে।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন—তুমি যুদ্ধ করবে না, কি বলছো?—তুমি ইচ্ছা করলেই যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হ'তে পারবে না, তোমার প্রকৃতিতে তোমায় যুদ্ধ করাবে।

গৌরী পণ্ডিত। গৌরী পণ্ডিত সাধন করেছিল। যখন স্তব করতো, 'হা রে রে নিরালম্ব লম্বোদর।'—তখন পণ্ডিতেরাও কেঁচো হয়ে যেত।

গ্যাস কোম্পানী। 'জ্ঞানদীপ' দ্রষ্টব্য।

ঘাম বার করো। টাকার জন্য যেমন ঘাম বার করো, তেমনি হরিনাম করে নেচে গেয়ে ঘাম বার করতে হয়।

আমি মনে করলাম, তোমাদের সঙ্গে নাচবো। গিয়ে দেখি যে ফোড়ন-টোড়ন সব পড়েছে—মেথি পর্যন্ত। আমি আর কি দিয়ে সম্বরা করবো।

তোমরা মাঝে মাঝে হরিনাম করতে অমন এসো।

ঘোষপাড়ার মত। একদিন আমি দালানে খাচ্ছি। একজন ঘোষপাড়ার মতের লোক এলো। এসে বলছে—তুমি খাচ্ছো, না কারুকে খাওয়াচ্ছ? অর্থাৎ যে সিদ্ধ হয়; সে দেখে যে, অন্তরে ভগবান আছেন।

যারা এ মতে সিদ্ধ হয়, তারা অন্য মতের লোকদের বলে 'জীব'। বিজাতীয় লোক থাকলে কথা কবে না। বলে—এখানে 'জীব' আছে।

ও দেশে এই মতের লোক একজন দেখেছি। সরী (সরস্বতী) পাথর—মেয়ে মানুষ। এ মতের লোকে পরস্পরের বাড়ীতে খায়, কিন্তু অন্য মতের লোকের বাড়ী খাবে না। মল্লিকরা সরী পাথরের বাড়ীতে গিয়ে খেলে তবু হৃদের বাড়ীতে খেলে না। বলে ওরা 'জীব' (হাস্য)।

আমি একদিন তার বাড়ীতে হৃদের সংগে বেড়াতে গিছ্‌লাম। বেশ তুলসী বন করেছে। কড়াই মুড়ি দিলে, দুটি খেলুম। হৃদে অনেক খেয়ে ফেল্লে, তার পর অসুখ।

ওরা সিদ্ধাবস্থাকে বলে সহজ অবস্থা। এক থাকের লোক আছে, তারা 'সহজ' 'সহজ' করে চ্যাঁচায়। সহজাবস্থার দুটি লক্ষণ বলে। প্রথম—কৃষ্ণগন্ধ গায়ে থাকবে না। দ্বিতীয়—পদ্মের উপর অলি বসবে, কিন্তু মধু পান করবে না। 'কৃষ্ণগন্ধ' নাই—এর মানে ঈশ্বরের ভাব সমস্ত অন্তরে, বাহিরে কোন চিহ্ন নাই, হরিনাম পর্যন্ত মুখে নাই। আর একটির মানে, কামিনীতে আসক্তি নাই—জিতেন্দ্রিয়।

ওরা ঠাকুরপূজা, প্রতিমাপূজা, এ সব লাইক করে না, জীবন্ত মানুষ চায়। তাই ত ওদের এক থাকের লোককে বলে কর্তাভজা, অর্থাৎ যারা কর্তাকে—গুরুকে—ঈশ্বর বোধে ভজনা করে, পূজা করে।

চক্র ও ভূমি। বেদমতে এ সব চক্রকে* 'ভূমি' বলে। সপ্তভূমি। হৃদয়—চতুর্থ ভূমি। অনাহত পদ্ম দ্বাদশ দল।

বিশুদ্ধ চক্র পঞ্চম ভূমি। এখানে মন উঠলে কেবল ঈশ্বরকথা বলতে আর শুনতে প্রাণ ব্যাকুল হয়। এ চক্রের স্থান কণ্ঠ। ষোড়শ দল পদ্ম। যার এই চক্রে মন এসেছে, তার সামনে বিষয়কথা—কামিনী-কাঞ্চনের কথা—হ'লে ভারী কষ্ট হয়। ওরূপ কথা শুনলে সে সেখান থেকে উঠে যায়।

তারপর ষষ্ঠ ভূমি। আজ্ঞা চক্র—দ্বিদল পদ্ম। এখানে কুলকুণ্ডলিনী এলে ঈশ্বরের রূপ দর্শন হয়। কিন্তু একটু আড়াল থাকে—যেমন লণ্ঠনের ভিতর আলো, মনে হয় আলো ছুঁলাম, কিন্তু কাচ ব্যবধান আছে ব'লে ছোঁয়া যায় না। তারপর সপ্তম ভূমি। সহস্রার পদ্ম। সেখানে কুণ্ডলিনী গেলে সমাধি হয়।

সহস্রারে সচ্চিদানন্দ শিব আছেন—তিনি শক্তির সহিত মিলিত হন। শিব-শক্তির মিলন।

সহস্রারে মন এসে সমাধিস্থ হ'য়ে আর বাহ্য থাকে না। সে আর দেহ রক্ষা করতে পারে না। মুখে দুধ দিলে দুধ গড়িয়ে যায়। এ অবস্থায় থাকলে একুশ দিনে মৃত্যু হয়। কালাপানিতে গেলে জাহাজ আর ফেরে না।

ঈশ্বরকোটী—অবতারাদি—এই সমাধি অবস্থা থেকে নামতে পারে। তারা ভক্তি ভক্ত নিয়ে থাকে, তাই নামতে পারে। তিনি তাদের ভিতর 'বিদ্যার আমি'—'ভক্তের আমি'—লোকশিক্ষার জন্য রেখে দেন। তাদের অবস্থা—যেমন ষষ্ঠ ভূমি আর সপ্তম ভূমির মাঝখানে বাচ্‌খেলা।

[* ষড়চক্ররূপে বর্ণিত মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞাকে এই সব চক্র বলা হয়েছে।]

চন্দ্র হালদার। কালীঘাটের চন্দ্র হালদার। সেজোবাবুর কাছে প্রায়ই আসতো। আমি ঈশ্বরের আবেশে মাটিতে অন্ধকারে পড়ে আছি। চন্দ্র হালদার ভাবতো, আমি ঢং ক'রে ঐ রকম হ'য়ে থাকি, বাবুর প্রিয়পাত্র হব বলে। সে অন্ধকারে এসে বুট জুতার গোঁজা দিতে লাগলো। গায়ে দাগ হয়েছিল। সবাই বললে, সেজোবাবুকে বলে দেওয়া যাক। আমি বারণ ক'রলুম।

চাতক। চৈতন্যের লক্ষণ দ্রষ্টব্য।

চাপরাস ও লোকশিক্ষা। ও-দেশে হালদার পুকুর ব'লে একটা পুকুর আছে। পাড়ে রোজ সকালবেলা লোকে বাহ্যে ক'রে রাখতো। যারা সকালবেলা আসে তারা খুব গালাগাল দেয়। আবার তারপর দিন সেইরূপ। বাহ্যে আর থামে না। (সকলের হাস্য)। তখন লোকে কোম্পানীকে জানালে। তারা একটা চাপরাসী পাঠিয়ে দিলে। সেই চাপরাসী যখন একটা কাগজ মেরে দিলে, 'বাহ্যে করিও না' তখন সব বন্ধ হ'লো। (সকলের হাস্য)।

লোকশিক্ষা দেবে তার চাপরাস চাই। না হ'লে হাসির কথা হ'য়ে পড়ে। আপনারই হয় না, আবার অন্যলোক। কানা কানাকে পথ দেখিয়ে ল'য়ে যাচ্ছে। (হাস্য)। হিতে-বিপরীত। ভগবান লাভ হ'লে অন্তর্দৃষ্টি হয়, কার কি রোগ বোঝা যায়। উপদেশ দেওয়া যায়। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহং ইতি মন্যতে।

আদেশ না থাকলে 'আমি লোকশিক্ষা দিচ্ছি' এই অহঙ্কার হয়। অহঙ্কার হয় অজ্ঞানে। অজ্ঞানে বোধ হয়, আমি কর্তা। ঈশ্বর কর্তা, ঈশ্বরই সব ক'রছেন, আমি কিছু করছি না, এ বোধ হলে তো সে জীবন্মুক্ত। 'আমি কর্তা,' 'আমি কর্তা', এই বোধ থেকেই যত দুঃখ, অশান্তি।

চার। আমি হঠাৎ অন্নপূর্ণা প্রতিষ্ঠার সময় দ্বারিকাবাবুকে বলেছিলাম (১৮৭৪-৭৫) বড় দীঘিতে বড় মাছ আছে গভীর জলে। চার ফেল, সেই চারের গন্ধে ঐ বড় মাছ আসবে। এক একবার ঘাই দেবে। প্রেম ভক্তি রূপ চার।

চাঁদ (দ্বিতীয়ার ও পূর্ণ)। আজ আমার খুব দিন। আমি দ্বিতীয়ার চাঁদ দেখলাম। দ্বিতীয়ার চাঁদ কেন বললুম জান? সীতা রাবণকে বলেছিলেন, রাবণ পূর্ণচন্দ্র, আর রামচন্দ্র আমার দ্বিতীয়ার চাঁদ। রাবণ মানে বুঝতে পারে নাই, তাই

ভারী খুশী। সীতার বলবার উদ্দেশ্য এই যে, রাবণের সম্পদ যতদূর হবার হ'য়েছে, এইবার দিন দিন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় হ্রাস পাবে। রামচন্দ্র দ্বিতীয়ার চাঁদ, তাঁর দিন দিন বৃদ্ধি হবে।

চাঁদামামা। 'চেলা নেই' দ্রষ্টব্য।

চিচ্ছক্তি ব্রহ্ম অভেদ। এই চিচ্ছক্তি আর বেদান্তের ব্রহ্ম (পুরুষ) অভেদ। যেমন জল আর তার হিমশক্তি। জলের হিমশক্তি ভাবলেই জলকে ভাবতে হয়; আবার জলকে ভাবলেই জলের হিমশক্তি ভাবনা এসে পড়ে। সাপ আর সাপের তির্যক্-গতি। তির্যক্‌গতি ভাবলেই সাপকে ভাবতে হবে। ব্রহ্ম বলি কখন? যখন নিষ্ক্রিয় বা কার্যে নির্লিপ্ত। পুরুষ যখন কাপড় পরে, তখন সেই পুরুষ থাকে। ছিলে দিগম্বর হলে সাম্বর—আবার হবে দিগম্বর। সাপের ভিতর বিষ আছে, সাপের কিছু হয় না। যাকে কামড়াবে, তার পক্ষে বিষ। ব্রহ্ম নিজে নির্লিপ্ত।

চিনি নেওয়া। এই সংসারে বালি আর চিনি মিশেল আছে। পিঁপড়ের মতো বালি ত্যাগ করে করে চিনিটুকু নিতে হয়। যে চিনিটুকু নিতে পারে সেই চতুর। তাঁর চিন্তা করবার জন্য একটু নির্জন স্থান কর। ধ্যানের স্থান। তুমি একবার কর না। আমিও একবার যাব।

চিল : অবধূতের গুরু। 'অবধূতের গুরু' দ্রষ্টব্য।

চিল-শকুন। 'তীর্থে যাওয়া' দ্রষ্টব্য।

চুম্বকপাথর। 'লোকশিক্ষা' দ্রষ্টব্য।

চেলা নেই। আমার কোন শালা চেলা নাই। আমিই সকলের চেলা। সকলেই ঈশ্বরের ছেলে, সকলেই ঈশ্বরের দাস—আমিও ঈশ্বরের ছেলে, আমিও ঈশ্বরের দাস।

চাঁদা মামা সকলেরই মামা।

চেষ্টাদ্বারা আয়ত্ত করতে হয়। কেশব সেন, প্রতাপ, এরা সব ব'লেছিল, মহাশয়, আমাদের জনক রাজার মতো। আমি বললুম, জনক রাজা অমনি মুখে বললেই হওয়া যায় না। জনক রাজা হেঁটমুণ্ড হ'য়ে আগে নির্জনে কত তপস্যা ক'রেছিল। তোমরা কিছু কর, তবে তো 'জনক রাজা' হবে। অমুক খুব তর তর ক'রে ইংরাজী লিখতে পারে, তা কি একেবারে লিখতে পেরেছিল? সে গরীবের ছেলে, আগে একজনের বাড়িতে থেকে তাদের রেঁধে দিতো, আর দুটি দুটি খেতো, অনেক কষ্টে লেখাপড়া শিখেছিলো, তাই এখন তর তর করে লিখতে পারে।

চৈতন্য : ভাব-অভাব। অভাবমুখ চৈতন্য আর ভাবমুখ চৈতন্য। ভাব ভক্তির একটি পথ আছে; আর অভাবের একটি আছে। তুমি অভাবের কথা বলছ। কিন্তু 'সে বড় কঠিন ঠাঁই গুরু-শিষ্যে দেখা নাই।' জনকের কাছে শুকদেব ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশের জন্য গেলেন। জনক বললেন, 'আগে দক্ষিণা দিতে হ'বে—তোমার ব্রহ্মজ্ঞান হ'লে আর দক্ষিণা দেবে না—কেননা তখন গুরুশিষ্যে ভেদ থাকে না।' ভাব অভাব সবই পথ। অনন্ত মত অনন্ত পথ। কিন্তু একটি কথা আছে। কলিতে নারদীয় ভক্তি—এই বিধান। এ পথে প্রথমে ভক্তি, ভক্তি পাকলে ভাব,

ভাবের চেয়ে উচ্চ মহাভাব আর প্রেম। মহাভাব আর প্রেম জীবের হয় না। যার তা হয়েছে তার বস্তুলাভ অর্থাৎ ঈশ্বরলাভ হয়েছে।

চৈতন্যদর্শন। অদ্বৈতজ্ঞান না হলে চৈতন্য দর্শন হয় না। চৈতন্য দর্শন হলে তবে নিত্যানন্দ। পরমহংস অবস্থায় এই নিত্যানন্দ।

বেদান্ত মতে অবতার নাই। সে মতে চৈতন্যদেব অদ্বৈতের একটি ফুট।

চৈতন্যদর্শন কিরূপ ? এক একবার চিনে দেশলাই জেবলে অন্ধকার ঘরে যেমন আলো।

চৈতন্যদেব। তিনি ঈশ্বরের অবতার। তাঁরসঙ্গে জীবের অনেক তফাত। তাঁর এমন বৈরাগ্য যে, সার্বভৌম যখন জিহবায় চিনি ঢেলে দিলে, চিনি হাওয়াতে ফর্ ফর্ করে উড়ে গেল, ভিজলো না। সর্বদাই সমাধিস্থ। কত বড় কামজয়ী। জীবের সহিত তাঁর তুলনা। সিংহ বার বছরে একবার রমণ করে, কিন্তু মাংস খায় ; চড়ুই কাঁকর খায়, কিন্তু রাতদিনই রমণ করে। তেমনিঅবতার আর জীব। জীব কাম ত্যাগ করে, আবার একদিন হয়তো রমণ হয়ে গেল ; সামলাতে পারে না। লজ্জা কেন ? যার হয় সে লোক পোক দেখে। লজ্জা ঘৃণা ভয়, তিন থাকতে নয়। এ সব পাশ। অষ্ট পাশ আছে না ?

দ্রঃ অনাসক্ত। প্রেম। মা। ভক্তি : ভাব : চৈতন্যদেব।

চৈতন্যদেবের দশা। চৈতন্যদেবের তিনটি অবস্থা হ'ত—১. বাহ্য দশা—তখন স্থূল আর সূক্ষ্মে তাঁর মন থাকত। ২. অর্ধ বাহ্য দশা—তখন কারণ শরীরে, কারণানন্দে মন গিয়েছে। ৩. অন্তর্দশা—তখন মহাকারণে মন লয় হ'তো।

বেদান্তের পঞ্চকোষের সঙ্গে এর বেশ মিল আছে। স্থূলশরীর, অর্থাৎ অন্নময় ও প্রাণময় কোষ। সূক্ষ্মশরীর, অর্থাৎ মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষ। কারণশরীর, অর্থাৎ আনন্দময় কোষ। মহাকারণ পঞ্চকোষের অতীত। মহাকারণে যখন মন লীন হ'ত তখন সমাধিস্থ।—এরই নাম নির্বিকল্প বা জড়-সমাধি।

চৈতন্যদেবের যখন বাহ্য দশা হ'ত তখন নাম-সংকীর্তন করতেন। অর্ধ বাহ্য-দশায় ভক্তসঙ্গে নৃত্য করতেন। অন্তর্দশায় সমাধিস্থ হ'তেন।

চৈতন্য ভক্তির অবতার : জীবকে ভক্তি শিখাতে এসেছিলেন। তাঁর উপর ভক্তি হ'ল তো সবই হ'ল। হঠযোগের কিছু দরকার নাই।

চৈতন্যবাণ। যাদের চৈতন্য হয়েছে, যাদের ঈশ্বর সৎ আর সব অসৎ অনিত্য বলে বোধ গেছে, তাদের আর এক রকম ভাব। তারা জানে যে, ঈশ্বরই একমাত্র কর্তা,আর সব অকর্তা। যাদের চৈতন্য হয়েছে তাদের বেতালে পা পড়ে না, হিসাব করে পাপ ত্যাগ কর্তে হয় না, ঈশ্বরের উপর এত ভালবাসা যে, যে কর্ম তারা করে সেই কর্মই সৎকর্ম। কিন্তু তারা জানে, এ কর্মের কর্তা আমি নই, আমি ঈশ্বরের দাস। আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী। তিনিযেমন করান, তেমনি করি, যেমন বলান তেমনি বলি, তিনি যেমন চালান, তেমনি চলি।

যাদের চৈতন্য হয়েছে,তারা পাপপুণ্যের পার। তারা দেখে ঈশ্বরই সব করছেন। এক জায়গায় একটি মঠ ছিল। মঠের সাধুরা রোজ মাধুকরী (ভিক্ষা) করতে যায়। একদিন একটি সাধু ভিক্ষা করতে করতে দেখে যে, একটি জমিদার একটি

লোককে ভারী মারছে। সাধুটি বড় দয়ালু; সে মাঝে পড়ে জমিদারকে মারতে বারণ করলে। জমিদার তখন ভারী রেগে রয়েছে, সে সমস্ত কোপটা সাধুটির গায়ে ঝাড়লে। এমন প্রহারকরলে যে, সাধুটি অচৈতন্য হয়ে পড়ে রইলো। কেউ গিয়ে মঠে খবর দিলে, তোমাদের একজন সাধুকে জমিদার ভারী মেরেছে। মঠের সাধুরা দৌড়ে এসে দেখে সাধুটি অচৈতন্য হয়ে পড়ে রয়েছে। তখন তারা পাঁচজনে ধরাধরি করে তাকে মঠের ভিতর নিয়ে গিয়ে একটি ঘরে শোয়ালে। সাধু অজ্ঞান, চারিদিকে মঠের লোকে ঘিরে বিমর্ষ হয়ে বসে আছে, কেউ কেউ বাতাস কচ্চে। একজন বল্লে, মুখে একটু দুধ দিয়ে দেখা যাক। মুখে দুধ দিতে দিতে সাধুর চৈতন্য হ'ল। চোখ মেলে দেখতে লাগলো। একজন বল্লে, 'ওহে দেখি, জ্ঞান হয়েছে কিনা? লোক চিনতে পারছে কি না?' তখন সে সাধুকে খুব চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'মহারাজ! তোমাকে কে দুধ খাওয়াচ্ছে?' সাধু আস্তে আস্তে বলছে, 'ভাই! যিনি আমাকে মেরেছিলেন, তিনিই দুধ খাওয়াচ্ছেন।'

চৈতন্যলাভ। চৈতন্য না লাভ করলে চৈতন্যকে জানা যায় না। বিচার কতক্ষণ? যতক্ষণ না তাঁকে লাভ করা যায়; শুধু মুখে বললে হবে না, এই আমি দেখছি তিনিই সব হয়েছেন। তাঁর কৃপায় চৈতন্য লাভ করা চাই! চৈতন্য লাভ করলে সমাধি হয়, মাঝে মাঝে দেহ ভুল হয়ে যায়, কামিনী কাঞ্চনের উপর আসক্তি থাকে না, ঈশ্বরীয় কথা ছাড়া কিছু ভাল লাগে না; বিষয় কথা শুনলে কষ্ট হয়। চৈতন্য লাভ ক'রলে তবে চৈতন্যকে জানতে পারা যায়।

চৈতন্যলাভের পর। আমি বলি, চৈতন্যলাভের পর সংসারে গিয়ে থাক। অনেক পরিশ্রম করে যদি কেউ সোনা পায়, সে মাটির ভিতর রাখতে পারে, জলের ভিতরও রাখতে পারে—সোনার কিছু হয় না।

আমি বলি, অনাসক্ত হয়ে সংসার কর। হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙ্গ—তাহলে হাতে আঠা লাগবে না।

কাঁচা মনকে সংসারে রাখতে গেলে মন মলিন হয়ে যায়। জ্ঞান লাভ করে তবে সংসারে থাকতে হয়।

শুধু জলে দুধ রাখলে দুধ নষ্ট হয়ে যায়। মাখন তুলে জলের উপর রাখলে আর কোন গোল থাকে না।

চৈতন্যের ত্রি-অবস্থা। চৈতন্যদেবের তিন রকম অবস্থা হ'তো—অন্তর্দশা, অর্ধ-বাহ্যদশা ও বাহ্যদশা। অন্তর্দশায় ভগবান দর্শন করে সমাধিস্থ হ'তেন—জড়-সমাধির অবস্থা হ'তো। অর্ধবাহ্যে একটু বাহিরের হুঁশ থাকতো। বাহ্যদশায় নামগুণ কীর্তন করতে পারতেন।

চৈতন্যের লক্ষণ। কারুর চৈতন্য হয়েছে। তার কিন্তু লক্ষণ আছে। ঈশ্বরীয় কথা বই আর কিছু শুনতে ভাল লাগে না। আর ঈশ্বরীয় কথা বই আর কিছু বলতে ভাল লাগে না। যেমন সাত সমুদ্র, গঙ্গা, যমুনা, নদী সব তাতে জল রয়েছে; কিন্তু চাতক বৃষ্টির জল চাচ্ছে। তৃষ্ণাতে ছাতি ফেটে যাচ্ছে, তবু অন্য জল খাবে না।

ছাগল কাট। অভিমান 'গ' দ্রষ্টব্য।

ছুঁচবাই। 'সত্য কথার বাতিক' দ্রষ্টব্য।

ছুঁচের ভিতর দিয়ে উট হাতী। 'ঈশ্বরের পক্ষে' দ্রষ্টব্য।

ছেলেবেলায়। আমি ছেলেদের এত ভালবাসি কেন জান ? ছেলেবেলা তাদের মন ষোল আনা নিজের কাছে থাকে, ক্রমে ভাগ হয়ে পড়ে। যে মন ভগবানকে দিতে হবে, সে মনের বার আনা মেয়েমানুষে নিয়ে ফেলে। তারপর তার ছেলে হলে প্রায় সব মনটাই খরচ হয়ে যায়। তাহলে ভগবানকে আর কি দেবে ? এইজন্য ছেলেবেলায় যারা ঈশ্বর লাভের চেষ্টা করে, তারা সহজে তাঁকে লাভ করতে পারবে। বুড়োদের হওয়া বড় কঠিন। আবার কারু কারু স্ত্রীকে আগলাতে আগলাতেই প্রাণ বেরিয়ে যায়।

জগৎ কি মিথ্যা। ক. মিথ্যা কেন ? ও সব বিচারের কথা।

প্রথমটা, 'নেতি' 'নেতি' বিচার করবার সময়, তিনি জীব নন, জগৎ নন, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব নন, হয়ে যায়,—'এ সব স্বপ্নবৎ' হয়ে যায়। তারপর অনুলোম বিলোম। তখন তিনিই জীব জগৎ হয়েছেন বোধ হয়।

তুমি সিঁড়ি ধরে ধরে ছাদে উঠলে। কিন্তু যতক্ষণ ছাদ বোধ ততক্ষণ সিঁড়িও আছে। যার উঁচু বোধ আছে, তার নীচু বোধও আছে।

আবার ছাদে উঠে দেখলে—যে জিনিসে ছাদ তৈয়ের হয়েছে—ইট, চুণ, সুরকি —সেই জিনিসেই সিঁড়ি তৈয়ের হয়েছে।

খ. **জগৎ মিথ্যা কেন হবে** ? ও সব বিচারের কথা। তাঁকে দর্শন হলে তখন বোঝা যায় যে তিনিই জীব জগৎ হয়েছেন।

আমায় মা কালীঘরে দেখিয়ে দিলেন যে মা-ই সব হয়েছেন। দেখিয়ে দিলেন সব চিন্ময়!—প্রতিমা চিন্ময়!—বেদী চিন্ময়!—কোশা কুশী চিন্ময়!—চৌকাট চিন্ময়!—মার্বেলের পাথর—সব চিন্ময়!

জগতের উপকার। দ্রঃ কৃষ্ণদাস পাল।

জগতের মাকে পেলে। জগতের মাকে পেলে, ভক্তিও পাবে, জ্ঞানও পাবে। জ্ঞানও পাবে, ভক্তিও পাবে। ভাবসমাধিতে রূপদর্শন, নির্বিকল্প সমাধিতে অখণ্ডসচ্চিদানন্দ দর্শন হয়, তখন অহং, নাম, রূপ থাকে না।

জগদ্ধাত্রীর রূপ। জগদ্ধাত্রীরূপের মানে জান ? যিনি জগৎকে ধারণ ক'রে আছেন। তিনি না ধ'রলে, তিনি না পালন ক'রলে জগৎ পড়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায়। মনকরীকে যে বশ ক'রতে পারে, তারই হৃদয়ে জগদ্ধাত্রী উদয় হন।

জগন্নাথের মহাপ্রসাদ। দ্রঃ গঙ্গাজল।

জগন্মাতার প্রকাশ। ঈশ্বর নরলীলা করেন। মানুষে তিনি অবতীর্ণ হন, যেমন শ্রীকৃষ্ণ, রামচন্দ্র, চৈতন্যদেব।

আমি কেশব সেনকে বলেছিলাম যে, মানুষের ভিতর তিনি বেশী প্রকাশ। মাঠের আলের ভিতর ছোট ছোট গর্ত থাকে; তাদের বলে ঘুটী। ঘুটীর ভিতর মাছ

কাঁকড়া জমে থাকে। মাছ, কাঁকড়া খুঁজতে গেলে ঐ ঘুটীর ভিতর খুঁজতে হয়; ঈশ্বরকে খুঁজতে হলে অবতারের ভিতর খুঁজতে হয়।

ঐ চৌদ্দপোয়া মানুষের ভিতর জগৎমাতা প্রকাশ হন।

দ্রঃ অবতারের আবির্ভাব।

জড়ভরত। জড়ভরত রাজা রহুগণের পাল্কী বহিতে বহিতে যখন আত্মজ্ঞানের কথা বলতে লাগলো, রাজা পাল্কী থেকে নীচে এসে বললে, তুমি কে গো! জড়-ভরত বললেন আমি নেতি, নেতি, শুদ্ধ আত্মা। একেবারে ঠিক বিশ্বাস, আমি শুদ্ধ আত্মা।

'ব্রহ্মজ্ঞান অবর্ণনীয়' দ্রষ্টব্য।

জড়সমাধি। 'সমাধি ও অহং' দ্রষ্টব্য।

জনক রাজা। 'নির্জন সাধনার প্রয়োজন'।

'চেষ্টাদ্বারা আয়ত্ত করতে হয়'।

জনক নির্লিপ্ত ব'লে তাঁর একটি নাম বিদেহ—কি না, দেহে দেহবুদ্ধি নাই। সংসারে থেকেও জীবন্মুক্ত হ'য়ে বেড়াতেন। কিন্তু দেহবুদ্ধি যাওয়া অনেক দূরের কথা। খুব সাধন চাই।

জনক ভারী বীরপুরুষ। দু'খানা তরবার ঘুরাতেন। একখানা জ্ঞান, একখানা কর্ম।

দ্রঃ 'জ্ঞান' : 'গুরু-শিষ্যবোধ'।

জন্মান্তর। দ্রঃ পরলোক। জন্মান্তর।

জন্মমৃত্যু। জন্ম মৃত্যু এসব ভেলকির মতো। এই আছে, এই নাই। জলই সত্য, জলের ভুড়ভুড়ি, এই আছে, এই নাই—ভুড়ভুড়ি জলে মিশিয়ে যায়। যে জলে উৎপত্তি, সেই জলেই লয়। ঈশ্বরই সত্য আর সব অনিত্য। ঈশ্বর যেন মহা-সমুদ্র, জীবেরা যেন ভুড়ভুড়ি, তাঁতেই জন্ম তাঁতেই লয়। ছেলেমেয়ে যেমন একটা বড় ভুড়ভুড়ির সঙ্গে পাঁচটা ছটা ছোট ভুড়ভুড়ি।

দ্রঃ মৃত্যু।

জপ। জপ থেকে ঈশ্বর লাভ হয়। নির্জনে গোপনে তাঁর নাম করতে করতে তাঁর কৃপা হয়। তারপর দর্শন। যেমন জলের ভিতর ডুবানো বাহাদুরী কাঠ আছে—তীরেতে শিকল দিয়ে বাঁধা—সেই শিকলের এক এক পাব ধরে ধরে গেলে, শেষে বাহাদুরী কাঠকে স্পর্শ করা যায়। ঠিক সেইরূপ জপ করতে করতে মগ্ন হয়ে গেলে ক্রমে ভগবানের সাক্ষাৎকার হয়। জপ করা কি, না নির্জনে নিঃশব্দে তাঁর নাম করা। একমনে নাম করতে করতে—জপ করতে করতে—তাঁর রূপ দর্শন হয়—তাঁর সাক্ষাৎকার হয়। দর্শনের কথা কাউকেও বলতে নাই তাহলে আর হয় না।

দ্রঃ স্মরণ মনন।

জমাবার চেষ্টা। জমাবার চেষ্টা মিথ্যা। অনেক কষ্টে মৌমাছি চাক তৈয়ার করে, আর একজন এসে ভেঙে নিয়ে যায়। বদ ছেলে!—পরিবার হয়তো নষ্ট—উপ-পতি করে—তোমারই ঘড়ি, তোমারই চেন তাকে দেবে। দেখ অর্থ যার দাস,

সেই মানুষ। যারা অর্থের ব্যবহার জানে না, তারা মানুষ হয়েও মানুষ নয়। আকৃতি মানুষের কিন্তু পশুর ব্যবহার।

জয়গোপাল সেন। যার টাকা আছে তার দেওয়া উচিত। (ত্রৈলোক্যের প্রতি) জয়গোপাল সেনের টাকা আছে তার দান করা উচিত। ও যে করে না সেটা নিন্দার কথা। এক একজন টাকা থাকলেও হিসেবী (কৃপণ) হয়;—টাকা যে কে ভোগ করবে তার ঠিক নাই।

সেদিন জয়গাপাল এসেছিল। গাড়ি করে আসে। গাড়িতে ভাঙ্গা লণ্ঠন;—ভাগাড়ের ফেরত ঘোড়া;—মেডিকেল কলেজের হাসপাতাল ফেরত দ্বারবান;—আর এখানের জন্য নিয়ে এল দুই পচা ডালিম।

জাগরণ ও স্বপ্ন : বেদান্তমতে। জাগরণ অবস্থাও কিছু নয়। এক কাঠুরে স্বপন দেখছিল। একজন লোক তার ঘুম ভাঙ্গানতে সে বিরক্ত হ'য়ে ব'লে উঠলো, 'তুই কেন আমার ঘুম ভাঙালি? আমি রাজা হয়েছিলাম, সাত ছেলের বাপ হয়েছিলাম। ছেলেরা সব লেখাপড়া, অস্ত্রবিদ্যা সব শিখছিল। আমি সিংহাসনে ব'সে রাজত্ব করছিলাম। কেন তুই আমার সুখের সংসার ভেঙ্গে দিলি?' সে ব্যক্তি বললে, 'ও ত স্বপন, ওতে আর কি হয়েছে।' কাঠুরে বললে, 'দূর। তুই বুঝিস না, আমার কাঠুরে হওয়া যেমন সত্য, স্বপনে রাজা হওয়াও তেমনি সত্য। কাঠুরে হওয়া যদি সত্য হয়, তা হ'লে স্বপনে রাজা হওয়াও সত্য।'

জাতিভেদ। 'আত্মকথা : জাতিভেদ কি আছে' দ্রষ্টব্য।

জাতিভেদ নিবারণ। ক. এক উপায়ে জাতিভেদ উঠে যেতে পারে। সে উপায়—ভক্তি। ভক্তের জাতি নাই। ভক্তি হ'লেই দেহ, মন, আত্মা, সব শুদ্ধ হয়। গৌর-নিতাই হরিনাম দিতে লাগলেন, আর আচণ্ডালে কোল দিলেন। ভক্তি থাকলে চণ্ডাল, চণ্ডাল নয়। অস্পৃশ্য জাতি ভক্তি থাকলে শুদ্ধ, পবিত্র হয়।

খ. আত্মজ্ঞান হলে জাতিভেদ থাকে না।

জাবর কাটা। দেবস্থান, তীর্থস্থান দর্শনাদি করে এসে সেই সব ভাব নিয়ে থাকতে হয়, জাবর কাটতে হয়, তা নইলে ওসব ঈশ্বরীয় ভাব প্রাণে দাঁড়াবে কেন? গরু যেমন পেট ভরে জাব খেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে এক জায়গায় বসে সেই সব খাবার উগরে ভাল করে চিবাতে বা জাবর কাটতে থাকে; সেই রকম দেবস্থান, তীর্থ-স্থান দেখবার পর সেখানে যে সব পবিত্র ঈশ্বরীয় ভাব মনে উঠে, সেই সব নিয়ে একান্তে বসে ভাবতে হয় ও তাইতে ডুবে যেতে হয়; দেখে এসেই সে সব মন থেকে তাড়িয়ে বিষয়ে, রূপ রসে, মন দিতে নাই; তাহলে ঐ ঈশ্বরীয় ভাবগুলি মনে স্থায়ী ফল আনে না। আবার ঈশ্বরীয়ভাব ভক্তিভরে হৃদয়ে পূর্ব হইতে পোষণ না করে তীর্থাদিতে গেলে, বিশেষ ফল পাওয়া যায় না।

দ্রঃ তীর্থফল।

জিতেন্দ্রিয় হওয়া। জিতেন্দ্রিয় হওয়া যায় কি রকম ক'রে? আপনাতে মেয়ের ভাব আরোপ কর্তে হয়। আমি অনেকদিন সখীভাবে ছিলাম। মেয়েমানুষের কাপড়, গয়না পরতুম, ওড়না গায়ে দিতুম। ওড়না গায়ে দিয়ে আরতি করতুম। তা না হলে পরিবারকে আট মাস কাছে এনে রেখেছিলাম কেমন ক'রে? দুজনেই

মা'র সখী।

আমি আপনাকে পুং (পুরুষ) বলতে পারি না। একদিন ভাবে রয়েছি (পরিবার) জিজ্ঞাসা করলে—আমি তোমার কে? আমি বললুম, 'আনন্দময়ী'।

জীব। দ্রঃ বদ্ধজীব। মুক্তজীব। চৈতন্যদেব।

জীবনের উদ্দেশ্য। ক. জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ। কর্ম তো আদিকাণ্ড; জীবনের উদ্দেশ্য হ'তে পারে না। তবে নিষ্কাম কর্ম একটা উপায়—উদ্দেশ্য নয়।

শম্ভু বললে, এখন এই আশীর্বাদ করুন যে, যা টাকা আছে, সেগুলি সদ্ব্যয়ে যায়—হাসপাতাল, ডিস্পেন্সারী করা, রাস্তা-ঘাট করা, কুয়ো করা এই সবে। আমি বললাম, এ সব কর্ম অনাসক্ত হ'য়ে করতে পারলে ভাল, কিন্তু তা বড় কঠিন। আর যাই হোক এটি যেন মনে থাকে যে, তোমার মানবজন্মের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ। হাসপাতাল ডিস্পেন্সারী করা নয়। মনে কর ঈশ্বর তোমার সামনে এলেন; এসে বললেন, তুমি বর লও। তা হলে তুমি কি বলবে, আমায় কতকগুলো হাসপাতাল ডিস্পেন্সারী ক'রে দাও, না, বলবে—হে ভগবান, তোমার পাদপদ্মে যেন শুদ্ধা ভক্তি হয়, আর যেন তোমাকে আমি সর্বদা দেখতে পাই। হাসপাতাল, ডিস্পেন্সারী, এ সব অনিত্য বস্তু। ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু। তাঁকে লাভ হ'লে আবার বোধ হয়, তিনিই কর্তা আমরা অকর্তা। তবে কেন তাঁকে ছেড়ে নানা কাজ বাড়িয়ে মরি? তাঁকে লাভ হলে তাঁর ইচ্ছায় অনেক হাসপাতাল, ডিস্পেন্সারী হ'তে পারে। তাই বলছি, কর্ম আদিকাণ্ড। কর্ম জীবনের উদ্দেশ্য নয়। সাধন ক'রে আরও এগিয়ে পড়। সাধন ক'রতে ক'রতে আরও এগিয়ে পড়লে শেষে জানতে পারবে যে ঈশ্বরই বস্তু, আর সব অবস্তু, ঈশ্বর লাভই জীবনের উদ্দেশ্য।

খ. ঈশ্বরকে ভালবাসা—এইটি জীবনের উদ্দেশ্য; যেমন বৃন্দাবনে গোপ-গোপীরা রাখালরা শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসত। যখন শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গেলেন, রাখালেরা তাঁর বিরহে কেঁদে বেড়াত।

দ্রঃ গোপীদের প্রেম।

জীবে দয়া। জীবে দয়া—জীবে দয়া। দূর শালা! কীটাণুকীট তুই জীবকে দয়া করবি? দয়া করবার তুই কে? না না—জীবে দয়া নয় শিবজ্ঞানে জীবের সেবা। ত্রৈলোক্য বললেন, সংসারে থাকতে গেলে টাকাও ত চাই, সঞ্চয়ও চাই। পাঁচটা দান, ধ্যান—কি। আগে টাকা সঞ্চয় করে তবে ঈশ্বর। আর দান, ধ্যান দয়া ত কত। নিজের মেয়ের বিয়েতে হাজার হাজার টাকা খরচ—আর পাশের বাড়ীতে খেতে পাচ্ছে না। তাদের দুটি চাল দিতে কষ্ট হয়—অনেক হিসেব করে দিতে হয়। খেতে পাচ্ছে না লোকে—তা আর কি হবে, ও শালারা মরুক আর বাঁচুক—আমি আর আমার বাড়ীর সকলে ভাল থাকলেই হলো। মুখে বলে সর্বজীবে দয়া।

জীবের প্রকার। ক. জীব চার প্রকার: বদ্ধজীব, মুমুক্ষুজীব, মুক্তজীব ও নিত্যজীব। নিত্যজীব—যেমন নারদাদি। এরা সংসারে থাকে জীবের মঙ্গলের

জন্য—জীবদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য।

বদ্ধজীব—বিষয়ে আসক্ত হয়ে থাকে, আর ভগবানকে ভুলে থাকে—ভুলেও ভগবানের চিন্তা করে না।

মুমুক্ষুজীব—যারা মুক্ত হবার ইচ্ছা করে। কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ মুক্ত হতে পারে, কেউ পারে না।

মুক্তজীব—যারা সংসারে কামিনী-কাঞ্চনে আবদ্ধ নয়—যেমন সাধু মহাত্মারা; যাদের মনে বিষয়বুদ্ধি নাই, আর যারা সর্বদা হরি-পাদপদ্ম চিন্তা করে।

যেমন জাল ফেলা হয়েছে পুকুরে। দু'চারটা মাছ এমন সেয়ানা যে কখন জালে পড়ে না—এরা নিত্যজীবের উপমাস্থল। কিন্তু অনেক মাছই জালে পড়ে। এদের মধ্যে কতকগুলি পালাবার চেষ্টা করে; এরা মুমুক্ষুজীবের উপমাস্থল। কিন্তু সব মাছই পালাতে পারে না। দু'চারটে ধপাঙ ধপাঙ করে জাল থেকে পালিয়ে যায়, তখন জেলেরা বলে—ঐ একটা মস্ত মাছ পালিয়ে গেল। কিন্তু যারা জালে পড়েছে, অধিকাংশই পালাতেও পারে না; আর পালাবার চেষ্টাও করে না। বরং জাল মুখে করে পুকুরের পাঁকের ভিতরে গিয়ে চুপ করে মুখ গুঁজড়ে শুয়ে থাকে—মনে করে, আর কোন ভয় নাই, আমরা বেশ আছি। কিন্তু জানে না যে, জেলে হড়হড় করে টেনে আড়ায় তুলবে। এরাই বদ্ধজীবের উপমাস্থল

জীবের থাক। ক. জীব চার থাক বলেছে—বদ্ধ, মুমুক্ষু, মুক্ত, নিত্য। সংসার যেন জালের স্বরূপ, জীব যেন মাছ, ঈশ্বর (যাঁর মায়া এই সংসার) তিনি জেলে। জেলের জালে যখন মাছ পড়ে, কতকগুলো মাছ জাল ছিঁড়ে পালাবার অর্থাৎ মুক্ত হবার চেষ্টা করে। এদের মুমুক্ষু জীব বলা যায়। যারা পালাবার চেষ্টা করছে, তাদের সকলেই পালাতে পারে না। দু-চারটা মাছ ধপাঙ্ শব্দ করে পালায়; তখন লোকেরা বলে, ঐ মাছটা বড়, পালিয়ে গেল! এই দু-চারটা লোক মুক্ত জীব। কতকগুলি মাছ স্বভাবতঃ এত সাবধান যে, কখনও সংসার জালে পড়ে না। কিন্তু অধিকাংশ মাছ জালে পড়ে; অথচ এ বোধ নাই যে, জালে পড়েছে মরতে হবে। তারা জালে পড়েই জালশুদ্ধ চোঁ-চাঁ দৌড় মারে ও একেবারে পাঁকে গিয়ে শরীর লুকোবার চেষ্টা করে। পালাবার কোন চেষ্টা নাই বরং আরও পাঁকে গিয়ে পড়ে। এরাই বদ্ধজীব। জালে এরা রয়েছে, কিন্তু মনে করে হেথায় বেশ আছি। বদ্ধজীব, সংসারে—অর্থাৎ কামিনী-কাঞ্চনে—আসক্ত হয়ে আছে। কলঙ্ক সাগরে মগ্ন হয়ে রয়েছে; কিন্তু মনে করে বেশ আছি। যারা মুমুক্ষু বা মুক্ত, সংসার তাদের পাতকুয়া বোধ হয়; ভাল লাগে না। তাই কেউ কেউ জ্ঞান লাভের পর, ভগবান লাভের পর, শরীর ত্যাগ করে। কিন্তু সে রকম শরীর ত্যাগ অনেক দূরের কথা।

বদ্ধজীবের—সংসারী জীবের—কোন মতে হুঁশ আর হয় না। এত দুঃখ, এত দাগা পায়, এত বিপদে পড়ে, তবুও চৈতন্য হয় না।

খ. কত রকম থাক থাক আছে—নিত্যজীব, মুক্তজীব, মুমুক্ষুজীব, বদ্ধজীব, নানা রকম মানুষ। নারদ, শুকদেব এঁরা নিত্যজীব, যেমন স্টীম বোট্ (কলের

জাহাজ) পারে আপনিও যেতে পারে আবার বড় জীব-জন্তু হাতী পর্যন্ত পারে নিয়ে যায়। নিত্যজীবেরা নায়েবের স্বরূপ ; একটা তালুক শাসন করে—আর-একটা তালুক শাসন ক'রতে যায়। আবার মুমুক্ষু জীব আছে, যারা সংসার জাল থেকে মুক্ত হবার জন্য ব্যাকুল হয়ে প্রাণপণে চেষ্টা ক'রছে। এদের মধ্যে দুই-একজন জাল থেকে পালাতে পারে, তারা মুক্তজীব। নিত্যজীবেরা এক-একটা সিয়ানা মাছের মতো ; কখনও জালে পড়ে না।

কিন্তু বদ্ধজীব—সংসারী জীব—তাদের হুঁশ নাই। তারা জালে পড়েই আছে, অথচ জালে বদ্ধ হয়েছি, এরূপ জ্ঞানও নাই। এরা হরিকথা সম্মুখে হলে সেখান থেকে চলে যায়—বলে হরিনাম মরবার সময় হবে ; এখন কেন ? আবার মৃত্যু-শয্যায় শুয়ে পরিবার কিম্বা ছেলেদের বলে, প্রদীপে অত সলতে কেন, একটা সলতে দাও ; তা না হলে তেল পুড়ে যাবে ; আর পরিবার ও ছেলেদের মনে করে কাঁদে আর বলে, 'হায়! আমি মলে এদের কি হবে!' আর বদ্ধজীব যাতে এত দুঃখ ভোগ করে, তাই আবার করে ; যেমন উটের কাঁটা ঘাস খেতে খেতে মুখ দিয়ে দরদর করে রক্ত পড়ে, তবু কাঁটা ঘাস ছাড়ে না। এদিকে ছেলে মারা গেছে, শোকে কাতর, তবু আবার বছর বছর ছেলে হবে ; মেয়ের বিয়েতে সর্বস্বান্ত হ'ল, আবার বছর বছর ছেলেমেয়ে হবে ; বলে, কি করবো অদৃষ্টে ছিল। যদি তীর্থ করতে যায়, নিজে ঈশ্বর চিন্তা করবার অবসর পায় না।—কেবল পরিবারদের পুঁটুলি বইতে প্রাণ যায়, ঠাকুরের মন্দিরে গিয়ে ছেলেকে চরণামৃত খাওয়াতে আর গড়াগড়ি দেওয়াতেই ব্যস্ত। বদ্ধজীব নিজের আর পরিবারের পেটের জন্য দাসত্ব করে—আর মিথ্যা কথা, প্রবঞ্চনা, তোষামোদ করে ধন উপায় করে। যারা ঈশ্বর চিন্তা করে, ঈশ্বরের ধ্যানে মগ্ন হয়, বদ্ধজীব তাদের পাগল বলে উড়িয়ে দেয়।

জীবের প্রকার দ্রষ্টব্য।

জীবন্মুক্ত। দেখ, ঈশ্বর সব ক'রছেন, তিনি যন্ত্রী আমি যন্ত্র। এ বিশ্বাস যদি কারু হয়, সে তো জীবন্মুক্ত—'তোমার কর্ম তুমি কর, লোকে বলে করি আমি।' কি রকম জানো ? বেদান্তের একটি উপমা আছে—একটা হাঁড়িতে ভাত চড়িয়েছো, আলু বেগুন সব ভাতে দিয়েছ ; খানিক পরে আলু বেগুন, চাল লাফাতে থাকে যেন অভিমান করছে 'আমি নড়ছি', 'আমি লাফাচ্ছি।' ছোট ছেলেরা দেখলে ভাবে, আলু পটল, বেগুন ওরা বুঝি জীয়ন্ত, তাই লাফাচ্ছে। যাঁদের জ্ঞান হ'য়েছে তাঁরা কিন্তু বুঝিয়ে দেয় যে, এই সব আলু, বেগুন, পটল এরা জীয়ন্ত নয়, নিজে লাফাচ্ছে না। হাঁড়ির নীচে আগুন জ্বলছে তাই ওরা লাফাচ্ছে। যদি কাঠ টেনে লওয়া যায়, তা হ'লে আর নড়ে না। জীবের 'আমি কর্তা' এই অভিমান অজ্ঞান থেকে হয়। ঈশ্বরের শক্তিতে সব শক্তিমান। জ্বলন্ত কাঠ টেনে নিলে সব চুপ।—পুতুলনাচের পুতুল বাজীকরের হাতে বেশ নাচে, হাত থেকে প'ড়ে গেলে আর নড়ে না চড়ে না।

যতক্ষণ না ঈশ্বর দর্শন হয়, যতক্ষণ সেই পরশমণি ছোঁয়া না হয়, ততক্ষণ আমি কর্তা এই ভুল থাকবে ; আমি সৎ কাজ করেছি, অসৎ কাজ করেছি, এই সব

ভেদ বোধ থাকবেই থাকবে। এ ভেদ বোধ তাঁরই মায়া—তাঁর মায়ার সংসার—চালাবার জন্য বন্দোবস্ত। বিদ্যামায়া আশ্রয় করলে, সৎপথ ধ'রলে তাঁকে লাভ করা যায়। যে লাভ করে, যে ঈশ্বরকে দর্শন করে, সেই মায়া পার হ'য়ে যেতে পারে। তিনিই একমাত্র কর্তা আর আমি অকর্তা, এ বিশ্বাস যার, সেই জীবন্মুক্ত, এ কথা কেশব সেনকে বলেছিলাম।

দ্র: 'জ্ঞানলাভের পর সংসার'।

জীব-শিব। পাশবদ্ধ জীব, পাশমুক্ত শিব। ভগবানের প্রেম—দুর্লভ জিনিস। প্রথমে স্ত্রীর যেমন স্বামীতে নিষ্ঠা, সেইরূপ নিষ্ঠা যদি ঈশ্বরেতে হয় তবেই ভক্তি হয়। শুদ্ধাভক্তি হওয়া বড় কঠিন। ভক্তিতে প্রাণ মন ঈশ্বরেতে লীন হয়।

জীবের স্বাধীনতা। কামিনী-কাঞ্চনে জীবকে বদ্ধ করে। জীবের স্বাধীনতা যায়। কামিনী থেকে কাঞ্চনের দরকার। তার জন্য পরের দাসত্ব। স্বাধীনতা চ'লে যায়। তোমার মনের মতো কাজ ক'রতে পার না।

জয়পুরে গোবিন্‌জীর পুজারীরা প্রথম প্রথম বিবাহ করে নাই। তখন খুব তেজস্বী ছিল। রাজা একবার ডেকে পাঠিয়েছিলেন, তা তারা যায় নাই। বলেছিল 'রাজাকে আসতে বল।' তারপর রাজা ও পাঁচজনে তাদের বিয়ে দিয়ে দিলেন। তখন রাজার সঙ্গে দেখা করবার জন্য, আর কাহারও ডাকতে হ'ল না। নিজে নিজেই গিয়ে উপস্থিত। 'মহারাজ আশীর্বাদ করতে এসেছি, এই নির্মাল্য এনেছি, ধারণ করুন।' কাজে কাজেই আসতে হয়; আজ ঘর তুলতে হবে, আজ ছেলের অন্নপ্রাশন, আজ—হাতেখড়ি, এই সব।

জন্মান্তর। আমি শুনেছি জন্মান্তর আছে। ঈশ্বরের কার্য আমরা ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে কি বুঝবো? অনেকে ব'লে গেছে, তাই অবিশ্বাস করতে পারি না। ভীষ্মদেব দেহত্যাগ ক'রবেন, শরশয্যায় শুয়ে আছেন, পান্ডবেরা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সব দাঁড়িয়ে। তাঁরা দেখলেন যে, ভীষ্মদেবের চক্ষু দিয়ে জল প'ড়ছে। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, ভাই, কি আশ্চর্য। পিতামহ, যিনি স্বয়ং ভীষ্মদেব—সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, জ্ঞানী, অষ্টবসুর এক বসু, তিনিও দেহত্যাগের সময় মায়াতে কাঁদছেন! শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মদেবকে এ কথা বলাতে তিনি বললেন, কৃষ্ণ তুমি বেশ জান, আমি সেজন্য কাঁদছি না। যখন ভাবছি যে, যে পান্ডবদের স্বয়ং ভগবান নিজে সারথী, তা'দেরও দুঃখ-বিপদের শেষ নাই, তখন এই মনে ক'রে কাঁদছি যে, ভগবানের কার্য কিছুই বুঝতে পারলাম না।

দ্র. পরলোক ও জন্মান্তর।

জ্ঞান। সংসার আশ্রমের জ্ঞান ও সন্ন্যাস আশ্রমের জ্ঞান।

যদি বল, সংসার আশ্রমের জ্ঞানী আর সন্ন্যাস আশ্রমের জ্ঞানী, এ দুয়ের তফাত আছে কিনা? তার উত্তর এই যে দুই-ই এক জিনিস। এটিও জ্ঞানী উটিও জ্ঞানী—এক জিনিস। তবে সংসারে জ্ঞানীরও ভয় আছে। কামিনী-কাঞ্চনের ভিতর থাকতে গেলেই একটু না একটু ভয় আছে। কাজলের ঘরে থাকতে গেলে যত সিয়ানাই হও না কেন কাল দাগ একটু না একটু গায়ে লাগবেই।

মাখন তুলে যদি নূতন হাঁড়িতে রাখ, মাখন নষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে না। যদি

ঘোলের হাঁড়িতে রাখ, সন্দেহ হয়। (সকলের হাস্য)।

খ. খই যখন ভাজা হয় দু'চারটে খই খোলা থেকে টপ্ টপ্ ক'রে লাফিয়ে পড়ে। সেগুলি যেন মল্লিকা ফুলের মতো, গায়ে একটু দাগ থাকে না। খোলার উপর যে সব খই থাকে, সেও বেশ খই, তবে অত ফুলের মতো হয় না, একটু গায়ে দাগ থাকে। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী যদি জ্ঞান লাভ করে, তবে ঠিক এই মল্লিকা ফুলের মতো দাগশূন্য হয়। আর জ্ঞানের পর সংসার খোলায় থাকলে একটু গায়ে লাল্‌চে দাগ হ'তে পারে। (সকলের হাস্য)।

জনক রাজার সভায় একটি ভৈরবী এসেছিল। স্ত্রীলোক দেখে জনক রাজা হেঁট হ'য়ে চোখ নীচু করেছিলেন। ভৈরবী তাই দেখে ব'লেছিলেন, 'হে জনক, তোমার এখনও স্ত্রীলোক দেখে ভয়!' পূর্ণজ্ঞান হ'লে পাঁচ বছরের ছেলের স্বভাব হয়—তখন স্ত্রী-পুরুষ ব'লে ভেদবুদ্ধি থাকে না।

যাই হোক যদিও সংসারের জ্ঞানীর গায়ে দাগ থাকতে পারে, সে দাগে কোন ক্ষতি হয় না। চন্দ্রে কলঙ্ক আছে বটে কিন্তু আলোর ব্যাঘাত হয় না।

গ. হে ঈশ্বর, তুমি কর্তা আর আমি অকর্তা, এরই নাম জ্ঞান।

দ্রঃ জগতের মাকে পেলে। অজ্ঞান-জ্ঞান-বিজ্ঞান। 'বিষয়ীর জ্ঞান'।

জ্ঞান কাকে বলে। জ্ঞান কাকে বলে ; আর আমি কে ? ঈশ্বরই কর্তা আর সব অকর্তা এর নাম জ্ঞান। আমি অকর্তা। তাঁর হাতের যন্ত্র। তাই আমি বলি, মা, তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র ; তুমি ঘরণী, আমি ঘর ; আমি গাড়ি, তুমি ইঞ্জিনীয়ার ; যেমন চালাও, তেমনি চলি ; যেমন করাও, তেমনি করি ; যেমন বলাও তেমনি বলি, নাহং নাহং তুঁহু তুঁহু।

জ্ঞান-অজ্ঞান। ক. 'আমি' আর 'আমার' এইটির নাম অজ্ঞান। রাসমণি কালীবাড়ি ক'রেছেন, এই কথাই লোকে বলে। কেউ বলে না যে, ঈশ্বর ক'রেছেন। ব্রাহ্মসমাজ অমুক লোক ক'রে গেছেন—এ কথা আর কেউ বলে না যে, ঈশ্বরের ইচ্ছায় এটি হ'য়েছে। আমি ক'রছি, এইটির নাম অজ্ঞান। হে ঈশ্বর, তুমি কর্তা আর আমি অকর্তা ; তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র ; এইটির নাম জ্ঞান। হে ঈশ্বর, আমার কিছুই নয়—এ মন্দির আমার নয়, এ কালীবাড়ি আমার নয়, এ সমাজ আমার নয়, সব তোমার জিনিস ; এ স্ত্রী, পুত্র, পরিবার এ সব কিছুই আমার নয়, সব তোমার জিনিস ; এর নাম জ্ঞান।

'ব্রহ্ম : জ্ঞান-অজ্ঞান' দ্রষ্টব্য।

খ. আমি আর আমার অজ্ঞান। বিচার করতে গেলে যাকে আমি আমি করছো, দেখবে তিনি আত্মা বই আর কেউ নয়। বিচার কর—তুমি শরীর, না হাড়, না মাংস, না আর কিছু ? তখন দেখবে, তুমি কিছু নও। তোমার কোন উপাধি নাই। তখন আবার আমি কিছু করি নাই, আমার দোষও নাই, গুণও নাই। পাপও নাই, পুণ্যও নাই।

এটা সোনা, এটা পেতল—এর নাম অজ্ঞান। সব সোনা—এর নাম জ্ঞান।

জ্ঞানও জ্ঞানীর লক্ষণ। জ্ঞানের চিহ্ন, প্রথম—শান্ত স্বভাব ; দ্বিতীয়—অভিমান-শূন্য স্বভাব।

জ্ঞানীর আর কতকগুলি লক্ষণ আছে। সাধুর কাছে ত্যাগী, কর্মস্থলে—যেমন লেক্‌চার দিবার সময়—সিংহতুল্য, স্ত্রীর কাছে রসরাজ, রসপণ্ডিত।

জ্ঞান চৈতন্যময়। জ্ঞান আর অজ্ঞান কাকে বলে?—যতক্ষণ ঈশ্বর দূরে এই বোধ ততক্ষণ অজ্ঞান; যতক্ষণ হেথা হেথা বোধ, ততক্ষণ জ্ঞান।

যখন ঠিক জ্ঞান হয়, তখন সব জিনিস চৈতন্যময় বোধ হয়। আমি শিবুর সঙ্গে আলাপ করতুম। শিবু তখন খুব ছেলেমানুষ—চার পাঁচ বছরের হবে। ওদেশে তখন আছি। মেঘ ডাকছে, বিদ্যুৎ হচ্ছে। শিবু বলছে, খুড়ো ঐ চক্‌মকি ঝাড়ছে! একদিন দেখি, সে একলা ফড়িং ধরতে যাচ্ছে। কাছে গাছে পাতা নড়ছিল। তখন পাতাকে বলছে চুপ, চুপ, আমি ফড়িং ধরবো। বালক সব চৈতন্যময় দেখছে। সরল বিশ্বাস, বালকের বিশ্বাস না হ'লে ভগবানকে পাওয়া যায় না।

জ্ঞানদীপ। টাকা থাকলেই বড় মানুষ হয় না। বড় মানুষের বাড়ীর একটি লক্ষণ যে সব ঘরে আলো থাকে। গরীবেরা তেল খরচ করতে পারে না তাই তত আলো বন্দোবস্ত করে না। এই দেহমন্দির অন্ধকারে রাখতে নাই, জ্ঞানদীপ জেবলে দিতে হয়। জ্ঞানদীপ জেবলে ঘরে ব্রহ্মময়ীর মুখ দেখ না।

সকলেরই জ্ঞান হ'তে পারে। জীবাত্মা আর পরমাত্মা। প্রার্থনা কর—সেই পরমাত্মার সঙ্গে সব জীবেরই যোগ হ'তে পারে। গ্যাসের নল সব বাড়ীতেই খাটানো আছে। গ্যাস কোম্পানীর কাছে গ্যাস পাওয়া যায়। আরজি কর; করলেই গ্যাস বন্দোবস্ত করে দেবে—ঘরেতে আলো জবলবে। শিয়ালদহে অপিস আছে।

জ্ঞানযোগ। বিচার পথেও তাঁকে পাওয়া যায়। একেই জ্ঞানযোগ বলে। বিচার পথ বড় কঠিন। তোমায় ত সপ্তভূমির কথা বলেছি। সপ্তম ভূমিতে মন পেঁাছিলে সমাধি হয়। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, এই বোধ ঠিক হলে মনের লয় হয়, সমাধি হয়। কিন্তু কলিতে জীব অন্নগত প্রাণ, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা কেমন করে বোধ হবে? সে বোধ দেহবুদ্ধি না গেলে হয় না। 'আমি দেহ নই, আমি মন নই, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব নই, আমি সুখ-দুঃখের অতীত, আমার আবার রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু কৈ?—এ সব বোধ কলিতে হওয়া কঠিন। যতই বিচার করো, কোনখান থেকে দেহাত্মবুদ্ধি এসে দেখা দেয়। অশ্বত্থ গাছ এই কেটে দাও, মনে করলে মূলশুদ্ধ উঠে গেল, কিন্তু তার পরদিন সকালে দেখো, গাছের একটি ফেকড়ী দেখা দিয়েছে! দেহাভিমান যায় না।

খ. বিচারপথে জ্ঞানযোগের পথে, তাঁকে পাওয়া যায়। কিন্তু এ পথ বড় কঠিন। আমি শরীর নই, মন নই, বুদ্ধি নই; আমার রোগ নাই, শোক নাই, অশান্তি নাই; আমি সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, আমি সুখ-দুঃখের অতীত, আমি ইন্দ্রিয়ের বশ নই, এ সব কথা মুখে বলা খুব সোজা। কাজে করা, ধারণা হওয়া বড় কঠিন। কাঁটাতে হাত কেটে যাচ্ছে, দর্ দর্ ক'রে রক্ত পড়ছে, অথচ বলছি, কই কাঁটায় আমার হাত কাটে নাই, আমি বেশ আছি। এ সব কথা বলা সাজে না। আগে ঐ কাঁটাকে জ্ঞানাগ্নিতে পোড়াতে হবে তো।

দ্র. যোগের প্রকার। পথ দুটি।

জ্ঞানযোগ ভারী কঠিন। 'যোগের প্রকার' দ্রষ্টব্য।

জ্ঞানলাভের পর সংসার। যদি কেরাণীকে জেলে দেয়, সে জেল খাটে বটে, কিন্তু যখন জেল থেকে তাকে ছেড়ে দেয়, তখন সে কি রাস্তায় এসে ধেই ধেই করে নেচে নেচে বেড়াবে ? সে আবার কেরাণীগিরি জুটিয়ে লয়, সেই আগেকার কাজই করে। গুরুর কৃপায় জ্ঞানলাভের পরেও সংসারে জীবন্মুক্ত হয়ে থাকা যায়।

জ্ঞানলাভ হলে। জ্ঞানলাভ হ'লে অহঙ্কার যেতে পারে। জ্ঞানলাভ হ'লে সমাধিস্থ হয়। সমাধিস্থ হ'লে তবে অহং যায়। সে জ্ঞানলাভ বড় কঠিন।

জ্ঞান : সংসারীর ও সর্বত্যাগীর। সংসারীর জ্ঞান আর সর্বত্যাগীর জ্ঞান—অনেক তফাৎ। সংসারীর জ্ঞান—দীপের আলোর ন্যায় ঘরের ভিতরটি আলো হয়, নিজের দেহ ঘরকন্না ছাড়া আর কিছু বুঝতে পারে না। সর্বত্যাগীর জ্ঞান, সূর্যের আলোর ন্যায়। সে আলোতে ঘরের ভিতর বা'র সব দেখা যায়। চৈতন্যদেবের জ্ঞান সৌরজ্ঞান—জ্ঞানসূর্যের আলো। আবার তাঁর ভিতর ভক্তি-চন্দ্রের শীতল আলোও ছিল। ব্রহ্মজ্ঞান, ভক্তিপ্রেম, দুইই ছিল।

ঠাকুর কি চৈতন্যদেবের অবস্থা বর্ণনা করিয়া নিজের অবস্থা বলিতেছেন ?

জ্ঞান হয়েছে তা কেমন করে জানব ? জ্ঞান হ'লে তাঁকে (ঈশ্বরকে) আর দূরে দেখায় না। তিনি আর তিনি বোধ হয় না। তখন ইনি। হৃদয়মধ্যে তাঁকে দেখা যায়। তিনি সকলের ভিতর আছেন, যে খুঁজে সেই পায়।

জ্ঞান হবার লক্ষণ। জ্ঞান জ্ঞান বললেই কি হয় ? জ্ঞান হবার লক্ষণ আছে। দুটি লক্ষণ—প্রথম অনুরাগ অর্থাৎ ঈশ্বরকে ভালবাসা। শুধু জ্ঞান বিচার করছি, কিন্তু ঈশ্বরেতে অনুরাগ নাই, ভালবাসা নাই, সে মিছে। আর একটি লক্ষণ কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ।

দ্রঃ কুলকুণ্ডলিনী জাগরণ।

জ্ঞানাশ্রিত ভক্তি। দ্রঃ 'ভক্তি : জ্ঞানাশ্রিত ও প্রেমা'।

জ্ঞানী। জ্ঞানী রূপও চায় না, অবতারও চায় না। রামচন্দ্র বনে যেতে যেতে কতকগুলি ঋষিদের দেখতে পেলেন। তাঁরা রামকে খুব আদর করে আশ্রমে বসালেন। সেই ঋষিরা বললেন, রাম তোমাকে আজ আমরা দেখলুম, আমাদের সকল সফল হ'ল। কিন্তু আমরা তোমাকে জানি দশরথের বেটা। ভরদ্বাজাদি তোমাকে অবতার বলে ; আমরা কিন্তু তা বলি না, আমরা সেই অখণ্ড সচ্চিদা-নন্দের চিন্তা করি। রাম প্রসন্ন হয়ে হাসতে লাগলেন।

জ্ঞানী ও ভক্ত। জ্ঞানীরা দেখে সব স্বপ্নবৎ। ভক্তেরা সব অবস্থা লয়। জ্ঞানী দুধ দেয় ছিড়িক ছিড়িক করে। এক-একটা গরু—বেছে বেছে খায় ; তাই ছিড়িক ছিড়িক দুধ। যারা অত বাছে না আর সব খায়, তারা হুড় হুড় করে দুধ দেয়। উত্তম ভক্ত—নিত্য, লীলা দুই লয়। তাই নিত্য থেকে মন নেমে এলেও তাঁকে সম্ভোগ করতে পায়। উত্তম ভক্ত হুড় হুড় করে দুধ দেয়।

জ্ঞানীচাষী। এক দেশে একটি চাষা থাকে। ভারী জ্ঞানী। চাষ-বাস করে—পরিবার আছে, একটি ছেলে অনেক দিন পরে হয়েছে, নাম হারু। ছেলেটার

উপর বাপ মা দুজনেরই ভালবাসা ; কেন না, সবে ধন নীলমণি। চাষাটি ধার্মিক, গাঁয়ের সব লোকেই ভালবাসে। একদিন মাঠে কাজ করছে এমন সময় একজন এসে খপর দিলে, হারুর কলেরা হয়েছে। চাষাটি বাড়ি গিয়ে অনেক চিকিৎসা করালে কিন্তু ছেলেটি মারা গেল। বাড়ির সকলে শোকে কাতর হলো কিন্তু চাষাটির যেন কিছুই হয় নাই। উল্টে সকলকে বুঝায় যে, শোক করে কি হবে ? তারপর আবার চাষ করতে গেল। বাড়ি ফিরে এসে দেখে, পরিবার আরও কাঁদছে। পরিবার বললে, তুমি নিষ্ঠুর—ছেলেটার জন্য একবার কাঁদলেও না ? চাষা তখন স্থির হয়ে বললে, কেন কাঁদছি না বলবো ? আমি কাল একটা ভারী স্বপ্ন দেখেছি। দেখলাম যে, রাজা হয়েছি আর আট ছেলের বাপ হয়েছি—খুব সুখে আছি। তারপর ঘুম ভেঙ্গে গেল। এখন মহা ভাবনায় পড়েছি—আমার আট ছেলের জন্য শোক করবো, না, তোমার এই এক ছেলে হারুর জন্য শোক করবো ?

চাষী জ্ঞানী, তাই দেখছিল স্বপ্ন অবস্থাও যেমন মিথ্যা, জাগরণ অবস্থাও তেমনি মিথ্যা ; এক নিত্যবস্তু সেই আত্মা।

জ্ঞানীর উদ্দেশ্য। জ্ঞানীর উদ্দেশ্য স্ব-স্বরূপকে জানা ; এরই নাম জ্ঞান, এরই নাম মুক্তি। পরব্রহ্ম, ইনিই নিজের স্বরূপ। আমি আর পরব্রহ্ম এক, মায়ার দরুন জানতে দেয় না।

জ্ঞানীর লক্ষণ কি। জ্ঞানী কারু অনিষ্ট করতে পারে না। বালকের মতো হয়ে যায়। লোহার খড়্গে যদি পরশমণি ছোঁয়ান হয়, খড়্গ সোনা হয়ে যায়। সোনায় হিংসার কাজ হয় না। বাহিরে হয় ত দেখায় যে, রাগ আছে কি অহংকার আছে, কিন্তু বস্তুতঃ জ্ঞানীর ও সব কিছু থাকে না।

দূরে থেকে পোড়া দড়ি দেখলে বোধ হয়, ঠিক একগাছা দড়ি পড়ে আছে। কিন্তু কাছে এসে ফুঁ দিলে সব উড়ে যায়। ক্রোধের আকার, অহংকারের আকার কেবল। কিন্তু সত্যকার ক্রোধ নয়, অহংকার নয়।

বালকের আঁট থাকে না। এই খেলাঘর করলে, কেউ হাত দেয় ত ধেই ধেই করে নেচে কাঁদতে আরম্ভ করবে। আবার নিজেই ভেঙ্গে ফেলবে সব। এই কাপড়ে এত আঁট, বলছে 'আমার বাবা দিয়েছে, আমি দেবো না।' আবার একটা পুতুল দিলে পরে ভুলে যায়, কাপড়খানা ফেলে দিয়ে চলে যায়।

এই সব জ্ঞানীর লক্ষণ। হয়ত বাড়ীতে খুব ঐশ্বর্য ; কোচ, কেদারা, ছবি, গাড়ী-ঘোড়া ; আবার সব ফেলে কাশী চলে যাবে।

দ্রঃ পূর্ণ জ্ঞানীর লক্ষণ।

জ্ঞানের আলো। তিনি জ্ঞানসূর্য। তাঁর একটি কিরণে এই জগতে জ্ঞানের আলো পড়েছে, তবেই আমরা পরস্পরকে জানতে পারছি, আর জগতে কত রকম বিদ্যা উপার্জন করছি। তাঁর আলো যদি একবার তিনি নিজে তাঁর মুখের উপর ধরেন, তা হলে দর্শন লাভ হয়। সার্জন সাহেব রাত্রে আঁধারে লণ্ঠন হাতে করে বেড়ায় ; তার মুখ কেউ দেখতে পায় না। কিন্তু ঐ আলোতে সে সকলের মুখ দেখতে পায় ; আর সকলে পরস্পরের মুখ দেখতে পায়।

যদি কেউ সার্জনকে দেখতে চায়, তা হলে তাকে প্রার্থনা করতে হয়। বলতে হয়—সাহেব, কৃপা করে একবার আলোটি নিজের মুখের উপর ফিরাও, তোমাকে একবার দেখি।

ঈশ্বরকে প্রার্থনা করতে হয়, ঠাকুর কৃপা করে জ্ঞানের আলো তোমার নিজের উপর একবার ধর, আমি তোমায় দর্শন করি।

ঘরে যদি আলো না জ্বলে, সেটি দারিদ্র্যের চিহ্ন। তাই হৃদয় মধ্যে জ্ঞানের আলো জ্বালতে হয়। 'জ্ঞানদীপ জেবলে ঘরে, ব্রহ্মময়ীর মুখ দেখ না।'

জ্ঞানের লক্ষণ। দুটি জ্ঞানের লক্ষণ। প্রথম কূটস্থ বুদ্ধি। হাজার দুঃখ-কষ্ট-বিপদ-বিঘ্ন হোক—নির্বিকার, যেমন কামারশালের লোহা, যার উপর হাতুড়ি দিয়ে পেটে। আর, দ্বিতীয় পুরুষকার—খুব রোখ। কাম ক্রোধে আমার অনিষ্ট কচ্ছে তো একেবারে ত্যাগ। কচ্ছপ যদি হাত পা ভিতরে সাদ করে, চারখানা করে কাটলেও আর বার করবে না।

জ্ঞানোন্মাদ। তবে জ্ঞানোন্মাদ হলে আর কর্তব্য থাকে না। তখন কালকার জন্য তুমি না ভাবলে ঈশ্বর ভাবেন। জ্ঞানোন্মাদ হলে তোমার পরিবারদের জন্য তিনি ভাববেন। যখন জমিদার নাবালক ছেলে রেখে মরে যায়, তখন 'অছি' সেই নাবালকের ভার লয়। এ সব আইনের ব্যাপার, তুমি তো সব জান।

জ্যোতি। দ্রঃ আলো।

ঝড়ের এঁটোপাতা। সংসারে থাকো ঝড়ের এঁটো পাত হয়ে। ঝড়ে এঁটো পাতাকে কখনও ঘরের ভিতর লয়ে যায়, কখনও আঁস্তাকুড়ে। হাওয়া যেদিকে যায়, পাতাও সেইদিকে যায়। কখনও ভাল জায়গায়, কখনও মন্দ জায়গায়। তোমাকে এখন সংসারে ফেলেছেন ; ভাল, এখন সেই স্থানেই থাকো—আবার যখন সেখান থেকে তুলে ওর চেয়ে ভাল জায়গায় লয়ে ফেলবেন, তখন যা হয় হবে।

সংসারে রেখেছেন তা কি করবে ? সমস্ত তাঁকে সমর্পণ করো—তাঁকে আত্মসমর্পণ করো। তা হলে আর কোন গোল থাকবে না। তখন দেখবে, তিনিই সব করছেন।

দ্রঃ সংসারে থাকার রীতি।

ঝাড়ু। ঝাড়ু অস্পৃশ্য বটে কিন্তু স্থানকে শুদ্ধ করে।

টাকা। ক. টাকাও একটি বিলক্ষণ উপাধি। টাকা হলেই মানুষ আর-এক রকম হয়ে যায়, সে মানুষ থাকে না।

এখানে একজন ব্রাহ্মণ আসা-যাওয়া করতো। সে বাহিরে বেশ বিনয়ী ছিল। কিছুদিন পরে আমরা কোন্নগরে গেছলুম। হৃদে সঙ্গে ছিল। নৌকা থেকে যাই নামছি, দেখি সেই ব্রাহ্মণ গঙ্গার ধারে বসে আছে। বোধ হয়, হাওয়া খাচ্ছিল। আমাদের দেখে বলছে, 'কি ঠাকুর! বলি —আছ কেমন ?' তার কথার স্বর শুনে আমি হৃদেকে বললুম, 'ওরে হৃদে! এ লোকটার টাকা হয়েছে, তাই এই রকম

কথা।' হ্রদে হাসতে লাগলো।

একটা ব্যাঙের একটা টাকা ছিল। গর্তে তার টাকাটা ছিল। একটা হাতী সেই গর্ত ডিঙ্গিয়ে গিছিল। তখন ব্যাঙটা বেরিয়ে এসে খুব রাগ করে হাতীকে লাথি দেখাতে লাগল। আর বললে, তোর এত বড় সাধ্য যে আমায় ডিঙ্গিয়ে যাস! টাকার এত অহঙ্কার।

খ. টাকাতে যদি ঈশ্বরের সেবা হয় ত' সে টাকায় দোষ নাই।

গ. সংসারে টাকার দরকার বটে, কিন্তু উগনোর জন্য অতো ভেবো না। যদৃচ্ছা লাভ—এই ভালো। সঞ্চয়ের জন্য অত ভেবো না। যারা তাঁকে মন প্রাণ সমর্পণ করে—যারা তাঁর ভক্ত, শরণাগত—তারা ও সব অতো ভাবে না। যত্র আয়—তত্র ব্যয়। এক দিক থেকে টাকা আসে, আর এক দিক থেকে খরচ হয়ে যায়। এর নাম যদৃচ্ছালাভ। গীতায় আছে।

ঘ. অনেকে টাকা গায়ের রক্ত মনে করে। কিন্তু টাকাকে বেশি যত্ন করলে একদিন হয়ত সব বেরিয়ে যায়। যারা টাকার সদ্ব্যবহার করে, ঠাকুর সেবা, সাধুভক্তের সেবা করে, দান করে, তাদেরই কাজ হয়। তাদেরই ফসল হয়।

টাকা থাকলে দান করা উচিত। দ্রঃ জয়গোপাল সেন।

টাকা : মুক্তপুরুষের। সাঁকোর নিচে জল সহজে বেরিয়ে যায়, জমে না ; তেমনি মুক্ত পুরুষদিগের হাতে যে টাকা পয়সা আসে, তা থাকে না, অমনি খরচ হয়ে যায়। তাঁদের বিষয়বুদ্ধি একেবারেই নেই।

টাকাতে বিদ্যার সংসার। টাকাতে যদি কেউ বিদ্যার সংসার করে, ঈশ্বরের সেবা করে, সাধু ভক্তের সেবা করে তাতে দোষ নাই। টাকায় খাওয়া দাওয়া হয়, একটা থাকবার জায়গা হয়, ঠাকুর সেবা হয়, সাধু ভক্তের সেবা হয়, সম্মুখে কেউ গরীব পড়লে তার উপকার হয়—এই সব টাকার সদ্ব্যবহার। ঐশ্বর্য ভোগের জন্য টাকা নয়। দেহের সুখের জন্য টাকা নয়। লোকমান্যের জন্য টাকা নয়। বিদ্যার সংসারের জন্য বেশি অর্থ উপায়ের জন্য চেষ্টা করবে, কিন্তু সদুপায়ে। উপার্জন করা উদ্দেশ্য নয়। ঈশ্বরের সেবা করাই উদ্দেশ্য। টাকাতে যদি ঈশ্বরের সেবা হয় ত সে টাকায় দোষ নাই। টাকা থাকলে অর্ধ জীবন্মুক্ত—যদি মন ঈশ্বরেতে থাকে।

দ্রঃ মুক্তপুরুষের টাকা।

টাকা ভোগের জন্য নয়। টাকায় খাওয়া-দাওয়া হয়, একটা থাকবার জায়গা হয়, ঠাকুরের সেবা হয়, সাধু ভক্তের সেবা হয়, সম্মুখে কেউ গরীব পড়লে তার উপকার হয়। এই সব টাকার সদ্ব্যবহার। ঐশ্বর্য ভোগের জন্য টাকা নয়।

টাকা মাটি, মাটি টাকা। তাঁকে পেলে সবাইকে পাব। টাকা মাটি, মাটিই টাকা—সোনা মাটি, মাটিই সোনা—এই বলে ত্যাগ কল্লুম ; গঙ্গার জলে ফেলে দিলুম। তখন ভয় হ'ল যে, মা লক্ষ্মী যদি রাগ করেন। লক্ষ্মীর ঐশ্বর্য অবজ্ঞা কল্লুম। যদি খ্যাঁট বন্ধ করেন। তখন বললুম, মা তোমায় চাই, আর কিছুই চাই না ; তাঁকে পেলে তবে সব পাব।

টাকার অহংকার। টাকার অহঙ্কার করতে নাই। যদি বলো আমি ধনী—তো

ধনীর আবার তারে বাড়া, তারে বাড়া আছে। সন্ধ্যার পর যখন জোনাকি পোকা উঠে, সে মনে করে, আমি এই জগৎকে আলো দিচ্ছি! কিন্তু নক্ষত্র যেই উঠলো অমনি তার অভিমান চলে গেল। তখন নক্ষত্রেরা ভাবতে লাগলো আমরা জগৎকে আলো দিচ্ছি! কিছু পরে চন্দ্র উঠলো, তখন নক্ষত্রেরা লজ্জায় মলিন হয়ে গেল। চন্দ্র মনে করলেন আমার আলোতে জগৎ হাসছে, আমি জগৎকে আলো দিচ্ছি। দেখতে দেখতে অরুণ উদয় হ'ল, সূর্য উঠছেন। চাঁদ মলিন হয়ে গেল—খানিকক্ষণ পরে আর দেখাই গেল না।

ধনীরা যদি এইগুলি ভাবে, তা হলে ধনের অহংকার হয় না।

টেক্স আদায়। যেমন কোন বাড়িতে বাস করতে হ'লে তার টেক্স দিতে হয়, তেমনি এই দেহটার ভিতর বাস করতে হ'লে এরও টেক্স দিতে হয়। রোগ শোক সেই টেক্স আদায় করা জানবে।

ঠাকুর সেবা। একটি ব্রাহ্মণের বাড়ীতে ঠাকুরের সেবা ছিল। এক দিন কোন কাজ উপলক্ষ্যে তার অন্যস্থানে যেতে হয়েছিল। ছোট ছেলেটিকে বলে গেল, তুই আজ ঠাকুরকে ভোগ দিস ; ঠাকুরকে খাওয়াবি। ছেলেটি ঠাকুরকে ভোগ দিল। ঠাকুর কিন্তু চুপ করে আছেন। কথাও কন না, খানও না। ছেলেটি অনেকক্ষণ বসে বসে দেখলে যে, ঠাকুর উঠছেন না! সে ঠিক জানে যে, ঠাকুর এসে আসনে বসে খাবেন। তখন সে বারবার বলতে লাগল, ঠাকুর এসে খাও, অনেক দেরী হ'ল ; আর আমি বসতে পারি না। ঠাকুর কথা কন না। ছেলেটি কান্না আরম্ভ করলে। বলতে লাগল, ঠাকুর বাবা তোমাকে খাওয়াতে বলে গেছেন ; তুমি কেন আসবে না, কেন আমার কাছে খাবে না? ব্যাকুল হয়ে যাই খানিকক্ষণ কেঁদেছে, ঠাকুর হাসতে হাসতে এসে আসনে বসে খেতে লাগলেন। ঠাকুরকে খাইয়ে যখন ঠাকুরঘর থেকে সে গেল, বাড়ীর লোকেরা বললে, ভোগ হয়ে গেছে ; সে সব নামিয়ে আন। ছেলেটি বললে, হাঁ হয়ে গেছে ; ঠাকুর সব খেয়ে গেছেন। তারা বললে সে কি রে! ছেলেটি সরল বুদ্ধিতে বললে, কেন, ঠাকুর ত খেয়ে গেছেন! তখন ঠাকুরঘরে গিয়ে দেখে সকলে অবাক!

ডাক্তারী। ডাক্তারী কর্ম খুব উঁচু কর্ম বলে অনেকের বোধ আছে। যদি টাকা না লয়ে পরের দুঃখ দেখে দয়া করে কেউ চিকিৎসা করে তবে সে মহৎ, কাজটিও মহৎ। কিন্তু টাকা লয়ে এ সব কাজ করতে মানুষ নির্দয় হয়ে যায়। ব্যবসার ভাবে টাকার জন্য হাগা, বাহ্যের রং এই সব দেখা—নীচের কাজ।

ডুব দাও। ডুব দাও। ঈশ্বরকে ভালবাসতে শেখ। তার প্রেমে মগ্ন হও।

ডোল পরিষ্কার। একজন সাধুর বড় জলতৃষ্ণা পেয়েছে, ভিস্তি জল নিয়ে যাচ্ছিল, সাধুকে জল দিতে চাইলে। সাধু বললে, 'তোমার ডোল (চামড়ার মোশক) কি পরিষ্কার?' ভিস্তি বললে, 'মহারাজ আমার ডোল খুব পরিষ্কার, কিন্তু তোমার ডোলের ভিতর মলমূত্র অনেক রকম ময়লা আছে। তাই বলছি আমার ডোল থেকে জল খাও, এতে দোষ হবে না।' তোমার ডোল অর্থাৎ তোমার দেহে,

তোমার পেটে।

'ড্যাম'। একটা কথা মনে পড়ে আমার হাসি পাচ্ছে। শুনো, একটা গল্প বলি। একজন নাপিত কামাতে গিয়েছিল। একজন ভদ্রলোককে কামাচ্ছিল। এখন কামাতে কামাতে তার একটু লেগেছিল। আর সে লোকটি ড্যাম (Damn) বলে উঠেছিল। নাপিত কিন্তু ড্যামের মানে জানে না। তখন সে ক্ষুর-টুর সব সেখানে রেখে, শীতকাল, জামার আস্তিন গুটিয়ে বলে, তুমি আমায় ড্যাম বললে, এর মানে কি, এখন বল। সে লোকটি বললে, আরে তুই কামা না ; ওর মানে এমন কিছু নয়, তবে একটু সাবধানে কামাস। নাপিত সে ছাড়বার নয়, সে বলতে লাগল, ড্যাম মানে যদি ভাল হয়, তা হ'লে আমি ড্যাম, আমার বাপ ড্যাম, আমার চৌদ্দপুরুষ ড্যাম। আর ড্যাম মানে যদি খারাপ হয়, তা হ'লে তুমি ড্যাম, তোমার বাবা ড্যাম, তোমার চৌদ্দপুরুষ ড্যাম। আর শুধু ড্যাম নয়। ড্যাম ড্যাম ড্যাম ড্যা ড্যাম ড্যাম।

ঢং করা। অনেকে ঢং ক'রে শোক করে। কাঁদতে হবে জেনে আগে নৎ খোলে আর আর গহনা সব খোলে ; খুলে বাক্সর ভিতর চাবি দিয়ে রেখে দেয়। তার পর আছড়ে এসে পড়ে, আর কাঁদে, 'ওগো দিদিগো, আমার কি হ'ল গো!'

তপস্যার কি প্রয়োজন। হরিকে যদি আরাধনা করা যায়, তাহলে তপস্যার কি প্রয়োজন? আর হরিকে যদি না আরাধনা করা হয়, তাহলেই বা তপস্যার কি প্রয়োজন? হরি যদি অন্তরে বাহিরে থাকেন, তাহলেই বা তপস্যার কি প্রয়োজন? আর যদি অন্তরে বাহিরে না থাকেন, তাহলেই বা তপস্যার কি প্রয়োজন? অতএব হে ব্রহ্মন্, বিরত হও, বৎস, তপস্যার কি প্রয়োজন? জ্ঞান-সিন্ধু শংকরের কাছে গমন কর। বৈষ্ণবেরা যে হরিভক্তির কথা বলে গেছেন, সেই সুপক্কা ভক্তি লাভ কর, লাভ কর। এই ভক্তি—এই ভক্তি-কাটারি দ্বারা ভবনিগড় ছেদন হবে।

তমোগুণ ও আত্মরক্ষা। আত্মরক্ষা ও তমোগুণ দেখ।

তমোগুণের মোড় ফেরান। মোড় ফেরান দেখ।

তিন অবস্থা। জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, জীবের এই তিন অবস্থা।

যারা জ্ঞান বিচার করে তারা তিন অবস্থাই উড়িয়ে দেয়। তারা বলে যে ব্রহ্ম তিন অবস্থারই পার ; স্থূল সূক্ষ্ম কারণ—তিন দেহের পার ; সত্ত্ব, রজঃ, তম, তিন গুণের পার ; সমস্তই মায়া, যেমন আয়নাতে প্রতিবিম্ব পড়েছে ; প্রতিবিম্ব কিছু বস্তু নয় ; ব্রহ্মই বস্তু আর সব অবস্তু।

ব্রহ্মজ্ঞানীরা আরও বলে, দেহাত্ম বুদ্ধি থাকলেই দুটো দেখায়। প্রতিবিম্বটাও সত্য বলে বোধ হয়। ঐ বুদ্ধি চলে গেলে, সোহহং 'আমিই সেই ব্রহ্ম' এই অনুভূতি হয়।

তিন টান। তবে ব্যাকুল হয়ে আর্জি (Prayer) করতে হয়। এমনি আছে, তিন টান একসঙ্গে হলে, ঈশ্বর দর্শন হয়। সন্তানের উপর মায়ের টান, সতী স্ত্রীর স্বামীর উপর টান, আর বিষয়ীর বিষয়ের উপর টান।

দ্রঃ ঈশ্বর দর্শনের উপায় খ।

তীব্র বৈরাগ্য। তীব্র বৈরাগ্য কাকে বলে, একটি গল্প শোন। এক দেশে অনাবৃষ্টি হয়েছে। চাষীরা সব খানা কেটে দূর থেকে জল আনছে। একজন চাষার খুব রোক আছে; সে একদিন প্রতিজ্ঞা করলে যতক্ষণ না জল আসে, খানার সঙ্গে আর নদীর সঙ্গে এক হয়, ততক্ষণ খানা খুঁড়ে যাবে। এদিকে স্নান করবার বেলা হ'ল। গৃহিণী মেয়ের হাতে তেল পাঠিয়ে দিল। মেয়ে বলল—'বাবা, বেলা হয়েছে, তেল মেখে নেয়ে ফেল।' সে বললে,'তুই যা, আমার এখন কাজ আছে।' বেলা দুই প্রহর একটা হ'ল, তখনও চাষা মাঠে কাজ করছে। স্নান করার নামটি নাই। তার স্ত্রী তখন মাঠে এসে বললে, 'এখনও নাও নাই কেন? ভাত জুড়িয়ে গেল, তোমার যে সবই বাড়াবাড়ি! না হয় কাল করবে, কি খেয়ে-দেয়েই করবে।' গালাগালি দিয়ে চাষা কোদাল হাতে করে তাড়া করলে; আর বললে, 'তোর আক্কেল নেই? বৃষ্টি হয় নাই। চাষ-বাস কিছুই হ'ল না, এবার ছেলে-পুলে কি খাবে? না খেয়ে সব মারা যাবি। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি মাঠে আজ জল আনবো তবে নাওয়া-খাওয়ার কথা কবো।' স্ত্রী গতিক দেখে দৌড়ে পালিয়ে গেল। চাষা সমস্ত দিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে সন্ধ্যার সময় খানার সঙ্গে নদীর যোগ করে দিলে। তখন একবারে বসে দেখতে লাগলো যে, নদীর জল মাঠে কুলকুল করে আসছে। তার মন তখন শান্ত আর আনন্দে পূর্ণ হ'ল। বাড়ি গিয়ে স্ত্রীকে ডেকে বললে, 'নে এখন তেল দে আর একটু তামাক সাজ।' তার-পর নিশ্চিন্ত হয়ে নেয়ে খেয়ে সুখে ভোঁস ভোঁস করে নিদ্রা যেতে লাগলো। এই রোক্ তীব্র বৈরাগ্যের উপমা।

তীর্থ। যেখানে অনেক লোক অনেকদিন ধরে ঈশ্বরকে দেখবে বলে তপ, জপ, ধ্যান, ধারণা, প্রার্থনা, উপাসনা করছে, সেখানে তাঁর প্রকাশ নিশ্চয় আছে জানবে। তাদের ভক্তিতে সেখানে ঈশ্বরীয় ভাবের একটা জমাট বেঁধে গেছে; তাই সেখানে সহজেই ঈশ্বরীয় ভাবের উদ্দীপন ও তাঁর দর্শন হয়। যুগযুগান্তর থেকে কত সাধু, ভক্ত, সিদ্ধপুরুষেরা এই সব তীর্থে ঈশ্বরকে দেখবে বলে এসেছে অন্য সব বাসনা ছেড়ে, তাঁকে প্রাণ ঢেলে ডেকেছে; সেই জন্য ঈশ্বর সব জায়গায় সমানভাবে থাকলেও এই সব স্থানে তাঁর বিশেষ প্রকাশ; যেমন মাটি খুঁড়লে সব জায়গাতেই জল পাওয়া যায়; কিন্তু যেখানে পাতকো, ডোবা, পুকুর বা হ্রদ আছে, সেখানে আর জলের জন্য খুঁড়তে হয় না—যখনই ইচ্ছা জল পাওয়া যায়, সেই রকম।

তীর্থফল। ওরে যার হেথায় আছে, তার সেথায় আছে; যার হেথায় নাই তার সেথায়ও নাই। যার প্রাণে ভক্তিভাব আছে, তীর্থে উদ্দীপন হয়ে, তার সেই ভাব আরও বেড়ে যায়; আর যার প্রাণে ঐ ভাব নেই তার বিশেষ আর কি হবে? তীর্থে বাস করতে গিয়ে কতলোক সেখানে আবার দোকান পাট ব্যবসা ফেঁদে বসে। মথুরের সঙ্গে পশ্চিমে গিয়ে দেখি, এখানেও যা সেখানেও তাই। এখানকার আমগাছ, তেঁতুলগাছ, বাঁশঝাড়টি যেমন, সেখানকার সেগুলিও তেমনি। তাই দেখে হৃদুকে বলেছিলাম, ওরে হৃদু, এখানে আর তবে কি দেখতে এলুম রে?

সেখানেও যা এখানেও তাই। কেবল মাঠঘাটের বিষ্ঠাগুলো দেখে মনে হয় এখানকার লোকের হজমশক্তিটা ওদেশের লোকের চেয়ে অধিক। ভেবেছিলাম, কাশীতে সকলে চব্বিশ ঘণ্টা শিবের ধ্যানে সমাধিতে আছে দেখতে পাব; বৃন্দাবনে সকলে গোবিন্দকে নিয়ে ভাবে প্রেমে বিহ্বল হয়ে রয়েছে দেখবো। গিয়ে দেখি সবই বিপরীত। যদি এখানে বসে ভক্তিলাভ করতে পার, তীর্থে যাবার কি দরকার ? তীর্থে গিয়ে যদি ভক্তিলাভ না হ'ল তাহলে তীর্থে যাওয়ার আর ফল হয় না।

দ্রঃ জাবর কাটা।

তস্মিন্ তুষ্টে। ঈশ্বরকে তুষ্ট কর, সকলেই তুষ্ট হবে। তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টম্। ঠাকুর যখন দ্রৌপদীর হাঁড়ির শাক খেয়ে বললেন, আমি তৃপ্ত হয়েছি, তখন জগৎ শুদ্ধ জীব তৃপ্ত—হেউ ঢেউ হয়েছিল। কই মুনিরা খেলে কি জগৎ তুষ্ট হয়েছিল—হেউ ঢেউ হয়েছিল ?

তীর্থে যাওয়া। যদি এখানে ব'সে ভক্তি লাভ করতে পার, তা হ'লে তীর্থে যাবার কি দরকার ? কাশী গিয়ে দেখলাম, সেই গাছ। সেই তেঁতুলপাতা।'

তীর্থে গিয়ে যদি ভক্তিলাভ না হ'ল, তা'হলে তীর্থে যাওয়ার আর ফল হ'ল না। ভক্তিই সার, একমাত্র প্রয়োজন।

চিল শকুনি কি জান ? অনেক লোক আছে, তারা লম্বা লম্বা কথা কয়। আর বলে যে, শাস্ত্রে যে সকল কর্ম ক'রতে বলছে, আমরা অনেক করেছি। এদিকে তাদের মন ভারী বিষয়াসক্ত—টাকা-কড়ি, মান, সম্ভ্রম, দেহের সুখ এই সব নিয়ে ব্যস্ত।

ত্যাগ। মন থেকে সব ত্যাগ না হ'লে ঈশ্বর লাভ হয় না। সাধু সঞ্চয় করতে পারে না। সঞ্চয় না করে 'পন্ছী আউর দরবেশ।' পাখী আর সাধু সঞ্চয় করে না। এখানকার ভাব—হাতে মাটি দেবার জন্য মাটি নিয়ে যেতে পারি না। বোটুয়াটা ক'রে পান আনবার যো নাই। হৃদে যখন বড় যন্ত্রণা দিচ্ছে, তখন এখান থেকে কাশী চলে যাবো মতলব হ'ল। ভাবলুম কাপড় লব—কিন্তু টাকা কেমন করে লব ? আর কাশী যাওয়া হ'ল না।

ত্যাগ (মাছ-পান)। সে কি রে। পান মাছে কি হয়েছে ? ওতে কিছু দোষ হয় না। কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগই ত্যাগ।

একজন মাদুর বগলে করে যাত্রা শুনতে এসেছিল। যাত্রার দেরী দেখে মাদুরটি পেতে ঘুমিয়ে পড়লো। যখন উঠলো তখন সব শেষ হয়ে গেছে। তখন মাদুর বগলে করে বাড়ী ফিরে গেল।

ত্যাগ ও ভোগ। মনে করলেই ত্যাগ করা যায় না। প্রারব্ধ, সংস্কার, এ সব আবার আছে। একজন রাজাকে একজন যোগী বললে, তুমি আমার কাছে বসে থেকে ভগবানের চিন্তা কর। রাজা বললে, ঠাকুর সে বড় হবে না; আমি থাকতে পারি ? কিন্তু আমার এখনও ভোগ আছে। এ বনে যদি থাকি, হয় ত বনেতে একটা রাজ্য হয়ে যাবে। আমার এখনও ভোগ আছে।

নটবর পাঁজা যখন ছেলেমানুষ, এই বাগানে গরু চরাত। তার কিন্তু অনেক

ভোগ ছিল। তাই এখন রেড়ির কল ক'রে অনেক টাকা করেছে। আলমবাজারে রেড়ির কলের ব্যবসা খুব ফেঁদেছে।

ত্যাগ : সংসার নয় মনে। আন্তরিক হ'লে সংসারেও ঈশ্বরলাভ করা যায়। 'আমি ও আমার' এইটিই অজ্ঞান। হে ঈশ্বর, তুমি ও তোমার এইটিই জ্ঞান।

সংসারে থাকো, যেমন বড় মানুষের বাড়ীর ঝি। সব কাজ ক'রে ছেলে মানুষ করে। বাবুর ছেলেকে বলে আমার হরি, কিন্তু মনে মনে বেশ জানে, এ বাড়ী আমার নয়, এ ছেলেও আমার নয়। সে সব কাজ করে, কিন্তু তার মন দেশে পড়ে থাকে। তেমনি সংসারে সব কর্ম কর কিন্তু ঈশ্বরের দিকে মন রেখো। আর জেনো যে, গৃহ, পরিবার, পুত্র, এ সব আমার নয়, এ সব তাঁর। আমি কেবল তাঁর দাস।

আমি মনে ত্যাগ কর্তে বলি। সংসার ত্যাগ বলি না। অনাসক্ত হয়ে সংসারে থেকে, আন্তরিক চাইলে, তাঁকে পাওয়া যায়।

ত্যাগী। কামিনীকাঞ্চনের ভিতর থাকলে মন বড় টেনে লয়। সাবধানে থাকতে হয়। ত্যাগীদের অত ভয় নাই। ঠিক ঠিক ত্যাগী কামিনী-কাঞ্চন থেকে তফাতে থাকে। তাই সাধন থাকলে ঈশ্বরে সর্বদা মন রাখতে পারে।

ঠিক ঠিক ত্যাগী। যারা সর্বদা ঈশ্বরে মন দিতে পারে, তারা মৌমাছির মতো কেবল ফুলে বসে, মধু পান করে। সংসারে কামিনী-কাঞ্চনের ভিতরে যে আছে, তার ঈশ্বরে মন হতে পারে; আবার কখন কখন কামিনী-কাঞ্চনেও মন হয়। যেমন সাধারণ মাছি সন্দেশেও বসে আর পচা ঘায়েও বসে; বিষ্ঠাতেও বসে।

ঈশ্বরেতে সর্বদা মন রাখবে। প্রথমে একটু খেটে নিতে হয়। তার পর পেন্সান্ ভোগ করবে।

দ্রঃ 'ফোঁস করা'।

ত্রিগুণ : ক. সংসারীর। যেমন সংসারীদের মধ্যে সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিন গুণ আছে; তেমনি ভক্তিরও সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিন গুণ আছে।

সংসারীর সত্ত্বগুণ কি রকম জান? বাড়িটি এখানে ভাঙ্গা, ওখানে ভাঙ্গা—মেরামত করে না। ঠাকুরদালানে পায়রাগুলো হাগছে, উঠানে শেওলা প'ড়ছে হুঁশ নাই। আসবাবগুলো পুরানো, ফিট-ফাট করবার চেষ্টা নাই। কাপড় যা তাই একখানা হ'লেই হ'ল। লোকটি খুব শান্ত, শিষ্ট, দয়ালু, অমায়িক; কারু কোনও অনিষ্ট করে না।

সংসারীর রজোগুণের লক্ষণ আবার আছে। ঘড়ি, ঘড়ির চেন, হাতে দুই-তিনটা আংটি। বাড়ির আসবাব খুব ফিটফাট। দেওয়ালে কুইনের ছবি, রাজপুত্রের ছবি, কোন বড় মানুষের ছবি। বাড়িটি চুনকাম করা, যেন কোনখানে একটু দাগ নাই। নানা রকমের ভাল পোষাক। চাকরদেরও পোষাক। এমনি এমনি সব।

সংসারীর তমোগুণের লক্ষণ—নিদ্রা, কাম, ক্রোধ, অহঙ্কার এই সব।

খ. ভক্তের। আর ভক্তির সত্ত্ব আছে। যে ভক্তের সত্ত্বগুণ আছে, সে ধ্যান করে অতি গোপনে। সে হয়ত মশারির ভিতর ধ্যান করে—সবাই জানছে, ইনি শুয়ে আছেন, বুঝি রাত্রে ঘুম হয় নাই, তাই উঠতে দেরী হচ্ছে। এদিকে শরীরের

উপর আদর কেবল পেটচলা পর্যন্ত ; শাকান্ন পেলেই হ'ল। খাবার ঘটা নাই। পোষাকের আড়ম্বর নাই। বাড়ির আসবাবের জাঁকজমক নাই। আর সত্ত্বগুণী ভক্ত কখনও তোষামোদ ক'রে ধন লয় না।

ভক্তির রজঃ থাকলে সে ভক্তের হয়তো তিলক আছে, রুদ্রাক্ষের মালা আছে। সেই মালার মধ্যে মধ্যে আবার একটি সোনার দানা। ভক্তির তমঃ বার হয়, তার বিশ্বাস জ্বলন্ত। ঈশ্বরের কাছে সেরূপ ভক্ত জোর করে। যেন ডাকাতি ক'রে ধন কেড়ে লওয়া। 'মারো কাটো বাঁধো।' এইরূপ ডাকাত-পড়া ভাব।

ত্রিগুণাতীত। 'ঈশ্বরদর্শন হবার লক্ষণ' দ্রষ্টব্য।

ত্রিগুণের ফলে স্বভাবের ভিন্নতা। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের ভিন্ন স্বভাব। তমোগুণীদের লক্ষণ—অহঙ্কার, নিদ্রা, বেশী ভোজন, কাম, ক্রোধ এই সব। রজোগুণীরা বেশী কাজ জড়ায় ; কাপড় পোষাক ফিটফাট, বাড়ি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, বৈঠকখানায় কুইনের ছবি। যখন ঈশ্বর চিন্তা করে তখন চেলী-গরদ পরে গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, তার মাঝে মাঝে একটি একটি সোনার রুদ্রাক্ষ ; যদি কেউ ঠাকুরবাড়ি দেখতে আসে তবে সঙ্গে করে করে দেখায় আর বলে, এদিকে আসুন আরও আছে, শ্বেত পাথরের, মার্বেল পাথরের মেঝে আছে, ষোল-ফোকর নাটমন্দির আছে। আবার দান করে, লোককে দেখিয়ে। সত্ত্বগুণী লোক অতি শিষ্ট-শান্ত, কাপড় যা তা ; রোজগার পেট চলা পর্যন্ত, কখনও লোকের তোষামোদ ক'রে ধন লয় না, বাড়িতে মেরামত নাই, ছেলেদের পোষাকের জন্য ভাবে না ; মান-সম্ভ্রমের জন্য ব্যস্ত হয় না, ঈশ্বর চিন্তা, দানধ্যান সমস্ত গোপনে—লোকে টের পায় না ; মশারীর ভিতর ধ্যান করে, লোকে ভাবে বাবুর রাতে ঘুম হয় নাই তাই বেলা পর্যন্ত ঘুমাচ্ছেন। সত্ত্বগুণ সিঁড়ির শেষ ধাপ, তার পরেই ছাদ। সত্ত্বগুণ এলেই ঈশ্বর লাভের আর দেরী হয় না—আর একটু গেলেই তাঁকে পাবে।

থিয়েটার আর করা কেন ? না না ও থাক, ওতে লোকশিক্ষা হবে।

দ্র. আত্মকথা : অভিনয়-দর্শন।

দক্ষিণা। দ্রঃ গুরুশিষ্য বোধ।

দগ্ধ রিপু। দ্রঃ কামাদি রিপু দগ্ধ হয়।

দত্তাত্রেয়। 'ব্রহ্মজ্ঞান অবর্ণনীয়' দ্রষ্টব্য।

দয়া (ইংরাজী মতে)। হৃদে শম্ভু মল্লিককে বলেছিল, আমায় কিছু টাকা দাও। শম্ভু মল্লিকের ইংরাজী মত, সে বললে, তোমায় কেন টাকা দিতে যাব ? তুমি খেটে খেতে পার, তুমি যা হক কিছু রোজগার করছো। তবে খুব গরীব হয় সে এক কথা, কি কানা, খোঁড়া পঙ্গু ; এদের দিলে কাজ হয়। তখন হৃদে বললে, মহাশয়। আপনি উটি বলবেন না। আমার টাকায় কাজ নাই। ঈশ্বর করুন যেন আমায় কানা খোঁড়া অতি দরিদ্দীর, এ সব না হতে হয়। আপনারও দিয়ে কাজ নাই, আমারও নিয়ে কাজ নাই।

দয়া। 'গৃহীর প্রথম কর্তব্য' দেখ।

দয়া ও মায়া। দয়া খুব ভাল। দয়া আর মায়া অনেক তফাত। দয়া ভাল, মায়া ভাল নয়। মায়া আত্মীয়ের উপর ভালবাসা, স্ত্রী, পুত্র, ভাই, ভগিনী, ভাইপো, ভাগনে, বাপ, মা এদেরই উপর ভালবাসা। দয়া সর্বভূতে সমান ভালবাসা। 'মানুষ খ' দ্রষ্টব্য

দয়া বন্ধন কি? দয়া সত্ত্বগুণ থেকে হয়। সত্ত্বগুণে পালন, রজোগুণে সৃষ্টি, তমোগুণে সংহার। কিন্তু ব্রহ্ম সত্ত্বরজস্তমঃ তিন গুণের পার। প্রকৃতির পার। যেখানে ঠিক ঠিক সেখানে গুণ পৌঁছিতে পারে না। চোর যেমন ঠিক জায়গায় যেতে পারে না, ভয় হয় পাছে ধরা পড়ে! সত্ত্বরজস্তমঃ তিন গুণই চোর। একটা গল্প বলি শুন—

একটি লোক বনের পথ দিয়ে যাচ্ছিল। এমন সময়ে তাকে তিনজন ডাকাত এসে ধরলে। তারা তার সর্বস্ব কেড়ে নিলে। একজন চোর বললে, এ লোকটাকে রেখে কি হবে? এই কথা বলে খাঁড়া দিয়ে কাটতে এলো। তখন আর একজন চোর বললে, না হে কেটে কি হবে? একে হাত-পা বেঁধে এখানে ফেলে যাও। তখন তাকে হাত-পা বেঁধে ঐখানে রেখে চোরেরা চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে তাদের মধ্যে একজন ফিরে এসে বললে, আহা তোমার কি লেগেছে? এসো আমি তোমার বন্ধন খুলে দিই। তার বন্ধন খুলে দিয়ে চোরটি বললে, আমার সঙ্গে সঙ্গে এসো, তোমায় সদর রাস্তায় তুলে দিচ্ছি। অনেকক্ষণ পরে সদর রাস্তায় এসে বললে, এই রাস্তা ধরে যাও, ঐ তোমার বাড়ি দেখা যাচ্ছে। তখন লোকটি চোরকে বললে, মশাই আমার অনেক উপকার করলেন, এখন আপনিও আসুন, আমার বাড়ি পর্যন্ত যাবেন। চোর বললে, না, আমার ওখানে যাবার যো নাই, পুলিসে টের পাবে।

সংসারই অরণ্য। এই বনে সত্ত্বরজস্তমঃ তিন গুণ ডাকাত, জীবের তত্ত্বজ্ঞান কেড়ে লয়। তমোগুণ জীবের বিনাশ করতে যায়। রজোগুণ সংসারে বদ্ধ করে। কিন্তু সত্ত্বগুণ, রজস্তমঃ থেকে বাঁচায়। সত্ত্বগুণের আশ্রয় পেলে কাম-ক্রোধ এই সব তমোগুণ থেকে রক্ষা হয়। সত্ত্বগুণ আবার জীবের সংসার-বন্ধন মোচন করে। কিন্তু সত্ত্বগুণও চোর, তত্ত্বজ্ঞান দিতে পারে না। কিন্তু সেই পরম ধামে যাবার পথে তুলে দেয়। দিয়ে বলে, ঐ দেখ তোমার বাড়ি ঐ দেখা যায়! যেখানে ব্রহ্মজ্ঞান সেখান থেকে সত্ত্বগুণ অনেক দূরে।

দল। 'ব্রহ্মজ্ঞান। কেশব সেন। দল আমি' দ্রষ্টব্য।

দলগড়া। কেশব সেনকে বললুম, আমি দলপাতি দল করেছি, আমি লোকশিক্ষা দিচ্ছি, এ 'আমি' 'কাঁচা আমি।' মত প্রচার বড় কঠিন। ঈশ্বরের আজ্ঞা ব্যতিরেকে হয় না। তাঁর আদেশ চাই। যেমন শুকদেব ভাগবত কথা বলতে আদেশ পেয়েছিলেন। যদি ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার করে কেউ আদেশ পায়, সে যদি প্রচার করে, লোকশিক্ষা দেয়, দোষ নাই। তার 'আমি' 'কাঁচা আমি' নয়, 'পাকা আমি।'

কেশবকে বলেছিলাম 'কাঁচা আমি' ত্যাগ কর। 'দাস আমি', 'ভক্তের আমি' এতে কোন দোষ নাই।

তুমি দল দল করছো। তোমার দল থেকে লোক ভেঙ্গে ভেঙ্গে যাচ্ছে। কেশব বললে, মহাশয়, তিন বৎসর এ দলে থেকে আবার ও দলে গেল। যাবার সময় আবার গালাগালি দিয়ে গেল। আমি বললাম, তুমি লক্ষণ দেখ না কেন, যাকে তাকে চেলা করলে কি হয়?

দল ভাঙ্গার কারণ। তুমি প্রকৃতি দেখে শিষ্য করো না, তাই এইরূপ ভেঙ্গে ভেঙ্গে যায়।

মানুষগুলি দেখতে সব একরকম, কিন্তু ভিন্ন প্রকৃতি। কারু ভিতর সত্ত্বগুণ বেশী, কারু রজোগুণ বেশী, কারু তমোগুণ। পুলিগুলি দেখতে সব এক-রকম। কিন্তু কারু ভিতর ক্ষীরের পোর, কারু ভিতর নারিকেল ছাঁই, কারু ভিতর কলায়ের পোর।

দর্শনের দোষ। তুমি কি রকম লোক গা! যুধিষ্ঠিরের কেবল নরক-দর্শনই মনে ক'রে রেখেছ? যুধিষ্ঠিরের সত্য কথা, ক্ষমা, ধৈর্য, বিবেক, বৈরাগ্য, ঈশ্বরে ভক্তি এ সব কিছু মনে হয় না!

দশরথ। 'সরলতা' দ্রষ্টব্য।

দান। তুমি যে দান ধ্যান কর, খুব ভাল। যাদের টাকা আছে তাদের দান করা উচিত। কৃপণের ধন উড়ে যায়, দাতার ধন রক্ষা হয়, সৎকাজে যায়। ও-দেশে চাষারা খানা কেটে ক্ষেতে জল আনে। কখনও কখনও জলের এত তোড় হয় যে ক্ষেতের আল ভেঙ্গে যায়, আর জল বেরিয়ে যায় ও ফসল নষ্ট হয়। তাই চাষারা আলের মাঝে মাঝে ছেঁদা করে রাখে, তাকে ঘোগ বলে। জল ঘোগ দিয়ে একটু একটু বেরিয়ে যায়, তখন জলের তোড়ে আল ভাঙ্গে না। আর ক্ষেতের উপর পলি পড়ে। সেই পলিতে ক্ষেত উর্বরা হয়; আর খুব ফসল হয়। যে দান ধ্যান করে, সে অনেক ফল লাভ করে; চতুর্বর্গ ফল।

দান। তা নয়। সামনে দুঃখ কষ্ট দেখলে টাকা থাকলে দেওয়া উচিত। জ্ঞানী বলে, 'দেরে দেরে, এরে কিছু দে।' তা না হলে, আমি কি করতে পারি—'ঈশ্বরই কর্তা আর সব অকর্তা' এইরূপ বোধ হয়।

মহাপুরুষেরা জীবের দুঃখে কাতর হয়ে ভগবানের পথ দেখিয়ে দেন। শঙ্করা-চার্য জীবশিক্ষার জন্য 'বিদ্যার আমি' রেখেছিলেন।

অন্নদানের চেয়ে জ্ঞান দান, ভক্তিদান আরও বড়। চৈতন্যদেব তাই আচণ্ডালে ভক্তি বিলিয়েছিলেন।

দান-ধ্যান। কি, আগে টাকা সঞ্চয় করে তবে ঈশ্বর! আর দান-ধ্যান-দয়া কত! নিজের মেয়ের বিয়েতে হাজার হাজার টাকা খরচ—আর পাশের বাড়িতে খেতে পাচ্ছে না। তাদের দুটি চাল দিতে কষ্ট হয়—অনেক হিসেব ক'রে দিতে হয়। খেতে পাচ্ছে না লোকে,—তা আর কি হবে, ও শালারা মরুক আর বাঁচুক—আমি আর আমার বাড়ির সকলে ভাল থাকলেই হ'ল। মুখে বলে সর্বজীবে দয়া!

দাস আমি। আমি গ দ্রষ্টব্য।

দাস আমির কাম-ক্রোধ। ঠিক ভাব যদি হয়, তা হলে কাম-ক্রোধের কেবল আকার

মাত্র থাকে। যদি ঈশ্বর লাভের পর 'দাস আমি' বা 'ভক্তের আমি' থাকে, সে ব্যক্তি কারো অনিষ্ট করতে পারে না। পরশমণি ছোঁয়ার পর তরবার সোনা হয়ে যায়, তরবারের আকার থাকে কিন্তু কারো হিংসা করে না।

নারিকেল গাছের বেল্লো শুকিয়ে ঝরে পড়ে গেলে, কেবল দাগ মাত্র থাকে। সেই দাগে এইটি টের পাওয়া যায় যে, এককালে ঐখানে নারিকেলের বেল্লো ছিল। সেই রকম যার ঈশ্বর লাভ হয়েছে, তার অহঙ্কারের দাগমাত্র থাকে, কাম-ক্রোধের আকার মাত্র থাকে; বালকের অবস্থা হয়। বালকের যেমন সত্ত্ব, রজঃ, তমো গুণের মধ্যে কোন গুণের আঁট নাই। বালকের কোন জিনিসের উপর টান করতেও যতক্ষণ—তাকে ছাড়তেও ততক্ষণ। একখানা পাঁচ টাকার কাপড় তুমি আধ পয়সার পুতুল দিয়ে ভুলিয়ে নিতে পারো। কিন্তু প্রথমে আঁট করে বলবে এখন—না আমি দেবো না, আমার বাবা কিনে দিয়েছে। বালকের আবার সবাই সমান—ইনি বড়, উনি ছোট, এরূপ বোধ নাই। তাই জাতি বিচার নাই। মা বলে দিয়েছে, 'ও তোর দাদা হয়', সে ছুতোর হলেও একপাতে বসে ভাত খাবে। বালকের ঘৃণা নাই, শুচি-অশুচি বোধ নাই। পায়খানায় গিয়ে হাতে মাটি দেয় না। [সঙ্গে আমি দ্রষ্টব্য]

দাসত্ব। যার কর্ম কচ্ছ, তারই করো। একজনের চাকরী কল্লেই মন খারাপ হয়ে যায়, আবার পাঁচ জনের!

একজন স্ত্রীলোক একজন মুসলমানের উপর আসক্ত হয়ে, তার সঙ্গে আলাপ করবার জন্য ডেকেছিল। মুসলমানটি সাধুলোক ছিল, সে বল্লে—আমি প্রস্রাব করবো, আমার বদনা আনতে যাই। স্ত্রীলোকটি বল্লে—তা এইখানেই হবে, আমি বদনা দিব এখন। সে বল্লে তা হবে না। আমি যে বদনার কাছে একবার লজ্জা ত্যাগ করেছি, সেই বদনাই ব্যবহার করবো—আবার নূতন বদনার কাছে নির্লজ্জ হবো না। এই বলে সে চলে গেল। মাগীটারও আক্কেল হ'ল। সে বদনার মানে বুঝলে উপপতি।

দাসত্ব। এমনি আছে যে, বার বছর না কত ঐ রকম দাসত্ব করলে তাই হয়ে যায়। যাদের অতদিন দাসত্ব করলে, তাদের সত্তা হয়ে যায়। তাদের রজঃ, তমঃ গুণ, জীব-হিংসা, বিলাস এই সব এসে পড়ে, তাদের সেবা করতে করতে। শুধু দাসত্ব নয়, আবার পেনসান খায়।

দাসত্ব অপরের। তুমি রাগই কর আর যাই কর—রাখালকে বল্লুম ঈশ্বরের জন্য গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে মরেছিস এ কথা বরং শুনবো, তবু কারুর দাসত্ব করিস, চাকরী করিস, এ কথা যেন না শুনি।

নেপালের একটি মেয়ে এসেছিল। বেশ এসরাজ বাজিয়ে গান করলে; হরিনাম গান। কেউ জিজ্ঞাসা করলে—তোমার বিবাহ হয়েছে? তা বললে, আবার কার দাসী হব? এক ভগবানের দাসী আমি।

দাসত্বের যন্ত্রণা। তোমরা নিজে নিজে তো দেখছো, পরের কর্ম স্বীকার করে কি হয়ে রয়েছো। আর দেখ, অত পাশ করা, কত ইংরাজী পড়া পণ্ডিত, মনিবের চাকরী স্বীকার করে তাদের বুট জুতার গোঁজা দুবেলা খায়। এর কারণ কেবল

'কামিনী'। বিয়ে করে নদের হাট বসিয়ে আর হাট তোলবার যো নাই। তাই এত অপমানবোধ, অত দাসত্বের যন্ত্রণা।

দ্রঃ সংসারী : তিনের দাস।

দাসীভাব। সংসার করতে দোষ কি ? তবে সংসারে দাসীর মতো থাক।

দাসী মনিবের বাড়ির কথায় বলে, 'আমাদের বাড়ি।' কিন্তু তার নিজের বাড়ি হয়তো কোন পাড়াগাঁয়ে। মনিবের বাড়িকে দেখিয়ে মুখে বলে, 'আমাদের বাড়ি।' মনে জানে যে ওবাড়ি আমাদের নয়, আমাদের বাড়ি সেই পাড়াগাঁয়ে। আবার মনিবের ছেলেকে মানুষ করে, আর বলে, 'হরি আমার বড় দুষ্টু হয়েছে'; 'আমার হরি মিষ্টি খেতে ভালবাসে না।' 'আমার হরি' মুখে বলে বটে, কিন্তু জানে, হরি আমার নয়, মনিবের ছেলে।

তাই যারা আসে, তাদের আমি বলি, সংসার কর না কেন, তাতে দোষ নাই তবে ঈশ্বরেতে মন রেখে কর, জেনো যে বাড়ি ঘর পরিবার আমার নয় ; এ সব ঈশ্বরের। আমার ঘর ঈশ্বরের কাছে। আর বলি যে, তাঁর পাদপদ্মে ভক্তির জন্য ব্যাকুল হ'য়ে সর্বদা প্রার্থনা করবে।

দুইপথ। আবার জ্ঞান ভক্তি দুইটিই পথ—যে পথ দিয়ে যাও, তাঁকেই পাবে। জ্ঞানী এক ভাবে তাঁকে দেখে, ভক্ত আর এক ভাবে তাঁকে দেখে। জ্ঞানীর ঈশ্বর তেজোময়, ভক্তের রসময়।

দুদিক রাখা। বলে দু'দিক রাখবো। দু'আনা মদ খেলে মানুষ দু'দিক রাখতে চায়, আর খুব মদ খেলে কি আর দু'দিক রাখা যায়!

ঈশ্বরের আনন্দ পেলে আর কিছু ভাল লাগে না। তখন কামিনী-কাঞ্চনের কথা যেন বুকে বাজে। (ঠাকুর কীর্তনের সুরে বলিতেছেন) 'আন লোকের আন কথা, কিছু ভাল ত লাগে না।' তখন ঈশ্বরের জন্য পাগল হয়, টাকা-ফাকা কিছুই ভাল লাগে না!

দুর্গাপূজা আর কেন ? আর দেখ, দাঁতও সব পড়ে গেছে, আর দুর্গাপূজা কেন? একজন বলেছিল, আর দুর্গাপূজা কর না কেন ? সে ব্যক্তি উত্তর দিলে, আর দাঁত নাই ভাই। পাঁঠা খাবার শক্তি গেছে।

দুষ্টের সৃষ্টি কেন। তাঁর ইচ্ছা, তাঁর লীলা। তাঁর মায়াতে বিদ্যা আছে, অবিদ্যাও আছে। অন্ধকারের প্রয়োজন আছে, অন্ধকার থাকলে আলোর আরও মহিমা প্রকাশ হয়। কাম, ক্রোধ, লোভ খারাপ জিনিস বটে, তবে তিনি দিয়েছেন কেন ? মহৎ লোক তয়ের করবেন ব'লে। ইন্দ্রিয় জয় করলে মহৎ হয়। জিতেন্দ্রিয় কি না করতে পারে ? ঈশ্বরলাভ পর্যন্ত তাঁর কৃপায় করতে পারে। আবার অন্যদিকে দেখো, কাম থেকে তাঁর সৃষ্টি-লীলা চলছে।

দুষ্ট লোকেরও দরকার আছে! একটি তালুকের প্রজারা বড়ই দুর্দান্ত হয়েছিল। তখন গোলক চৌধুরীকে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল। তার নামে প্রজারা কাঁপতে লাগল —এতো কঠোর শাসন। সবই দরকার। সীতা বললেন, রাম! অযোধ্যায় সব যদি অট্টালিকা হতো তো বেশ হতো, অনেক বাড়ি দেখছি ভাঙ্গা, পুরানো। রাম বললেন, সীতা! সব বাড়ি সুন্দর থাকলে মিস্ত্রীরা কি করবে ? ঈশ্বর সব

রকম করেছেন—ভাল গাছ, বিষ গাছ, আবার আগাছাও করেছেন। জানোয়ারদের ভিতর ভাল মন্দ সব আছে।

ঢ় হও। একটাতে দৃঢ় হও, হয় সাকারে নয় নিরাকারে। তবে ঈশ্বরলাভ হয়, নচেৎ না। দৃঢ় হলে সাকারবাদীও ঈশ্বরলাভ করবে, নিরাকারবাদীও করবে। মিছরীর রুটি সিধে করে খাও, আর আড় করে খাও, মিষ্টি লাগবে।

কিন্তু দৃঢ় হতে হবে ; ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকতে হবে। বিষয়ীর ঈশ্বর কিরূপ জান ? যেমন খুড়ী-জেঠীর কোঁদল শুনে ছেলেরা খেলা করবার সময় পরস্পর বলে, 'আমার ঈশ্বরের দিব্য।' আর যেমন কোন ফিট বাবু, পান চিবুতে চিবুতে হাতে স্টিক ধরে বাগানে বেড়াতে বেড়াতে একটি ফুল তুলে বন্ধুকে বলে—ঈশ্বর কি বিউটিফুল ফুল করেছেন। কিন্তু এ বিষয়ীর ভাব ক্ষণিক, যেন তপ্ত লোহার উপর জলের ছিটে।

একটার উপর দৃঢ় হতে হবে। ডুব দাও। না দিলে সমুদ্রের ভিতর রত্ন পাওয়া যায় না। জলের উপর কেবল ভাসলে পাওয়া যায় না।

[সাকার নিরাকার স্বন্দ্ব দেখ।]

দেবেন্দ্র ঠাকুর। ও যা ভোগ করেছে, অমন কে করেছে।—যখন সেজোবাবুর সঙ্গে ওর বাড়ীতে গেলাম, দেখলাম, ছোট ছোট ছেলে অনেক—ডাক্তার এসেছে, ঔষধ লিখে দিচ্ছে। যার আট ছেলে আবার মেয়ে, সে ঈশ্বর-চিন্তা করবে না তো কে করবে, এত ঐশ্বর্য ভোগ করার পর যদি ঈশ্বরচিন্তা না করতো, লোকে বলতো ধিক্!

দ্বারকানাথ ঠাকুরের ধার উনি সব শোধ করেছিলেন।

রেখে দে ও সব কথা। আর জ্বালাস নে। ক্ষমতা থেকেও যে বাপের ধার শোধ করে না, সে কি আর মানুষ ?

তবে সংসারীরা একেবারে ডুবে থাকে, তাদের তুলনায় খুব ভাল—তাদের শিক্ষা হবে।

দেহ ও আত্মা। দেহ আর আত্মা। দেহ হয়েছে আবার যাবে। আত্মার মৃত্যু নাই। যেমন সুপারি। পাকা সুপারি ছাল থেকে আলাদা হয়ে থাকে, কাঁচা বেলায় ফল আলাদা আর ছাল আলাদা করা বড় শক্ত। তাঁকে দর্শন করলে, তাঁকে লাভ করলে, দেহবুদ্ধি যায়। তখন দেহ আলাদা, আত্মা আলাদা বোধ হয়।

দ্রঃ 'মায়া'

দেহ ও দেহী। বালিশ ও তার খোলটা—দেহী ও দেহ। ঠাকুর কি বলিতেছেন যে দেহ বিনশ্বর, থাকিবে না ? দেহের ভিতর যিনি দেহী তিনিই অবিনাশী, অতএব দেহের ফটোগ্রাফ লইয়া কি হইবে ? দেহ অনিত্য জিনিস, এর আদর করে কি হবে ? বরং যে ভগবান অন্তর্যামী মানুষের হৃদয়মধ্যে বিরাজ করিতেছেন তাঁহারই পূজা করা উচিত।

দেহত্যাগের আগে। দেহত্যাগের আগে যদি কেউ ঈশ্বরের সাধন করে, আর সাধন করতে করতে ঈশ্বরকে ডাকতে ডাকতে, যদি দেহত্যাগ হয়, তাকে আর পাপ কখন স্পর্শ করবে ? হাতীর স্বভাব বটে, নাইয়ে দেওয়ার পরেও আবার ধুলো-

কাদা মাখে ; কিন্তু মাহুত নাইয়ে দিয়ে যদি আস্তাবলে তাকে ঢুকিয়ে দিতে পারে, তা হলে আর ধুলো-কাদা মাখতে পায় না ।

দেহ ধারণের ধর্ম । সুখ দুঃখ দেহ ধারণের ধর্ম । কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে আছে যে, কালুবীর জেলে গিছিল, তার বুকে পাষাণ দিয়ে রেখেছিল । কিন্তু কালুবীর ভগবতীর বরপুত্র । দেহ ধারণ করলেই সুখ দুঃখ ভোগ আছে । শ্রীমন্ত বড় ভক্ত । আর তার মা খুল্লনাকে ভগবতী কত ভালবাসতেন, সেই শ্রীমন্তের কত বিপদ । মশানে কাটতে নিয়ে গিছিলো । একজন কাঠুরে, পরম ভক্ত, ভগবতীর দর্শন পেলে, তিনি কত ভালবাসলেন, কত কৃপা করলেন । কিন্তু তার কাঠুরের কাজ আর ঘুচলো না । সেই কাঠ কেটে আবার খেতে হবে । কারাগারে চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রগদাধারী ভগবান দেবকীর দর্শন হ'ল, কিন্তু কারাগার ঘুচল না ।

দেহাত্ম বুদ্ধি । যতক্ষণ বিষয়াসক্তি থাকে, কামিনী-কাঞ্চনে ভালবাসা থাকে ততক্ষণ দেহবুদ্ধি যায় না । বিষয়াসক্তি যত কমে ততই আত্মজ্ঞানের দিকে চলে যেতে পারা যায়, আর দেহবুদ্ধি কমে । বিষয়াসক্তি একেবারে চলে গেলে আত্মজ্ঞান হয়, তখন আত্মা আলাদা আর দেহ আলাদা বোধ হয় । নারিকেলের জল না শুকুলে দা দিয়ে কেটে শাঁস আলাদা মালা আলাদা করা কঠিন হয় । জল যদি শুকিয়ে যায়, তা হলে নড় নড় করে, শাঁস আলাদা হয়ে যায় । একে বলে খ'ড়ো নারিকেল ।

ঈশ্বর লাভ হলে লক্ষণ এই যে, সে ব্যক্তি খ'ড়ো নারিকেলের মতো হয়ে যায়—দেহাত্মবুদ্ধি চলে যায় । দেহের সুখ-দুঃখে তার সুখ-দুঃখ বোধ হয় না, সে ব্যক্তি দেহের সুখ চায় না । সে জীবন্মুক্ত হয়ে বেড়ায় ।

ধনী । ক. টাকার অহঙ্কার দ্রষ্টব্য ।

ধনীর ঘরে ভক্ত । তোমাদের ধন ঐশ্বর্য আছে অথচ ঈশ্বরকে ডাকছো, এ খুব ভাল । গীতায় আছে যারা যোগভ্রষ্ট তারাই ভক্ত হয়ে ধনীর ঘরে জন্মায় ।

ধনের অহংকার । 'টাকার অহংকার' দ্রষ্টব্য ।

ধন্য ও ধিক্ । শূকরমাংস খেয়ে যদি ঈশ্বরে টান থাকে, সে লোক ধন্য । আর হবিষ্য করে যদি কামিনী-কাঞ্চনে মন থাকে, তাহলে সে ধিক্ । আমি জানি যে, যদি কেহ পর্বতের গুহায় বাস করে, গায়ে ছাই মাখে, উপবাস করে, নানা কঠোর করে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে বিষয়ে মন—কামিনী কাঞ্চনে মন, সে লোককে আমি বলি ধিক্ । আর যার কামিনী-কাঞ্চনে মন নাই—খায় দায় বেড়ায়, তাকে বলি ধন্য । লোক হাজার তপ জপ করুক ; যদি বিষয়বুদ্ধি থাকে, তাহলে কিছুই হবে না । আর শূকরমাংস খেয়ে যদি ঈশ্বরে মন থাকে, সে ব্যক্তি ধন্য । তার ক্রমে ঈশ্বর লাভ হবেই ।

ধর্ম : সনাতন ও আধুনিক । ঋষিদের ধর্ম সনাতন ধর্ম, অনন্তকাল আছে ও থাকবে । এই সনাতন ধর্মের ভিতর নিরাকার সাকার সব রকম পূজা আছে ; জ্ঞানপথ ভক্তিপথ সব আছে । অন্যান্য যে সব ধর্ম আধুনিক ধর্ম, কিছুদিন থাকবে আবার যাবে ।

ধর্মদ্বন্দ্ব। ক. শ্রীমদ্ভাগবত—তাতেও নাকি ঐ রকম কথা আছে, 'কেশবমন্ত্র না নিয়ে ভবসাগর পার হওয়াও যা, আর কুকুরের ল্যাজ ধরে মহাসমুদ্র পার হওয়াও তা।' সব মতের লোকেরা আপনার মতটাই বড় করে গেছে।

শাক্তেরাও বৈষ্ণবদের খাটো করবার চেষ্টা করে। শ্রীকৃষ্ণ ভবনদীর কাণ্ডারী, পার ক'রে দেন—শাক্তেরা বলে, 'তা তো বটেই, মা রাজরাজেশ্বরী—তিনি কি আপনি এসে পার করবেন ?—ঐ কৃষ্ণকেই রেখে দিয়েছেন পার করবার জন্য।'

খ. 'আমারই ধর্ম ঠিক, আর সকলের মিথ্যা' এ ভাব ভাল নয়।

আমি দেখি তিনিই সব হ'য়ে রয়েছেন—মানুষ, প্রতিমা, শালগ্রাম সকলের ভিতরেই এক দেখি। এক ছাড়া দুই আমি দেখি না।

অনেকে মনে করে আমাদের মত ঠিক, আর সব ভুল—আমরা জিতেছি আর সব হেরেছে। কিন্তু যে এগিয়ে এসেছে সে হয়ত, একটুর জন্য আটকে গেল। পেছনে যে পড়েছিল সে তখন এগিয়ে গেল। গোলকধাম খেলায়, অনেক এগিয়ে এসে, পোয়া (ঘুঁটি) আর পড়ল না।

হার জিত তাঁর হাতে। তাঁর কার্য কিছু বোঝা যায় না। দেখ না, ডাব অত উঁচুতে থাকে, রোদ পায়, তবু ঠাণ্ডা শক্তি।—এদিকে পাণিফল জলে থাকে—গরম গুণ।

মানুষের শরীর দেখ। যেটা মূল (গোড়া), সেটা উপরে চলে গেল।

ধর্ম-বিদ্বেষ। ক. তবে এটা ভাল না—এই বলা যে আমরা যা বুঝেছি তাই ঠিক, আর যে যা বলছে সব ভুল। আমরা নিরাকার বলছি, অতএব তিনি নিরাকার, তিনি সাকার নন। আমরা সাকার বলছি, অতএব তিনি সাকার, নিরাকার নন। মানুষ কি তাঁর ইতি করতে পারে ?

এই রকম বৈষ্ণব শাক্তদের ভিতর রেষারেষি। বৈষ্ণব বলে, আমার কেশব, শাক্ত বলে, আমার ভগবতী, একমাত্র উদ্ধারকর্তা।

আমি বৈষ্ণবচরণকে সেজোবাবুর কাছে নিয়ে গিছলাম। বৈষ্ণবচরণ বৈরাগী খুব পণ্ডিত কিন্তু গোঁড়া বৈষ্ণব। এদিকে সেজোবাবু ভগবতীর ভক্ত। বেশ কথা হচ্ছিল, বৈষ্ণবচরণ ব'লে ফেললে, মুক্তি দেবার একমাত্র কর্তা কেশব। বলতেই সেজোবাবুর মুখ লাল হ'য়ে গেল। বলেছিল, 'শালা আমার!' (সকলের হাস্য)। শাক্ত কি না। বলবে না ? আমি আবার বৈষ্ণবচরণের গা টিপি।

যত লোক দেখি, ধর্ম ধর্ম ক'রে—এ ওর সঙ্গে ঝগড়া করছে ও এর সঙ্গে ঝগড়া করছে। হিন্দু, মুসলমান, ব্রহ্মজ্ঞানী, শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব ; সব পরস্পর ঝগড়া। এ বুদ্ধি নাই যে, যাঁকে কৃষ্ণ বলছো, তাঁকেই শিব, তাঁকেই আদ্যাশক্তি বলা হয় ; তাঁকেই আল্লা বলা হয়। এক রাম তাঁর হাজার নাম।

বস্তু এক, নাম আলাদা। সকলেই এক জিনিসকে চাচ্চে। তবে আলাদা জায়গা, আলাদা পাত্র, আলাদা নাম। একটা পুকুরে অনেকগুলি ঘাট আছে ; হিন্দুরা এক ঘাট থেকে জল নিচ্চে, কলসী ক'রে—বলছে 'জল'। মুসলমানরা আর এক ঘাট থেকে জল নিচ্চে, চামড়ার ডোলে ক'রে—তারা ব'লছে 'পানী'। খৃষ্টানরা আর এক ঘাটে জল নিচ্চে—তারা বলছে 'ওয়াটার'।

যদি কেউ বলে, না জিনিসটা জল নয়, পানী; কি পানী নয়, ওয়াটার; কি ওয়াটার নয়, জল; তা হলে হাসির কথা হয়। তাই দলাদলি, মনান্তর, ঝগড়া, ধর্ম নিয়ে লাটালাটি, মারামারি,কাটাকাটি; এ সব ভাল নয়। সকলেই তাঁর পথে যাচ্চে, আন্তরিক হ'লেই ব্যাকুল হ'লেই তাঁকে লাভ করবে।

খ. বিদ্বেষভাব ভাল নয়—শাক্ত, বৈষ্ণব, বৈদান্তিক এরা ঝগড়া করে, সেটা ভাল নয়। পদ্মলোচন বর্ধমানের সভাপণ্ডিত ছিল; সভায় বিচার হচ্ছিল—শিব বড় না ব্রহ্মা বড়। পদ্মলোচন বেশ বলেছিল—আমি জানি না, আমার সঙ্গে শিবেরও আলাপ নেই, ব্রহ্মারও আলাপ নেই।

ধর্মমতের ভিন্নত্ব ও অভিন্নত্ব। কি জান? দেশ-কাল-পাত্র ভেদে ঈশ্বর নানা ধর্ম করেছেন। কিন্তু সব মতই পথ, মত কিছু ঈশ্বর নয়। তবে আন্তরিক ভক্তি ক'রে একটা মত আশ্রয় ক'ল্লে তাঁর কাছে পেঁছান যায়। যদি কোন মত আশ্রয় ক'রে তাতে ভুল থাকে, আন্তরিক হ'লে তিনি সে ভুল শুধরিয়ে দেন। যদি কেউ আন্তরিক জগন্নাথ দর্শনে বেরোয়, আর ভুলে দক্ষিণদিকে না গিয়ে উত্তর দিকে যায়, তা'হলে অবশ্য পথে কেউ ব'লে দেয়—ওহে,ওদিকে যেও না, দক্ষিণ-দিকে যাও। সে ব্যক্তি কখনও না কখন জগন্নাথ দর্শন ক'রবে।

তবে অন্যের মতো ভুল হ'য়েছে,এ কথা আমাদের দরকার নাই। যাঁর জগৎ,তিনি ভাবছেন। আমাদের কর্তব্য, কিসে যো সো ক'রে জগন্নাথ দর্শন হয়।

ধর্ম-সমন্বয়। যে সমন্বয় ক'রেছে, সেই-ই লোক। অনেকেই একঘেয়ে। আমি কিন্তু দেখি—সব এক। শাক্ত, বৈষ্ণব, বেদান্ত মত সবই সেই এককে ল'য়ে। যিনিই নিরাকার, তিনিই সাকার, তাঁরই নানা রূপ।

বেদে যাঁর কথা আছে, তন্ত্রে তাঁরই কথা, পুরাণেও তাঁরই কথা। সেই এক সচ্চিদা-নন্দের কথা। যাঁরই নিত্য, তাঁরই লীলা।

বেদে বলেছে, ওঁ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। তন্ত্রে বলেছে, ওঁ সচ্চিদানন্দ শিবঃ—শিবঃ কেবলঃ—কেবলঃ শিবঃ। পুরাণে বলেছে, ওঁ সচ্চিদানন্দঃ কৃষ্ণঃ। সেই এক সচ্চিদানন্দের কথাই বেদ পুরাণ তন্ত্রে আছে। আর বৈষ্ণবশাস্ত্রেও আছে—কৃষ্ণই কালী হয়েছিলেন।

খ. হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, ঋষিদের কালের ব্রহ্মজ্ঞানী ও ইদানীং ব্রহ্মজ্ঞানী তোমরা—সকলেই এক বস্তুকে চাইছো। তবে যার যা পেটে সয়, মা সেইরূপ ব্যবস্থা ক'রেছেন। মা যদি বাড়ীতে মাছ আনেন, আর পাঁচটি ছেলে থাকে, সকলকেই পোলাও কালিয়া ক'রে দেন না। সকলের পেট সমান নয়। কারু জন্য মাছের ঝোলের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু মা সকলকেই সমান ভালবাসেন।

আমার ভাব কি জান? আমি মাছ সব রকম খেতে ভালবাসি। আমার মেয়েলি স্বভাব। আমি মাছ ভাজা, হলুদ দিয়ে মাছ, টকের মাছ, বাটি-চচ্চড়ি, এ সব তাতেই আছি। আবার মুড়িঘন্টোতেও আছি, কালিয়া পোলোয়াতেও আছি।

ধর্মাধর্ম। ক. ধর্মাধর্ম কি জান? এখানে 'ধর্ম' মানে বৈধীধর্ম। যেমন দান কর্তে হবে, শ্রাদ্ধ, কাঙ্গালীভোজন এই সব।

এই ধর্মকেই বলে কর্মকান্ড। এ পথ বড় কঠিন। নিষ্কামকর্ম করা বড় কঠিন। তাই ভক্তিপথ আশ্রয় ক'র্তে বলেছে।

একজন বাড়ীতে শ্রাদ্ধ ক'রেছিল। অনেক লোকজন খাচ্ছিল। একটা কসাই গরু নিয়ে যাচ্ছে, কাটবে বলে। গরু বাগ মানছিল না —কসাই হাঁপিয়ে পড়েছিল। তখন সে ভাবলে শ্রাদ্ধবাড়ী গিয়ে খাই। খেয়ে গায়ে জোর করি, তারপর গরুটাকে নিয়ে যাব। শেষে তাই ক'ল্লে, কিন্তু যখন সে গরু কাটলে তখন যে শ্রাদ্ধ করেছিল, তারও গো-হত্যার পাপ হ'লো।

তাই বলছি, কর্মকান্ডের চেয়ে ভক্তিপথ ভাল।

খ. ধর্ম কি না দানাদি কর্ম। ধর্ম নিলেই অধর্ম ল'তে হবে। পুণ্য নিলেই পাপ ল'তে হবে। জ্ঞান নিলেই অজ্ঞান ল'তে হবে। শুচি নিলেই অশুচি ল'তে হবে। যেমন যার আলো বোধ আছে, তার অন্ধকার বোধও আছে। যার এক বোধ আছে, তার অনেক বোধও আছে। যার ভাল বোধ আছে, তার মন্দ বোধও আছে।

যদি কারও শূকের মাংস খেয়ে ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তি থাকে, সে পুরুষ ধন্য, আর হবিষ্য খেয়ে যদি সংসারে আসক্তি থাকে—

ধর্মাধর্ম ত্যাগ ক'রলে কি বাকী থাকে? শুদ্ধা ভক্তি। আমি মাকে বলেছিলাম, মা! এই লও তোমার ধর্ম, এই লও তোমার অধর্ম, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও; এই লও তোমার পুণ্য, এই লও তোমার পাপ, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও; এই লও তোমার জ্ঞান, এই লও তোমার অজ্ঞান, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। দেখ, জ্ঞান পর্যন্ত আমি চাই নাই। আমি লোকমান্যও চাই নাই। ধর্মাধর্ম ছাড়লে শুদ্ধা ভক্তি—অমলা, নিষ্কামা, অহৈতুকী ভক্তি—বাকী থাকে।

ধৈর্য ও সাধনা। ওরে কালে হবে কালে বুঝবি। বীচিটা পুঁতলেই কি অমনি ফল পাওয়া যায়? আগে অংকুর হবে, তারপর চারা গাছ হবে, তারপর সেই গাছ বড় হয়ে তাতে ফুল ধরবে, তারপর ফল—সেই রকম। তবে লেগে থাকতে হবে, ছাড়লে হবে না। তাঁর সেবা, বন্দনা ও অধীনতা কি না দীনভাব এই নিয়ে বিশ্বাস করে পড়ে থাকতে থাকতে সব হবে, তাঁর দর্শন পাওয়া যাবেই যাবে। তা না করে ছেড়ে দিলে কিন্তু ঐ পর্যন্তই হ'ল।

ধর্মের গতি। ধর্মের সূক্ষ্ম গতি। একটু কামনা থাকলে ভগবানকে পাওয়া যায় না। ছুঁচের ভিতর সুতো যাওয়া, একটু রোঁ থাকলে হয় না।

কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন, ভাই আমাকে যদি লাভ করতে চাও, তা হ'লে অষ্ট-সিদ্ধির একটা সিদ্ধি থাকলে হবে না।

ধ্যান। তাঁকে ধ্যান করতে হলে, প্রথমে উপাধি শূন্য তাঁকে ধ্যান করবার চেষ্টা করা উচিত। তিনি নিরুপাধি, বাক্যমনের অতীত। কিন্তু এ ধ্যানে সিদ্ধ হওয়া বড় কঠিন।

তিনি মানুষে অবতীর্ণ হন, তখন ধ্যানের খুব সুবিধা। মানুষের ভিতরে নারায়ণ। দেহটি আবরণ, যেন লণ্ঠনের ভিতরে আলো জ্বলছে। অথবা শার্সির ভিতর বহুমূল্য জিনিস দেখছি।

ধ্যান গভীর হলে। গভীর ধ্যানে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়। একজন ব্যাধ পাখী মারবার জন্য তাগ্ করছে—কাছ দিয়ে বর চলে যাচ্ছে, সঙ্গে বরযাত্রীরা, কত রোশনাই, বাজনা, গাড়ি, ঘোড়া—কতক্ষণ ধরে কাছ দিয়ে চলে গেল। ব্যাধের কিন্তু হুঁশ নাই। সে জানতে পারলো না যে কাছ দিয়ে বর চলে গেল।

একজন একলা একটি পুকুরের ধারে মাছ ধরছে। অনেকক্ষণ পরে ফাতনাটা নড়তে লাগল, মাঝে মাঝে কাত হতে লাগল। সে তখন ছিপ হাতে করে টান মারবার উদ্যোগ করছে। এমন সময় একজন পথিক কাছে এসে জিজ্ঞাসা করছে, মহাশয়, অমুক বাঁড়ুয্যেদের বাড়ি কোথায় বলতে পারেন? কোন উত্তর নাই। এ ব্যক্তি তখন ছিপ হাতে করে টান মারবার উদ্যোগ করছে। পথিক বার বার উচ্চৈঃস্বরে বলতে লাগল, মহাশয়, অমুক বাঁড়ুয্যেদের বাড়ি কোথায় বলতে পারেন? সে ব্যক্তির হুঁশ নাই। তাঁর হাত কাঁপছে, কেবল ফাতনার দিকে দৃষ্টি। তখন পথিক বিরক্ত হয়ে চলে গেল। সে অনেক দূরে চলে গেছে, এমন সময় ফাতনাটা ডুবে গেল, আর ও ব্যক্তি টান মেরে মাছটাকে আড়ায় তুললে। তখন গামছা দিয়ে মুখ পুঁছে, চীৎকার করে পথিককে ডাকছে—ওহে, শোনো—শোনো! পথিক ফিরতে চায় না, অনেক ডাকাডাকির পর ফিরল। এসে বলছে, কেন মহাশয়, আবার ডাকছ কেন? তখন সে বললে, তুমি আমায় কি বলছিলে? পথিক বললে, তখন অতবার করে জিজ্ঞাসা করলুম—আর এখন বলছো কি বললে! সে বললে, তখন যে ফাতনা ডুবছিল, তাই আমি কিছুই শুনতে পাই নাই।

ধ্যানে এইরূপ একাগ্রতা হয়, অন্য কিছু দেখা যায় না, শোনাও যায় না। স্পর্শ-বোধ পর্যন্ত হয় না। সাপ গায়ের উপর দিয়ে চলে যায়, জানতে পারে না। যে ধ্যান করে সেও বুঝতে পারে না—সাপটাও জানতে পারে না।

গভীর ধ্যানে ইন্দ্রিয়ের সব কাজ বন্ধ হয়ে যায়। মন বহির্মুখ থাকে না—যেন বার বাড়িতে কপাট পড়লো। ইন্দ্রিয়ের পাঁচটি বিষয়—রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ বাইরে পড়ে থাকবে।

ধ্যান : চোখ চেয়ে, কথা বলে। চক্ষু চেয়েও ধ্যান হয়। কথা হচ্ছে, তবুও ধ্যান হয়। যেমন মনে কর, একজনের দাঁতের ব্যামো আছে, কন্ কন্ করে।—

হ্যাঁগো, দাঁতের ব্যামো যদি থাকে, সব কর্ম করছে, কিন্তু দরদের দিকে মনটা আছে। তা হলে ধ্যান চোখ চেয়েও হয়, কথা কইতে কইতেও হয়।

ধ্যান সঠিক হওয়ার লক্ষণ। ধ্যান যে ঠিক হচ্ছে, তার লক্ষণ আছে। একটি লক্ষণ—মাথায় পাখী বসবে জড় মনে করে।

ধ্যানের স্থান। হৃদয় ডঙ্কাপেটা জায়গা। হৃদয়ে ধ্যান হতে পারে, অথবা সহস্রারে, এগুলি আইনের ধ্যান—শাস্ত্রে আছে। তবে তোমার যেখানে অভিরুচি ধ্যান করতে পার। সব স্থানই তো ব্রহ্মময়; কোথায় তিনি নাই?

যখন বলির কাছে তিন পায় নারায়ণ স্বর্গ মর্ত্য পাতাল ঢেকে ফেললেন, তখন কি কোন স্থান বাকী ছিল? গঙ্গাতীরও যেমন পবিত্র আবার যেখানে খারাপ মাটি আছে সে-ও তেমনি পবিত্র। আবার আছে, এ সমস্ত তাঁরই বিরাটমূর্তি।

ধ্যানের প্রকার। নিরাকার ধ্যান ও সাকার ধ্যান। নিরাকার ধ্যান বড় কঠিন। সে ধ্যানে যা কিছু দেখছ, শুনছ—লীন হয়ে যাবে ; কেবল স্ব-স্বরূপ চিন্তা করে শিব নাচেন। 'আমি কি' 'আমি কি', এই বলে নাচেন।

একে বলে শিবযোগ। ধ্যানের সময় কপালে দৃষ্টি রাখতে হয়। 'নেতি' 'নেতি' করে জগৎ ছেড়ে স্ব-স্বরূপ চিন্তা।

আর এক আছে বিষ্ণুযোগ। নাসাগ্রে দৃষ্টি ; অর্ধেক জগতে, অর্ধেক অন্তরে। সাকার ধ্যানে এইরূপ হয়।

শিব কখন কখন সাকার চিন্তা করে নাচেন। 'রাম, রাম' বলে নাচেন।

ধ্রুব। দ্রঃ ভক্তি (সকাম ও নিষ্কাম)।

নন্দ ঘোষ। 'সরলতা' দ্রষ্টব্য।

নমস্কার। নমস্কার মানসেই ভাল। পায়ে হাত দিয়ে নমস্কারে কি দরকার। আর মানসে নমস্কার করলে কেউ কুণ্ঠিত হবে না।

নরলীলায়। নরলীলায় অবতারকে ঠিক মানুষের মতো আচরণ করতে হয়, তাই চিনতে পারা কঠিন। মানুষ হয়েছেন ত ঠিক মানুষ। সেই ক্ষুধা-তৃষ্ণা, রোগ-শোক, কখন বা ভয় ঠিক মানুষের মতো। রামচন্দ্র সীতার শোকে কাতর হয়েছিলেন। গোপাল নন্দের জুতো মাথায় করে নিয়ে গিছলেন—পিঁড়ে বয়ে নিয়ে গিছলেন।

থিয়েটারে সাধু সাজে, সাধুর মতো ব্যবহার করবে—যে রাজা সেজেছে তার মতো ব্যবহার করবে না। যা সেজেছে তাই অভিনয় করবে।

একজন বহুরূপী সেজেছে, 'ত্যাগী সাধু'। সাজটি ঠিক হয়েছে দেখে বাবুরা একটি টাকা দিতে গেল। সে নিলে না, উঁহু করে চলে গেল। গা-হাত-পা ধুয়ে যখন সহজ বেশে এলো, তখন বল্লে, 'টাকা দাও'। বাবুরা বল্লে, 'এই তুমি টাকা নেবো না বলে চলে গেলে, আবার টাকা চাইছ ?' সে বল্লে, 'তখন সাধু সেজেছি, টাকা নিতে নাই।'

তেমনি ঈশ্বর, যখন মানুষ হন, ঠিক মানুষের মতো ব্যবহার করেন।

বৃন্দাবনে গেলে অনেক লীলার স্থান দেখা যায়।

নরেন্দ্র। ক. দেখ, চাষারা হাটে গরু কিনতে যায় ; তারা ভাল গরু, মন্দ গরু বেশ চেনে। ল্যাজের নীচে হাত দিয়ে দেখে। কোনও গরু ল্যাজে হাত দিলে শুয়ে পড়ে, সে গরু কেনে না। যে গরু ল্যাজে হাত দিলে তিড়িং-মিড়িং করে লাফিয়ে উঠে সেই গরুকেই পছন্দ করে। নরেন্দ্র সেই গরুর জাত ; ভিতরে খুব তেজ।

দ্রঃ ঈশ্বরের ঐশ্বর্য বর্ণনা।

খ. দেখ, তার যেমন বিদ্যে তেমনি বুদ্ধি। আবার গাইতে বাজাতে। এদিকে জিতেন্দ্রিয়, বলছে বিয়ে করবে না।

গ. নরেন্দ্রের খুব উঁচু ঘর—নিরাকারের ঘর। পুরুষের সত্তা। এত ভক্ত আসছে, ওর মতো একটিও নাই।

এক একবার বসে বসে আমি খতাই। তা দেখি, অন্য পদ্ম কারুর দশদল, কারুর ষোড়শদল, কারুর শতদল কিন্তু পদ্মমধ্যে নরেন্দ্র সহস্রদল।
অন্যেরা কলসী, ঘটি এ সব হতে পারে ; নরেন্দ্র জালা।
ডোবা পুষ্করিণীর মধ্যে নরেন্দ্র বড় দীঘি। যেমন হালদার পুকুর।
মাছের মধ্যে নরেন্দ্র রাঙ্গাচক্ষু বড় রুই, আর সব নানারকম মাছ—পোনা কাঠি-বাটা এই সব।
খুব আধার—অনেক জিনিস ধরে। বড় ফুটোওলা বাঁশ।
নরেন্দ্র কিছুর বশ নয়। আসক্তি, ইন্দ্রিয়সুখের বশ নয়। পুরুষ পায়রা! পুরুষ পায়রার ঠোঁট ধরলে ঠোঁট টেনে ছিনিয়ে লয় —মাদী পায়রা চুপ করে থাকে।
ঘ. এই ছেলেটিকে দেখছো এখানে একরকম। দুরন্ত ছেলে, বাবার কাছে যখন বসে, যেন জুজুটি। আবার চাঁদনীতে যখন খেলে, তখন আর এক মূর্তি। এরা নিত্যসিদ্ধের থাক। এরা সংসারে কখন বদ্ধ হয় না। একটু বয়স হলেই চৈতন্য হয়, আর ভগবানের দিকে চলে যায়। এরা সংসারে আসে জীব-শিক্ষার জন্য। এদের সংসারের বস্তু কিছু ভাল লাগে না—এরা কামিনী-কাঞ্চনে কখনও আসক্ত হয় না।
বেদে আছে হোমা পাখির কথা। খুব উঁচু আকাশে সে পাখি থাকে। সেই আকাশেই ডিম পাড়ে। ডিম পাড়লেই ডিমটা পড়তে থাকে। ডিম পড়তে পড়তে ফুটে যায়। তখন ছানাটা পড়তে থাকে। পড়তে পড়তে তার চোখ ফোটে আর ডানা বেরোয়। চোখ ফুটলেই দেখতে পায় যে, সে পড়ে যাচ্চে, আর শরীর মাটিতে লাগলে একবারে চুরমার হয়ে যাবে। তখন সে পাখি মা'র দিকে, উর্ধ্ব-দিকে, চোঁচা দৌড় দেয়, আর উঁচুতে উঠে যায়।
ঙ. দেখ না, নরেন্দ্র কাহাকেও কেয়ার (গ্রাহ্য) করে না। আমার সঙ্গে কাপ্তেনের গাড়ীতে যাচ্ছিল—কাপ্তেন ভাল জায়গায় ব'সতে বললে —তা চেয়েও দেখলে না। আমারই অপেক্ষা রাখে না! আবার যা জানে, তাও বলে না—পাছে আমি লোকের কাছে বলে বেড়াই খুব, নরেন্দ্র এত বিদ্বান। মায়ামোহ নাই।—যেন কোন বন্ধন নাই! খুব ভাল আধার। একাধারে অনেক গুণ ; গাইতে বাজাতে, লিখতে, পড়তে! এদিকে জিতেন্দ্রিয়,—ব'লেছে বিয়ে করবে না। নরেন্দ্র বেশী আসে না। সে ভাল। বেশী এলে আমি বিহ্বল হই।
চ. নরেন্দ্রের সঙ্গে প্রথম দেখা হলো। দেখলুম, দেহ-বুদ্ধি নাই। একটু বুকে হাত দিতেই বাহ্যশূন্য হয়ে গেল। হুঁশ হ'লে বলে উঠলো, 'ওগো, তুমি আমার কি করলে? আমার যে মা-বাপ আছে!' যদু মল্লিকের বাড়ীতেও ঠিক ঐ রকম হয়েছিল। ক্রমে তাকে দেখবার জন্য ব্যাকুলতা বাড়তে লাগলো, প্রাণ আটু-পাটু করতে লাগলো। তখন ভোলানাথকে* বললুম হ্যাঁগা, আমার মন এমন হচ্ছে কেন? নরেন্দ্র বলে একটি কায়েতের ছেলে, তার জন্য এমন হচ্ছে কেন? ভোলানাথ বললে, 'এর মানে ভারতে আছে। সমাধিস্থ লোকের মন যখন নীচে আসে, সত্ত্বগুণী লোকের সঙ্গে বিলাস করে। সত্ত্বগুণী লোক দেখলে তবে তার মন ঠান্ডা হয়।' এই কথা শুনে তবে আমার মনের শান্তি হ'ল। মাঝে মাঝে

নরেন্দ্রকে দেখবো বলে বসে বসে কাঁদতুম।'
['ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, ঠাকুরবাড়ীর মুহুরী, পরে খাজাঞ্চী হয়েছিলেন।]
ওর মদ্দের ভাব (পুরুষ ভাব) আর আমার মেদীভাব (প্রকৃতিভাব)। নরেন্দ্রের উঁচুঘর, অখণ্ডের ঘর।

'নরেন্দ্র রাখাল', 'নরেন্দ্র', তুককরা, 'ঈশ্বর রসের সাগর', 'সচ্চিদানন্দ সাগর'।
দ্র. নরেন্দ্র খুব ভাল; গাইতে বাজাতে, পড়া-শুনোয় বিদ্যায়; এদিকে জিতেন্দ্রিয়, বিবেক বৈরাগ্য আছে, সত্যবাদী। অনেক গুণ।
আত্মকথা : ঈশ্বরের রূপ, নরেন্দ্র সাক্ষাৎ।

রাখাল (বিবেকানন্দ ব্রহ্মানন্দ)। নরেন্দ্র, রাখাল-টাখাল এই সব ছোকরা, এরা নিত্য-সিদ্ধ, এরা জন্মে জন্মে ঈশ্বরের ভক্ত। অনেকের সাধ্যসাধনা করে একটু ভক্তি হয়, এদের কিন্তু আজন্ম ঈশ্বরে ভালবাসা। যেন পাতাল ফোঁড়া শিব—বসানো শিব নয়।
নিত্যসিদ্ধ একটি থাক আলাদা। সব পাখির ঠোঁট বাঁকা নয়। এরা কখনও সংসারে আসক্ত হয় না। যেমন প্রহ্লাদ।

নষ্ট স্ত্রীর মতো। তোমরা মুমুক্ষু, ব্যাকুলতা থাকলেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। শ্রাদ্ধের অন্ন খেও না। সংসারে নষ্ট স্ত্রীর মতো থাকবে। নষ্ট স্ত্রী বাড়ির সব কাজ যেন খুব মন দিয়ে করে, কিন্তু তার মন উপপতির উপর রাত-দিন পড়ে থাকে। সংসারের কাজ করো, কিন্তু মন সর্বদা ঈশ্বরের উপর রাখবে।
দ্রঃ সংসারে থাকতে হলে।

নাটক দেখা। দ্রঃ পুত্রপ্রীতি।

নানকপন্থী। কাশীতে নানকপন্থী ছোকরা সাধু দেখেছিলাম। তার উমের তোমার মতো। আমায় বলতো 'প্রেমী সাধু'। কাশীতে তাদের মঠ আছে; এক-দিন আমায় সেখানে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গেল। মোহন্তকে দেখলুম, যেন একটি গিন্নী। তাকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'উপায় কি?' সে বললে, কলিযুগে নারদীয় ভক্তি পাঠ কচ্ছিল। পাঠ শেষ হলে বলতে লাগলো—'জলে বিষ্ণুঃ স্থলে বিষ্ণুঃ বিষ্ণুঃ পর্বতমস্তকে। সর্বম্ বিষ্ণুময়ং জগৎ।' সব শেষে বললে, শান্তিঃ শান্তিঃ প্রশান্তিঃ।
এক দিন গীতা পাঠ করলে। তা এমনি আঁট, বিষয়ী লোকের দিকে চেয়ে পড়বে না। আমার দিকে চেয়ে পড়লে। সেজোবাবু ছিল। সোজাবাবুর দিকে পেছন ফিরে পড়তে লাগল। সেই নানকপন্থী সাধুটি বলেছিল, উপায় নারদীয় ভক্তি'। ওরা বেদান্তবাদী কিন্তু ভক্তিমার্গও মানে।

নানা পথ। নানা পথ ঈশ্বরের কাছে পেঁীছিবার। মত পথ। যেমন কালীঘরে যেতে নানা পথ দিয়ে যাওয়া যায়। তবে কোনও পথ শুদ্ধ, কোনও পথ নোংরা, শুদ্ধ পথ দিয়ে যাওয়াই ভাল।

অনেক মত—অনেক পথ—দেখলাম। এ সব আর ভাল লাগে না। পরস্পর সব বিবাদ করে। এখানে আর কেউ নাই; তোমরা আপনার লোক, তোমাদের বলছি, শেষে এই বুঝেছি, তিনি পূর্ণ—আমি তাঁর অংশ; তিনি প্রভু—আমি তাঁর

দাস ; আবার এক একবার ভাবি, তিনিই আমি আমিই তিনি।

নামগুণ কীর্তন। তাঁর নামগুণ কীর্তন করলে দেহের সব পাপ পালিয়ে যায়। দেহ-বৃক্ষে পাপ-পাখি, তাঁর নাম-কীর্তন যেন হাততালি দেওয়া। হাততালি দিলে যেমন বৃক্ষের উপরের পাখি সব পালায়, তেমনি সব পাপ তাঁর নাম গুণ-কীর্তনে চলে যায়।

আবার দেখ, মেঠো পুকুরের জল সূর্যের তাপে আপনা আপনি শুকিয়ে যায়। তেমনি তাঁর নাম-গুণ কীর্তনে পাপ-পুষ্করিণীর জল আপনা আপনি শুকিয়ে যায়।

নাম-বীজ। তাঁর নাম বীজের খুব শক্তি। অবিদ্যা নাশ করে। বীজ এত কোমল, অঙ্কুর এত কোমল, তবু শক্ত মাটি ভেদ করে। মাটি ফেটে যায়। সব কাজ ফেলে সন্ধ্যার সময় তোমরা তাঁকে ডাকবে। অন্ধকারে ঈশ্বরকে মনে পড়ে। সব এই দেখা যাচ্ছিল—কে এমন করলে। মুসলমানেরা দ্যাখ, সব কাজ ফেলে ঠিক সময়ে নমাজটি পড়ে। সন্ধ্যা হলে সব কর্ম ছেড়ে হরি স্মরণ করবে। নামেতে রুচি ও বিশ্বাস করতে পারলে তার আর কোন প্রকার বিচার বা সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়, নামেতেই চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়।

দ্রঃ নাম-মাহাত্ম্য।

নাম-মাহাত্ম্য। ক. নামের খুব মাহাত্ম্য আছে বটে। তবে অনুরাগ না থাকলে কি হয় ? ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হওয়া দরকার। শুধু নাম করে যাচ্ছি, কিন্তু কামিনীকাঞ্চনে মন রয়েছে, তাতে কি হয় ? বিছে বা ডাকুয় (মাকড়সা) কামড় অমনি মন্ত্রে সারে না—ঘুঁটের ভাবরা দিতে হয়। হাতিকে নাইয়ে দিলে কি হবে আবার ধুলো কাদা মেখে যে কে সেই। তবে হাতিশালায় ঢোকাবার আগে যদি কেউ ধুলো ঝেড়ে দেয় ও স্নান করিয়ে দেয় তা হলে গা পরিষ্কার থাকে। নামেতে একবার শুদ্ধ হ'ল ; কিন্তু তার পরই হয়ত নানা পাপে লিপ্ত হয়। মনে বল নাই, প্রতিজ্ঞা করে না যে, আর পাপ করব না। গঙ্গা স্নানে পাপ সব যায়। গেলে কি হবে ? লোকে বলে থাকে, পাপগুলো গাছের উপর থাকে। গঙ্গা নেয়ে যখন মানুষটা ফেরে, তখন ঐ পুরনো পাপগুলো গাছ থেকে ঝাঁপ দিয়ে ওর ঘাড়ের উপর পড়ে। স্নান করে দু'পা না আসতে আসতে আবার ঘাড়ে চড়েছে। তাই নাম কর, সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনা কর, যাতে ঈশ্বরেতে অনুরাগ হয়। আর যে সব জিনিস দু'দিনের জন্য, যেমন টাকা, মান, দেহের সুখ, তাদের উপর যাতে ভালবাসা কমে যায়, প্রার্থনা কর।

খ. তাঁর নাম করলে সব পাপ কেটে যায়। কাম, ক্রোধ, শরীরের সুখ-ইচ্ছা, এ সব পালিয়ে যায়। ব্যাকুল হয়ে তাঁকে প্রার্থনা কর, যাতে তাঁর নামে রুচি হয়। তিনিই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন।

গ. ঈশ্বরের নামের ভারী মাহাত্ম্য। শীঘ্র ফল না হতে পারে কিন্তু কখনও না কখনও এর ফল হবেই হবে। যেমন কেউ বাড়ির কার্ণিসের উপর বীজ রেখে গিয়েছিল ; অনেকদিন পরে বাড়ি ভূমিসাৎ হয়ে গেল, তখনও সেই বীজ

মাটিতে পড়ে গাছ হল ও তার ফলও হল।

নামে বিশ্বাস। কৃষ্ণকিশোর পরম হিন্দু, সদাচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ, সে বৃন্দাবনে গিছিল। একদিন ভ্রমণ করতে করতে জলতৃষ্ণা পেয়েছিল। একটা কুয়ার কাছে গিয়ে দেখলে, একজন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাকে বললে, ওরে তুই এক ঘটি জল আমায় দিতে পারিস ? তুই কি জাত। সে বললে, ঠাকুর মহাশয়, আমি হীন জাত ; মুচি। কৃষ্ণকিশোর বললে, তুই বল, শিব। নে, এখন জল তুলে দে।

ভগবানের নাম করলে মানুষের দেহ মন সব শুদ্ধ হয়ে যায়।

কেবল 'পাপ' আর 'নরক' এই সব কথা কেন ? একবার বল যে অন্যায় কর্ম যা করেছি আর করবো না। আর তাঁর নামে বিশ্বাস কর।

নারদীয় ভক্তি। ক. কলিযুগের পক্ষে নারদীয় ভক্তি। শাস্ত্রে যে সকল কর্মের কথা আছে, তার সময় কৈ ? আজকালকার জ্বরে দশমূল পাঁচন চলে না। দশমূল পাঁচন দিতে গেলে রোগীর এদিকে হয়ে যায়। আজকাল ফিবার মিকশ্চার। কর্ম করতে যদি বল—তো নেজামুড়া বাদ দিয়ে বলবে। আমি লোকদের বলি, তোমাদের 'আপোধন্যন্যা' ও সব অত বলতে হবে না। তোমাদের গায়ত্রী জপলেই হবে। কর্মের কথা যদি একান্ত বল তবে ঈশানের মতো কর্মী দুই-একজনকে বলতে পার।

খ. কলিতে নারদীয় ভক্তি—সর্বদা তাঁর নাম গুণ কীর্তন করা। যাদের সময় নাই, তারা যেন সকালে হাততালি দিয়ে একমনে হরিবোল হরিবোল বলে তাঁর ভজনা করে।

ভক্তির আমিতে অহংকার হয় না। অজ্ঞান করে না, বরং ঈশ্বর লাভ করিয়ে দেয়। এ 'আমি' আমির মধ্যে নয়। যেমন হিংচে শাক শাকের মধ্যে নয়, অন্য শাকে অসুখ হয়, কিন্তু হিংচে শাক খেলে পিত্তনাশ হয়, উলটে উপকার হয়, মিছরি মিষ্টির মধ্যে নয়, অন্য মিষ্টি খেলে অপকার হয়, মিছরি খেলে অম্বল নাশ হয়।

দ্রঃ 'কলিতে ভক্তিযোগ'। অনন্তপথ-খ।

নিজে ভাল হলে। যার ঈশ্বরে আন্তরিক ভক্তি আছে, তার সকলেই বশে আসে—রাজা, দুষ্ট লোক, স্ত্রী। নিজের আন্তরিক ভক্তি থাকলে স্ত্রীও ক্রমে ঈশ্বরের পথে যেতে পারে। নিজে ভাল হলে ঈশ্বরের ইচ্ছাতে সেও ভাল হতে পারে।

নারায়ণ শাস্ত্রী। নারায়ণ শাস্ত্রীও শুধু পণ্ডিত নয়, সাধ্য সাধনা করেছিল। নারায়ণ শাস্ত্রী পঁচিশ বৎসর একটানে পড়েছিল। সাত বৎসর ন্যায় পড়েছিল তবুও 'হর, হর' বলতে বলতে ভাব হ'ত। জয়পুরের রাজা সভাপণ্ডিত করতে চেয়েছিল। তা সে কাজ স্বীকার করলে না। দক্ষিণেশ্বরে প্রায় এসে থাকত। বশিষ্ঠাশ্রমে যাবার ভারী ইচ্ছা, সেখানে তপস্যা করবে। যাবার কথা আমাকে প্রায় বলত। আমি তাকে সেখানে যেতে বারণ করলাম।—তখন বলে 'কোন দিন মরে যাব, সাধন কবে করব—ডুবকি কব ফাট যায়গা।' অনেক জেদাজেদির পর আমি যেতে বল্লাম।

শুনতে পাই, কেউ কেউ বলে নারায়ণ শাস্ত্রী নাকি শরীর ত্যাগ করেছে, তপস্যা করবার সময় ভৈরবে নাকি চড় মেরেছিল। আবার কেউ কেউ বলে, বেঁচে আছে—এই আমরা তাকে রেলে তুলে দিয়ে এলাম।

দ্রঃ আত্মকথা : কেশব দর্শন।

নিতাই-এর চাতুরি। সংসারী লোকদের যদি বল যে সব ত্যাগ করে ঈশ্বরের পাদপদ্মে মগ্ন হও, তা তারা কখনও শুনবে না। তাই বিষয়ী লোকদের টানবার জন্য গৌর-নিতাই দুই ভাই মিলে পরামর্শ করে এই ব্যবস্থা করেছিলেন—'মাগুর মাছের ঝোল, যুবতী মেয়ের কোল, বোল হরি বোল।' প্রথম দুইটির লোভে অনেকে হরিবোল বলতে যেতো। হরিনাম-সুধার একটু আস্বাদ পেলে বুঝতে পারতো যে 'মাগুর মাছের ঝোল, আর কিছুই নয়, হরিপ্রেমে যে অশ্রু পড়ে তাই'; যুবতী মেয়ে কি না—পৃথিবী। যুবতী মেয়ের কোল কি না—ধূলায় হরিপ্রেমে গড়াগড়ি।

নিতাই কোন রকমে হরিনাম করিয়ে নিতেন।

নিত্য ও লীলা। আমি সবই লই। তুরীয় আবার জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি। আমি তিন অবস্থাই লই। ব্রহ্ম আবার মায়া, জীব, জগৎ সবই লই। সব না নিলে ওজনে কম পড়ে।

ব্রহ্ম—জীবজগৎবিশিষ্ট। প্রথমে নেতি নেতি করবার সময় জীবজগৎকে ছেড়ে দিতে হয়। অহং বুদ্ধি যতক্ষণ, ততক্ষণ তিনি সব হ'য়েছেন, এই বোধ হয়—তিনিই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন।

বেলের সার বলতে গেলে শাঁসই বুঝায়, তখন বীচি আর খোলা ফেলে দিতে হয়। কিন্তু বেলটা কত ওজনে ছিল বলতে গেলে শুধু শাঁস ওজন করলে হবে না। ওজনের সময় শাঁস, বীচি, খোলা সব নিতে হবে। যারই শাঁস, তারই বীচি, তারই খোলা।

যাঁরই নিত্য, তাঁরই লীলা।

তাই আমি নিত্য, লীলা সবই লই। মায়া ব'লে জগৎ সংসার উড়িয়ে দিই না। তা হ'লে যে ওজনে কম পড়বে।

দ্র. 'ওঙ্কার ধ্বনি'।

নিত্যশুদ্ধবোধরূপম্। তা তোমায় কেমন করে বুঝাবো। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, 'ঘি কেমন খেলে?' তাকে এখন কি ক'রে বুঝাবে? হদ্দ বলতে পার 'কেমন ঘি না যেমন ঘি।' একটি মেয়েকে তার একটি সঙ্গী জিজ্ঞাসা ক'রেছিল, 'তোর স্বামী এসেছে, আচ্ছা ভাই, স্বামী এলে কিরূপ আনন্দ হয়?' মেয়েটি বললে, 'ভাই, তোর স্বামী হ'লে তুই জানবি; এখন তোরে কেমন ক'রে বুঝাব।' পুরাণে আছে ভগবতী যখন হিমালয়ের ঘরে জন্মালেন, তখন তাঁকে মা নানারূপে দর্শন দিলেন। গিরিরাজ সব রূপ দর্শন করে শেষে ভগবতীকে বললেন, মা বেদে যে ব্রহ্মের কথা আছে একবার আমার যেন ব্রহ্মদর্শন হয়। তখন ভগবতী বললেন, বাবা ব্রহ্মদর্শন যদি ক'রতে চাও তবে সাধুসঙ্গ কর।

ব্রহ্ম কি জিনিস—মুখে বলা যায় না। একজন বলেছিল, সব উচ্ছিষ্ট হয়েছে, কেবল ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট হন নাই। এর মানে এই যে, বেদ, পুরাণ, তন্ত্র আর সব শাস্ত্র, মুখে উচ্চারণ হওয়াতে উচ্ছিষ্ট হয়েছে বলা যেতে পারে; কিন্তু ব্রহ্ম কি বস্তু কেউ এ পর্যন্ত মুখে বলতে পারে নাই। তাই ব্রহ্ম এ পর্যন্ত উচ্ছিষ্ট হন নাই। আর সচ্চিদানন্দের সঙ্গে ক্রীড়া, রমণ যে কি আনন্দের তা বলা যায় না। যার হয়েছে সে জানে।

নিত্যসিদ্ধ। ক. সাধারণ লোক সাধন করে, ঈশ্বরে ভক্তিও করে। আবার সংসারেও আসক্ত হয়, কামিনী-কাঞ্চনে মুগ্ধ হয়। মাছি যেমন ফুলে বসে, সন্দেশে বসে, আবার বিষ্ঠাতেও বসে।

নিত্যসিদ্ধ যেমন মৌমাছি; কেবল ফুলের উপর বসে মধু পান করে। নিত্যসিদ্ধ হরি রস পান করে, বিষয় রসের দিকে যায় না।

সাধ্যসাধনা করে যে ভক্তি, এদের সে ভক্তি নয়।

খ. যে নিত্যসিদ্ধ তার আবার সংসারে ভয় কি? ছকবাঁধা খেলা; আবার ফেললে কি হয়, ছকবাঁধা খেলাতে এ ভয় থাকে না।

যে নিত্যসিদ্ধ, সে মনে করলে সংসারেও থাকতে পারে। কেউ কেউ দুই তলোয়ার নিয়ে খেলতে পারে। এমন খেলোয়াড় যে, ঢিল পড়লে তলোয়ারে লেগে ঠিকরে যায়।

দ্রঃ সিদ্ধ। হোমা পাখি।

নিত্যসিদ্ধের থাক। ক. এই ছেলেটিকে দেখছ, এখানে এক রকম। দুরন্ত ছেলে বাবার কাছে যখন বসে, যেমন জুজুটি, আবার চাঁদনিতে যখন খেলে, তখন আর এক মূর্তি। এরা নিত্যসিদ্ধের থাক। এরা সংসারে কখন বদ্ধ হয় না। একটু বয়স হলেই চৈতন্য হয়, আর ভগবানের দিকে চলে যায়। এরা সংসারে আসে জীবশিক্ষার জন্য। এদের সংসারের বস্তু কিছু ভাল লাগে না—এরা কামিনী-কাঞ্চনে কখন আসক্ত হয় না।

বেদে আছে হোমা পাখির কথা। খুব উঁচু আকাশে সে পাখি থাকে। সেই আকাশেই ডিম পাড়ে। ডিম পাড়লে ডিমটা পড়তে থাকে—কিন্তু এত উঁচু যে, অনেকদিন থেকে ডিমটা পড়তে থাকে। ডিম পড়তে পড়তে ফুটে যায়। তখন ছানাটা পড়তে থাকে। পড়তে পড়তে তার চোখ ফোটে ও ডানা বেরোয়। চোখ ফুটলেই দেখতে পায় যে, সে পড়ে যাচ্ছে, আর মাটিতে লাগলে একেবারে চুরমার হয়ে যাবে। তখন সে পাখি মার দিকে একেবারে চোঁচা দৌড় দেয় আর উঁচুতে উঠে যায়।

খ. নিত্যসিদ্ধ আলাদা থাক—যেমন অরণি কাষ্ঠ, একটু ঘসলেই আগুন—আবার না ঘসলেও হয়। একটু সাধন করলেই নিত্যসিদ্ধ ভগবানকে লাভ করে, আবার সাধন না করলেও পায়।

তবে নিত্যসিদ্ধ ভগবানকে লাভ করার পর সাধন করে। যেমন লাউ-কুমড়ো গাছে আগে ফল হয় তারপর ফুল।

নিত্যজীব। 'জীবের প্রকার' দেখ।

নিত্যবস্তু। 'জ্ঞানীচাষী' দ্রষ্টব্য।

নিন্দা। কারু নিন্দা কোরো না—পোকাটিরও না। তুমি নিজেই ত বলো, লোমশ মুনির কথা। যেমন ভক্তি প্রার্থনা করবে তেমনি ওটাও বলবে—যেন কারু নিন্দা না করি।

নিন্দাবাদ। কারু নিন্দা কোরো না—পোকাটিরও না। যেমন ভক্তি প্রার্থনা করবে তেমনি ওটাও বলবে—'যেন কারু নিন্দা না করি।' নারায়ণই এইসব রূপ ধরে রয়েছেন। দুষ্ট খারাপ লোককেও পূজো করা যায়। দেখ না কুমারী পূজো। একটা হাগে মোতে নাক দিয়ে কফ পড়ছে, এমন মেয়েকে পূজো কেন ? ভগবতীর একটি রূপ বলে। শুদ্ধাত্মা কুমারীতে ভগবতীর বেশী প্রকাশ ; ওদেশে এক-জনদের বাড়ী প্রায় সর্বদাই গিয়ে থাকতাম ; তারা সমবয়সা। তাদের মা সকলকে ঘৃণা করতো। শেষে সেই মার পায়ের খিল কি রকম করে খুলে গেল। আর পা পচতে লাগল। ঘরে এত পচা গন্ধ হল যে, লোকে ঢুকতে পারতো না।

নিরাকার ও সাকার। 'হিন্দুতে ব্রাহ্মতে তফাৎ' দ্রষ্টব্য।

নিরাকার ব্রহ্মের সাক্ষাৎ হয় কি ? নিরাকার ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হবে কেন ? তবে বড় কঠিন। বিষয় বুদ্ধির লেশ থাকলে হবে না। ইন্দ্রিয়ের বিষয় যত আছে—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ শব্দ সমস্ত ত্যাগ হলে—মনের লয় হলে—তবে অনুভববোধে বোধ হয় আর অস্তিমাত্র জানা যায়।

তাঁকে পেতে গেলে একটা ভাব আশ্রয় করতে হয়—বীরভাব, সখীভাব বা দাসী-ভাব আর সন্তানভাব।

দ্রঃ ঈশ্বরদর্শন কি করা যায় ?

নিরাকার সাকার দ্বন্দ্ব। 'সাকার-নিরাকার দ্বন্দ্ব' দেখ।

নির্জন বাস। নির্জনে দই পেতে মাখন তুলতে হয়। জ্ঞানভক্তিরূপ মাখন যদি একবার মনরূপ দুধ থেকে তোলা হয়, তাহলে সংসাররূপ জলের উপর রাখলে নির্লিপ্ত হয়ে ভাসবে। কিন্তু মনকে কাঁচা অবস্থায়—দুধের অবস্থায়, যদি সংসার রূপ জলের উপর রাখ, তাহলে দুধে জলে মিশে যাবে। তখন আর মন নির্লিপ্ত হয়ে ভাসতে পারবে না।

ঈশ্বর লাভের জন্য সংসারে থেকে, এক হাতে ঈশ্বরের পাদপদ্ম ধ'রে থাকবে আর এক হাতে কাজ করবে। যখন কাজ থেকে অবসর হবে, তখন দুই হাতেই ঈশ্বরের পাদপদ্ম ধরে থাকবে, তখন নির্জনে বাস করবে, কেবল তাঁর চিন্তা আর সেবা করবে।

দ্রঃ সংসারী সাধনা। গৃহত্যাগের প্রয়োজন কি।

নির্জন বাস কতকাল। ফুটপাতের গাছ দেখেছ ? যতদিন চারা, ততদিন চারি-দিকে বেড়া দিতে হয়। না হলে ছাগল-গরুতে খেয়ে ফেলবে। গাছের গুঁড়ি মোটা হলে আর বেড়ার দরকার নাই। তখন হাতী বেঁধে দিলেও গাছ ভাঙ্গবে না। গুঁড়ি যদি করে নিতে পারো আর ভাবনা কি, ভয় কি ? বিবেক লাভ করবার চেষ্টা আগে কর। তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙ্গ, হাতে আঠা জড়াবে না।

নির্জন সাধনার প্রয়োজন। নির্জনে না গেলে, শক্ত রোগ সারবে কেমন করে।

রোগটি হচ্ছে বিকার। আবার যে ঘরে বিকারী রোগী, সেই ঘরেই আচার, তেঁতুল আর জলের জালা। তা রোগ সারবে কেমন করে? আচার, তেঁতুল—এই দেখো, বলতে বলতে আমার মুখে জল এসেছে (সকলের হাস্য)। সম্মুখে থাকলে কি হয়, সকলেই তো জানো? মেয়েমানুষ পুরুষের পক্ষে এই আচার তেঁতুল। ভোগবাসনা—জলের জালা; বিষয়-তৃষ্ণার শেষ নাই, আর এই বিষয় রোগীর ঘরে। এতে কি বিকার রোগ সারে? দিন কতক ঠাঁইনাড়া হ'য়ে থাকতে হয়, যেখানে আচার-তেঁতুল নাই, জলের জালা নাই। তারপর নীরোগ হ'য়ে আবার সেই ঘরে এলে আর ভয় নাই। তাঁকে লাভ করে সংসারে এসে থাকলে, আর কামিনী-কাঞ্চনে কিছু করতে পারে না। তখন জনকের মতো নির্লিপ্ত হতে পারবে। কিন্তু প্রথমাবস্থায় সাবধান হওয়া চাই। খুব নির্জনে থেকে সাধন করা চাই। অশ্বত্থ গাছ যখন চারা থাকে, তখন চারিদিকে বেড়া দেয়, পাছে ছাগল-গরুতে নষ্ট করে। কিন্তু গুঁড়ি মোটা হলে আর বেড়ার দরকার থাকে না। হাতী বেঁধে দিলেও গাছের কিছু করতে পারে না। যদি নির্জনে সাধন ক'রে ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তিলাভ করে বল বাড়িয়ে, বাড়ি গিয়ে সংসার কর, তাহলে কামিনী-কাঞ্চন তোমার কিছু করতে পারবে না।

নির্লিপ্ত মন। 'নির্জন বাস' দ্রষ্টব্য।

নির্লিপ্তির সাধনা। কিন্তু সংসারে নির্লিপ্তভাবে থাকতে গেলে কিছু সাধন করা চাই। দিন কতক নির্জনে থাকা দরকার; তা এক বছর হোক, ছয় মাস হোক, তিন মাস হোক বা একমাস হোক। সেই নির্জনে ঈশ্বর চিন্তা করতে হয়। সর্বদা তাঁকে ব্যাকুল হয়ে ভক্তির জন্য প্রার্থনা করতে হয়। আর মনে মনে বলতে হয়, 'আমার এ সংসারে কেউ নাই, যাদের আপনার বলি, তারা দুদিনের জন্য। ভগবান আমার একমাত্র আপনার লোক, তিনিই আমার সর্বস্ব; হায়! কেমন করে তাঁকে পাব!'

নির্লিপ্ত অর্জন। ব্রহ্মজ্ঞানীরা আমায় বলেছিল, মহাশয়! আমাদের জনক রাজার মতো। তাঁর মতো নির্লিপ্তভাবে আমরা সংসার করবো। আমি বললুম, নির্লিপ্তভাবে সংসার করা বড় কঠিন। মুখে বললেই জনক রাজা হওয়া যায় না। জনক রাজা হেঁটমুণ্ড হয়ে ঊর্ধ্বপদ করে কত তপস্যা করেছিলেন। তোমাদের হেঁটমুণ্ড বা ঊর্ধ্বপদ হতে হবে না, কিন্তু সাধন চাই। নির্জনে বাস চাই। নির্জনে জ্ঞানলাভ, ভক্তিলাভ করে তবে গিয়ে সংসার করতে হয়। দই নির্জনে পাততে হয়। ঠেলাঠেলি নাড়ানাড়ি করলে দই বসে না।

নির্বিকল্প সমাধি। 'সমাধি ও অহং', 'জগতের মাকে পেলে' দ্রষ্টব্য।

নিষ্কাম কর্ম। ক. সংসার ধর্ম; তাতে দোষ নাই। কিন্তু ঈশ্বরের পাদপদ্মে মন রেখে, কামনাশূন্য হয়ে কাজকর্ম করবে। এই দেখ না, যদি কারও পিঠে একটা ফোঁড়া হয়, সে যেমন সকলের সঙ্গে কথাবার্তা কয়, হয়তো কাজকর্মও করে, কিন্তু যেমন ফোঁড়ার দিকে মন পড়ে থাকে, সেইরূপ।

সংসারে নষ্ট মেয়ের মতো থাকবে। মন উপপতির দিকে কিন্তু সে সংসারের সব কাজ করে।

খ. নিষ্কাম কর্ম ভাল। তাতে অশান্তি হয় না। কিন্তু নিষ্কাম কর্ম করা বড় কঠিন। মনে করছি, নিষ্কাম কর্ম করছি কিন্তু কোথা থেকে কামনা এসে পড়ে, জানতে দেয় না। আগে যদি অনেক সাধন থাকে, সাধনের বলে কেউ কেউ নিষ্কাম কর্ম করতে পারে। ঈশ্বর দর্শনের পর নিষ্কাম কর্ম অনায়াসে করা যায়। ঈশ্বর দর্শনের পর প্রায় কর্মত্যাগ হয়; দুই-একজন (নারদাদি) লোকশিক্ষার জন্য কর্ম করে। সন্ন্যাসী সঞ্চয় করবে না—প্রেম হলে কর্মত্যাগ হয়।

গ. পূজা হোম, যাগ যজ্ঞ কিছুই কিছু নয়। যদি তাঁর উপর ভালবাসা আসে তাহলে আর এ সব কর্মের বেশী দরকার নাই। যতক্ষণ হাওয়া পাওয়া না যায়, ততক্ষণই পাখার দরকার; যদি দক্ষিণে হাওয়া আপনি আসে, পাখা রেখে দেওয়া যায়। আর পাখার কি দরকার।

তুমি যে সব কর্ম করছো, এ সব সৎকর্ম। যদি 'আমি কর্তা' এই অহঙ্কার ত্যাগ করে নিষ্কামভাবে করতে পারো, তাহলে খুব ভাল। এই নিষ্কাম কর্ম করতে করতে ঈশ্বরেতে ভক্তি ভালবাসা আসে। এইরূপ নিষ্কাম কর্ম করতে করতে ঈশ্বর লাভ হয়।

নিষ্ঠাভক্তি। ব্যাকুলতা থাকলে সব পথ দিয়েই তাঁকে পাওয়া যায়। তবে নিষ্ঠা থাকা ভাল। নিষ্ঠাভক্তির আর একটি নাম অব্যভিচারিণী ভক্তি। যেমন এক ডেলে গাছ, সোজা উঠেছে। ব্যভিচারিণী ভক্তি যেমন পাঁচ ডেলে গাছ। গোপীদের এমন নিষ্ঠা যে বৃন্দাবনের মোহন চূড়া, পীত ধড়া পরা রাখালকৃষ্ণ ছাড়া আর কিছু ভালবাসবে না। মথুরায় যখন রাজবেশ, পাগড়ী মাথায় কৃষ্ণকে দর্শন করলে তখন তারা ঘোমটা দিলে। আর বললে, ইনি আবার কে? এর সঙ্গে আলাপ করে আমরা কি দ্বিচারিণী হব?

স্ত্রী যে স্বামীর সেবা করে সেও নিষ্ঠাভক্তি, দেবর ভাসুরকে খাওয়ায়, পা ধোয়ার জল দেয়, কিন্তু স্বামীর সঙ্গে অন্য সম্বন্ধ। সেইরূপ নিজের ধর্মতেও নিষ্ঠা হতে পারে। তা বলে অন্য ধর্মকে ঘৃণা করবে না। বরং তাদের সঙ্গে মিষ্ট ব্যবহার করবে।

খ. সব মতকে নমস্কার করবে, তবে একটি আছে নিষ্ঠাভক্তি। সবাইকে প্রণাম করবে বটে, কিন্তু একটির উপরে প্রাণঢালা ভালবাসার নাম নিষ্ঠা।

রাম রূপ বই আর কোনও রূপ হনুমানের ভাল লাগতো না।

গোপীদের এত নিষ্ঠা যে, তারা দ্বারকার পাগড়িবাঁধা শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে চাইলে না।

পত্নী, দেওর, ভাসুর ইত্যাদিকে পা ধোয়ার জল আসনাদি দ্বারা সেবা করে, কিন্তু পতিকে যেরূপ সেবা করে, সেরূপ সেবা আর কাহাকেও করে না। পতির সঙ্গে সম্বন্ধ আলাদা।

নীচু। 'উঁচু নীচু' দ্রষ্টব্য।

নীচু নজর। পণ্ডিত খুব লম্বা লম্বা কথা বলে, কিন্তু নজর কোথায়? কামিনী আর কাঞ্চনে, দেহের সুখ আর টাকায়।

শকুনি খুব উঁচুতে উড়ে, কিন্তু নজর ভাগাড়ে। কেবল খুঁজছে, কোথায় মড়া

জানোয়ার, কোথায় ভাগাড়, কোথায় মড়া।

নীলকণ্ঠ (যাত্রাওয়ালা)। দ্রঃ যাত্রায় লোকশিক্ষা।

নেতি নেতি বিচার। যতক্ষণ ঈশ্বরকে না পাওয়া যায় ততক্ষণ 'নেতি নেতি' করে ত্যাগ করতে হয়। তাঁকে যারা পেয়েছে, তারা জানে যে তিনিই সব হয়েছেন—ঈশ্বরমায়া-জীবজগৎ। তখন বোধ হয় জীবজগৎশুদ্ধ তিনি। যদি একটা বেলের খোলা, শাঁস, বীচি আলাদা করা যায়, আর একজন যদি বলে, বেলটা কত ওজনে ছিল দেখ ত, তুমি কি খোলা বীচি ফেলে শাঁসটা কেবল ওজন করবে, না, ওজন করতে হলে খোলা বীচি সমস্ত ধরতে হবে। ধরলে তবে বলতে পারবে, বেলটা এতো ওজনে ছিল। খোলাটা যেন জগৎ; জীবগুলি যেন বীচি। বিচারের সময় জীব আর জগৎকে অনাত্মা বলেছিলে, অবস্তু বলেছিলে। বিচার করবার সময় শাঁসকেই সার, খোলা আর বীচিকে অসার বলে বোধ হয়। বিচার হয়ে গেলে, সমস্ত জড়িয়ে এক বলে বোধ হয়। আর বোধ হয়, যে সত্তাতে শাঁস সেই সত্তা দিয়েই বেলের খোলা আর বীচি হয়েছে। বেল বুঝতে গেলে সব বুঝিয়ে যাবে। অনুলোম বিলোম। ঘোলেরই মাখন, মাখনেরই ঘোল। যদি ঘোল হয়ে থাকে তো মাখনও হয়েছে। যদি মাখন হয়ে থাকে, তাহলে ঘোলও হয়েছে। আত্মা যদি থাকেন, তো অনাত্মাও আছে।

যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা, (Phenomenal world) যাঁরই লীলা তাঁরই নিত্য (Absolute)। যিনি ঈশ্বর বলে গোচর হন, তিনিই জীবজগৎ হয়েছেন। যে জেনেছে সে দেখে যে তিনিই সব হয়েছেন—বাপ, মা, ছেলে, প্রতিবেশী, জীব-জন্তু, ভাল মন্দ, শুচি, অশুচি সমস্ত।

পঞ্চদশী দেখা। ও সব একবার প্রথম প্রথম শুনতে হয়—প্রথম প্রথম একবার বিচার করে নিতে হয়। তারপর—

যতনে হৃদয় রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে,

মন তুই দেখ আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাহি দেখে।

সাধনাবস্থায় ওসব শুনতে হয়। তাঁকে লাভের পর জ্ঞানের অভাব থাকে না। মা রাশ ঠেলে দেন।

প্রথমে বানান করে লিখতে হয়, তার পর অমনি টেনে যাও।

সোনা গলাবার সময় খুব উঠে পড়ে লাগতে হয়। এক হাতে হাপর—এক হাতে পাখা—মুখে চোঙ্গ—যতক্ষণ না সোনা গলে। গলার পর, যেই গড়নেতে ঢালা হলো—অমনি নিশ্চিন্ত।

শাস্ত্র শুধু পড়লে হয় না। কামিনী-কাঞ্চনের মধ্যে থাকলে শাস্ত্রের মর্ম বুঝতে দেয় না। সংসারের আসক্তিতে জ্ঞান লোপ হয়ে যায়।

সাধ করে শিখেছিলাম কাব্যরস যত।
কালার পিরীতে পড়ে সব হইল হত।

পটোয়ারী করা। পঞ্চবটীর কাছে গঙ্গার ধারে টাকা মাটি, মাটিই টাকা, টাকাই মাটি, এই বিচার করতে করতে যখন টাকা গঙ্গার জলে ফেলে দিলুম, তখন একটু

ভয় হ'ল। ভাবলুম, আমি কি লক্ষ্মীছাড়া হলুম! মা লক্ষ্মী যদি খ্যাঁট বন্ধ করে দেন, তা হলে কি হবে। তখন হাজরার মতো পটোয়ারী করলুম। বললুম, মা! তুমি যেন হৃদয়ে থেকো! একজন তপস্যা করাতে ভগবতী সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, তুমি বর লও। সে বললে, মা যদি বর দিবে, তবে এই কর যেন আমি নাতির সঙ্গে সোনার থালে ভাত খাই। এক বরেতে নাতি, ঐশ্বর্য, সোনার থাল সব হ'ল!

পড়াশুনা। দেখ, শুধু পড়াশুনাতে কিছু হয় না। বাজনার বোল লোবে মুখস্থ বেশ বলতে পারে, হাতে আনা বড় শক্ত!

পড়াশুনা-বোঝা। অনেকে মনে করে, বই না পড়ে বুঝি জ্ঞান হয় না, বিদ্যা হয় না। কিন্তু পড়ার চেয়ে শুনা ভাল, শুনার চেয়ে দেখা ভাল। কাশীর বিষয় পড়া, কাশীর বিষয় শুনা, আর কাশী দর্শন অনেক তফাত।

আবার যারা নিজে সতরঞ্চ খেলে, তারা চাল তত বুঝে না, কিন্তু যারা না খেলে উপর চাল বলে দেয়, তাদের চাল ওদের চেয়ে অনেকটা ঠিক ঠিক হয়। সংসারী লোক মনে করে, আমরা বড় বুদ্ধিমান কিন্তু তারা বিষয়াসক্ত। নিজে খেলছে। নিজের চাল ঠিক বুঝতে পারে না। কিন্তু সংসারত্যাগী সাধুলোক বিষয়ে অনাসক্ত। তারা সংসারীদের চেয়ে বুদ্ধিমান। নিজে খেলে না, তাই উপর চাল ঠিক বলে দিতে পারে।

পথ। ভক্তিযোগ জ্ঞানযোগ এ সবই পথ। যে পথ দিয়েই যাও তাঁকে পাবে। ভক্তির পথ সহজ নয়। জ্ঞান বিচারের পথ কঠিন পথ।

কোন পথটি ভাল অত বিচার করবার কি দরকার। বিজয়ের সঙ্গে অনেকদিন কথা হয়েছিল, বিজয়কে বললাম, একজন প্রার্থনা করতো, 'হে ঈশ্বর! তুমি যে কি, কেমন আছ, আমায় দেখা দাও।'

জ্ঞান বিচারের পথ কঠিন। পার্বতী গিরিরাজকে নানা ঈশ্বরীয় রূপে দেখা দিয়ে বললেন, 'পিতা, যদি ব্রহ্মজ্ঞান চাও সাধু সঙ্গ কর।'

পথ ও মত। এ রকম মনে করা ভাল নয় যে আমার ধর্মই ঠিক; আর অন্য সকলের ধর্ম ভুল। সব পথ দিয়েই তাঁকে পাওয়া যায়। আন্তরিক ব্যাকুলতা থাকলেই হ'ল। অনন্ত পথ—অনন্ত মত।

পথ দুটি। জ্ঞান ও ভক্তি দুইই পথ। ভক্তি-পথে একটু আচার বেশী করতে হয়। জ্ঞানপথে যদি অনাচার কেউ করে, সে নষ্ট হয়ে যায়। বেশী আগুন জ্বাললে কলা গাছটাও ভিতরে ফেলে দিলে পুড়ে যায়।

জ্ঞানীর পথ বিচার করতে করতে নাস্তিকভাব হয়তো কখন কখন এসে পড়ে। ভক্তের আন্তরিক তাঁকে জানবার ইচ্ছা থাকলে, নাস্তিকভাব এলেও সে ঈশ্বর চিন্তা ছেড়ে দেয় না। যার বাপ পিতামহ চাষাগিরি করে এসেছে, হাজাশুখা বৎসরে ফসল না হলেও সে চাষ করে।

পদ্মলোচন। পদ্মলোচন ভারী জ্ঞানী ছিলেন, কিন্তু আমি মা, মা, করতুম, তবু আমায় খুব মানতো। পদ্মলোচন বর্ধমানের রাজার সভা-পণ্ডিত ছিল। কলকাতায় এসেছিল, এসে কামারহাটির কাছে একটি বাগানে ছিল। আমার পণ্ডিত

দেখবার ইচ্ছা হ'ল। হৃদেকে পাঠিয়ে দিলুম জানতে, অভিমান আছে কি না? শুনলাম পণ্ডিতের অভিমান নাই। আমার সঙ্গে দেখা হ'ল। এতো জ্ঞানী আর পণ্ডিত, তবু আমার মুখে রামপ্রসাদের গান শুনে কান্না! কথা কয়ে এমন সুখ কোথাও পাই নাই। আমায় বললে, 'ভক্তের সঙ্গ করবো এ কামনা ত্যাগ করো, নচেৎ নানারকমের লোক তোমায় পতিত করবে।' বৈষ্ণবচরণের গুরু উৎসবানন্দের সঙ্গে লিখে বিচার করেছিল, আমায় আবার বললে, আপনি একটু শুনুন। একটা সভায় বিচার হয়েছিল—শিব বড়, না, ব্রহ্মা বড়। শেষে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা পদ্মলোচনকে জিজ্ঞাসা করলে। পদ্মলোচন এমনি সরল, সে বললে, 'আমার চৌদ্দপুরুষ শিবও দেখে নাই, ব্রহ্মাও দেখে নাই।' কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ শুনে আমায় একদিন বললে, 'ওসব ত্যাগ করেছো কেন? এটা টাকা, এটা মাটি, এ ভেদবুদ্ধি তো অজ্ঞান থেকে হয়।' আমি কি বলবো, বললাম—কে জানে বাপু, আমার টাকাকড়ি ও সব ভাল লাগে না।

পণ্ডিত। ক. আরও বলিতেছেন, যখন প্রথমে তোমার কথা শুনলুম, জিজ্ঞাসা করলুম যে, এই পণ্ডিত কি শুধু পণ্ডিত, না, বিবেক-বৈরাগ্য আছে।

যে পণ্ডিতের বিবেক নাই, সে পণ্ডিতই নয়।

খ. যারা শুধু পণ্ডিত কিন্তু যাদের ভগবানে ভক্তি নাই, তাদের কথা গোলমেলে। সামাধ্যায়ী বলে এক পণ্ডিত বলেছিল 'ঈশ্বর নীরস, তোমরা নিজের প্রেমভক্তি দিয়ে সরস করো।' বেদে যাঁকে 'রসস্বরূপ' বলেছে তাঁকে কিনা নীরস বলে! আর এতে বোধ হচ্ছে, সে ব্যক্তি ঈশ্বর কি বস্তু কখনও জানে নাই। তাই এরূপ গোলমেলে কথা।

একজন বলেছিল, 'আমার মামার বাড়িতে এক গোয়াল ঘোড়া আছে।' এ কথায় বুঝতে হবে, ঘোড়া আদবেই নাই, কেন না গোয়ালে ঘোড়া থাকে না।

দ্রঃ লোকশিক্ষা। পাণ্ডিত্য। নীচু নজর।

পণ্ডিত ও সাধু। পণ্ডিত আর সাধু অনেক তফাৎ। শুধু পণ্ডিত যে, তার কামিনী কাঞ্চনে মন আছে। সাধুর মন হরিপাদপদ্মে। পণ্ডিত বলে এক, আর করে এক। সাধুর কথা ছেড়ে দাও। যাদের হরিপাদপদ্মে মন তাদের কাজ, কথা সব আলাদা।

পরমহংস। এই মায়ার সংসারে বিদ্যা অবিদ্যা দুইই আছে। পরমহংস কাকে বলি? যিনি হাঁসের মতো দুধে-জলে একসঙ্গে থাকলেও জলটি ছেড়ে দুধটি নিতে পারেন। পিঁপড়ের ন্যায় বালিতে চিনিতে একসঙ্গে থাকলেও বালি ছেড়ে চিনিটুকু গ্রহণ করতে পারেন।

পরমহংস অবস্থায়। পরমহংস তিনগুণের অতীত। তার ভিতর তিনগুণ আছে আবার নাই। ঠিক বালক, কোন গুণের বশ নয়। তাই ছোট ছোট ছেলেদের পরমহংসরা কাছে আসতে দেয়, তাদের স্বভাব আরোপ করবে বলে।

পরমহংস সঞ্চয় করতে পারে না। এটা সংসারীদের পক্ষে নয়, তাদের পরিবারদের জন্য সঞ্চয় করতে হয়।

পরমহংস অবস্থায় দ্যাখে তিনিই সুমতি দেন—তিনিই কুমতি দেন। তিতো

মিঠে ফল কি নেই ? কোন গাছে মিষ্ট ফল, কোন গাছে তিতো বা টক ফল। তিনি মিষ্ট আম গাছও করেছেন। আর টক আমড়া গাছও করেছেন।

দ্রঃ চৈতন্যদর্শন।

পরমাত্মাদর্শন। মনে কর সূর্য আর দশটি জলপূর্ণ ঘট রয়েছে, প্রত্যেক ঘটে সূর্যের প্রতিবিম্ব দেখা যাচ্ছে। প্রথমে দেখা যাচ্ছে একটি সূর্য ও দশটি প্রতি-বিম্ব সূর্য। যদি ৯টা ঘট ভেঙ্গে দেওয়া যায়, তাহলে বাকী থাকে একটি সূর্য ও একটি প্রতিবিম্ব সূর্য। এক একটি ঘট যেন এক এক ট জীব। প্রতিবিম্ব সূর্য ধরে ধরে সত্য সূর্যের কাছে যাওয়া যায়। জীবাত্মা থেকে পরমাত্মায় পোঁছান যায়। জীব (জীবাত্মা) যদি সাধন ভজন করে তাহলে পরমাত্মা দর্শন করতে পারে। শেষের ঘটটি ভেঙ্গে দিলে কি আছে মুখে বলা যায় না।

পরলোক। পরলোকের কথা বলছ ? গীতার মত—মৃত্যুকালে যা ভাববে তাই হবে। ভরত রাজা 'হরিণ' 'হরিণ' করে শোকে প্রাণত্যাগ করেছিল। তাই তার হরিণ হয়ে জন্মাতে হল। তাই জপ, ধ্যান, পূজা এ সব রাত দিন অভ্যাস করতে হয়—তা হলে মৃত্যুকালে ঈশ্বরচিন্তা আসে—অভ্যাসের গুণে। এরূপে মৃত্যু হলে ঈশ্বরের স্বরূপ পায়।

কেশব সেনও পরলোকের কথা জিজ্ঞাসা করেছিল। আমি কেশবকেও বললুম, 'এ সব হিসাবে তোমার কি দরকার ?' তারপর আবার বললুম, যতক্ষণ না ঈশ্বর লাভ হয়, ততক্ষণ পুনঃ পুনঃ সংসারে যাতায়াত করতে হবে। কুমোরেরা হাঁড়ি সরা রৌদ্রে শুকুতে দেয় ; ছাগল গরুতে মাড়িয়ে যদি ভেঙ্গে দেয় তা হলে তৈরি লাল হাঁড়িগুলো ফেলে দেয়। কাঁচাগুলো কিন্তু আবার নিয়ে কাদা মাটির সঙ্গে-মিশিয়ে ফেলে ও আবার চাকে দেয়।

পরলোক : জন্মান্তর। যতক্ষণ মানুষ অজ্ঞান থাকে, অর্থাৎ যতক্ষণ ঈশ্বর-লাভ হয় নাই, ততক্ষণ জন্মগ্রহণ করতে হবে। কিন্তু জ্ঞানলাভ হলে আর এ সংসারে আসতে হয় না। পৃথিবীতে বা অন্য কোন লোকে যেতে হয় না।

কুমোরেরা হাঁড়ি রৌদ্রে শুকুতে দেয়। দেখ নাই, তার ভিতর পাকা হাঁড়িও আছে, কাঁচা হাঁড়িও আছে। গরু-টরু চলে গেলে হাঁড়ি কতক কতক ভেঙ্গে যায়। পাকা হাঁড়ি ভেঙ্গে গেলে কুমোর সেগুলিকে ফেলে দেয়, তার দ্বারা আর কোন কাজ হয় না। কাঁচা হাঁড়ি ভাঙ্গলে কুমোর তাদের আবার লয় ; নিয়ে চাকেতে তাল পাকিয়ে দেয়, নূতন হাঁড়ি তৈয়ার হয়। তাই যতক্ষণ ঈশ্বর-দর্শন হয় নাই, ততক্ষণ কুমোরের হাতে যেতে হবে, অর্থাৎ এই সংসারে ফিরে ফিরে আসতে হবে।

সিদ্ধ ধান পুঁতলে কি হবে ? আর গাছ হয় না। মানুষ জ্ঞানাগ্নিতে সিদ্ধ হলে তার দ্বারা আর নূতন সৃষ্টি হয় না, সে মুক্ত হয়ে যায়।

পরিবারদের উপর কর্তব্য কত দিন ? তাদের খাওয়া-পরার কষ্ট না থাকে। কিন্তু সন্তান নিজে সমর্থ হলে আর তাদের ভার লবার দরকার নাই, পাখীর ছানা খুঁটে খেতে শিখলে, আবার মার কাছে খেতে এলে, মা ঠোক্কর মারে।

দ্রঃ স্ত্রীর প্রতি কি কর্তব্য।

পরোপকার। পরোপকার! তোমার সাধ্য কি যে তুমি পরোপকার করো? মানুষের এতো নপর চপর কিন্তু যখন ঘুমোয়, তখন যদি কেউ দাঁড়িয়ে মুখে মুতে দেয়, তো টের পায় না, মুখ ভেসে যায়। তখন অহঙ্কার, অভিমান, দর্প কোথায় যায়?

সংসারী ব্যক্তি নিষ্কামভাবে যদি কাউকে দান করে সে নিজের উপকারের জন্য, 'পরোপকারের' জন্য নয়। সর্বভূতে হরি আছেন তাঁরই সেবা করা হয়। হরিসেবা হলে নিজেরই উপকার হ'ল, 'পরোপকার' নয়। এই সর্বভূতে হরির সেবা—শুধু মানুষের নয়, জীবজন্তুর মধ্যেও হরির সেবা, যদি কেউ করে, আর যদি সে মান চায় না, যশ চায় না, মরবার পর স্বর্গ চায় না, যাদের সেবা করছে তাদের কাছ থেকে উলটে কোনও উপকার চায় না, এরূপ ভাবে যদি সেবা করে, তা হলে তার যথার্থ নিষ্কাম কর্ম, অনাসক্ত কর্ম করা হয়। এইরূপ নিষ্কাম কর্ম করলে তার নিজের কল্যাণ হয়। এরই নাম কর্মযোগ। এই কর্মযোগও ঈশ্বর-লাভের একটি পথ। কিন্তু বড় কঠিন, কলিযুগের পক্ষে নয়।

তাই বলছি, যে অনাসক্ত হয়ে এরূপ কর্ম করে, দয়া দান করে, সে নিজেরই মঙ্গল করে। পরের উপকার পরের মঙ্গল সে ঈশ্বর করেন—যিনি চন্দ্র, সূর্য, বাপ, মা, ফল, ফুল, শস্য জীবের জন্য করেছেন। বাপ-মার ভিতর যা স্নেহ দেয়, সে তাঁরই স্নেহ, জীবের রক্ষার জন্যই দিয়েছেন। দয়ালুর ভিতর যা দয়া দেখ, সে তাঁরই দয়া নিঃসহায় জীবের রক্ষার জন্য দিয়েছেন। তুমি দয়া কর আর না কর, তিনি কোন না কোন সূত্রে তাঁর কাজ করবেন। তাঁর কাজ আটকে থাকে না।

পাকাভক্তি। অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে কি সকলে ধরতে পারে? কিন্তু নিত্যে উঠে যে বিলাসের জন্য লীলায় থাকে, তারই পাকা ভক্তি। বিলাতে কুইন (রাণী) দেখে এলে পর, তখন কুইন-এর কথা; কুইন-এর কার্য, এ সকল বর্ণনা করা চলতে পারে। কুইন-এর কথা তখন বলা ঠিক ঠিক হয়। ভরদ্বাজাদি ঋষি রামকে স্তব করেছিলেন, আর বলেছিলেন—'হে রাম তুমিই সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ। তুমি আমাদের কাছে মানুষরূপে অবতীর্ণ হয়েছ। বস্তুতঃ তুমি তোমার মায়া আশ্রয় করেছ বলে, তোমাকে মানুষের মতো দেখাচ্চে।' ভরদ্বাজাদি ঋষি রামের পরম ভক্ত। তাঁদের ভক্তি পাকা ভক্তি।

পাঁকাল মাছ। পাঁকাল মাছের মতো থাকবে। সংসার থেকে তফাতে গিয়ে, নির্জনে ঈশ্বর-চিন্তা মাঝে মাঝে করলে, তাঁতে ভক্তি জন্মে। তখন নির্লিপ্ত হয়ে থাকতে পারবে। পাঁক আছে, পাঁকের ভিতর থাকতে হয়, তবু গায়ে পাঁক লাগে না। সে লোক অনাসক্ত হয়ে সংসারে থাকে।

দ্রঃ 'সংসারীভক্ত', 'গৃহাশ্রমে কি ভগবানলাভ হয়'।

পাত্রবিচার। পাত্র দেখে উপদেশ দিতে হয়। তোমরা পাত্র দেখে উপদেশ দাও না। আমার কাছে কেহ ছোকরা এলে আমি জিজ্ঞাসা করি, 'তোর কে আছে?' মনে কর, বাপ নাই; হয়তো বাপের ঋণ আছে, সে কেমন করে ঈশ্বরে মন দিবেক? শুনছো বাপ?

পাণ্ডিত্য। শুধু পাণ্ডিত্যে কি হবে ? অনেক শ্লোক, অনেক শাস্ত্র, পণ্ডিতের জানা থাকতে পারে ; কিন্তু যার সংসারে আসক্তি আছে, যার কামিনী-কাঞ্চনে মনে মনে ভালবাসা আছে, তার শাস্ত্র ধারণা হয় না—মিছে পড়া। পাঁজিতে লিখেছে, বিশ আড়া জল, কিন্তু পাঁজি টিপলে এক ফোঁটাও পড়ে না। এক ফোঁটাই পড়—কিন্তু এক ফোঁটাও পড়ে না।

পণ্ডিত দ্রষ্টব্য।

পাণ্ডব। 'ভক্ত জ্ঞানী' দ্রষ্টব্য।

পানকৌড়ি। সংসারী ভক্ত দ্রষ্টব্য।

পানাপুকুর। তাঁর মায়াতে সব ঢেকে রেখেছেন—কিছু জানতে দেন না। কামিনী-কাঞ্চন মায়া। ওই মায়াকে সরিয়ে যে তাঁকে দর্শন করে সেই তাঁকে দেখতে পায়। একজনকে বোঝাতে বোঝাতে (ঈশ্বর একটি আশ্চর্য ব্যাপার) দেখালেন, হঠাৎ সামনে দেখলাম, দেশের (কামার পুকুরের) একটি পুকুর, আর একজন লোক পানা সরিয়ে যেন জলপান করলে। জলটি স্ফটিকের মতো। দেখালে যে, সেই সচ্চিদানন্দ মায়ারূপ পানাতে ঢাকা—যে সরিয়ে জল খায় সেই পায়।

পাপ। খৃষ্টানদের একখানা বই একজন দিলে, আমি পড়ে শুনাতে বললুম। তাতে কেবল পাপ আর পাপ। (কেশবের প্রতি) তোমাদের ব্রাহ্মসমাজেও কেবল 'পাপ'। যে ব্যক্তি 'আমি বদ্ধ' বার বার বলে, সে শালা বদ্ধই হয়ে যায়। যে রাত-দিন 'আমি পাপী' 'আমি পাপী' এই করে, সে তাই হয়ে যায়।
ঈশ্বরের নামে এমন বিশ্বাস হওয়া চাই—কি, আমি তাঁর নাম করেছি, আমার এখনও পাপ থাকবে! আমার আবার পাপ কি ? আমার আবার বন্ধন কি ?

দ্রঃ খৃষ্টানী মত, কর্মভোগ, ঈশ্বর নির্লিপ্ত।

আচ্ছা, তোমরা অত পাপ পাপ বললে কেন ? একশোবার, 'আমি পাপী, আমি পাপী' বললে তাই হয়ে যায়। এমন বিশ্বাস করা চাই যে, তার নাম করেছি—আমার আবার পাপ কি ? তিনি আমাদের বাপ মা ; তাঁকে বলো যে পাপ করেছি, আর কখনও করব না। আর তাঁর নাম কর, তাঁর নামে সকলে দেহ মন পবিত্র কর—জিহ্বাকে পবিত্র কর।

পাপ-পুণ্য। আছে, আবার নাই। তিনি যদি অহংতত্ত্ব, (Ego) রেখে দেন, তা হলে ভেদবুদ্ধিও রেখে দেন, পাপ-পুণ্য জ্ঞানও রেখে দেন। তিনি দু-একজনেতে অহংকার একেবারে পুঁছে ফেলেন—তারা পাপ-পুণ্য ভাল-মন্দের পার হয়ে যায়! ঈশ্বর দর্শন যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ ভেদবুদ্ধি ভাল-মন্দ জ্ঞান থাকবেই থাকবে। তুমি মুখে বলতে পারো, আমার পাপ-পুণ্য সমান হয়ে গেছে ; তিনি যেমন করাচ্ছেন, তেমনি করছি। কিন্তু অন্তরে জান যে, ও সব কথা মাত্র ; মন্দ কাজটি করলেই মন ধুগ্ ধুগ্ করবে। ঈশ্বর দর্শনের পরও তাঁর যদি ইচ্ছা হয়, তিনি 'দাস আমি' রেখে দেন। সে অবস্থায় ভক্ত হলে—আমি দাস, তুমি প্রভু। সে ভক্তের ঈশ্বরীয় কথা, ঈশ্বরীয় কাজ ভাল লাগে ; ঈশ্বরবিমুখ লোককে ভাল লাগে না ; ঈশ্বর ছাড়া কাজ ভাল লাগে না। তবেই হ'ল, এরূপ ভক্তেতেও তিনি ভেদবুদ্ধি রাখেন।

পাপের দায়িত্ব কার ? ১. ঈশ্বরের নিয়ম যে, পাপ করলে তার ফল পেতে হবে। লঙ্কা খেলে আর ঝাল লাগবে না ? সেজোবাবু বয়সকালে অনেক রকম করেছিল, তাই মৃত্যুর সময় নানা রকম অসুখ হ'ল। কম বয়সে এত টের পাওয়া যায় না। কালীবাড়িতে ভোগ রাঁধবার অনেক সুঁদরী কাঠ থাকে। ভিজে কাঠ প্রথমটা বেশ জ্বলে যায়, তখন ভিতরে যে জল আছে, টের পাওয়া যায় না। কাঠটা পোড়া শেষ হলে যত জল পেছনে ঠেলে আসে ও ফ্যাঁচফোঁচ করে উনুন নিভিয়ে দেয়। তাই কাম, ক্রোধ, লোভ এ সব থেকে সাবধান হতে হয়। দেখো না, হনুমান ক্রোধ ক'রে লঙ্কা দগ্ধ করেছিল, শেষে মনে পড়লো, অশোকবনে সীতা আছেন, তখন ছটফট করতে লাগলো, পাছে সীতার কিছু হয়।

পাপের দায়িত্ব কার ? ২. তিনিই যদি সব করাচ্ছেন তা হলে আমি পাপের জন্য দায়ী নই।

দুর্যোধন এ কথা বলেছিল—

ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন, যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।

যার ঠিক বিশ্বাস—ঈশ্বরই কর্তা আর আমি অকর্তা—তার পাপ বার্য হয় না।

যে নাচতে ঠিক শিখেছে তার বেতালে পা পড়ে না।

অন্তর শুদ্ধ না হলে ঈশ্বর আছেন বলে বিশ্বাসই হয় না!

পাঁজি। 'পাণ্ডিত্য' দ্রষ্টব্য।

পুনর্জন্ম। যতক্ষণ না ঈশ্বর লাভ হয়, ততক্ষণ পুনঃ পুনঃ সংসারে যাতায়াত করতে হবে। কুমারেরা হাঁড়ি সরা রৌদ্রে শুকুতে দেয়, ছাগল গরুতে মাড়িয়ে যদি ভেঙে দেয় তাহলে তৈরি লাল হাঁড়িগুলো ফেলে দেয়। কাঁচাগুলো কিন্তু আবার নিয়ে কাদামাটির সঙ্গে মিশিয়ে ফেলে ও আবার চাকে দেয়।

পুত্রপ্রীতি। দ্রঃ ভালবাসার গতি।

কেশবের বাড়িতে নববৃন্দাবন নাটক দেখতে গিয়েছিলাম। দেখলাম, একজন ডিপুটি ৮০০ টাকা মাহিনা পায়, সকলে বললে, খুব পণ্ডিত, কিন্তু একটা ছেলে লয়ে ব্যতিব্যস্ত। ছেলেটি কিসে ভাল জায়গায় বসবে, কিসে অভিনয় দেখতে পাবে, এই জন্য ব্যাকুল। এদিকে ঈশ্বরীয় কথা হ'চ্ছে তা শুনবে না, ছেলে কেবল জিজ্ঞাসা করছে, বাবা এটা কি, ওটা কি!—তিনিও ছেলে লয়ে ব্যতিব্যস্ত। কেবল বই পড়েছে মাত্র, কিন্তু ধারণা হয় নাই।

পুঁজিমত দর। এরা কি জানো! একটা পাতকুয়োর ব্যাঙ কখনও পৃথিবী দেখে নাই; পাতকুয়াটি জানে; তাই বিশ্বাস করবে না যে, একটা পৃথিবী আছে। ভগবানের আনন্দের সন্ধান পায় নাই, তাই 'সংসার, সংসার' করছে।

ওদের সঙ্গে বকচো কেন? দুইই নিয়ে আছে। ভগবানের আনন্দের কথা বুঝতে পারে না। পাঁচ বছরের বালককে কি রমণ-সুখ বোঝানো যায়? বিষয়ীরা যে ঈশ্বর ঈশ্বর করে, শোনা কথা। যেমন খুড়ী জ্যেঠীরা কোঁদল করে, তাদের কাছ থেকে বালকেরা শুনে শেখে আর বলে, 'আমার ঈশ্বর আছেন', 'তোর ঈশ্বরের দিব্য'!

তা হোক্। ওদের দোষ নাই। সকলে কি সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে ধরতে

পারে ? রামচন্দ্রকে বারজন ঋষি কেবল জানতে পেরেছিল। সকলে ধরতে পারে না। কেউ সাধারণ মানুষ ভাবে ; কেউ সাধু ভাবে ; দুচার জন অবতার বলে ধরতে পারে।

যার যেমন পুঁজি—জিনিসের সেই রকম দর দেয়। একজন বাবু তাঁর চাকরকে বললে, তুই এই হীরেটি বাজারে নিয়ে যা। আমায় বলবি, কে কি রকম দর দেয়। আগে বেগুনওয়ালার কাছে নিয়ে যা। চাকরটি প্রথমে বেগুনওয়ালার কাছে গেল। সে নেড়ে চেড়ে দেখে বললে—ভাই, নয় সের বেগুন আমি দিতে পারি। চাকরটি বললে, ভাই আর একটু ওঠো, না হয় দশ সের দাও। সে বললে, আমি বাজার দরের চেয়ে বেশী বলে ফেলেছি ; এতে তোমার পোষায় ত দিয়ে যাও। চাকর হাসতে হাসতে হীরেটি ফিরিয়ে নিয়ে বাবুর কাছে বললে, মহাশয় বেগুনওয়ালা নয় সের বেগুনের বেশী একটিও দেবে না। সে বললে, আমি বাজার দরের চেয়ে বেশী ব'লে ফেলেছি।

বাবু হেসে বললে, আচ্ছা এবার কাপড়ওয়ালার কাছে নিয়ে যা। ও বেগুন নিয়ে থাকে, ও আর কতদূর বুঝবে। কাপড়ওয়ালার পুঁজি একটু বেশী—দেখি ও কি বলে। চাকরটি কাপড়ওয়ালার কাছে বললে, ওহে এটি নেবে ? কত দর দিতে পার ? কাপড়ওয়ালা বললে, হাঁ জিনিসটা ভাল, এতে বেশ গহনা হ'তে পারে ; তা ভাই আমি নয়শো টাকা দিতে পারি। চাকরটি বললে, ভাই আর একটু ওঠ, তা হ'লে ছেড়ে দিয়ে যাই ; না হয় হাজার টাকাই দাও। কাপড়ওয়ালা বললে, ভাই, আর কিছু ব'লো না ; আমি বাজার দরের চেয়ে বেশী ব'লে ফেলেছি ; নয়শো টাকার বেশী একটি টাকাও আমি দিতে পারব না। চাকর ফিরিয়ে নিয়ে মনিবের কাছে হাসতে হাসতে ফিরে গেল আর বললে যে, কাপড়ওয়ালা বলেছে যে ন'শো টাকার বেশী একটি টাকাও সে দিতে পারবে না। আরও সে বলছে, আমি বাজার দরের চেয়ে বেশী ব'লে ফেলেছি। তখন তার মনিব হাসতে হাসতে বললে, এইবার জহুরীর কাছে যাও—সে কি বলে দেখা যাক। চাকরটি জহুরীর কাছে এল। জহুরী একটু দেখেই একেবারে বললে, একলাখ টাকা দেবো।

দ্রঃ অবতারকে চেনা।

পূর্ণজ্ঞান। পূর্ণজ্ঞান আর পূর্ণভক্তি একই। নেতি নেতি করে বিচারের শেষ হলে, ব্রহ্মজ্ঞান।—তার পর যা ত্যাগ করে গিছিল, তাই আবার গ্রহণ। ছাদে উঠবার সময় সাবধানে উঠতে হয়। তারপর দেখে যে, ছাদও যে জিনিস—ইট চূণ সুর্কি—সিঁড়িও সেই জিনিসে তৈয়ারী।

পূর্ণজ্ঞানের লক্ষণ। ক. পূর্ণ জ্ঞানের লক্ষণ—পূর্ণ জ্ঞান হলে মানুষ চুপ হয়ে যায়। তখন আমি-রূপ নুনের পুতুল সচ্চিদানন্দরূপ সাগরে গ'লে এক হ'য়ে যায়, আর একটুও ভেদবুদ্ধি থাকে না।

বিচার করা যতক্ষণ না শেষ হয়, লোকে ফড় ফড় করে তর্ক করে। শেষ হ'লে চুপ হ'য়ে যায়। কলসী পূর্ণ হ'লে, কলসীর জল পুকুরের জল এক হ'লে আর শব্দ থাকে না। যতক্ষণ না কলসী পূর্ণ হয় ততক্ষণ শব্দ।

আগেকার লোকে বলতো, কালাপানিতে জাহাজ গেলে ফেরে না।
আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল (হাস্য)। হাজার বিচার কর, 'আমি' যায় না। তোমার আমার পক্ষে 'ভক্ত আমি' এ অভিমান ভাল।
দ্রঃ জ্ঞানীর লক্ষণ।
খ. হরিই সেব্য, হরিই সেবক—এই ভাবটি পূর্ণ জ্ঞানের লক্ষণ। প্রথমে নেতি নেতি করে হরিই সত্য আর সব মিথ্যা বলে বোধ হয়। তারপরে সেই দ্যাখে যে, হরিই এই সব হয়েছেন—ঈশ্বরই মায়া, জীব জগৎ এই সব হয়েছেন। অনুলোম হয়ে তারপর বিলোম। এইটি পুরাণের মত। যেমন একটি বেলের ভিতর শাঁস, বীজ আর খোলা আছে। খোলা বীজ ফেলে দিলে শাঁসটুকু পাওয়া যায়, কিন্তু বেলটি কত ওজনে ছিল জানতে গেলে, খোলা বীজ বাদ দিলে চলবে না। তাই জীব জগৎকে ছেড়ে প্রথমে সচ্চিদানন্দে পেঁছাতে হয়; তারপর সচ্চিদানন্দকে লাভ করে দ্যাখে যে তিনিই এই সব জীব, জগৎ হয়েছেন। শাঁস যে বস্তুর, বীজ ও খোলা সেই বস্তু থেকেই হয়েছে—যেমন ঘোলের মাখন, মাখনেরি ঘোল।
তবে কেউ বলতে পারে, সচ্চিদানন্দ এত শক্ত হ'ল কেমন করে—এই জগৎ টিপলে খুব কঠিন বোধ হয়। তার উত্তর এই, যে শোণিত শুক্র এত তরল জিনিস,—কিন্তু তাই থেকে এত বড় জীব—মানুষ তৈয়ারী হচ্ছে। তাঁ হতে সবই হতে পারে।
পূর্ণজ্ঞানীর লক্ষণ। পূর্ণজ্ঞানীর একটি লক্ষণ—'পিশাচবৎ'। খাওয়া-দাওয়ার বিচার নাই—শুচি-অশুচির বিচার নাই। পূর্ণজ্ঞানী ও পূর্ণমূর্খ, দুইজনেরই বাহিরের লক্ষণ এক রকম। পূর্ণজ্ঞানী হয় ত গঙ্গাস্নানে মন্ত্র পাঠ করলে না, ঠাকুরপূজা করবার সময় ফুলগুলি হয় ত এক সঙ্গে ঠাকুরের চরণে দিয়ে চলে এল, কোনও তন্ত্রমন্ত্র নাই।
পূর্ণভক্তি। দ্রঃ পূর্ণজ্ঞান।
পূর্বজন্মের সংস্কার। ক. পূর্বজন্মের সংস্কার মানতে হয়। শুনেছি একজন শব সাধন করছিল, গভীর বনে ভগবতীর আরাধনা করছিল। কিন্তু সে অনেক বিভীষিকা দেখতে লাগলো; শেষে তাকে বাঘে নিয়ে গেল। আর একজন বাঘের ভয়ে নিকটে একটা গাছের উপর উঠেছিল। সে, শব আর অন্যান্য পূজার উপকরণ তৈয়ার দেখে, নেমে এসে আচমন করে শবের উপর বসে গেল। একটু জপ করতে করতে মা সাক্ষাৎকার হলেন ও বললেন—আমি তোমার উপর প্রসন্ন হয়েছি, তুমি বর নাও। মার পাদপদ্মে প্রণত হয়ে সে বললে—মা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমার কাণ্ড দেখে অবাক হয়েছি। যে ব্যক্তি এত খেটে, এত আয়োজন করে, এতদিন ধ'রে তোমার সাধনা করছিল, তাকে তোমার দয়া হল না। আর আমি কিছু জানি না, শুনি না, ভজনহীন, সাধনহীন, জ্ঞানহীন, ভক্তিহীন, আমার উপর এত কৃপা হ'ল। ভগবতী হাসতে হাসতে বললেন, বাছা। তোমার জন্মান্তরের কথা স্মরণ নাই, তুমি জন্ম জন্ম আমার তপস্যা করেছিলে, সেই সাধনবলে তোমার এরূপ জোটপাট হয়েছে, তাই আমার

দর্শন পেলে। এখন বল কি বর চাও ?

খ. কি জান ? অনেকটা পূর্বজন্মের সংস্কারেতে হয়। লোকে মনে করে, হঠাৎ হচ্ছে। একজন সকালে একপাত্র মদ খেয়েছিল, তাতেই বেজায় মাতাল, ঢলাঢলি আরম্ভ করলে। লোকে অবাক। একপাত্রে এত মাতাল কি করে হ'ল ? একজন বললে, ওরে ও সমস্ত রাত্রি মদ খেয়েছে। হনুমান সোনার লংকা দগ্ধ করলে। লোকে অবাক। একটা বানর এসে সব পুড়িয়ে দিলে। কিন্তু আবার বলেছে, আদত কথা এই—সীতার নিঃশ্বাসে আর রামের কোপে পুড়েছিল। আর দেখ, লালাবাবু। এত ঐশ্বর্য, পূর্বজন্মের সংস্কার না থাকলে ফস করে কি বৈরাগ্য হয় ? আর রানী ভবানী। মেয়েমানুষ হয়ে এত জ্ঞানভক্তি। একেবারে জ্ঞান পূর্ণের কেমন করে হ'ল ? জন্মান্তরীণ। পূর্ব পূর্ব জন্মে সব করা আছে। শরীরই ছোট হয় আবার বৃদ্ধ হয়—আত্মা সেইরূপে নয়।

দ্রঃ সংস্কার।

পেনসান। দ্রঃ দাসত্ব।

প্রকৃতি ভাব। শ্রীকৃষ্ণের শিরে ময়ূর পাখা, ময়ূর পাখাতে যোনি চিহ্ন আছে—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতিকে মাথায় রেখেছেন।

কৃষ্ণ রাসমণ্ডলে গেলেন। কিন্তু সেখানে নিজে প্রকৃতি হলেন। তাই দেখ রাস-মণ্ডলে তাঁর মেয়ের বেশ। নিজে প্রকৃতিভাব না হলে প্রকৃতির সঙ্গের অধিকারী হয় না। প্রকৃতিভাব হলে তবে রাস, তবে সম্ভোগ। কিন্তু সাধকের অবস্থায় খুব সাবধান হতে হয়। তখন মেয়েমানুষ থেকে অনেক অন্তরে থাকতে হয়। এমন কি ভক্তিমতী হলেও বেশী কাছে যেতে নাই। ছাদে উঠবার সময় হেলতে দুলতে নাই। হেললে দুললে পড়বার খুব সম্ভাবনা। যারা দুর্বল, তাদের ধরে ধরে উঠতে হয়।

প্রকৃতির ঐশ্বর্য। নামরূপ যেখানে, সেইখানেই প্রকৃতির ঐশ্বর্য। সীতা হনুমান-কে বলেছিলেন, 'বৎস! আমিই একরূপে রাম, একরূপে সীতা হয়ে আছি; একরূপে ইন্দ্র, একরূপে ইন্দ্রাণী—একরূপে ব্রহ্মা, একরূপে ব্রহ্মাণী—একরূপে রুদ্র, একরূপে রুদ্রাণী—হয়ে আছি'।—নামরূপ যা আছে সব চিচ্ছক্তির ঐশ্বর্য। সমস্তই; এমন কি ধ্যান ধ্যাতা পর্যন্ত। আমি ধ্যান কচ্চি, যতক্ষণ বোধ ততক্ষণ তাঁরই এলাকায় আছি।

প্রকৃতির ভিন্নতা। ঈশ্বরের সৃষ্টিতে নানা রকম জীব, জন্তু, গাছপালা আছে। জানোয়ারের মধ্যে ভাল আছে, মন্দ আছে। বাঘের মতো হিংস্র জন্তু আছে। গাছের মধ্যে অমৃতের ন্যায় ফল হয় এমন আছে; আবার বিষফলও আছে। তেমনি মানুষের মধ্যে ভাল আছে, মন্দও আছে; সাধু আছে, অসাধুও আছে, সংসারী জীব আছে আবার ভক্ত আছে।

প্রচার (যথার্থ)। প্রকৃত প্রচার কি রকম জান ? লোককে না ভজিয়ে আপনি ভজলে যথেষ্ট প্রচার হয়। যে আপনি মুক্ত হতে চেষ্টা করে, সে যথার্থ প্রচার করে। যে আপনি মুক্ত, শত শত লোক কোথা হতে আপনি এসে তার কাছে শিক্ষা লয়। ফুল ফুটলে ভ্রমর আপনি এসে জোটে।

প্রতিপাদ্য : সচ্চিদানন্দ। আমার ধর্ম ঠিক আর অপরের ধর্ম ভুল—এ মত ভাল না। ঈশ্বর এক—এক বৈ দুই নাই। তাঁকে ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন লোকে ডাকে। কেউ বলে গড্, কেউ বলে আল্লা, কেউ বলে কৃষ্ণ, কেউ বলে শিব, কেউ বলে ব্রহ্ম। যেমন পুকুরে জল আছে—এক ঘাটের লোক বলছে জল, আর এক ঘাটের লোক বলছে ওয়াটার, আর এক ঘাটের লোক বলছে পানি—হিন্দু বলছে জল, খৃষ্টান বলছে ওয়াটার, মুসলমান বলছে পানি—কিন্তু বস্তু এক। মত—পথ। এক একটি ধর্মের মত এক একটি পথ—ঈশ্বরের দিকে লয়ে যায়। যেমন নদী নানা দিক থেকে এসে সাগরসঙ্গমে মিলিত হয়।

বেদ পুরাণ তন্ত্রে, প্রতিপাদ্য একই সচ্চিদানন্দ। বেদে সচ্চিদানন্দ (ব্রহ্ম)। পুরাণেও সচ্চিদানন্দ (কৃষ্ণ, রাম প্রভৃতি)। তন্ত্রেও সচ্চিদানন্দ (শিব)। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণ, সচ্চিদানন্দ শিব।

প্রতিমা পূজা। ক. তুমি মাটির প্রতিমা পূজা বলছিলে। যদি মাটিরই হয়, সে পূজাতে প্রয়োজন আছে। নানা রকম পূজা ঈশ্বরই আয়োজন ক'রেছেন। যার জগৎ তিনিই এ সব ক'রেছেন—অধিকারী ভেদে। যার যা পেটে যা সয়, মা সেইরূপ খাবার বন্দোবস্ত করেন। এক মার পাঁচ ছেলে। বাড়িতে মাছ এসেছে। মা মাছের নানা রকম ব্যঞ্জন ক'রেছেন—যার যা পেটে সয়। কারও জন্য মাছের পোলোয়া, কারও জন্য মাছের অম্বল, মাছের চড়চড়ি, মাছ ভাজা, এই সব ক'রেছেন। যেটি যার ভাল লাগে। যেটি যার পেটে সয়—বুঝলে?

খ. প্রতিমা-পূজাতে দোষ কি? বেদান্তে বলে, যেখানে 'অস্তি, ভাতি আর প্রিয়', সেইখানেই তাঁর প্রকাশ। তাই তিনি ছাড়া কোন জিনিসই নাই।

আবার দেখ, ছোট মেয়েরা পুতুল খেলা কত দিন করে? যতদিন না বিবাহ হয়, আর যত দিন না স্বামী সহবাস করে। বিবাহ হলে পুতুলগুলি পেঁটরায় তুলে ফেলে। ঈশ্বর লাভ হ'লে আর প্রতিমা-পূজার কি দরকার?

প্রতিমায় আবির্ভাব। প্রতিমায় আবির্ভাব হ'তে গেলে তিনটি জিনিসের দরকার—প্রথম পূজারীর ভক্তি, দ্বিতীয় প্রতিমা সুন্দর হওয়া চাই, তৃতীয় গৃহস্বামীর ভক্তি।

প্রদীপ। 'লোকশিক্ষা' দ্রষ্টব্য।

প্রবর্তক-সাধক-সিদ্ধ। প্রথমে প্রবর্তক। সে পড়ে, শুনে। তারপর সাধক—তাঁকে ডাকছে, ধ্যান চিন্তা করছে, নাম গুণ কীর্তন করছে। তারপর সিদ্ধ—তাঁকে বোধে বোধ করছে, দর্শন করছে। তারপর সিদ্ধের সিদ্ধ; যেমন চৈতন্যদেবের অবস্থা—কখনও বাৎসল্য, কখনও মধুর ভাব।

প্রবর্তকের ভাব। ভয় দেখিয়ে—ভয় পেয়ে—ভজনা, প্রবর্তকের ভাব।

প্রেম। ক. তোমারা 'প্যাম' 'প্যাম' কর; কিন্তু প্রেম কি সামান্য জিনিস গা? চৈতন্যদেবের 'প্রেম' হয়েছিল। প্রেমের দুটি লক্ষণ। প্রথম—জগৎ ভুল হয়ে যাবে। এত ঈশ্বরেতে ভালবাসা যে বাহ্যশূন্য! চৈতন্যদেব 'বন দেখে বৃন্দাবন ভাবে, সমুদ্র দেখে শ্রীযমুনা ভাবে!'

দ্বিতীয় লক্ষণ—নিজের দেহ যে এত প্রিয় জিনিস, এর উপরও মমতা থাকবে

না, দেহাত্মবোধ একেবারে চলে যাবে।

ঈশ্বর দর্শন না হলে প্রেম হয় না।

খ. নিষ্ঠার পর ভক্তি। ভক্তি পাকলে ভাব হয়। ভাব ঘনীভূত হলে মহাভাব হয়। সর্বশেষে প্রেম।

প্রেম রজ্জুর স্বরূপ। প্রেম হ'লে ভক্তের ঈশ্বর বাঁধা পড়েন আর পালাতে পারেন না। সামান্য জীবের ভাব পর্যন্ত হয়। ঈশ্বরকোটি না হ'লে মহাভাব প্রেম হয় না। চৈতন্যদেবের হয়েছিল।

গ. পূজার চেয়ে জপ বড়। জপের চেয়ে ধ্যান বড়। ধ্যানের চেয়ে ভাব বড়। ভাবের চেয়ে মহাভাব প্রেম বড়। চৈতন্যদেবের প্রেম হয়েছিল। প্রেম হলে ঈশ্বরকে বাঁধবার দড়ি পাওয়া গেল।

প্রেমাভক্তি। গোপীদের ভক্তি প্রেমাভক্তি; অব্যভিচারিণী ভক্তি নিষ্ঠা ভক্তি। ব্যভিচারিণী ভক্তি কাকে বলে জান? জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি। যেমন, কৃষ্ণই সব হয়েছেন তিনিই পরব্রহ্ম, তিনিই রাম, তিনিই শিব, তিনিই শক্তি। কিন্তু ও জ্ঞানটুকু প্রেমাভক্তির সঙ্গে মিশ্রিত নাই। দ্বারকায় হনুমান এসে বললে, 'সীতা-রাম দেখবো।' ঠাকুর রুক্মিণীকে বললেন, 'তুমি সীতা হয়ে বস, তা না হ'লে হনুমানের কাছে রক্ষা নাই।' পান্ডবেরা যখন রাজসূয় যজ্ঞ করেন, তখন যত রাজা সব যুধিষ্ঠিরকে সিংহাসনে বসিয়ে প্রণাম করতে লাগলো। বিভীষণ বললেন, আমি এক নারায়ণকে প্রণাম করবো আর কারুকে করবো না। তখন ঠাকুর নিজে যুধিষ্ঠিরকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করতে লাগলেন। তবে বিভীষণ রাজমুকুটসুদ্ধ সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম করে।

কি রকম জান? যেমন বাড়ীর বউ। দেওর, ভাশুর, শ্বশুর, স্বামী সকলকে সেবা করে, পা ধোবার জল দেয়, গামছা দেয়, পিঁড়ে পেতে দেয়, কিন্তু এক স্বামীর সঙ্গেই অন্য রকম সম্বন্ধ।

এই প্রেমাভক্তিতে দুটি জিনিস আছে। 'অহংতা' আর 'মমতা'। যশোদা ভাবতেন, আমি না দেখলে গোপালকে কে দেখবে, তা হ'লে গোপালের অসুখ করবে। কৃষ্ণকে ভগবান বলে যশোদার বোধ ছিল না। আর 'মমতা'—আমারজ্ঞান, আমার গোপাল। উদ্ধব বললেন, মা! তোমার কৃষ্ণ সাক্ষাৎ ভগবান, তিনি জগৎ চিন্তামণি। তিনি সামান্য নন। যশোদা বললেন, ওরে তোদের চিন্তামণি নয়, আমার গোপাল কেমন আছে জিজ্ঞাসা করছি।—চিন্তামণি না, আমার গোপাল।

দ্রঃ 'ভক্তি : জ্ঞানমিশ্রিত ও প্রেমা'। 'ক্ষীরের পোর'।

প্রেমাভক্তির নানারূপ। ভক্তি অমনি করলেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। প্রেমাভক্তি না হ'লে ঈশ্বর লাভ হয় না। প্রেমাভক্তির আর একটি নাম রাগভক্তি। প্রেম, অনুরাগ, না হ'লে ভগবান লাভ হয় না। ঈশ্বরের উপর ভালবাসা না এলে তাঁকে লাভ করা যায় না।

আর এক রকম ভক্তি আছে। তার নাম বৈধী ভক্তি। এত জপ করতে হবে, উপোস করতে হবে, তীর্থে যেতে হবে; এত উপচারে পূজা করতে হবে, এতোগুলি বলিদান দিতে হবে—এ সব বৈধী ভক্তি। এ সব অনেক করতে করতে ক্রমে রাগ-

ভক্তি আসে। কিন্তু রাগভক্তি যতক্ষণ না হবে, ততক্ষণ ঈশ্বর ভাল হবে না। তাঁর উপর ভালবাসা চাই। সংসারবুদ্ধি একেবারে চলে যাবে, আর তাঁর উপর ষোল আনা মন হবে, তবে তাঁকে পাবে।

কিন্তু কারু কারু রাগভক্তি আপনা-আপনি হয়। স্বতঃসিদ্ধ। ছেলেবেলা থেকেই আছে। ছেলেবেলা থেকেই ঈশ্বরের জন্য কাঁদে। যেমন প্রহ্লাদ। 'বিধিবাদীয়' ভক্তি—যেমন, হাওয়া পাবে বলে পাখা করা। হাওয়ার জন্য পাখার দরকার হয়। ঈশ্বরের উপর ভালবাসা আসবে বলে জপ, তপ, উপবাস। কিন্তু যদি দক্ষিণে হাওয়া আপনি বয়, পাখাখানা লোকে ফেলে দেয়। ঈশ্বরের উপর অনুরাগ, প্রেম, আপনি এলে, জপাদি কর্ম ত্যাগ হয়ে যায়। হরিপ্রেমে মাতোয়ারা হলে বৈধীকর্ম কে করবে ?

যতক্ষণ না তাঁর উপর ভালবাসা জন্মায় ততক্ষণ ভক্তি কাঁচাভক্তি। তাঁর উপর ভালবাসা এলে, তখন সেই ভক্তির নাম পাকাভক্তি।

যার কাঁচা ভক্তি, সে ঈশ্বরের কথা, উপদেশ ধারণা করতে পারে না। পাকাভক্তি হ'লে ধারণা করতে পারে। ফটোগ্রাফের কাচে যদি কালি (Silver Nitrate) মাখানো থাকে, তা হ'লে যা ছবি পড়ে তা রয়ে যায়। কিন্তু শুধু কাচের উপর হাজার ছবি পড়ুক একটাও থাকে না—একটু স'রে গেলেই, যেমন কাচ তেমনি কাচ। ঈশ্বরের উপর ভালবাসা না থাকলে উপদেশ ধারণা হয় না।

['বিধিবাদীয় ভক্তি ও প্রেমাভক্তি' দ্রষ্টব্য]

প্রেমের ভেদ। একাঙ্গী, কি না, ভালবাসা একদিক থেকে। যেমন জল হাঁসকে চাচ্চে না, কিন্তু হাঁস জলকে ভালবাসে। আবার আছে সাধারণী, সমঞ্জসা, সমর্থা। সাধারণী প্রেম—নিজের সুখ চায়, তুমি সুখী হও আর না হও, যেমন চন্দ্রাবলীর ভাব। আবার সমঞ্জসা, আমারও সুখ হোক, তোমারও হোক। এ খুব ভাল অবস্থা।

সকলের উচ্চ অবস্থা—সমর্থা! যেমন শ্রীমতীর। কৃষ্ণসুখে সুখী, তুমি সুখে থাক, আমার যাই হোক।

গোপীদের এই ভাব বড় উচ্চ ভাব।

প্রেমোন্মাদ। রাসমধ্যে যখন শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হলেন, গোপীরা একেবারে উন্মাদিনী। বৃক্ষ দেখে বলে, তুমি বুঝি তপস্বী, শ্রীকৃষ্ণকে নিশ্চয় দেখেছ। তা না হ'লে নিশ্চল, সমাধিস্থ হয়ে রয়েছ কেন ? তৃণাচ্ছাদিত পৃথিবী দেখে বলে, হে পৃথিবী, তুমি নিশ্চিত তাঁকে দর্শন করেছ, না হ'লে তুমি রোমাঞ্চিত হয়ে রয়েছ কেন ? অবশ্য তুমি তাঁর স্পর্শ সুখ সম্ভোগ করেছ। আবার মাধবীকে দেখে বলে, ও মাধবী, আমায় মাধব দে। গোপীদের প্রেমোন্মাদ।

প্রেমোন্মাদনা। আহা, সেই প্রেমের যদি একবিন্দু কারু হয়। কি অনুরাগ। কি ভালবাসা। শুধু ষোল আনা অনুরাগ নয়, পাঁচ সিকা পাঁচ আনা। এরই নাম প্রেমোন্মাদ। কথাটা এই, তাঁকে ভালবাসতে হবে। তাঁর জন্য ব্যাকুল হতে হবে। তা তুমি যে পথেই থাকো, সাকারেই বিশ্বাস কর বা নিরাকারেই বিশ্বাস কর,—ভগবান মানুষ হয়ে অবতার হন, এ কথা বিশ্বাস কর আর না কর—তাতে

অনুরাগ থাকলে হ'ল। তখন তিনি যে কেমন, তিনি নিজেই জানিয়ে দেবেন। যদি পাগল হতে হয়, সংসারের জিনিস লয়ে কেন পাগল হবে? যদি পাগল হতে হয়, তবে ঈশ্বরের জন্য পাগল হও।

প্রবর্তক। আর এক আছে প্রবর্তক, সাধক, সিদ্ধ, সিদ্ধের সিদ্ধ। যে ব্যক্তি সবে ঈশ্বরের আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছে, সে প্রবর্তকের থাক। প্রবর্তক ফোঁটা কাটে, তিলক মালা পরে, বাহিরে খুব আচার করে। সাধক আরো এগিয়ে গেছে; তার লোক-দেখান ভাব কমে যায়, সাধক ঈশ্বরকে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়, আন্তরিক তাঁকে ডাকে, তাঁর নাম করে, তাঁকে সরল অন্তঃকরণে প্রার্থনা করে।

প্রহ্লাদ। প্রহ্লাদ কখন দেখতেন সোঽহং; আবার কখন দাসভাবে থাকতেন। ভক্তি না নিলে কি নিয়ে থাকে? তাই সেব্য সেবকভাব আশ্রয় কর্তে হয়—তুমি প্রভু, আমি দাস। হরিরস আস্বাদন করবার জন্য। রসরসিকের ভাব—হে ঈশ্বর, তুমি রস, আমি রসিক।

দ্রঃ ভক্তি (সকাম নিষ্কাম)।

ফোঁস করা। সংসারী ফোঁস করবে। বিষ ঢালা উচিত নয়। কাজে কারু অনিষ্ট যেন না করে। কিন্তু শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য ক্রোধের আকার দেখাতে হয়। না হ'লে শত্রুরা এসে অনিষ্ট করবে। ত্যাগীর ফোঁসের দরকার নাই।

ফোঁস করতে বাধা নেই। একটা মাঠে রাখালেরা গরু চরাত। সেই মাঠে একটা ভয়ানক বিষধর সাপ ছিল। সকলেই সেই সাপের ভয়ে অত্যন্ত সাবধানে থাকতো। একদিন একটি ব্রহ্মচারী সেই মাঠের পথ দিয়ে আসছিল। রাখালেরা দৌড়ে এসে বলে, 'ঠাকুর মহাশয়। ওদিকে যাবেন না। ওদিকে যাবেন না। ওদিকে একটা ভয়ানক বিষাক্ত সাপ আছে!' ব্রহ্মচারী বলে, 'বাবা, তা হোক, আমার তাতে ভয় নাই, আমি মন্ত্র জানি।' এই কথা বলে ব্রহ্মচারী সেই দিকে চলে গেল। রাখালেরা ভয়ে কেউ সঙ্গে গেল না। এদিকে সাপটা ফণা তুলে দৌড়ে আসছে, কিন্তু কাছে আসতে না আসতে ব্রহ্মচারী যেই একটি মন্ত্র পড়লে, অমনি সাপটা কেঁচোর মতো পায়ের কাছে পড়ে রইল। ব্রহ্মচারী বলে, 'ওরে। তুই কেন পরের হিংসা করে বেড়াস, আয় তোকে মন্ত্র দিব। এই মন্ত্র জপলে তোর ভগবানে ভক্তি হবে, ভগবান লাভ হবে, আর হিংসা প্রবৃত্তি থাকবে না।' এই বলে সে সাপটাকে মন্ত্র দিল। সাপটা মন্ত্র পেয়ে গুরুকে প্রণাম করলে আর জিজ্ঞাসা করলে, 'ঠাকুর। কি করে সাধনা করব বলুন।' গুরু বললেন, 'এই মন্ত্র জপ কর, আর কারও হিংসা কোরো না।' ব্রহ্মচারী যাবার সময় বললে, 'আমি আবার আসবো।' এই রকমে কিছুদিন যায়। রাখালেরা দেখে যে, সাপটা আর কামড়াতে আসে না। ঢ্যালা মারে তবুও রাগ হয় না। যেন কেঁচোর মতন হয়ে গেছে। একদিন একজন রাখাল কাছে গিয়ে ল্যাজ ধরে খুব ঘুরপাক দিয়ে আছড়ে ফেলে দিলে। সাপটার মুখ দিয়ে রক্ত উঠতে লাগলো। আর সে অচেতন হয়ে পড়লো। নড়ে না চড়ে না। রাখালেরা মনে করলে যে সাপটা মরে গেছে। এই মনে করে তারা

সব চলে গেল। অনেক রাত্রে সাপের চেতনা হ'ল। সে আস্তে আস্তে অতি কষ্টে তার গর্তের ভিতর চলে গেল। শরীর চূর্ণ—নড়বার শক্তি নাই। অনেক দিন পরে যখন অস্থি-চর্মসার, তখন বাহিরে আহারের চেষ্টায় রাত্রে এক একবার চরতে আসত ; ভয়ে দিনের বেলা আসতো না, মন্ত্র লওয়া অবধি আর হিংসা করে না। মাটি, পাতা, গাছ থেকে পড়ে গেছে এমন ফল খেয়ে প্রাণধারণ করতো। প্রায় এক বৎসর পরে ব্রহ্মচারী আবার এলো। এসেই সাপের সন্ধান করলে। রাখালেরা বললে, 'সে সাপটা মরে গেছে।' ব্রহ্মচারীর কিন্তু একথা বিশ্বাস হ'ল না। সে জানে যে মন্ত্র ও নিয়েছে তা সাধন না হলে দেহত্যাগ হবে না। খুঁজে খুঁজে সেই দিকে তার দেওয়া নাম ধরে ডাকতে লাগলো। সে গুরুদেবের আওয়াজ শুনে গর্ত থেকে বেরিয়ে এলো ও খুব ভক্তিভরে প্রণাম করলে। ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করলে, 'তুই কেমন আছিস ?' সে বললে, 'আজ্ঞে ভাল আছি।' ব্রহ্মচারী বললে, 'তবে তুই এত রোগা হয়ে গিয়েছিস কেন ?' সাপ বল্লে, 'ঠাকুর। আপনি আদেশ করেছেন কারও হিংসা করো না। তাই পাতাটা, ফলটা খাই বলে, বোধহয় রোগা হয়ে গিছি।' ওর সত্ত্বগুণ হয়েছে কি না, তাই কারু উপর ক্রোধ নাই। সে ভুলেই গিয়েছিল যে, রাখালেরা মেরে ফেলবার যোগাড় করেছিল। ব্রহ্মচারী বললে, 'শুধু না খাওয়ার দরুন এরূপ অবস্থা হয় না, অবশ্য আরো কারণ আছে, ভেবে দ্যাখ।' সাপটার মনে পড়ল যে রাখালেরা একদিন আছাড় মেরেছিল। তখন সে বললে, 'ঠাকুর মনে পড়েছে বটে ; রাখালেরা একদিন আছাড় মেরেছিল। তারা অজ্ঞান, জানে না যে আমার মনের কি অবস্থা : আমি যে কাহাকেও কামড়াব না বা কোনরূপ অনিষ্ট করব না, কেমন করে জানবে ?' ব্রহ্মচারী বললে, 'ছি। তুই এত বোকা, আপনাকে রক্ষা করতে জানিস না ? আমি কামড়াতে বারণ করেছি, ফোঁস করতে নয়। ফোঁস করে তাদের ভয় দেখাস নাই কেন ?' দুষ্ট লোকের কাছে ফোঁস করতে হয়—ভয় দেখাতে হয়, পাছে অনিষ্ট করে। তাদের গায়ে বিষ ঢালতে নাই, অনিষ্ট করতে নাই।

বই-শাস্ত্র উপায় বলে। বই শাস্ত্র এ সব কেবল ঈশ্বরের কাছে পৌঁছিবার পথ বলে দেয়। পথ উপায়, জেনে লবার পর, আর বই শাস্ত্রে কি দরকার ? তখন নিজে কাজ করতে হয়।

একজন একখানা চিঠি পেয়েছিল, কুটুম বাড়ি তত্ত্ব করতে হবে, কি কি জিনিস লেখা ছিল। জিনিস কিনতে দেবার সময় চিঠিখানা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। কর্তাটি তখন খুব ব্যস্ত হয়ে চিঠির খোঁজ আরম্ভ করলেন। অনেকক্ষণ ধরে অনেকজন মিলে খুঁজলে। শেষে চিঠিখানা পাওয়া গেল। তখন আর আনন্দের সীমা নাই। কর্তা ব্যস্ত হয়ে অতি যত্নে চিঠিখানা হাতে নিলেন আর দেখতে লাগলেন, কি লেখা আছে। লেখা এই, পাঁচ সের সন্দেশ পাঠাইবে, একখানা কাপড় পাঠাইবে ; আরও কত কি। তখন আর চিঠির দরকার নাই, চিঠি ফেলে সন্দেশ ও কাপড়ের আর অন্যান্য জিনিসের চেষ্টায় বেরুলেন। চিঠির দরকার

কতক্ষণ ? যতক্ষণ সন্দেশ, কাপড় ইত্যাদির বিষয় না জানা যায়। তার পরই পাবার চেষ্টা।

শাস্ত্রে তাঁকে পাবার উপায়ের কথা পাবে। কিন্তু খবর সব জেনে কর্ম আরম্ভ করতে হয়। তবে তো বস্তুলাভ।

বাঁচবার ইচ্ছা কেন ? রাবণ বধের পর রাম লক্ষ্মণ লঙ্কায় প্রবেশ করলেন, রাবণের বাটীতে গিয়ে দেখেন, রাবণের মা নিকষা পালিয়ে যাচ্ছে। লক্ষ্মণ আশ্চর্য হয়ে বললেন, রাম, নিকষার সবংশ নাশ হ'ল তবু প্রাণের উপর এত টান! নিকষাকে কাছে ডাকিয়ে রাম বললেন, তোমার ভয় নাই, তুমি কেন পালাচ্ছিলে? নিকষা বললে, রাম! আমি সেজন্য পালাই নাই—বেঁচে ছিলাম ব'লে তোমার এত লীলা দেখতে পেলাম—যদি আরও বাঁচি তো আরও কত লীলা দেখতে পাব! তাই বাঁচবার সাধ।

বাসনা না থাকলে শরীর ধারণ হয় না।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্কিম তোমাদের একজন পণ্ডিত। বঙ্কিমের সঙ্গে দেখা হয়েছিল—আমি জিজ্ঞাসা করলুম, মানুষের কর্তব্য কি? তা বলে, 'আহার, নিদ্রা আর মৈথুন।' এই সকল কথাবার্তা শুনে আমার ঘৃণা হ'ল। বললুম যে, তোমার এ কি রকম কথা। তুমি তো বড় ছ্যাঁচড়া। যা সব রাতদিন চিন্তা করছো, কাজে করছো, তাই আবার মুখ দিয়ে বেরুচে। মুলো খেলেই মুলোর ঢেঁকুর ওঠে। তারপর অনেক ঈশ্বরীয় কথা হ'ল। ঘরে সংকীর্তন হ'ল। আমি আবার নাচলুম। তখন বলে, মহাশয়! আমাদের ওখানে একবার যাবেন। আমি বললুম, সে ঈশ্বরের ইচ্ছা।

[কলকাতা বেনেটোলা নিবাসী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পরম ভক্ত শ্রীঅধরলাল সেনের বাড়ীতে শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চাটুয্যের সঙ্গে শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের দেখা হয়েছিল। বঙ্কিমবাবু তাঁকে এই একবার মাত্র দর্শন করেছিলেন।]

বজ্জাত আমি। আমি (খ) দ্রষ্টব্য

বড় বেলায় দামড়া। বড় বেলায় দামড়া হয়েছে, আমি বর্ধমানে দেখেছিলাম। একটা দামড়া, গাই গরুর কাছে যেতে দেখে আমি জিজ্ঞেস কল্লুম, এ কি হলো? এ তো দামড়া! তখন গাড়োয়ান বললে, মশাই এ বেশী বয়সে দামড়া হয়েছিল। তাই আগেকার সংস্কার যায় নাই।

এক জায়গায় সন্ন্যাসীরা বসে আছে—একটি স্ত্রীলোক সেইখান দিয়ে চলে যাচ্ছে। সকলেই ঈশ্বর চিন্তা করছে, একজন আড় চোখে চেয়ে দেখলে: সে তিনটি ছেলে হবার পর সন্ন্যাসী হয়েছিল।

একটি বাটিতে যদি রসুন গোলা যায়, রসুনের গন্ধ কি যায়?

বন্ধ ও মুক্ত। মন থেকে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ হ'লে ঈশ্বরে মন যায়, মন গিয়ে লিপ্ত হয়। যিনিই বন্ধ, তিনিই মুক্ত হতে পারেন। ঈশ্বর থেকে বিমুখ হ'লেই বন্ধ—নিক্তির নীচের কাঁটা উপরের কাঁটা থেকে তফাৎ হয় কখন. যখন নিক্তির বাটিতে কামিনী-কাঞ্চনের ভার পড়ে।

বদ্ধজীব। ক. উট কাঁটা ঘাস বড় ভালবাসে। কিন্তু যত খায় মুখ দিয়ে রক্ত

দর্‌ দর্‌ করে পড়ে ; তব্‌ সেই কাঁটা ঘাসই খাবে, ছাড়বে না। সংসারী লোক এত শোক-তাপ পায়, তব্‌ কিছ্‌দিনের পর যেমন তেমনি। স্ত্রী মরে গেল, কি অসতী হ'ল, তব্‌ আবার বিয়ে করবে। ছেলে মরে গেল কত শোক পেলে, কিছ্‌-দিন পরেই সব ভুলে গেল। সেই ছেলের মা, যে শোকে অধীর হয়েছিল, আবার কিছ্‌দিন পরে চুল বাঁধলো, গয়না পরলো। এ রকম লোক মেয়ের বিয়েতে সর্ব-স্বান্ত হয়, আবার বছরে বছরে তাদের মেয়ে ছেলেও হয়। মোকন্দমা করে সর্বস্বান্ত হয়, আবার মোকন্দমা করে। যা ছেলে হয়েছে তাদেরই খাওয়াতে পারে না, পড়াতে পারে না, ভাল ঘরে রাখতে পারে না, আবার বছরে বছরে ছেলে হয়।

আবার কখনও কখনও যেন সাপে ছ‍ুঁচো গেলা হয়। গিলতেও পারে না, আবার উগরাতেও পারে না। বন্ধজীব হয়তো ব্‌ঝেছে যে, সংসারে কিছ্‌ই সার নাই ; আমড়ার কেবল আঁটি আর চামড়া। তব্‌ ছাড়তে পারে না। তব্‌ও ঈশ্বরের দিকে মন দিতে পারে না।

কেশব সেনের একজন আত্মীয়, পঞ্চাশ বছর বয়স, দেখি তাস খেলছে। যেন ঈশ্বরের নাম করবার সময় হয় নাই।

বন্ধজীবের আর একটি লক্ষণ আছে। তাকে যদি সংসার থেকে সরিয়ে ভাল জায়গায় রাখা যায়, তাহলে হে‍ঁদিয়ে হে‍ঁদিয়ে মারা যাবে। বিষ্ঠার পোকা বিষ্ঠাতেই বেশ আনন্দ। ঐতেই বেশ হৃষ্টপ‍ুষ্ট হয়। যদি সেই পোকাকে ভাতের হাঁড়িতে রাখ, তাহলে মরে যাবে।

খ. যারা কেবল কামিনী-কাঞ্চন নিয়ে আছে—ঈশ্বরকে একবারও ভাবে না, তারা বন্ধজীব। তাদের দিয়ে কি মহৎ কাজ হবে ? যেমন কাকে ঠোকরান আম, ঠাকুর সেবায় লাগে না, নিজের খেতেও সন্দেহ।

বন্ধজীব। সংসারী জীব, এরা যেমন গ‍ুটীপোকা। মনে করলে কেটে বেরিয়ে আসতে পারে ; কিন্তু নিজে ঘর বানিয়েছে, ছেড়ে আসতে মায়া হয়। শেষে মৃত্যু।

গ. জীবের প্রকার দেখ।

ঘ. বন্ধজীবেরা সংসারের কামিনী-কাঞ্চনে বন্ধ হয়েছে, হাত-পা বাঁধা। আবার মনে করে যে, সংসারের ঐ কামিনী ও কাঞ্চনেতেই স‍ুখ হবে, আর নির্ভয়ে থাকবে। জানে না যে ওতেই মৃত্যু হবে। বন্ধজীব যখন মরে তার পরিবার বলে, 'তুমি তো চল্লে, আমার কি করে গেলে ?' আবার এমনি মায়া যে, প্রদীপটাতে বেশী সলতে জ্বললে বন্ধজীব বলে, 'তেল প‍ুড়ে যাবে, সলতে কমিয়ে দাও।' এদিকে মৃত্যুশয্যায় শ‍ুয়ে রয়েছে।

বন্ধজীবেরা ঈশ্বরচিন্তা করে না। যদি অবসর হয় তা হ'লে হয় আবোল-তাবোল ফালতো গল্প করে, নয় মিছে কাজ করে। জিজ্ঞাসা করলে বলে, আমি চুপ করে থাকতে পারি না, তাই বেড়া বাঁধছি। হয়তো সময় কাটে না দেখে তাস খেলতে আরম্ভ করে।

বন্ধন ও ম‍ুক্তি। বন্ধন আর ম‍ুক্তি দ‍ুয়ের কর্তাই তিনি। তাঁর মায়াতে সংসারী জীব কামিনী-কাঞ্চনে বন্ধ, আবার তাঁর দয়া হলেই ম‍ুক্ত। তিনি 'ভব-বন্ধনের

বন্ধনহারিণী তারিণী'। তিনি মনকে আঁখি ঠেরে ইসারা করে বলে দিয়েছেন, 'যা, এখন সংসার করগে যা'। মনের কি দোষ? তিনি যদি আবার দয়া করে মনকে ফিরিয়ে দেন, তাহলে বিষয়বুদ্ধির হাত থেকে মুক্তি হয়। তখন আবার তাঁর পাদপদ্মে মন হয়।

দ্রঃ মুক্তির ডাক।

বল বাড়ান। অশ্বত্থ গাছ যখন চারা থাকে, তখন চারিদিকে বেড়া দেয়, পাছে ছাগল গরুতে নষ্ট করে। কিন্তু গুঁড়ি মোটা হলে আর বেড়ার দরকার থাকে না। হাতি বেঁধে দিলেও গাছের কিছু করতে পারে না। যদি নির্জনেতে সাধন করে, ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তি লাভ করে বল বাড়িয়ে, বাড়ি গিয়ে সংসার করে, তাঁকে পাবে। ভক্তি লাভের পর সংসার করা যায়। যেমন হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙলে হাতে আর আঠা লাগে না।

বলিদান। বিশেষ বিশেষ অবস্থায় শাস্ত্রে আছে, বলি দেওয়া যেতে পারে। বিধি-বাদীয় বলিতে দোষ নাই। যেমন অষ্টমীতে একটি পাঁঠা। কিন্তু সকল অবস্থাতে হয় না। আমার এখন এমন অবস্থা, দাঁড়িয়ে বলি দেখতে পারি না। মার প্রসাদী মাংস, এ অবস্থায় খেতে পারি না। তাই আঙ্গুলে করে একটু ছুঁয়ে মাথায় ফোঁটা কাটি; পাছে মা রাগ করেন।

আবার এমন অবস্থা হয় যে, দেখি সর্বভূতে ঈশ্বর, পিঁপড়েতেও তিনি। এ অবস্থায় হঠাৎ কোন প্রাণী মরলে এই সান্ত্বনা হয় যে তার দেহমাত্র বিনাশ হ'ল। আত্মার মৃত্যু নাই।

বস্তুবিচার। এই দেখ, টাকাতেই বা কি আছে, আর সুন্দর দেহেই বা কি আছে! বিচার কর, সুন্দরীর দেহেতেও কেবল হাড়, মাংস, চর্বি, মলমূত্র এই সব আছে। এই সব বস্তুতে মানুষ ঈশ্বরকে ছেড়ে কেন মন দেয়? কেন ঈশ্বরকে ভুলে যায়?

বস্ত্রহরণের মানে। অষ্টপাশ, গোপীদের সব পাশই গিয়েছিল, কেবল লজ্জা বাকী ছিল। তাই তিনি ও পাশটাও ঘুচিয়ে দিলেন। ঈশ্বর লাভ হ'লে সব পাশ চলে যায়।

বাউল মত। একজন বাউল এসেছিল। তা আমি বল্লাম, তোমার রসের কাজ সব হয়ে গেছে? খোলা নেমেছে? যত রস জ্বাল দেবে, তত রেফাইন হবে। প্রথম, আকের রস—তার পর গুড়—তার পর দোলো—তার পর চিনি—তার পর মিছরি, ওলা এই সব। ক্রমে ক্রমে আরও রেফাইন হচ্ছে।

খোলা নামবে কখন? অর্থাৎ সাধন শেষ হবে কবে?—যখন ইন্দ্রিয় জয় হবে—যেমন জোঁকের উপর চুণ দিলে জোঁক আপনি খুলে পড়ে যাবে—ইন্দ্রিয় তেমনি শিথিল হয়ে যাবে। রমণীর সঙ্গে থাকে না করে রমণ।

ওরা অনেকে রাধাতন্ত্রের মতে চলে। পঞ্চতত্ত্ব নিয়ে সাধন করে পৃথিবীতত্ত্ব, জল-তত্ত্ব, অগ্নিতত্ত্ব, বায়ুতত্ত্ব, আকাশতত্ত্ব—মল, মূত্র, রজ, বীজ এই সব তত্ত্ব। এ সব সাধন বড় নোংরা সাধন, যেমন পায়খানার ভিতর দিয়ে বাড়ীর মধ্যে ঢোকা।

বহুরূপী। একজন বাহ্যে গিছিল—দেখলে, গাছের উপর একটি সুন্দর জানোয়ার

রয়েছে। সে ক্রমে আর একজনকে বললে, 'ভাই! অমুক গাছে আমি একটি লাল রঙের জানোয়ার দেখে এলুম।' সে লোকটি বললে, 'আমিও দেখেছি, তা সে লাল রঙ হতে যাবে কেন? সে যে সবুজ রঙ।' আর একজন বললে, 'না, না; সে সবুজ হতে যাবে কেন; সে যে হলদে!' এইরূপে আরও কেউ কেউ বললে, 'বেগুনী, নীল, কাল, ইত্যাদি।' শেষে ঝগড়া। তখন তারা গাছতলায় গিয়ে দেখে একজন লোক বসে। জিজ্ঞাসা করায়, সে বললে, 'আমি এই গাছতলায় থাকি, আমি সে জানোয়ারটিকে বেশ জানি। তোমরা যা যা বলছো সব সত্য; সে কখনও লাল কখনও সবুজ কখনও হলদে কখনও নীল আরও সব কত কি হয়। আবার কখনও দেখি কোন রঙই নাই।

যে ব্যক্তি সদা সর্বদা ঈশ্বর চিন্তা করে, সেই জানতে পারে, তাঁর স্বরূপ কী। সে ব্যক্তিই জানে যে ঈশ্বর নানারূপে দেখা দেন। নানা ভাবে দেখা দেন। তিনি সগুণ আবার নির্গুণ। গাছতলায় যে থাকে সেই জানে যে, বহুরূপীর নানা রঙ, আবার কখন কখন কোন রঙই থাকে না। অন্য লোকে কেবল তর্ক ঝগড়া করে কষ্ট পায়।

বাউল মতে। শাক্তমতের সিদ্ধকে বলে কৌল। বেদান্তমতে বলে পরমহংস। বাউল বৈষ্ণবদের মতে সাঁই। 'সাঁইয়ের পর আর নাই!'

বাউল সিদ্ধ হলে সাঁই হয়। তখন সব অভেদ। অর্ধেক মালা গোহাড়, অর্ধেক মালা তুলসীর। হিঁদুর নীর—মুসলমানের পীর।

সাঁইয়েরা বলে—আলেখ। আলেখ। বেদমতে বলে ব্রহ্ম; ওরা বলে আলেখ। জীবদের বলে—আলেখ আসে আলেখ যায়; অর্থাৎ জীবাত্মা অব্যক্ত থেকে এসে তাইতে লয় হয়।

তারা বলে, হাওয়ার খবর জান?

অর্থাৎ কুলকুণ্ডলিনী জাগরণ হলে ঈড়া পিঙ্গলা সুষুম্না—এদের ভিতর দিয়ে যে মহাবায়ু উঠে, তাহার খবর।

জিজ্ঞাসা করে, কোন পৈঠেতে আছ?—ছটা পইঠে—ষড়চক্র।

যদি বলে পঞ্চমে আছে, তার মানে যে, বিশুদ্ধ চক্রে মন উঠেছে।

ওরা সিদ্ধাবস্থাকে বলে সহজ অবস্থা। এক থাকের লোক আছে, তারা 'সহজ' 'সহজ' করে চ্যাঁচায়। সহজাবস্থার দুটি লক্ষণ বলে। প্রথম—কৃষ্ণগন্ধ গায়ে থাকবে না। দ্বিতীয়—পদ্মের উপর অলি বসবে, কিন্তু মধু পান করবে না। 'কৃষ্ণগন্ধ' নাই—এর মানে ঈশ্বরের ভাব সমস্ত অন্তরে, বাহিরে কোন চিহ্ন নাই—হরিনাম পর্যন্ত মুখে নাই। আর একটির মানে, কামিনীতে আসক্তি নাই—জিতেন্দ্রিয়।

ওরা ঠাকুরপুজা, প্রতিমাপুজা, এ সব লাইক করে না, জীবন্ত মানুষ চায়। তাই ত ওদের এক থাকের লোককে বলে কর্তাভজা, অর্থাৎ যারা কর্তাকে—গুরুকে—ঈশ্বরবোধে ভজনা করে—পুজা করে।

বাহুরের অবস্থা। অহংকার ভাল নয়। 'আমি করছি' এটি অজ্ঞান থেকে হয়; হে ঈশ্বর, তুমি করছ—এইটি জ্ঞান। ঈশ্বর কর্তা আর সব অকর্তা।

'আমি' 'আমি' করলে যে কত দুর্গতি হয়, বাছুরের অবস্থা ভাবলে বুঝতে পারবে। বাছুরে 'হাম মা, হাম মা' (আমি আমি) করে। তার দুর্গতি দেখ। হয়ত সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত লাঙ্গল টানতে হচ্ছে ; রোদ নাই, বৃষ্টি নাই। হয়ত কসাই কেটে ফেললে। মাংসগুলো লোকে খাবে। ছালটা চামড়া হবে। সেই চামড়ায় জুতো এই সব তৈয়ার হবে। লোকে তার উপর পা দিয়ে চলে যাবে। তাতেও দুর্গতির শেষ হয় না। চামড়ায় ঢাক তৈয়ার হয়। আর ঢাকের কাঠি দিয়ে অনবরত চামড়ার উপর আঘাত করে। অবশেষে কিনা নাড়িভুঁড়িগুলো নিয়ে তাঁত তৈয়ার করে ; যখন ধুনুরীর তাঁত তৈয়ার হয় তখন ধোনার সময় 'তুঁহু তুঁহু' বলে। আর 'হাম মা, হাম মা' বলে না। তুঁহু তুঁহু বলে, তবেই নিস্তার, তবেই তার মুক্তি। কর্মক্ষেত্রে আর আসতে হয় না।

জীবও যখন বলে, 'হে ঈশ্বর, আমি কর্তা নই তুমিই কর্তা—আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী' জীবের সংসার-যন্ত্রণা শেষ হয়। তখনই জীবের মুক্তি হয়, আর এ কর্মক্ষেত্রে আসতে হয় না।

বাজনা ও গান। বাজনা নাই। ভাল বাজনা থাকলে গান খুব জমে। বলরামের আয়োজন কি জান—বামুনের গোস্ভি (গরুটি) খাবে কম—দুধ দেবে হুড় হুড় করে। বলরামের ভাব—আপনারা গাও আপনারা বাজাও।

বাজে খরচ। কি জান, সংসার করলে মনের বাজে খরচ হয়ে পড়ে। এই বাজে খরচ হওয়ার দরুন মনের যা ক্ষতি হয় সে ক্ষতি আবার পূরণ হয়, যদি কেউ সন্ন্যাস করে। বাপ প্রথম জন্ম দেন ; তার পরে দ্বিতীয় জন্ম উপনয়নের সময়। আর একবার জন্ম হয় সন্ন্যাসের সময়। কামিনী ও কাঞ্চন এই দুটি বিঘ্ন। মেয়েমানুষে আসক্তি ঈশ্বরের পথ থেকে বিমুখ করে দেয়। কিসে পতন হয়, পুরুষ জানতে পারে না। যখন কেল্লায় যাচ্ছি, একটুও বুঝতে পারি নাই যে, গড়ানে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি। কেল্লার ভিতর গাড়ী পৌঁছুলে দেখতে পেলুম কত নীচে এসেছি। আহা, পুরুষদের বুঝতে দেয় না। কাপ্তেন বলে, আমার স্ত্রী জ্ঞানী। ভূতে যাকে পায়, সে জানে না যে, ভূতে পেয়েছে। সে বলে, বেশ আছি।

বাঞ্ছাপূরণ। তাঁর ইচ্ছা। তবে প্রেমোন্মাদ না হ'লে তিনি সমস্ত ভার লন না। ছোট ছেলেকেই হাত ধ'রে খেতে বসিয়ে দেয়। বুড়োদের কে দেয় ? তাঁর চিন্তা ক'রে যখন নিজের ভার নিজে নিতে পারে না, তখনই ঈশ্বর ভার লন।

বাপ মা। বাপ মা কত বড় গুরু। রাখাল আমায় জিজ্ঞাসা করে যে, বাবার পাতে কি খাব ? আমি বলি, সে কি রে ? তোর কি হয়েছে যে, তোর বাবার পাতে খাবি না ?

তবে একটা কথা আছে, যারা সৎ, তারা উচ্ছিষ্ট কাহাকেও দেয় না। এমন কি, উচ্ছিষ্ট কুকুরকেও দেওয়া যায় না।

যদি পাপাচারী অপরাধী হয়। তা হ'ক। মা দ্বিচারিণী হলেও ত্যাগ করবে না। অমুক বাবুদের গুরুপত্নীর চরিত্র নষ্ট হওয়াতে তারা বললে যে ওঁর ছেলেকে গুরু করা যাক। আমি বললুম, সে কিগো। ওলকে ছেড়ে ওলের মুখী নেবে ? নষ্ট হ'ল ত কি ? তুমি তাঁকে ইষ্ট বলে জেনো। 'যদ্যপি আমার গুরু

শ্বশুড়ী বাড়ী যায়। তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়।'

মা বাপ কি কম জিনিস গা? তাঁরা প্রসন্ন না হ'লে ধর্মটর্ম কিছুই হয় না। চৈতন্যদেব ত প্রেমে উন্মত্ত; তবু সন্ন্যাসের আগে কতদিন ধরে মাকে বোঝান। বললেন, 'মা। আমি মাঝে মাঝে এসে তোমাকে দেখা দিব।'

আর তোমায় বলি, বাপ মা মানুষ করলে, এখন কত ছেলেপুলেও হ'ল, মাগ নিয়ে বেরিয়ে আসা। বাপ মাকে ফাঁকি দিয়ে ছেলে মাগ নিয়ে, বাউল বৈষ্ণবী সেজে বেরয়। তোমার বাপের অভাব নাই ব'লে; তা না হ'লে আমি বলতুম ধিক।

তু: মা।

বাপ-মার ঋণ। ওরে সংসারে বাপ-মা পরম গুরু, যতদিন বেঁচে থাকেন যথাশক্তি তাঁদের সেবা করতে হয়, আর মরে গেলে যথাসাধ্য শ্রাদ্ধ করতে হয়; যে দরিদ্র, কিছু নাই, শ্রাদ্ধ করবার ক্ষমতা নাই, তাকেও বনে গিয়ে তাঁদের স্মরণ করে কাঁদতে হয়, তবে তাঁদের ঋণ শোধ হয়।

বাবা। গুরু-বাবা-কর্তা দ্রষ্টব্য।

বায়ু ও ভাব। 'ভাব ও বায়ু' দ্রষ্টব্য।

বারো আনা চার আনা। ও দেশে ছুতোরদের মেয়েদের দেখেছি—ঢেঁকি নিয়ে চিড়ে কোটে। এক হাতে ধান নাড়ে, এক হাতে ছেলেকে মাই দ্যায়—আবার খরিদ্দারের সঙ্গে কথাও কচ্চে—'তোমার কাছে দুআনা পাওনা আছে—দাম দিয়ে যেও।' কিন্তু তার বারো আনা মন হাতের উপর—পাছে হাতে ঢেঁকি পড়ে যায়।

বারো আনা মন ঈশ্বরেতে রেখে চার আনা লয়ে কাজকর্ম করা।

বারোশো ন্যাড়া আর তেরশো নেড়ী তার সাক্ষী উদম সাড়ী। এ গল্প তো জান। নিত্যানন্দ গোস্বামীর ছেলে বীরভদ্রের তেরশো ন্যাড়া শিষ্য ছিল। তারা যখন সিদ্ধ হ'য়ে গেল, তখন বীরভদ্রের ভয় হ'ল। তিনি ভাবতে লাগলেন, এরা সিদ্ধ হ'ল, লোককে যা বলবে তাই ফলবে; যে দিক দিয়ে যাবে, সেই দিকেই ভয়; কেন না, লোক না জেনে যদি অপরাধ করে, তাদের অনিষ্ট হবে।

এই ভেবে বীরভদ্র তাদের বললেন—তোমরা গঙ্গায় গিয়ে সন্ধ্যা-আহ্নিক করে এস। ন্যাড়াদের এত তেজ যে, ধ্যান করতে করতে সমাধি হ'ল। কখন জোয়ার মাথার উপর দিয়ে চলে গেছে হুঁশ নাই। আবার ভাঁটা পড়েছে তবু ধ্যান ভাঙ্গে না। তেরোশোর মধ্যে একশো বুঝেছিল—বীরভদ্র কি বলবেন। গুরুর বাক্য লঙ্ঘন করতে নাই, তাই তারা সরে পড়লো, আর বীরভদ্রের সঙ্গে দেখা করলে না। বাকী বারোশো দেখা ক'রলে। বীরভদ্র বললেন, 'এই তেরোশো নেড়ী তোমাদের সেবা ক'রবে। তোমরা এদের বিয়ে কর।' ওরা বললে, 'যে আজ্ঞা কিন্তু আমাদের মধ্যে একশোজন কোথায় চলে গেছে।' ঐ বারোশোর এখন প্রত্যেকের সেবাদাসী সঙ্গে থাকতে লাগলো। তখন আর সে তেজ নাই, সে তপস্যার বল নাই। মেয়েমানুষ সঙ্গে থাকতে আর সে বল রইল না; কেন না, সেই সঙ্গে স্বাধীনতা লোপ হয়ে যায়।

বারোয়ারীতে। বারোয়ারীতে নানা মূর্তি করে—আর নানা মতের লোক যায়। রাধাকৃষ্ণ, হর-পার্বতী, সীতারাম ; ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি রয়েছে, আর প্রত্যেক মূর্তির কাছে লোকের ভিড় হয়েছে। যারা বৈষ্ণব তারা বেশী রাধাকৃষ্ণের কাছে দাঁড়িয়ে দেখছে। যারা শাক্ত তারা হর-পার্বতীর কাছে। যারা রামভক্ত তারা সীতারাম মূর্তির কাছে।

তবে যাদের কোন ঠাকুরের দিকে মন নাই তাদের আলাদা কথা। বেশ্যা উপপতিকে ঝাঁটা মারছে—বারোয়ারীতে এমন মূর্তিও করে। ওসব লোক সেইখানে দাঁড়িয়ে হাঁ ক'রে দেখে, আর চীৎকার করে বন্ধুদের বলে, আরে ও সব কি দেখছিস, এদিকে আয়! এদিকে আয়!

বালকের মতো বিশ্বাস। বালক মাকে দেখবার জন্য যেমন ব্যাকুল হয়, সেই ব্যাকুলতা। এই ব্যাকুলতা হ'ল তো অরুণ উদয় হ'ল। তার পর সূর্য উঠবেই। এই ব্যাকুলতার পরেই ঈশ্বর দর্শন।

জটিল বালকের কথা আছে। সে পাঠশালে যেত। একটু বনের পথ দিয়ে পাঠশালে যেতে হ'ত ; তাই সে ভয় পেত। মাকে বলাতে মা বললে, তোর ভয় কি ? তুই মধুসূদনকে ডাকবি। ছেলেটি জিজ্ঞাসা করলে, মধুসূদন কে ? মা বললে, মধুসূদন তোর দাদা হয়। তখন একলা যেতে যেতে যেই ভয় পেয়েছে, অমনি ডেকেছে, 'দাদা মধুসূদন'। কেউ কোথাও নাই। তখন উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে লাগল, কোথায় দাদা মধুসূদন, তুমি এসো আমার বড় ভয় পেয়েছে। ঠাকুর তখন থাকতে পারলেন না! এসে বললেন, এই যে আমি, তোর ভয় কি ? এই বলে সঙ্গে করে পাঠশালার রাস্তা পর্যন্ত পেঁছিয়ে দিলেন, আর বললেন, 'তুই যখন ডাকবি, আমি আসবো। ভয় কি ?' এই বালকের বিশ্বাস। এই ব্যাকুলতা!

বাসনাত্যাগ। 'অবধূতের গুরু' দ্রষ্টব্য।

বাসা পাকড়ান। দেখ, দুজন সাধু ভ্রমণ করতে করতে একটি সহরে এসে পড়েছিল। একজন হাঁ করে সহরের বাজার, দোকান, বাড়ি দেখছিল ; এমন সময়ে অপরটির সঙ্গে দেখা হ'ল। তখন সে সাধুটি বললে, তুমি হাঁ করে সহর দেখছ—তল্পী-তল্পা কোথায় ? প্রথম সাধুটি বললে, আগে আমি বাসা পাকড়ে, তল্পী-তল্পা রেখে ঘরে চাবি দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বেরিয়েছি। এখন সহরে রং দেখে বেড়াচ্ছি। তাই তোমায় জিজ্ঞাসা করছি, তুমি কি বাসা পাকড়েছ ?

বাহ্য-আড়ম্বর। দ্রঃ আড়ম্বর।

বিচার। দেখছি, বিচার করে এক রকম জানা যায়, তাঁকে ধ্যান করে এক রকম জানা যায়। আবার তিনি যখন দেখিয়ে দেন—সে এক। তিনি যদি দেখিয়ে দেন,—এর নাম অবতার—তিনি যদি তাঁর মানুষ লীলা দেখিয়ে দেন, তাহলে আর বিচার করতে হয় না, কারুকে বুঝিয়ে দিতে হয় না। কি রকম জানো ? যেমন অন্ধকারের ভিতর দেশলাই ঘষতে ঘষতে দপ্ করে আলো হয়। সেই রকম দপ করে আলো যদি তিনি দেন, তাহলে সব সন্দেহ মিটে যায়! এরূপ বিচার করে কি তাঁকে জানা যায় ?

বিচারের পথ। 'জ্ঞানযোগ' দ্রষ্টব্য।

বিচারের পর (ঈশ্বর বিচার)। বিচার করতে করতে আমি-টামি আর কিছুই থাকে না। পেঁয়াজের প্রথমে লাল খোসা তুমি ছাড়ালে, তারপর সাদা পুরু খোসা। এইরূপ বরাবর ছাড়াতে ছাড়াতে ভিতরে কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না।
যেখানে নিজের আমি খুঁজে পাওয়া যায় না—আর খুঁজেই বা কে?—সেখানে ব্রহ্মের স্বরূপবোধে বোধ কিরূপ হয় সে কথা কে বলবে।
একটা লুণের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিছিল। সমুদ্রে যাই নেমেছে অমনি গলে মিশে গেল। তখন খবর কে দিবে?

বিজ্ঞান। কি না বিশেষরূপে জানা। কেউ দুধ শুনেছে, কেউ দুধ দেখেছে, কেউ দুধ খেয়েছে। যে কেবল শুনেছে, সে অজ্ঞান। যে দেখেছে সে জ্ঞানী; যে খেয়েছে, তারই বিজ্ঞান অর্থাৎ বিশেষরূপে জানা হয়েছে। ঈশ্বর দর্শন করে তাঁর সহিত আলাপ, যেন তিনি পরমাত্মীয়; এরই নাম বিজ্ঞান।
দ্রঃ অজ্ঞান-জ্ঞান-বিজ্ঞান।

বিজ্ঞান-অজ্ঞান। বিজ্ঞান। নানা জ্ঞানের নাম অজ্ঞান। সর্বভূতে ঈশ্বর আছেন, এর নাম জ্ঞান। বিশেষরূপে জানার নাম বিজ্ঞান। ঈশ্বরের সহিত আলাপ, তাঁতে আত্মীয়বোধ, এর নাম বিজ্ঞান।
কাঠে আগুন আছে, অগ্নিতত্ত্ব আছে; এর নাম জ্ঞান। সেই কাঠ জ্বালিয়ে ভাত রেঁধে খাওয়া ও খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হওয়ার নাম বিজ্ঞান।
যেমন পায়ে কাঁটা ফুটলে আর একটি কাঁটা আহরণ করতে হয়; তার পর পায়ের কাঁটাটি তুলে দুটি কাঁটা ফেলে দেয়। তেমনি অজ্ঞানকাঁটা তুলবার জন্য জ্ঞানকাঁটা জোগাড় করতে হয়। অজ্ঞান নাশের পর জ্ঞান অজ্ঞান দুই-ই ফেলে দিতে হয়। তখন বিজ্ঞান।

বিজ্ঞান হ'লে। সংসারেও থাকা যায়। তখন বেশ অনুভব হয় যে, তিনিই জীব-জগৎ হয়েছেন, তিনি সংসার ছাড়া নন। রামচন্দ্র যখন জ্ঞানলাভের পর 'সংসারে থাকবো না' বললেন, দশরথ বশিষ্ঠকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলেন, বুঝাবার জন্য। বশিষ্ঠ বললেন, 'রাম! যদি সংসার ঈশ্বর ছাড়া হয়, তুমি ত্যাগ কর্তে পারো।' রামচন্দ্র চুপ করে রইলেন। তিনি বেশ জানেন যে, ঈশ্বর ছাড়া কিছুই নাই। তাঁর আর সংসার ত্যাগ করা হ'ল না। কথাটা এই, দিব্য চক্ষু চাই। মন শুদ্ধ হলেই সেই চক্ষু হয়। দেখ না কুমারী পূজো। হাগা মোতা মেয়ে, তাকে ঠিক দেখলুম সাক্ষাৎ ভগবতী। এক দিকে স্ত্রী, এক দিকে ছেলে, দু-জনকেই আদর কচ্চে, কিন্তু ভিন্ন ভাবে। তবেই হ'ল, মন নিয়ে কথা। শুদ্ধ মানতে একভাব হয়। সেই মনটি পেলে সংসারে ঈশ্বর-দর্শন হয়; তবে সাধন চাই।

বিজ্ঞানীর বিচার পদ্ধতি ও ফল। নেতি নেতি বিচার করে সেই নিত্য অখণ্ড সচ্চিদানন্দে পেঁছয়। তারা এই বিচার করে—তিনি জীব নন, জগৎ নন, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব নন। নিত্যে পেঁছে আবার দেখে—তিনি এই সব হয়েছেন—জীব জগৎ, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব।
দুধকে দই পেতে মন্থন করে মাখন তুলতে হয়। কিন্তু মাখন তোলা হলে

দেখে যে, ঘোলেরই মাখন, মাখনেরই ঘোল। খোলেরই মাঝ, মাঝেরই খোল। মাখন হয়েছে ত ঘোলও হয়েছে। মাখনকে ভাবতে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে ঘোলকে ভাবতে হয়—কেন না ঘোল না থাকলে মাখন হয় না। তাই নিত্যকে মানতে গেলেই লীলাকেও মানতে হয়। অনুলোম ও বিলোম। সাকার-নিরাকার সাক্ষাৎকারের পর এই অবস্থা। সাকার চিন্ময়রূপ, নিরাকার অখন্ড সচ্চিদানন্দ। তিনিই সব হয়েছেন—তাই বিজ্ঞানীর 'এই সংসার মজার কুটি।' জ্ঞানীর পক্ষে 'এ সংসার ধোঁকার টাটি।' রামপ্রসাদ ধোঁকার টাটি বলেছেন। তাই একজন জবাব দিয়েছিল—

"এই সংসার মজার কুটি, আমি খাই দাই আর মজা লুটি।
ওরে বদ্যি নাহিক বুদ্ধি, বুঝিস কেবল মোটামুটি॥
জনক রাজা মহাতেজা তার কিসের ছিল ত্রুটি।
সে এদিক-ওদিক দুদিক রেখে খেয়েছিল দুধের বাটি॥"

বিজ্ঞানী ঈশ্বরের আনন্দ বিশেষরূপে সম্ভোগ করেছে। কেউ দুধ শুনেছে, কেউ দেখেছে, কেউ খেয়েছে। বিজ্ঞানী দুধ খেয়েছে আর খেয়ে আনন্দ লাভ করেছে ও হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে।

বিড়ালছানা। দ্রঃ সন্তানভাব।

বিদ্বেষভাব বর্জন। যখন বাহিরে লোকের সঙ্গে মিশবে, তখন সকলকে ভালবাসবে, মিশে যেন এক হয়ে যাবে—বিদ্বেষ ভাব আর রাখবে না। 'ও ব্যক্তি সাকার মানে, নিরাকার মানে না; ও নিরাকার মানে, সাকার মানে না; ও হিন্দু, ও মুসলমান, ও খৃষ্টান'—এই বলে নাক সিঁটকে ঘৃণা করো না। তিনি যাঁকে যেমন বুঝিয়েছেন। সকলের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি জানবে, জেনে তাদের সঙ্গে মিশবে, যত দূর পার। আর ভালবাসবে। তার পর নিজের ঘরে গিয়ে শান্তি আনন্দভোগ করবে। 'জ্ঞানদীপ জেবলে ঘরে ব্রহ্মময়ীর মুখ দেখো না।' নিজের ঘরে স্ব-স্বরূপকে দেখতে পাবে।

রাখাল যখন গরু চরাতে যায়, গরু সব মাঠে গিয়ে এক হয়ে যায়। এক পালের গরু। যখন সন্ধ্যায় নিজের ঘরে যায়, আবার পৃথক হয়ে যায়। নিজের ঘরে আপনাতে আপনি থাকে।

বিদ্যা। যে বিদ্যা লাভ করলে তাঁকে জানা যায়, সেই বিদ্যা, আর সব মিছে।

বিদ্যা ও পণ্ডিত। অনেক পণ্ডিত আছে, কত জ্ঞানের কথা বলে। মুখেই বলে কাজে কিছুই নয়। যেমন শকুনি খুব উঁচুতে উঠে; কিন্তু ভাগাড়ের দিকে নজর; অর্থাৎ সেই কামিনী-কাঞ্চনের উপর, সংসারের উপর—আসক্তি। যদি শুনি, পণ্ডিতের বিবেক বৈরাগ্য আছে, তবে ভয় হয়। তা না হলে কুকুর ছাগল জ্ঞান হয়। হাজার লেখাপড়া শেখ, ঈশ্বরে ভক্তি না থাকলে তাঁকে লাভ করবার ইচ্ছা না থাকলে—সব মিছে। যে বিদ্যা লাভ করলে তাঁকে জানা যায় সেই-ই বিদ্যা; আর সব মিছে।

বিদ্যার সংসার। তাঁকে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা কর, বিবেকের জন্য প্রার্থনা কর। ঈশ্বরই সত্য আর সব অনিত্য—এরই নাম বিবেক। জল-ছাঁকা দিয়ে জল ছেঁকে

নিতে হয়। ময়লাটা একদিকে পড়ে—ভাল জল একদিকে পড়ে, বিবেকরূপ জল-ছাঁকা আরোপ করো। তোমরা তাঁকে জেনে সংসার করো। এরই নাম বিদ্যার সংসার।

দ্রঃ বিবেক।

বিদ্যাসাগর। ক. আজ সাগরে এসে মিললাম। এতদিন খাল বিল হ্রদ নদী দেখেছি, এইবার সাগর দেখছি।

না গো! নোনা জল কেন? তুমি তো অবিদ্যার সাগর নও, তুমি যে বিদ্যার সাগর। তুমি ক্ষীরসমুদ্র।

তোমার কর্ম সাত্ত্বিক কর্ম। সত্ত্বের রজঃ। সত্ত্বগুণ থেকে দয়া হয়। দয়ার জন্য যে কর্ম করা যায়, সে রাজসিক কর্ম বটে—কিন্তু এ রজোগুণ—সত্ত্বের রজোগুণ, এতে দোষ নাই। শুকদেবাদি লোকশিক্ষার জন্য দয়া রেখেছিলেন—ঈশ্বর বিষয় শিক্ষা দিবার জন্য। তুমি বিদ্যাদান অন্নদান করছো, এও ভাল। নিষ্কাম করতে পারলেই এতে ভগবান লাভ হয়। কেউ করে নামের জন্য, পুণ্যের জন্য, তাদের কর্ম নিষ্কাম নয়। আর সিদ্ধ ত তুমি আছই। আলু পটল সিদ্ধ হলে ত নরম হয়, শুধু পণ্ডিতগুলো দরকচা পড়া! না এদিক, না ওদিক। শকুনি খুব উঁচুতে উঠে, তার নজর ভাগাড়ে। যারা শুধু পণ্ডিত শুনতেই পণ্ডিত, কিন্তু তাদের কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি—শকুনির মতো পচা মড়া খুঁজছে। আসক্তি অবিদ্যার সংসারে। দয়া, ভক্তি, বৈরাগ্য বিদ্যার ঐশ্বর্য।

খ. আমরা জেলেডিঙ্গি। খাল বিল আবার বড় নদীতেও যেতে পারি। কিন্তু আপনি জাহাজ, কি জানি যেতে গিয়ে চড়ায় পাছে লেগে যায়!

গ. আর দু-একবার ঈশ্বর বিদ্যাসাগরকে দেখবার প্রয়োজন। চালচিত্র একবার মোটামুটি এঁকে নিয়ে তারপর বসে বসে রঙ ফলায়। প্রতিমা প্রথমে একমেটে, তারপর দোমেটে, তারপর খড়ি, তারপর রং—পরে পরে করতে হয়। ঈশ্বর বিদ্যাসাগরের সব প্রস্তুত কেবল চাপা রয়েছে। কতকগুলি সৎকাজ করছে—কিন্তু অন্তরে কি আছে তা জানে না, অন্তরে সোনা চাপা রয়েছে। অন্তরে ঈশ্বর আছেন—জানতে পারলে সব কাজ ছেড়ে ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকতে ইচ্ছা হয়।

ঘ. দেখ, দয়া আর মায়া এ দুটি আলাদা জিনিস। মায়া মানে আত্মীয়ে মমতা; যেমন বাপ মা, ভাই ভগ্নী, স্ত্রী পুত্র এদের উপর ভালবাসা। দয়া সর্বভূতে ভালবাসা; সমদৃষ্টি। কারু ভিতর যদি দয়া দেখ যেমন বিদ্যাসাগরের, সে জানবে ঈশ্বরের দয়া। দয়া থেকে সর্বভূতের সেবা হয়। মায়াও ঈশ্বরের। মায়া দ্বারা তিনি আত্মীয়দের সেবা করিয়ে লন। তবে একটি কথা আছে; মায়াতে অজ্ঞান করে রাখে, আর বদ্ধ করে। কিন্তু দয়াতে চিত্তশুদ্ধি হয়। ক্রমে বন্ধন মুক্তি হয়।

বিদ্যাসাগরের পাণ্ডিত্য আছে, দয়া আছে; কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি নাই। অন্তরে সোনা চাপা আছে, যদি সেই সোনার সন্ধান পেতো, এত বাহিরের কাজ যা কচ্ছে সে সব কম পড়ে যেতো; শেষে একেবারে ত্যাগ হয়ে যেতো। অন্তরে

• হৃদয়মধ্যে ঈশ্বর আছেন, এ কথা জানতে পারলে তাঁরই ধ্যান চিন্তায় মন যেতো।
• কারু কারু নিষ্কাম কর্ম অনেক দিন করতে করতে শেষে বৈরাগ্য হয়, আর ঐ দিকে মন যায় ; ঈশ্বরে মন লিপ্ত হয়।

ঈশ্বর বিদ্যাসাগর যেরূপ কাজ করছে সে খুব ভাল।

ঙ. বিদ্যাসাগরের এক কথায় তাকে চিনেছি, কতদূর বুদ্ধির দৌড়! যখন বললুম, শক্তিবিশেষ ; তখন বিদ্যাসাগর বললে, মহাশয়, তবে কি তিনি কারুকে বেশী, কারুকে কম শক্তি দিয়েছেন ? আমি অমনি বললুম, তা দিয়েছেন বইকি। শক্তি কম বেশী না হলে তোমার নাম এত হবে কেন ? তোমার বিদ্যা, তোমার দয়া এই সব শুনে তো আমরা এসেছি। তোমার তো দুটো শিং বেরোয় নাই! বিদ্যাসাগরের এত বিদ্যা, এত নাম, কিন্তু কাঁচা কথা বলে ফেললে, তিনি কি কারুকে বেশী শক্তি, কারুকে কম শক্তি দিয়েছেন ? কি জানো, জালে প্রথম প্রথম বড় বড় মাছ পড়ে ; রুই, কাতলা। তারপর জেলেরা পাঁকটা পা দিয়ে ঘেঁটে দেয় তখন চুনো পুঁটি, পাঁকাল এই সব মাছ বেরোয়—একটু দেখতে দেখতে ধরা পড়ে। ঈশ্বরকে না জানলে ক্রমশঃ ভিতরের চুনোপুঁটি বেরিয়ে পড়ে। শুধু পণ্ডিত হলে কি হবে ?

দ্রঃ ঈশ্বরচন্দ্র ব্রহ্ম অনুচ্ছিষ্ট।

বিধিবাদীয় ভক্তি ও প্রেমাভক্তি। এত জপ, এত ধ্যান করতে হবে, এইরূপ পূজা করতে হবে, এ সব 'বিধিবাদীয়' ভক্তি। যেমন ধ্যান হলে মাঠ পার হতে গেলে আল দিয়ে ঘুরে ঘুরে যেতে হবে। আবার যেমন সম্মুখের গাঁয়ে যাবে, কিন্তু বাঁকা নদী দিয়ে ঘুরে ঘুরে যেতে হবে।

রাগভক্তি প্রেমাভক্তি ঈশ্বরে আত্মীয়ের ন্যায় ভালবাসা, এলে আর কোন বিধি-নিয়ম থাকে না। তখন ধানকাটা মাঠ যেমন পার হওয়া। আল দিয়ে যেতে হয় না। সোজা এক দিক দিয়ে গেলেই হ'ল।

বন্যা এলে আর বাঁকা নদী দিয়ে ঘুরে ঘুরে যেতে হয় না। তখন মাঠের উপর এক বাঁশ জল! সোজা নৌকা চালিয়ে দিলেই হ'ল।

এই রাগভক্তি, অনুরাগ, ভালবাসা না এলে ঈশ্বর লাভ হয় না।

'প্রেমাভক্তির নানারূপ' দ্রষ্টব্য।

বিবাহিত স্ত্রী ও ঐহিক সম্পর্ক। 'কালী নামে দাওরে বেড়া' দ্রষ্টব্য।

বিবেক। ঈশ্বর সৎ আর সব অসৎ, এই বিচার। সৎ মানে নিত্য। অসৎ—অনিত্য। যার বিবেক হয়েছে, সে জানে ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু। বিবেক উদয় হলে ঈশ্বরকে জানবার ইচ্ছা হয়। অসৎকে ভালবাসলে—যেমন দেহসুখ, লোকমান্য, টাকা এই সব ভালবাসলে—ঈশ্বর, যিনি সৎস্বরূপ, তাঁকে জানতে ইচ্ছা হয় না। সদসৎ বিচার এলে তবে ঈশ্বরকে খুঁজতে ইচ্ছা করে।

দ্রঃ বিদ্যার সংসার।

বিবেক কিভাবে হয় ? ফল কি ? মনে নিবৃত্তি এলে তবে বিবেক হয়, বিবেক হলে তত্ত্বকথা মনে উঠে। তখন মনের বেড়াতে যেতে সাধ হয়, কালীকল্পতরুমূলে।

সেই গাছতলায় গেলে, ঈশ্বরের কাছে গেলে, চার ফল কুড়িয়ে পাবে—অনায়াসে পাবে, কুড়িয়ে পাবে—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। তাঁকে পেলে ধর্ম, অর্থ, কাম যা সংসারীর দরকারও তাও হয়—যদি কেউ চায়।

বিবেক-বৈরাগ্য। ডুব দিলে কুমীর ধরতে পারে, কিন্তু হলুদ মাখলে কুমীর ছোঁয় না। 'হৃদিরত্নাকরের অগাধ জলে, কামাদি ছয়টি কুমীর আছে। কিন্তু বিবেক বৈরাগ্যরূপ হলুদ মাখলে তারা আর তোমাকে ছোঁবে না।'

পাণ্ডিত্য কি লেকচার কি হবে যদি বিবেক বৈরাগ্য না আসে। ঈশ্বর সত্য আর সব অনিত্য ; তিনিই বস্তু আর সব অবস্তু ; এর নাম বিবেক।

তাঁকে হৃদয়মন্দিরে আগে প্রতিষ্ঠা কর। বক্তৃতা, লেকচার, তারপর ইচ্ছা হয়তো করো। শুধু ব্রহ্ম ব্রহ্ম বললে কি হবে, যদি বিবেকবৈরাগ্য না থাকে ? ও তো ফাঁকা শঙ্খধ্বনি ?

বিবেক-বৈরাগ্যের জ্ঞান। সংসারে জ্ঞান কারু কারু হয়। তাই দুই যোগীর কথা আছে, গুপ্তযোগী ও ব্যক্তযোগী। যারা সংসার ত্যাগ করেছে তারা ব্যক্তযোগী, তাদের সকলে চেনে। গুপ্ত যোগীর প্রকাশ নাই। যেমন দাসী সব কর্ম করছে, কিন্তু দেশের ছেলেপুলের দিকে মন পড়ে আছে। আর যেমন তোমায় বলেছি, নষ্ট মেয়ে সংসারের সব কাজ উৎসাহের সহিত করে, কিন্তু সর্বদাই উপপতির দিকে মন পড়ে থাকে। বিবেক-বৈরাগ্য হওয়া বড় কঠিন। আমি কর্তা, আর এ সব জিনিস আমার—এ বোধ সহজে যায় না। একজন ডিপুটিকে দেখলাম, ৮০০ টাকা মাইনে, ঈশ্বরীয় কথা হচ্ছে, সেদিকে মন একটুও দিলে না। একটা ছেলে সঙ্গে করে এনেছিল, তাকে একবার এখানে বসায়, একবার সেখানে বসায়। আর একজনকে আমি জানি, নাম করবো না ; জপ করতো খুব, কিন্তু দশ হাজার টাকার জন্য মিথ্যা সাক্ষী দিচ্ছিলো। তাই বলছি, বিবেক-বৈরাগ্য হলে সংসারেতেও হয়।

বিবেকানন্দ। ক. নরেন্দ্র (বিবেকানন্দ) দ্রষ্টব্য।

'ঈশ্বর রসের সাগর' 'সচ্চিদানন্দ সাগর' নরেন্দ্র-রাখাল দ্রষ্টব্য।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ কি ? বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ আছে—রামানুজের মত। কিনা, জীব-জগৎবিশিষ্ট ব্রহ্ম। সব জড়িয়ে একটি।

যেমন একটি বেল। খোলা আলাদা, বীজ আলাদা, শাঁস আলাদা একজন করে-ছিল। বেলটি কত ওজনের জানবার দরকার হয়েছিল। এখন শুধু শাঁস ওজন করতে হবে। প্রথমে খোলা নয়, বীচি নয়, শাঁসটিই সার পদার্থ বলে বোধ হয়। তারপর বিচার করে দেখে—যে বস্তুর শাঁস সেই বস্তুরই খোলা আর বীচি। আগে নেতি নেতি করে যেতে হয়। জীব নেতি, জগৎ নেতি এইরূপ বিচার করতে হয় ; ব্রহ্মই বস্তু আর সব অবস্তু। তারপর অনুভব হয়, যার শাঁস তারই খোলা বীচি, যা থেকে ব্রহ্ম বলছো তাই থেকে জীবজগৎ। যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা। তাই রামানুজ বলতেন, জীবজগৎবিশিষ্ট ব্রহ্ম। এরই নাম বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদ।

বিশ্বনাথ উপাধ্যায়। (নেপাল রাজার উকিল) আর একটি আছে—কাপ্তেন।

সংসারী বটে, কিন্তু ভারী ভক্ত। তুমি আলাপ করো।

কাপ্তেনের বেদ, বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা, অধ্যাত্ম, এ সব কণ্ঠস্থ। তুমি আলাপ করে দেখো।

খুব ভক্তি। আমি বরাহনগরে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, তা আমায় ছাতা ধরে। ওর বাড়িতে লয়ে গিয়ে কত যত্ন! বাতাস করে—পা টিপে দেয়—আর নানা তরকারী করে খাওয়ায়। আমি একদিন তার বাড়ীতে পাইখানায় বেহুঁশ হয়ে গেছি। ও তো অত আচারী, পাইখানার ভিতর আমার কাছে গিয়ে পা ফাঁক করে বসিয়ে দেয়। অত আচারী, ঘৃণা করলে না।

কাপ্তেনের অনেক খরচা। কাশীতে ভায়েরা থাকে, তাদের দিতে হয়। মাগ আগে কৃপণ ছিল, এখন এত বিব্রত হয়েছে যে সব রকম খরচ করতে পারে না।

কাপ্তেনের পরিবার আমায় বললে যে, সংসার ওঁর ভাল লাগে না। তাই মাঝে বলেছিল, সংসার ছেড়ে দেবো। মাঝে মাঝে ছেড়ে দেবো, ছেড়ে দেবো, করতো।

ওদের বংশই ভক্ত। বাপ লড়ায়ে যেতো। শুনেছি লড়ায়ের সময় এক হাতে শিব পূজা, এক হাতে তরবার খোলা, যুদ্ধ করতো।

লোকটা ভারী আচারী। কেশব সেনের কাছে যেত, তাই এখানে একমাস আসে নাই। বলে, কেশব সেন ভ্রষ্টাচার—ইংরাজের সঙ্গে খায়, ভিন্ন জাতে মেয়ের বিয়ে দিয়েছে, জাত নাই। আমি বললুম, আমার সে সবের দরকার কি? কেশব হরিনাম করে, দেখতে যাই, ঈশ্বরীয় কথা শুনতে যাই—আমি কুলটি খাই, কাঁটায় আমার কি কাজ? তবুও আমায় ছাড়ে না; বলে তুমি কেশব সেনের ওখানে কেন যাও? তখন আমি বললুম, একটু বিরক্ত হয়ে, আমি তো টাকার জন্য যাই না—আমি হরিনাম শুনতে যাই—আর তুমি লাট সাহেবের বাড়িতে যাও কেমন করে? তারা ম্লেচ্ছ, তাদের সঙ্গে থাকো কেমন করে? এই সব বলার পর একটু থামে।

কিন্তু খুব ভক্তি। যখন পূজা করে, কর্পূরের আরতি করে। আর পূজা করতে করতে আসনে বসে স্তব করে। তখন আর একটি মানুষ। যেন তন্ময় হয়ে যায়।

বিশ্বাস। ঈশ্বরকে নিরাকার বলে বিশ্বাস থাকলেও তাঁকে পাওয়া যায়। আবার সাকার বলে বিশ্বাস থাকলেও তাঁকে পাওয়া যায়। তাঁতে বিশ্বাস থাকা আর শরণাগত হওয়া, এই দুটি দরকার। মানুষ তো অজ্ঞান, ভুল হতেই পারে। এক সের ঘটিতে কি চার সের দুধ ধরে? তবে যে পথেই থাকো, ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকা চাই। তিনি তো অন্তর্যামী—সে আন্তরিক ডাক শুনবেনই শুনবেন। ব্যাকুল হয়ে সাকারবাদীর পথেই যাও, আর নিরাকারবাদীর পথেই যাও, তাঁকেই (ঈশ্বরকেই) পাবে।

মিছরীর রুটি সিধে করেই খাও, আর আড় করেই খাও; মিষ্টি লাগবে।

দ্রষ্টব্য: 'কৃষ্ণ কিশোর', বালকের মতো বিশ্বাস। সাধু মহাত্মায় বিশ্বাস। সরলতা ও বিশ্বাস।

ব্যাসদেব যমুনা পার হবেন, গোপীরা এসে উপস্থিত। গোপীরাও পার হবে,

কিন্তু খেয়া মিলছে না। গোপীরা বললে, ঠাকুর। এখন কি হবে। ব্যাসদেব বললেন, আচ্ছা তোদের পার করে দিচ্ছি, কিন্তু আমার বড় খিদে পেয়েছে, কিছু আছে ? গোপীদের কাছে দুধ, ক্ষীর, নবনী অনেক ছিল, সমস্ত ভক্ষণ করলেন। গোপীরা বললেন, ঠাকুর পারের কি হ'ল। ব্যাসদেব তখন তীরে গিয়ে দাঁড়ালেন ; বললেন, হে যমুনে, যদি আজ কিছু খেয়ে না থাকি, তোমার জল দুভাগ হয়ে যাবে, আর আমরা সব সেই পথ দিয়ে পার হয়ে যাব। বলতে না বলতে জল দু ধারে সরে গেল। গোপীরা অবাক ; ভাবতে লাগলো উনি এইমাত্র এত খেলেন ; আবার বলছেন, 'যদি আমি কিছু খেয়ে না থাকি ?'
এই দৃঢ় বিশ্বাস। আমি না, হৃদয়মধ্যে নারায়ণ ; তিনি খেয়েছেন।

বিশ্বাস-আনন্দ কর্ম। কর্ম করতে গেলে একটি বিশ্বাস চাই, সেই সঙ্গে জিনিসটি মনে করে আনন্দ হয়, তবে সে ব্যক্তি কাজে প্রবৃত্ত হয়। মাটির নীচে এক ঘড়া মোহর আছে—এই জ্ঞান, এই বিশ্বাস, প্রথমে চাই। ঘড়া মনে করে সেই সঙ্গে আনন্দ হয়—তারপর খোঁড়ে। খুঁড়তে খুঁড়তে ঠং শব্দ হ'লে আনন্দ বাড়ে। তারপর ঘড়ার কানা দেখা যায়। তখন আনন্দ আরও বাড়ে। এই রকম ক্রমে ক্রমে আনন্দ বাড়তে থাকে। আমি নিজে ঠাকুরবাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখেছি—সাধু গাঁজা তয়ের করছে আর সাজতে সাজতে আনন্দ।

বিশ্বাস হয় কেমন করে। তাঁতে অনুরাগ কর। তোমাদেরই গানে আছে, 'প্রভু ! বিনে অনুরাগ করে যজ্ঞ যাগ, তোমারে কি যায় জানা।' যাতে এ রূপ অনুরাগ, এরূপ ঈশ্বরে ভালবাসা হয়, সে জন্য তাঁর কাছে গোপনে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করো, আর কাঁদো। মাগের ব্যামো হলে, কি টাকা লোকসান হলে, কি কর্মের জন্য, লোকে এক ঘটি কাঁদে, ঈশ্বরের জন্য কে কাঁদে বল দেখি ?

বিশ্বাসের জোর। ক. বিশ্বাসের কত জোর তা তো শুনেছ ? পুরাণে আছে, রামচন্দ্র যিনি সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ, তাঁর লঙ্কায় যেতে সেতু বাঁধতে হ'ল। কিন্তু হনুমান রাম নামে বিশ্বাস করে লাফ দিয়ে সমুদ্রের পারে গিয়ে পড়ল। তার আর সেতুর দরকার হয় নাই।।

বিভীষণ একটি পাতায় রাম নাম লিখে, ঐ পাতাটি একটি লোকের কাপড়ের খোঁটে বেঁধে দিছল। সে লোকটি সমুদ্রের পারে যাবে। বিভীষণ তাকে বললে, তোমার ভয় নাই, তুমি বিশ্বাস করে জলের উপর দিয়ে চলে যাও, কিন্তু দেখো যাই অবিশ্বাস করবে, অমনি জলে ডুবে য বে। লোকটি বেশ সমুদ্রের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছিল ; এমন সময়ে তার ভারী ইচ্ছা হ'ল যে, কাপড়ের খোঁটে কি বাঁধা আছে একবার দেখে। খুলে দেখে যে কেবল 'রামনাম' লেখা রয়েছে। তখন সে ভাবলে, এ কি। শুধু রাম নাম একটি লেখা রয়েছে ! যাই অবিশ্বাস, অমনি ডুবে গেল।

যার ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে, সে যদি মহাপাতক করে—গো, ব্রাহ্মণ, স্ত্রী হত্যা করে, তবুও ভগবানে এই বিশ্বাসের বলে ভারী ভারী পাপ থেকে উদ্ধার হতে পারে। সে যদি বলে আর আমি এমন কাজ করবো না, তার কিছুতেই ভয় হয় না।

খ. শম্ভু মল্লিক বাগবাজার থেকে হেঁটে নিজের বাগানে আসতো। কেউ বলেছিল, 'অত রাস্তা, কেন গাড়ী করে আস না, বিপদ হতে পারে।' তখন শম্ভু মুখ লাল করে বলে উঠেছিল, 'কি, তাঁর নাম করে বেরিয়েছি আবার বিপদ!' বিশ্বাসেতেই সব হয়! আমি বলতুম অমুককে যদি দেখি, তবে বলি সত্য। অমুক খাজাঞ্চি যদি আমার সঙ্গে কথা কয়। তা যেটা মনে করতুম, সেইটেই মিলে যেত!

বিষয়কর্ম। বিষয়কর্মে আসক্তি শুধু যে বিলাতে আছে, এমন নয়। সব জায়গায় আছে। তবে কি জান? কর্মকাণ্ড হচ্ছে আদিকাণ্ড। সত্ত্বগুণ (ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য, দয়া এই সব) না হ'লে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। রজোগুণে কাজের আড়ম্বর হয়। তাই রজোগুণ থেকে তমোগুণ এসে পড়ে। বেশী কাজ জড়ালেই ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়। আর কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি বাড়ে।

'অনাসক্তি' কলিতে ভক্তিযোগ দ্রষ্টব্য।

বিষয়-রস শুকোবার উপায়। মার কাছে ব্যাকুল হয়ে ডাকো। তাঁর দর্শন হ'লে বিষয়-রস শুকিয়ে যাবে; কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি সব দূরে চলে যাবে। আপনার মা বোধ থাকলে এক্ষণেই হয়। তিনি তো ধর্ম-মা নন। আপনারই মা। ব্যাকুল হয়ে মার কাছে আব্দার কর। ছেলে ঘুড়ি কিনবার জন্য মার আঁচল ধরে পয়সা চায়—মা হয়তো আর মেয়েদের সঙ্গে গল্প করছে। প্রথমে মা কোনমতে দিতে চায় না। বলে, 'না', তিনি বারণ করে গেছেন, তিনি এলে বলে দিব, এক্ষণই ঘুড়ি নিয়ে একটা কাণ্ড করবি।' যখন ছেলে কাঁদতে শুরু করে, কোনমতে ছাড়ে না, মা অন্য মেয়েদের বলে, রোস মা, এ ছেলেটাকে একবার শান্ত করে আসি। এই কথা বলে, চাবিটা নিয়ে কড়াৎ কড়াৎ করে বাক্স খুলে একটা পয়সা ফেলে দেয়। তোমরাও মার কাছে আব্দার করো, তিনি অবশ্য দেখা দিবেন। আমি শিখদের ঐ কথা বলেছিলাম। তারা দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে এসেছিল; মা-কালীর মন্দিরের সম্মুখে বসে কথা হয়েছিল। তারা বলেছিল, ঈশ্বর দয়াময়। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কিসে দয়াময়? তারা বললে, কেন মহারাজ! তিনি সর্বদা আমাদের দেখছেন, আমাদের ধর্ম, অর্থ সব দিচ্ছেন, আহার যোগাচ্ছেন। আমি বললুম, যদি কারো ছেলেপুলে হয়, তাদের খাওয়ার ভার বাপে নেবে, না তো, কি বামুনপাড়ার লোকে এসে নেবে?]

বিষয়ী। 'ভক্ত ও বিষয়ী' দ্রষ্টব্য।

বিষয়ীর ঈশ্বর। বিষয়ীর ঈশ্বর কেমন জান? খুড়ী-জ্যেঠীর কোঁদল শুনে ছেলেরা যেমন ঝগড়া করতে করতে বলে, আমার ঈশ্বর আছেন।

বিষয়ীর জ্ঞান। বিষয়ী লোকের জ্ঞান কখনও দেখা দেয়; এক একবার দীপ-শিখার ন্যায়। না, না, সূর্যের একটি কিরণের ন্যায়। ফুটো দিয়ে যেন কিরণটি আসছে। বিষয়ী লোকের ঈশ্বরের নাম করা—অনুরাগ নাই। বালক যেমন বলে, তোর পরমেশ্বরের দিব্যি। খুড়ী-জ্যেঠীর কোঁদল শুনে 'পরমেশ্বরের দিব্যি' শিখেছে!

বিষয়ীর প্রতি। তাঁর নামগুণ কীর্তন সর্বদা করতে হয়, বিষয়চিন্তা যত পার

ত্যাগ করতে হয়—তুমি চাষ করবার জন্য ক্ষেতে অনেক কষ্টে জল আনছো, কিন্তু ঘোগ (আলের গর্ত) দিয়ে সব বেরিয়ে যাচ্ছে। নালা কেটে জল আনা বৃথা পণ্ডশ্রম হ'ল।

চিত্তশুদ্ধি হলে, বিষয়াসক্তি চলে গেলে, ব্যাকুলতা আসবে ; তোমার প্রার্থনা ঈশ্বরের কাছে পোঁছিবে। টেলিগ্রাফ-এর তারের ভিতর অন্য জিনিস মিশাল থাকলে বা ফুটো থাকলে তাদের খবর পোঁছিবে না।

আমি ব্যাকুল হয়ে একলা একলা কাঁদতাম ; কোথায় নারায়ণ এই বলে কাঁদতাম। কাঁদতে কাঁদতে অজ্ঞান হয়ে যেতাম—মহাবায়ুতে লীন।

যোগ কিসে হয় ? টেলিগ্রাফের তারে অন্য জিনিস বা ফুটো না থাকলে হয়। একেবারে বিষয়াসক্তি ত্যাগ।

কোন কামনা-বাসনা রাখতে নাই। কামনা-বাসনা থাকলে সকাম ভক্তি বলে। নিষ্কাম ভক্তিকে বলে অহেতুকী ভক্তি। তুমি ভালোবাসো আর নাই বাসো, তবু তোমাকে ভালোবাসি। এর নাম অহেতুকী।

কথাটা এই, তাঁকে ভালবাসা। খুব ভালবাসা হলে দর্শন হয়। সতীর পতির উপর টান, মায়ের সন্তানের উপর টান, বিষয়ীর বিষয়ের উপর টান—এই তিন টান যদি একত্র হয়, তাহলে ঈশ্বর দর্শন হয়।

বিষয়ীর রোক। বিষয়ী লোকদের রোক নাই। হ'ল হ'ল ; না হ'ল না হ'ল। জলের দরকার হয়েছে কূপ খুঁড়ছে। খুঁড়তে খুঁড়তে যেমন পাথর বেরুলো, অমনি সেখানটা ছেড়ে দিলে। আর এক জায়গা খুঁড়তে বালি পেয়ে গেল ; কেবল বালি বেরোয়। সেখানটাও ছেড়ে দিলে। যেখানে খুঁড়তে আরম্ভ করেছ, সেখানেই খুঁড়বে তবে ত জল পাবে।

জীব যেমন কর্ম করে, তেমনি ফল পায়। তাই গানে আছে ;

দোষ কারু নয় গো মা আমি স্বখাত সলিতে ডুবে মরি শ্যামা।

বিষয়ী লোক। 'লেকচার' দ্রষ্টব্য।

বিষয়ী লোকের দস্তুর। দ্রঃ যদুমল্লিক।

বিষ্ণুপুর। আমি একবার বিষ্ণুপুরে গিছিলুম। রাজার বেশ সব ঠাকুরবাড়ি আছে। সেখানে ভগবতীর মূর্তি আছে, নাম মৃন্ময়ী। ঠাকুরবাড়ির কাছে বড় দীঘি। কৃষ্ণবাঁধ। লালবাঁধ। আচ্ছা, দীঘিতে আবাঠার (মাথা ঘসার) গন্ধ পেলুম কেন বল দেখি ? আমি ত জানতুম না যে, মেয়েরা মৃন্ময়ীদর্শনের সময় আবাঠা তাঁকে দেয়। আর দীঘির কাছে আমার ভাব সমাধি হ'ল, তখন বিগ্রহ দেখি নাই। আবেশে সেই দীঘির কাছে মৃন্ময়ী দর্শন হ'ল—কোমর পর্যন্ত।

বীজ। নাম বীজ দ্রষ্টব্য।

বীর ভক্ত। সংসারে থেকে যে তাঁকে ডাকে সে বীর ভক্ত। ভগবান বলেন, যে সংসার ছেড়ে দিয়েছে সে ত আমায় ডাকবেই, আমার সেবা করবেই—তার আর বাহাদুরী কি ? সে যদি আমায় না ডাকে সকলে ছি ছি করবে। আর যে সংসারে থেকে আমায় ডাকে—বিশ মণ পাথর ঠেলে যে আমায় দেখে সেই-ই বাহাদুর, সেই-ই বীরপুরুষ।

বীরভক্ত। অন্যায় অসত্য দেখলে চুপ করে থাকতে নাই। মনে কর নষ্ট স্ত্রী পরমার্থ হানি করতে আসছে ; তখন বীরের ভাব ধরতে হয়। তখন বলবে কি, শালি, আমার পরমার্থ হানি করবি !—এক্ষণে তোর শরীর চিরে দিব।
দ্রঃ কন্যা শক্তিরূপা।

বীর্য ধারণ। শুকদেবাদি ঊর্ধ্বরেতা। এঁদের রেতঃপাত কখন হয় নাই।
আর এক আছে ধৈর্যরেতা। আগে রেতঃপাত হয়েছে, কিন্তু তারপর বীর্যধারণ। বার বছর ধৈর্যরেতা হলে বিশেষ শক্তি জন্মায় ! ভিতরে একটি নূতন নাড়ী হয়, তার নাম মেধা নাড়ী। সে নাড়ী হলে সব স্মরণ থাকে—সব জানতে পারে।
বীর্যপাতে বলক্ষয় হয়। স্বপ্নদোষে যা বেরিয়ে যায়, তাতে দোষ নাই। ও ভাতের গুণে হয়। ও সব বেরিয়ে গিয়েও যা থাকে, তাতেই কাজ হয়। তবু স্ত্রীসঙ্গ করা উচিত নয়।
শেষে যা থাকে, তা খুব রিফাইন (Refine) হয়ে থাকে। লাহাদের ওখানে গুড়ের নাগরি সব রেখেছিল, নাগরির নীচে একটি একটি ফুটো করে ; তারপর এক বৎসর পরে দেখলে, সব দানা বেঁধে রয়েছে—মিছরির মতো। রস যা বেরিয়ে যাবার, ফুটো দিয়ে তা বেরিয়ে গেছে।

বীর্যধারণ না করলে। ধৈর্যরেতার কথা তখন যা বলছিলে তা ঠিক। বীর্য ধারণ না করলে এ সব ধারণা হয় না।
একজন চৈতন্যদেবকে বল্লে, এদের এত উপদেশ দেন, তেমন উন্নতি করতে পাচ্ছে না কেন ? তিনি বল্লেন—এরা যোষিৎসঙ্গ করে সব অপব্যয় করে। তাই ধারণা করতে পারে না ! ফুটো কলসীতে জল রাখলে জল ক্রমে ক্রমে বেরিয়ে যায়।

বীর্যপাত (সন্ন্যাসী)। সন্ন্যাসীর পক্ষে বীর্যপাত বড়ই খারাপ। তাই তাদের সাবধানে থাকতে হয়। স্ত্রীরূপ দর্শন যাতে না হয়। ভক্ত স্ত্রীলোক হলেও সেখান থেকে সরে যাবে। স্ত্রীরূপ দেখাও খারাপ। জাগ্রত অবস্থায় না হয়, স্বপ্নে বীর্যপাত হয়।
সন্ন্যাসী জিতেন্দ্রিয় হলেও লোকশিক্ষার জন্য মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করবে না। ভক্ত স্ত্রীলোক হলেও বেশীক্ষণ আলাপ করবে না।
সন্ন্যাসীর হচ্ছে নির্জলা একাদশী। আর দু-রকম একাদশী আছে। ফল মূলে খেয়ে—আর লুচি ছক্কা খেয়ে।
লুচি ছক্কার সঙ্গে হ'ল দুখানা রুটি দুধে ভিজছে।
তোমরা নির্জলা একাদশী পারবে না।

বুদ্ধদেব। বুদ্ধদেবের কথা অনেক শুনেছি, তিনি দশাবতারের ভিতর একজন অবতার। ব্রহ্ম অচল, অটল, নিষ্ক্রিয় বোধ-স্বরূপ। বুদ্ধি যখন এই বোধ-স্বরূপে লয় হয় তখন ব্রহ্ম-জ্ঞান হয় ; তখন মানুষ বুদ্ধ হয়ে যায়।

বৃন্দাবনের রজঃ। দ্রঃ গঙ্গাজল।

বেদান্তবাদী। আগে সাধন চাই। শম, দম, তিতিক্ষা চাই। এরা নির্বাণের চেষ্টা করছে। এরা বেদান্তবাদী, কেবল বিচার করে ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা—বড় কঠিন পথ। জগৎ মিথ্যা হলে তুমিও মিথ্যা, যিনি বলেছেন তিনিও মিথ্যা, তাঁর

কথাও স্বপ্নবৎ। বড় দূরের কথা।

কি রকম জ্ঞান? যেমন কর্পূর পোড়ালে কিছু বাকী থাকে না। কাঠ পোড়ালে তবু ছাই বাকী থাকে। শেষ বিচারের পর সমাধি হয়। তখন 'আমি' 'তুমি' 'জগৎ' এ সবের খবর থাকে না।

দ্রঃ নানকপন্থী।

বেদান্তবাদী সাধু। একটি বেদান্তবাদী সাধু এসেছিল। মেঘ দেখে নাচতো, ঝড়-বৃষ্টিতে খুব আনন্দ। ধ্যানের সময় কেউ কাছে গেলে বড় চটে যেত। আমি একদিন গিছলুম। যাওয়াতে ভারী বিরক্ত। সর্বদাই বিচার করতো, 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা।' মায়াতে নানারূপ দেখাচ্ছে, তাই ঝাড়ের কলম লয়ে বেড়াত। ঝাড়ের কলম দিয়ে দেখলে নানা রং দেখা যায়—বস্তুত ব্রহ্ম বৈ আর কিছু নাই, কিন্তু মায়াতে অহংকারেতে নানা বস্তু দেখাচ্ছে। পাছে মায়া হয়, আসক্তি হয়, তাই কোন জিনিস একবার বৈ আর দেখবে না।

স্নানের সময় পাখী উড়ছে দেখে বিচার করতো। দুজনে বাহ্যে যেতুম। মুসলমানের পুকুর শুনে আর জল নিলে না। হলধারী আবার ব্যাকরণ জিজ্ঞাসা কল্লে, ব্যাকরণ জানে। ব্যঞ্জনবর্ণের কথা হ'ল। তিন দিন এখানে ছিল। একদিন পোস্তার ধারে সানায়ের শব্দ শুনে বললে, যার ব্রহ্মদর্শন হয়, তার ঐ শব্দ শুনে সমাধি হয়।

বেদান্তমতে স্বপ্ন ও জাগরণ। দ্রঃ জাগরণ ও স্বপ্ন (বেদান্তমতে)।

বেদান্তের বিচার। ক. বেদান্ত বিচারে সংসার মায়াময়—স্বপ্নের মতো, সব মিথ্যা। যিনি পরমাত্মা, তিনি সাক্ষিস্বরূপ—জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি তিন অবস্থারই সাক্ষিস্বরূপ। এ সব তোমার ভাবের কথা। স্বপ্নও যত সত্য, জাগরণ সেইরূপ সত্য।

খ. বেদান্ত বিচারের কাছে রূপ-টূপ উড়ে যায়। সে বিচারের শেষ সিদ্ধান্ত এই—ব্রহ্ম সত্য, আর নামরূপযুক্ত জগৎ মিথ্যা। যতক্ষণ 'আমি ভক্ত' এই অভিমান থাকে, ততক্ষণই ঈশ্বরের রূপ দর্শন আর ঈশ্বরকে ব্যক্তি (person) বলে বোধ সম্ভব হয়। বিচারের চক্ষে দেখলে, ভক্তের 'আমি' অভিমান, ভক্তকে একটু দূরে রেখেছে।

বেদান্তের সার। আমায় মা জানিয়ে দিয়েছেন বেদান্তের সার—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা।

বেশ্যা উদ্ধার। অমুক মল্লিকের মা, খুব বড় মানুষের ঘরের মেয়ে। বেশ্যাদের কথায় জিজ্ঞাসা করলে, ওদের কি কোন মতে উদ্ধার হবে না? নিজে আগে আগে অনেক রকম করেছে কিনা। তাই জিজ্ঞাসা করলে। আমি বললুম—হাঁ, হবে—যদি আন্তরিক ব্যাকুল হয়ে কাঁদে, আর বলে আর করবো না। শুধু হরিনাম করলে কি হবে, আন্তরিক কাঁদতে হবে।

বৈদ্য ও আচার্য। তিন রকম বৈদ্য আছে। এক রকম—তারা নাড়ী দেখে ঔষধ ব্যবস্থা করে চলে যায়। রোগীকে কেবল বলে যায়, ঔষধ খেয়ো হে। এরা অধম থাকের বৈদ্য।

সেইরূপ কতকগুলি আচার্য উপদেশ দিয়ে যায়, কিন্তু উপদেশে লোকের ভাল হ'ল কি মন্দ হ'ল তা দেখে না। তার জন্য ভাবে না।

কতকগুলি বৈদ্য আছে, তারা ঔষধ ব্যবস্থা করে রোগীকে ঔষধ খেতে বলে। রোগী যদি খেতে না চায়, তাকে অনেক বুঝায়। এরা মধ্যম থাকের বৈদ্য। সেইরূপ মধ্যম থাকের আচার্যও আছে। তাঁরা উপদেশ দেন, আবার অনেক করে লোকদের বুঝান যাতে উপদেশ অনুসারে চলে। আবার উত্তম থাকের বৈদ্য আছে। মিষ্টি কথাতে রোগী যদি না বুঝে, তারা জোর পর্যন্ত করে। দরকার হয়, রোগীর বুকে হাঁটু দিয়ে রোগীকে ঔষধ গিলিয়ে দেয়। সেইরূপ উত্তম থাকের আচার্য আছে। তাঁরা ঈশ্বরের পথে আনবার জন্য শিষ্যদের উপর জোর পর্যন্ত করেন।

বৈদ্যের প্রকার। বৈদ্য তিন প্রকার—উত্তম বৈদ্য, মধ্যম বৈদ্য, অধম বৈদ্য। যে বৈদ্য এসে নাড়ী টিপে 'ঔষধ খেও হে' এই কথা ব'লে চলে যায়, সে অধম বৈদ্য—রোগী খেলে কিনা এ খবর সে লয় না। যে বৈদ্য রোগীকে ঔষধ খেতে অনেক ক'রে বুঝায়—সে মিষ্ট কথাতে বলে, 'ওহে ঔষধ না খেলে কেমন করে ভাল হবে। লক্ষ্মীটি খাও, আমি নিজে ঔষধ মেড়ে দিচ্ছি খাও'—সে মধ্যম বৈদ্য। আর যে বৈদ্য, রোগী কোনও মতে খেলে না দেখে বুকে হাঁটু দিয়ে, জোর করে ঔষধ খাইয়ে দেয় সে উত্তম বৈদ্য। এইটি বৈদ্যের তমোগুণ, এ গুণে রোগীর মঙ্গল হয়, অপকার হয় না।

বৈধী কর্ম। শাস্ত্রে অনেক কর্ম ক'রতে বলে গেছে—তাই করছি ; এরূপ ভক্তিকে বৈধীভক্তি বলে। আর এক আছে, রাগভক্তি। সেটি অনুরাগ থেকে হয়, ঈশ্বরে ভালবাসা থেকে হয়—যেমন প্রহ্লাদের। সে ভক্তি যদি আসে, আর বৈধীকর্মের প্রয়োজন হয় না।

আচার ধর্ম দ্রষ্টব্য

বৈধীধর্ম। ধর্মাধর্ম

বৈধীভক্তি : দ্রষ্টব্য 'প্রেমাভক্তির নানারূপ' রাগভক্তি.

বৈরাগ্য (তীব্র)। এর নাম তীব্র বৈরাগ্য। যাই বিবেক এলো তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করলে। গামছা কাঁধেই চলে গেল। সংসার গোছগাছ করতে এল না। বাড়ির দিকে একবার পেছন ফিরে চাইলেও না।

যে ত্যাগ করবে তার খুব মনের বল চাই। ডাকাত পড়ার ভাব। অ্যায়।।।—ডাকাতি করবার আগে যেমন ডাকাতেরা বলে—মারো। লোটো। কাটো।

বৈরাগ্য ও কামিনী। যদি একবার এইরূপ তীব্র বৈরাগ্য হয়ে ঈশ্বর লাভ হয়, তা হলে আর মেয়েমানুষে আসক্তি থাকে না। ঘরে থাকলেও, মেয়েমানুষে আসক্তি থাকে না, তাদের ভয় থাকে না। যদি একটা চুম্বক পাথর খুব বড় হয়, আর একটা সামান্য হয়, তাহলে লোহাকে কোনটা টেনে লবে ? বড়টাই টেনে লবে। ঈশ্বর বড় চুম্বক পাথর, তাঁর কাছে কামিনী ছোট চুম্বক পাথর। কামিনী কি করবে ?

বৈরাগ্য কি করে হয় ? ভোগের শান্তি না হলে বৈরাগ্য হয় না। ছোট ছেলেকে

খাবার আর পুতুল দিয়ে বেশ ভুলানো যায়। কিন্তু যখন খাওয়া হয়ে গেল, আর পুতুল নিয়ে খেলা হয়ে গেল, তখন 'মা যাব' বলে। মার কাছে নিয়ে না গেলে পুতুল ছুঁড়ে ফেলে দেয়, আর চীৎকার করে কাঁদে।

বৈরাগ্য তীব্র কেন হয় না। কেন তীব্র বৈরাগ্য হয় না জিজ্ঞাসা করছো ? তার মানে আছে। ভিতরে বাসনা প্রবৃত্তি সব আছে। হাজরাকে তাই বলি। ওদেশে মাঠে জল আনে, মাঠের চারিদিকে আল দেওয়া আছে, পাছে জল বেরিয়ে যায়। কাদার আল, কিন্তু আলের মাঝে মাঝে ঘোগ (গর্ত)। প্রাণপণে তো জল আনছে কিন্তু ঘোগ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। বাসনা ঘোগ। জপ তপ করে বটে, কিন্তু পেছনে বাসনা। সেই বাসনা-ঘোগ দিয়ে সব বেরিয়ে যাচ্ছে।

বৈরাগ্যের প্রকার। ক. বৈরাগ্য তিন-চার প্রকার। সংসারের জ্বালায় জ্বলে গেরুয়া-বসন পরেছে—সে বৈরাগ্য বেশী দিন থাকে না। হয়ত কর্ম নাই, গেরুয়া পরে কাশী চলে গেল। তিন মাস পরে ঘরে পত্র এল, 'আমার একটি কর্ম হইয়াছে, কিছুদিন পরে বাড়ি যাইব, তোমরা ভাবিত হইও না।' আবার সব আছে, কোন অভাব নাই, কিন্তু কিছু ভাল লাগে না। ভগবানের জন্য একলা একলা কাঁদে। সে বৈরাগ্য যথার্থ বৈরাগ্য।

খ. বৈরাগ্য দুই প্রকার। তীব্র বৈরাগ্য আর মন্দা বৈরাগ্য। মন্দা বৈরাগ্য—হচ্ছে হবে—ঢিমে তেতাল। তীব্র বৈরাগ্য—শাণিত খুরের ধার—মায়াপাশ কচ কচ করে কেটে দেয়।

কোনও চাষা কতদিন ধরে খাটছে—পুষ্করিণীর জল ক্ষেতে আর আসছে না! মনে রোখ নাই। আবার কেউ দু চার দিন পরেই—আজ জল আনবো ত ছাড়বো, প্রতিজ্ঞা করে। নাওয়া খাওয়া সব বন্ধ। সমস্ত দিন খেটে সন্ধ্যার সময় যখন জল কুল কুল করে আসতে লাগলো, তখন আনন্দ। তারপর বাড়ীতে গিয়ে পরিবারকে বলে—'দে এখন তেল দে নাইবো।' নেয়ে খেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে নিদ্রা।

একজনের পরিবার বল্লে, 'অমুক লোকের ভারী বৈরাগ্য হয়েছে, তোমার কিছু হ'ল না!' যার বৈরাগ্য হয়েছে, সে লোকটির ষোল জন স্ত্রী—এক একজন করে তাদের ত্যাগ করছে।

সোয়ামী নাইতে যাচ্ছিল, কাঁধে গামছা—বলে 'ক্ষেপী! সে লোক ত্যাগ করতে পারবে না—একটু একটু করে কি ত্যাগ হয়! আমি ত্যাগ করতে পারবো। এই দেখ, আমি চল্লুম!'

সে বাড়ীর গোছগাছ না করে—সেই অবস্থায়—কাঁধে গামছা—বাড়ী ত্যাগ করে চলে গেল।—এরই নাম তীব্র বৈরাগ্য।

আর এক রকম বৈরাগ্য তাকে বলে মর্কট বৈরাগ্য। সংসারের জ্বালায় জ্বলে গেরুয়া বসন পরে কাশী গেল। অনেক দিন সংবাদ নাই। তারপর একখানা চিঠি এলো—তোমরা ভাবিবে না, আমার এখানে একটি কর্ম হইয়াছে।

বৈষম্যদোষ। 'ঈশ্বর কি বৈষম্যদোষে দুষ্ট' দ্রষ্টব্য।

বৈষ্ণবচরণ বৈরাগী। দ্রঃ ধর্মবিশেষ।

বৈষ্ণব সাধকের থাক। বৈষ্ণবরা বলে যে ঈশ্বরের পথে যারা যাচ্ছে আর যারা

তাঁকে লাভ করেছে তাদের থাক থাক আছে—প্রবর্তক, সাধক, সিদ্ধ আর সিদ্ধের সিদ্ধ। যিনি সবে পথে উঠছেন তাকে প্রবর্তক বলে। যে সাধন ভজন করছে, পূজা, জপ, ধ্যান, নামকীর্তন করছে—সে ব্যক্তি সাধক। যে ব্যক্তি ঈশ্বর আছেন বোধে বোধ করেছে, তাকেই সিদ্ধ বলে। যেমন বেদান্তের উপমা আছে—অন্ধকার ঘর, বাবু শুয়ে আছে। বাবুকে একজন হাতড়ে হাতড়ে খুঁজছে। একটা কৌচে হাত দিয়ে বলছে, এ নয়, জানালায় হাত দিয়ে বলছে এ নয়, দরজায় হাত দিয়ে বলছে, এ নয়। নেতি, নেতি, নেতি। শেষে বাবুর গায়ে হাত পড়েছে, তখন বলছে, 'ইহ' এই বাবু—অর্থাৎ 'অস্তি' বোধ হয়েছে। বাবুকে লাভ হয়েছে কিন্তু বিশেষ রূপে জানা হয় নাই।

আর এক থাক আছে, তাকে বলে সিদ্ধের সিদ্ধ। বাবুর সঙ্গে যদি বিশেষ আলাপ হয় তা হলে আর এক রকম অবস্থা—যদি ঈশ্বরের সঙ্গে প্রেম ভক্তির দ্বারা বিশেষ আলাপ হয়। যে সিদ্ধ সে ঈশ্বরকে পেয়েছে বটে—যিনি সিদ্ধের সিদ্ধ তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে বিশেষরূপে আলাপ করেছেন।

বোঝা। 'পড়া-শুনা-বোঝা' দ্রষ্টব্য।

ব্যবসা। দেখ, ব্যবসা করতে গেলে সত্য কথার আঁট থাকে না। ব্যবসায় তেজী মন্দি আছে। নানকের গল্পে আছে যে তিনি বললেন, অসাধুর দ্রব্য ভোজন করতে গিয়ে দেখলুম যে সে সব রক্তমাখা হয়ে গেছে। সাধুদের শুদ্ধ জিনিস দিতে হয়। মিথ্যা উপায়ে রোজগার করা জিনিস দিতে নাই। সত্যপথে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়।

ব্যাকুলতা। আচ্ছা, এরা এত জপ করে, এত তীর্থ করেছে, তবু এরকম কেন? যেন আঠার মাসে এক বৎসর।

হরিশকে বললুম, কাশী যাওয়া কি দরকার যদি ব্যাকুলতা না থাকে। ব্যাকুলতা থাকলে, এইখানেই কাশী।

এত তীর্থ এত জপ করে, হয় না কেন? ব্যাকুলতা নাই। ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকলে তিনি দেখা দেন।

যাত্রার গোড়ায় অনেক খচমচ খচমচ করে; তখন শ্রীকৃষ্ণকে দেখা যায় না। তার পর নারদ ঋষি যখন ব্যাকুল হয়ে বৃন্দাবনে এসে বীণা বাজাতে বাজাতে ডাকে আর বলে, প্রাণ হে গোবিন্দ মম জীবন। তখন কৃষ্ণ আর থাকতে পারেন না। রাখালদের সঙ্গে সামনে আসেন আর বলেন, ধবলী রও। ধবলী রও।

দ্রঃ ঈশ্বরদর্শন (যোগাযোগ ব্যাকুলতা)।

ব্যাকুলতা কেন হয় না? ভোগান্ত না হলে ব্যাকুলতা হয় না। কামিনী-কাঞ্চনের ভোগ যেটুকু আছে সেটুকু তৃপ্ত না হলে জগতের মাকে মনে পড়ে না। ছেলে যখন খেলায় মত্ত হয়, তখন মাকে চায় না। খেলা সাঙ্গ হয়ে গেলে তখন বলে, 'মা যাবো।' হৃদের ছেলে পায়রা লয়ে খেলা কচ্ছিল; পায়রাকে ডাকছে—'আয় তি তি!' করে। পায়রা লয়ে খেলা তৃপ্ত যাই হলো, অমনি কাঁদতে আরম্ভ করলে। তখন একজন অচেনা লোক এসে বল্লে, আমি তোকে মার কাছে লয়ে যাচ্ছি আয়। সে তারই কাঁধে চড়ে অনায়াসে গেল।

যারা নিত্যসিদ্ধ, তাদের সংসারে ঢুকতে হয় না। তাদের ভোগের বাসনা জন্ম থেকেই মিটে গেছে।

ব্যাকুলতা কেন হয় না সংসারীর। সংসারীদের ঈশ্বরানুরাগ ক্ষণিক—যেমন তপ্ত খোলায় জল পড়েছে, ছ্যাঁক করে উঠলো—তারপরই শুকিয়ে গেল।

সংসারী লোকদের ভোগের দিকে মন রয়েছে—তাই জন্য সে অনুরাগ, সে ব্যাকুলতা হয় না।

ব্যাকুলতা ছাড়া মুক্তি হয় না। কর্ম গেলে কেরানীর যেমন ব্যাকুলতা হয়। সে যেমন রোজ আফিসে আফিসে ঘোরে আর জিজ্ঞাসা করে, হ্যাঁগা কোন কর্ম খালি হয়েছে? ব্যাকুলতা হলে ছটফট করে, কিসে ঈশ্বরকে পাব। গোঁপে চাড়া, পায়ের উপর পা দিয়ে বসে আছেন, পান চিবুচ্ছেন, কোন ভাবনা নেই এরূপ অবস্থা হলে ঈশ্বর লাভ হয় না।

ব্রহ্ম অনুচ্ছিষ্ট। ক. ব্রহ্ম যে কি, মুখে বলা যায় না। সব জিনিস উচ্ছিষ্ট হয়ে গেছে। বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, ষড়দর্শন, সব এঁটো হয়ে গেছে। মুখে পড়া হয়েছে, মুখে উচ্চারণ হয়েছে—তাই এঁটো হয়েছে। কিন্তু একটি জিনিস কেবল উচ্ছিষ্ট হয় নাই, সে জিনিসটি ব্রহ্ম। ব্রহ্ম যে কি, আজ পর্যন্ত কেহ মুখে বলতে পারে নাই।

খ. ব্রহ্ম যে কি বস্তু মুখে বলা যায় না। সব জিনিস উচ্ছিষ্ট হয়েছে (অর্থাৎ মুখে বলা হয়েছে) কিন্তু ব্রহ্ম কি—কেউ মুখে বলতে পারে নাই। তাই উচ্ছিষ্ট হয় নাই। এ কথাটি বিদ্যাসাগরকে বলেছিলাম—বিদ্যাসাগর শুনে ভারী খুসী।

গ. এক বাপের দুটি ছেলে। ব্রহ্মবিদ্যা শিখবার জন্য ছেলে দুটিকে বাপ আচার্যের হাতে দিলেন। কয়েক বৎসর পরে তারা গুরুগৃহ থেকে ফিরে এলো, এসে বাপকে প্রণাম করলে। বাপের ইচ্ছা দেখেন, এদের ব্রহ্মজ্ঞান কিরূপ হয়েছে। বড় ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলে, 'বাপ। তুমি ত সব পড়েছ, ব্রহ্ম কিরূপ বল দেখি?' বড় ছেলেটি বেদ থেকে নানা শ্লোক বলে বলে ব্রহ্মের স্বরূপ বুঝাতে লাগলো। বাপ চুপ করে রইলেন। যখন ছোট ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন, সে হেঁটমুখে চুপ ক'রে রইল। মুখে কোন কথা নাই। বাপ তখন প্রসন্ন হ'য়ে ছোট ছেলেকে বললেন, 'বাপু। তুমিই একটু বুঝেছ। ব্রহ্ম যে কি, তা মুখে বলা যায় না।'

মানুষ মনে করে, আমরা তাঁকে জেনে ফেলেছি। একটা পিঁপড়ে চিনির পাহাড়ে গিছলো। এক দানা খেয়ে পেট ভরে গেল, আর এক দানা মুখে ক'রে বাসায় যেতে লাগলো, যাবার সময় ভাবছে, এবার এসে সব পাহাড়টি লয়ে যাব। ক্ষুদ্র জীবেরা এই সব মনে করে। জানে না ব্রহ্ম বাক্যমনের অতীত।

যে যতই বড় হউক না কেন, তাঁকে কি জানবে? শুকদেবাদি না হয় ডেঁও পিঁপড়ে—চিনির আট দশটা দানা না হয় মুখে করুক।

ব্রহ্ম ও আদ্যাশক্তি। যিনি ব্রহ্ম, তিনিই আদ্যাশক্তি। যখন নিষ্ক্রিয়, তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলি। পুরুষ বলি। যখন সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় এই সব করেন তাঁকে শক্তি বলি। পুরুষ আর প্রকৃতি। যিনিই পুরুষ তিনিই প্রকৃতি। আনন্দময় আর

আনন্দময়ী।

যার পুরুষ জ্ঞান আছে, তার মেয়ে জ্ঞানও আছে। যার বাপ জ্ঞান আছে তার মা জ্ঞানও আছে।

যার অন্ধকার জ্ঞান আছে তার আলো জ্ঞানও আছে। যার রাত জ্ঞান আছে তার দিন জ্ঞানও আছে। যার সুখ জ্ঞান আছে, তার দুঃখ জ্ঞানও আছে।

ব্রহ্ম ও শক্তি। তাই ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। এককে মানলেই আর একটিকে মানতে হয়। যেমন অগ্নি আর তার দাহিকাশক্তি; অগ্নি মানলেই দাহিকাশক্তি মানতে হয়, দাহিকাশক্তি ছাড়া অগ্নি ভাবা যায় না; আবার অগ্নিকে বাদ দিয়ে দাহিকা-শক্তি ভাবা যায় না। সূর্যকে বাদ দিয়ে সূর্যের রশ্মি ভাবা যায় না; সূর্যের রশ্মিকে ছেড়ে সূর্যকে ভাবা যায় না।

দুধ কেমন? না ধোবো ধোবো। দুধকে ছেড়ে দুধের ধবলত্ব ভাবা যায় না। আবার দুধের ধবলত্ব ছেড়ে দুধকে ভাবা যায় না।

তাই ব্রহ্মকে ছেড়ে শক্তিকে, শক্তিকে ছেড়ে ব্রহ্মকে ভাবা যায় না। নিত্যকে ছেড়ে লীলা, লীলাকে ছেড়ে নিত্য ভাবা যায় না।

ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। দ্রঃ 'ভক্তের ভগবান', 'শক্তির অভেদ', 'আদ্যাশক্তি', 'আদ্যাশক্তি দর্শনের উপায়', 'চিচ্ছক্তি ও ব্রহ্ম অভেদ'।

ব্রহ্মজ্ঞান। যার ব্রহ্মজ্ঞান হ'য়েছে, সে জীবন্মুক্ত! সে ঠিক বুঝতে পারে যে, আত্মা আলাদা আর দেহ আলাদা। ভগবানকে দর্শন করলে দেহাত্মবুদ্ধি আর থাকে না। দুটি আলাদা। যেমন নারিকেলের জল শুকিয়ে গেলে শাঁস আলাদা আর খোলা আলাদা হ'য়ে যায়। আত্মাটি যেন দেহের ভিতর নড় নড় করে। তেমনি বিষয়বুদ্ধিরূপ জল শুকিয়ে গেলে আত্মজ্ঞান হয়। আত্মা আলাদা আর দেহ আলাদা বোধ হয়। কাঁচা সুপারি বা কাঁচা বাদামের ভিতরের সুপারি বা বাদাম ছাল থেকে তফাত করা যায় না। কিন্তু পাকা অবস্থায় সুপারি বা বাদাম আলাদা—ও ছাল আলাদা হ'য়ে যায়। পাকা অবস্থায় রস শুকিয়ে যায়। ব্রহ্মজ্ঞান হলে বিষয়রস শুকিয়ে যায়।

ব্রহ্ম : জ্ঞান-অজ্ঞান। ক. দেখ, জ্ঞান-অজ্ঞানের পার হও, তবে তাঁকে জানতে পারা যায়। নানা জ্ঞানের নাম অজ্ঞান। পাণ্ডিত্যের অহংকারও অজ্ঞান। এক ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন, এই নিশ্চয় বুদ্ধির নাম জ্ঞান। তাঁকে বিশেষরূপে জানার নাম বিজ্ঞান। যেমন পায়ে কাঁটা বিঁধেছে, সে কাঁটাটা তোলবার জন্য আর একটি কাঁটার প্রয়োজন। কাঁটাটা তোলবার পর দুটি কাঁটাই ফেলে দেয়। প্রথমে অজ্ঞান কাঁটা দূর করবার জন্য জ্ঞান কাঁটাটি আনতে হয়। তারপর জ্ঞান-অজ্ঞান দুইটিই ফেলে দিতে হয়। তিনি যে জ্ঞান-অজ্ঞানের পার। লক্ষ্মণ বলেছিলেন, রাম! এ কি আশ্চর্য! এত বড় জ্ঞানী স্বয়ং বশিষ্ঠদেব, পুত্রশোকে অধীর হ'য়ে কেঁদে-ছিলেন! রাম বললেন, ভাই, যার জ্ঞান আছে, তার অজ্ঞানও আছে, যার এক জ্ঞান আছে, তার অনেক জ্ঞানও আছে। যার আলো বোধ আছে, তার অন্ধকার বোধও আছে। ব্রহ্ম—জ্ঞান-অজ্ঞানের পার, পাপ-পুণ্যের পার, ধর্মাধর্মের পার, শুচি-অশুচির পার।

খ. ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়। তিনি যখন সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়, এই সকল কাজ করেন, তখন তাঁকে আদ্যাশক্তি বলে। সেই আদ্যাশক্তিকে প্রসন্ন করতে হয়। চণ্ডীতে আছে জান না? দেবতারা আগে আদ্যাশক্তির স্তব ক'ল্লেন। তিনি প্রসন্ন হলে তবে হরির যোগনিদ্রা ভাঙ্গবে।

ব্রহ্মজ্ঞান অবর্ণনীয়। ব্রহ্ম কি, তা মুখে বলা যায় না। যার হয় সে খবর দিতে পারে না। একটা কথা আছে, কালাপানিতে জাহাজ গেলে আর ফিরে না।

চার বন্ধু ভ্রমণ করতে করতে পাঁচিলে ঘেরা একটা জায়গা দেখতে পেলে। খুব উঁচু পাঁচিল। ভিতরে কি আছে দেখবার জন্য সকলে বড় উৎসুক হ'ল। পাঁচিল বেয়ে একজন উঠলো। উঁকি মেরে যা দেখলে, তাতে অবাক হয়ে 'হা হা হা হা' ব'লে ভিতরে পড়ে গেল। আর কোন খবর দিল না। যেই উঠে সেই 'হা হা হা হা' করে পড়ে যায়। তখন খবর আর কে দেবে?

জড়ভরত, দত্তাত্রেয় এঁরা ব্রহ্ম দর্শন করে আর খবর দিতে পারেন নাই। ব্রহ্মজ্ঞান হয়ে সমাধি হলে আর 'আমি' থাকে না। তাই রামপ্রসাদ বলেছে, 'আপনি যদি না পারিস মন তবে রামপ্রসাদকে সঙ্গে নে না।' মনের লয় হওয়া চাই, আবার 'রামপ্রসাদের লয়' অর্থাৎ অহংতত্ত্বের লয় হওয়া চাই। তবে সেই ব্রহ্মজ্ঞান হয়।

দ্রঃ 'ব্রহ্মজ্ঞান চুপ'।

ব্রহ্মজ্ঞান ও ভক্তিযোগ। ['ভক্তিযোগ ও ব্রহ্মজ্ঞান' দ্রষ্টব্য]

ব্রহ্মজ্ঞান ও শুকদেব। কেউ কেউ বলে, শুকদেব ব্রহ্মসমুদ্রের দর্শন স্পর্শন মাত্র করেছিলেন, নেমে ডুব দেন নাই। তাই ফিরে এসে অত উপদেশ দিয়েছিলেন। কেউ বলে তিনি ব্রহ্মজ্ঞানের পর ফিরে এসেছিলেন—লোকশিক্ষার জন্য। পরীক্ষিৎকে ভাগবত বলবেন আরো কত লোকশিক্ষা দিবেন, তাই ঈশ্বর তাঁর সব 'আমি'র লয় করেন নাই। বিদ্যার 'আমি' এক রেখে দিয়েছিলেন।

ব্রহ্মজ্ঞান : কেশবসেন/দল/আমি। কেশব সেনের সঙ্গে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা হচ্ছিল। কেশব বললে, আরও বলুন। আমি বললুম, আর বললে দলটল থাকে না। তখন কেশব বললে, তবে আর থাক, মশাই। তবু কেশবকে বললুম, 'আমি' এটি অজ্ঞান। 'আমি থাক, কর্তা' আর আমার এই সব স্ত্রী, পুত্র, বিষয়, মান, সম্ভ্রম, এ ভাব অজ্ঞান না হলে হয় না। তখন কেশব বললে, মহাশয় 'আমি' ত্যাগ করলে যে আর কিছুই থাকে না। আমি বললুম, কেশব তোমাকে সব 'আমি' ত্যাগ করতে বলছি না, তুমি 'কাঁচা আমি' ত্যাগ কর। 'আমি কর্তা' 'আমার স্ত্রী-পুত্র' 'আমি গুরু', এ সব অভিমান, 'কাঁচা আমি'—এইটি ত্যাগ কর। এইটি ত্যাগ করে 'পাকা আমি' হয়ে থাকো। আমি তাঁর দাস, আমি তাঁর ভক্ত, আমি অকর্তা, তিনি কর্তা।

ব্রহ্মজ্ঞান চুপ। ব্রহ্ম আকাশবৎ। ব্রহ্মের ভিতর বিকার নাই। যেমন অগ্নির কোন রংই নাই। তবে শক্তিতে তিনি নানা হয়েছেন। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই তিন গুণ শক্তিরই গুণ। আগুনে যদি সাদা রং ফেলে দাও সাদা দেখাবে। যদি লাল রং ফেলে দাও লাল দেখাবে। যদি কাল রং ফেলে দাও তবে আগুন কাল দেখাবে। ব্রহ্ম—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিন গুণের অতীত। তিনি যে কি, মুখে বলা যায় না।

তিনি বাক্যের অতীত। নেতি নেতি করে করে যা বাকি থাকে আর যেখানে আনন্দ সেই ব্রহ্ম।

একটি মেয়ের স্বামী এসেছে ; অন্য সমবয়স্ক ছোকরাদের সহিত বাহিরের ঘরে বসেছে। এদিকে ঐ মেয়েটি ও তার সমবয়স্কা মেয়েরা জানালা দিয়ে দেখছে। তারা বরটিকে চেনে না—ঐ মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করছে, ঐটি কি তোর বর ? তখন সে একটু হেসে বলছে—না। আর একজনকে দেখিয়ে বলছে, ঐটি কি তোর বর ? সে আবার বলছে, না। আবার একজনকে দেখিয়ে বলছে, ঐটি কি তোর বর ? সে আবার বলছে, না। শেষে তার স্বামীকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করলে—ঐটি তোর বর ? তখন সে হাঁও বললে না, নাও বললে না—কেবল একটু ফিক করে হেসে চুপ করে রইল। তখন সমবয়স্কারা বুঝলে যে, ঐটিই তার স্বামী। যেখানে ঠিক ব্রহ্মজ্ঞান সেখানে চুপ।

দ্রঃ 'ব্রহ্মজ্ঞান অবর্ণনীয়'।

ব্রহ্মজ্ঞান পেতে হলে। বিষয়বুদ্ধির লেশ থাকলে এই ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। কামিনী-কাঞ্চন মনে আদৌ থাকবে না, তবে হবে। গিরিরাজকে পার্বতী বল্লেন, 'বাবা, ব্রহ্মজ্ঞান যদি চাও তা হলে সাধুসঙ্গ কর।'

ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পর। ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পরেও অনেকের ভিতর তিনি 'বিদ্যার আমি'—'ভক্তের আমি' রেখে দেন। হনুমান সাকার নিরাকার সাক্ষাৎকার করবার পর সেব্য সেবকের ভাবে, ভক্তের ভাবে থাকতেন। রামচন্দ্রকে বলেছিলেন, রাম, কখন ভাবি তুমি পূর্ণ, আমি অংশ। কখন ভাবি তুমি সেব্য আমি সেবক ; আর রাম, যখন তত্ত্বজ্ঞান হয় তখন দেখি তুমিই আমি, আমিই তুমি।

ব্রহ্মজ্ঞান হলে। দ্রঃ শান্তি।

ব্রহ্মজ্ঞানী : জ্ঞানপথ। বেদে ব্রহ্মজ্ঞানীর নানারকম অবস্থা বর্ণনা আছে। সে পথ, জ্ঞানপথ—বড় কঠিন পথ। বিষয়বুদ্ধির—কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তির লেশমাত্র থাকলে—জ্ঞান হয় না। এ পথ কলিযুগের পক্ষে নয়।

এই সম্বন্ধে বেদে সপ্তভূমির কথা আছে। এই সাত ভূমি মনের স্থানে। যখন সংসারে মন থাকে, তখন লিঙ্গ, গুহ্য, নাভি মনের বাসস্থান। মনের তখন ঊর্দ্ধ-দৃষ্টি থাকে না—কেবল কামিনী-কাঞ্চনে মন থাকে। মনের চতুর্থ ভূমি—হৃদয়। তখন প্রথম চৈতন্য হয়েছে। আর চারিদিকে জ্যোতিঃ দর্শন হয়। তখন সে ব্যক্তি ঐশ্বরিক জ্যোতিঃ দেখে অবাক হয়ে বলে, 'একি! একি!' তখন আর নীচের দিকে (সংসারের দিকে) মন যায় না।

মনের পঞ্চম ভূমি—কণ্ঠ। মন যার কণ্ঠে উঠেছে, তার অবিদ্যা অজ্ঞান সব গিয়ে, ঈশ্বরীয় কথা বই অন্য কোন কথা শুনতে বা বলতে ভাল লাগে না। যদি কেউ অন্য কথা বলে, সেখান থেকে উঠে যায়।

মনের ষষ্ঠ ভূমি—কপাল। মন সেখানে গেলে অহর্নিশি ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন হয়। তখনও একটু 'আমি' থাকে। সে ব্যক্তি সেই নিরুপম রূপ দর্শন করে উন্মত্ত হয়ে, সেই রূপকে স্পর্শ আর আলিঙ্গন করতে যায় কিন্তু পারে না। যেমন লণ্ঠনের ভিতর আলো আছে, মনে হয়, এই আলো ছুঁলুম ছুঁলুম ; কিন্তু

কাঁচ ব্যবধান আছে বলে ছুঁতে পারা যায় না ।

শিরোদেশ—সপ্তম ভূমি—সেখানে মন গেলে সমাধি হয় ও ব্রহ্মজ্ঞানীর ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ দর্শন হয়। কিন্তু সে অবস্থায় শরীর অধিক দিন থাকে না। সর্বদা বেহুঁশ, কিছু খেতে পারে না, মুখে দুধ দিলে গড়িয়ে যায়। এই ভূমিতে একুশ দিনে মৃত্যু। এই ব্রহ্মজ্ঞানীর অবস্থা।

ব্রহ্মজ্ঞানীর লক্ষণ। ব্রহ্মজ্ঞান হলে কতকগুলি লক্ষণে বুঝা যায়। শ্রীমদ্‌ভাগবতে জ্ঞানীর চারটি অবস্থার কথা আছে—(১) বালকবৎ, (২) জড়বৎ, (৩) উন্মাদবৎ, (৪) পিশাচবৎ। পাঁচ বছরের বালকের অবস্থা হয়। আবার কখনও পাগলের মতন ব্যবহার করে।

ব্রহ্মদর্শন ও লোকশিক্ষা। শংকরাচার্য লোক-শিক্ষার জন্য বিদ্যার 'আমি' রেখে-ছিলেন। ব্রহ্মদর্শন হলে মানুষ চুপ হয়ে যায়। যতক্ষণ দর্শন না হয়, ততক্ষণই বিচার। ঘি কাঁচা যতক্ষণ থাকে ততক্ষণই কল-কলানি। পাকা ঘির কোন শব্দ থাকে না। কিন্তু যখন পাকা ঘিয়ে আবার কাঁচা লুচি পড়ে—তখন আর একবার ছ্যাঁক কল্ কল্ করে। যখন কাঁচা লুচিকে পাকা করে, তখন আবার চুপ হয়ে যায়। তেমনি সমাধিস্থ পুরুষ লোকশিক্ষা দিবার জন্য আবার নেমে আসে, আবার কথা কয়।

যতক্ষণ মৌমাছি ফুলে না বসে ততক্ষণ ভন্ ভন্ করে। ফুলে বসে মধুপান করতে আরম্ভ করলে চুপ হয়ে যায়। মধুপান করবার পর মাতাল হয়ে আবার কখনও কখনও গুন গুন করে।

পুকুরে কলসীতে জল ভবার সময় ভক্ ভক্ শব্দ হয়। পূর্ণ হয়ে গেলে আর শব্দ হয় না। তবে আর এক কলসীতে যদি ঢালাঢালি হয় তা হলে আবার শব্দ হয়।

ব্রহ্ম নির্লিপ্ত। এই জগতে বিদ্যামায়া অবিদ্যামায়া দুইই আছে; জ্ঞান ভক্তি আবার কামিনীকাঞ্চনও আছে, সৎও আছে, অসৎও আছে। ভালও আছে আবার মন্দও আছে। কিন্তু ব্রহ্ম নির্লিপ্ত। ভাল মন্দ জীবের পক্ষে, সৎ অসৎ জীবের পক্ষে, তাঁর ওতে কিছু হয় না।

যেমন প্রদীপের সম্মুখে কেউ বা ভাগবত পড়ছে, আর কেউ বা জাল করছে। প্রদীপ নির্লিপ্ত।

সূর্য শিষ্টের উপর আলো দিচ্চে, আবার দুষ্টের উপরও দিচ্চে।

যদি বল দুঃখ, পাপ, অশান্তি এ সকল তবে কি? তার উত্তর এই যে, ও সব জীবের পক্ষে। ব্রহ্ম নির্লিপ্ত। সাপের ভিতর বিষ আছে, অন্যকে কামড়ালে মরে যায়। সাপের কিন্তু কিছু হয় না।

ব্রহ্মপদ তুচ্ছ। সংসারীরা বলে, কেন কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি যায় না? তাঁকে লাভ করলে আসক্তি যায়। যদি একবার ব্রহ্মানন্দ পায়, তাহলে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করতে বা অর্থ, মান সম্ভ্রমের জন্য, আর মন দৌড়ায় না।

বাদুলে পোকা যদি একবার আলো দেখে, তাহলে আর অন্ধকারে যায় না।

রাবণকে বলেছিল, তুমি সীতার জন্য মায়ার নানা রূপ ধরছো, একবার রামরূপ

ধরে সীতার কাছে যাও না কেন? রাবণ বললে, তুচ্ছং ব্রহ্মপদং পরবধূসঙ্গ কুতঃ —যখন রামকে চিন্তা করি, তখন ব্রহ্মপদ তুচ্ছ হয়, পরস্ত্রী তো সামান্য কথা! তা রামরূপ কি ধরবো।

ব্রহ্ম : পুরুষ-প্রকৃতি। যিনিই পুরুষ তিনিই প্রকৃতি, যিনিই ব্রহ্ম তিনিই শক্তি। যখন নিষ্ক্রিয় সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করছেন না, তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলি, পুরুষ বলি; আর যখন ঐ সব কাজ করেন তখন তাঁকে শক্তি বলি, প্রকৃতি বলি। কিন্তু যিনিই ব্রহ্ম তিনিই শক্তি, যিনিই পুরুষ তিনিই প্রকৃতি হয়ে রয়েছেন। জল স্থির থাকলেও জল, আর হেললে দুললেও জল। সাপ এঁকে বেঁকে চললেও সাপ; আবার চুপ করে কুণ্ডলি পাকিয়ে থাকলেও সাপ।

ব্রহ্মবর্ণন। তবে বেদে পুরাণে যা বলেছে—সে কি রকম বলা জান? একজন সাগর দেখে এলে কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে, কেমন দেখলে, সে লোক মুখ হাঁ করে বলে—ও! কি দেখলুম! কি হিল্লোল কল্লোল! ব্রহ্মের কথাও সেই রকম। বেদে আছে—তিনি আনন্দস্বরূপ—সচ্চিদানন্দ। শুকদেবাদি এই ব্রহ্মসাগর তটে দাঁড়িয়ে দর্শন স্পর্শন করেছিলেন। এক মতে আছে—তাঁরা এ সাগরে নামেন নাই। এ সাগরে নামলে আর ফিরবার যো নাই।

ব্রহ্মবোধ। প্রথমে 'নেতি' 'নেতি' করতে হয়। তিনি পঞ্চভূত নন; ইন্দ্রিয় নন; মন, বুদ্ধি, অহংকার নন; তিনি সকল তত্ত্বের অতীত। ছাদে উঠতে হবে, সব সিঁড়ি একে একে ত্যাগ করে যেতে হবে। সিঁড়ি কিছু ছাদ নয়। কিন্তু ছাদের উপর পৌঁছে দেখা যায় যে, যে জিনিসে ছাদ তৈয়ারী, ইট, চুন, সুরকি—সেই জিনিসেই সিঁড়িও তৈয়ারী। যিনি পরব্রহ্ম তিনিই এই জীবজগৎ হয়েছেন, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন। যিনি আত্মা, তিনিই পঞ্চভূত হয়েছেন। মাটি এত শক্ত কেন, যদি আত্মা থেকেই হয়েছে। তাঁর ইচ্ছাতে সব হতে পারে। শোণিত শুক্র থেকে যে হাড় মাংস হচ্ছে! সমুদ্রের ফেণা কত শক্ত হয়!

ব্রহ্ম সগুণ। 'শক্তির অভেদ', 'আদ্যাশক্তি দর্শনের উপায়' দ্রষ্টব্য।

ব্রহ্মস্বরূপ অবর্ণনীয়। নিত্যশুদ্ধবোধরূপম্।

ব্রহ্ম ও কালী। যিনি ব্রহ্ম তিনিই কালী (মা আদ্যাশক্তি)। যখন নিষ্ক্রিয়, তাঁকে ব্রহ্ম বলে কই। যখন সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় এই সব কাজ করেন, তাঁকে শক্তি বলে কই। স্থির জল ব্রহ্মের উপমা। জল হেলচে দুলচে, শক্তি বা কালীর উপমা। কালী! কি না—যিনি মহাকালের (ব্রহ্মের) সহিত রমণ করেন। কালী 'সাকার আকার নিরাকারা।' তোমাদের যদি নিরাকার বলে বিশ্বাস, কালীকে সেইরূপ চিন্তা করবে। একটা দৃঢ় করে তার চিন্তা করলে তিনিই জানিয়ে দেবেন, তিনি কেমন। শ্যামপুকুরে পৌঁছিলে তেলীপাড়াও জানতে পারবে। তখন জানতে পারবে যে তিনি শুধু আছেন (অস্তিমাত্রম্) তা নয়। তিনি তোমার কাছে এসে কথা কবেন—আমি যেমন তোমার সঙ্গে কথা কচ্ছি। বিশ্বাস করো সব হয়ে যাবে। আর একটি কথা—তোমার নিরাকার বলে যদি বিশ্বাস, দৃঢ় করে তাই বিশ্বাস করো। কিন্তু মতুয়ার বুদ্ধি (Dogmatism) কোরো না। তাঁর সম্বন্ধে এমন কথা জোর করে ব'লো না যে তিনি এই হতে পারেন, আর এই হতে পারেন

না। বলো আমার বিশ্বাস তিনি নিরাকার, আর কত কি হতে পারেন তিনি জানেন। আমি জানি না। বুঝতে পারি না। মানুষের এক ছটাক বুদ্ধিতে ঈশ্বরের স্বরূপ কি বুঝা যায়? এক সের ঘটিতে কি চার সের দুধ ধরে? তিনি যদি কৃপা করে কখনও দর্শন দেন, আর বুঝিয়ে দেন, তবে বুঝা যায়; নচেৎ নয়।

যিনি ব্রহ্ম তিনিই শক্তি, তিনিই মা।

ব্রহ্মানন্দ। নরেন্দ্র-রাখাল দ্রষ্টব্য।

ব্রহ্মের বর্ণনা : তটস্থ লক্ষণে। ব্রহ্ম কি মুখে বলা যায় না। রামগীতায় আছে, কেবল তটস্থ লক্ষণের দ্বারা তাঁকে বলা যায়, যেমন গঙ্গার উপর ঘোষপল্লী। গঙ্গার তটের উপর আছে এই কথা বলে ঘোষপল্লীকে ব্যক্ত করা যায়।

ব্রাহ্ম উপাসনা। তোমাদের উপাসনা শুনেছি। কিন্তু তোমাদের ব্রাহ্মসমাজে ঈশ্বরের ঐশ্বর্য অত বর্ণনা কর কেন? হে ঈশ্বর, তুমি আকাশ করিয়াছ; বড় বড় সমুদ্র করিয়াছ, চন্দ্রলোক, সূর্যলোক, নক্ষত্রলোক, সব করিয়াছ; এ সব কথায় আমাদের অত কাজ কি?

সব লোক বাবুর বাগান দেখেই অবাক—কেমন গাছ, কেমন ফুল, কেমন ঝিল, কেমন বৈঠকখানা, কেমন তার ভিতর ছবি, এই সব দেখেই অবাক। কিন্তু কই, বাগানের মালিক যে বাবু তাঁকে খোঁজে ক'জন? বাবুকে খোঁজে দুই-একজনা। ঈশ্বরকে ব্যাকুল হয়ে খুঁজলে তাঁকে দর্শন হয়, তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়, কথা হয়; যেমন, আমি তোমাদের সঙ্গে কথা কচ্ছি। সত্য বলছি দর্শন হয়।

এ কথা কারেই বা বলছি—কে বা বিশ্বাস করে!

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। আর তুমি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের নিয়ে বেশী মাখামাখি করো না। ওদের চিন্তা দু'পয়সা পাবার জন্য!

আমি দেখেছি, ব্রাহ্মণ স্বস্ত্যয়ন করতে এসেছে, চণ্ডীপাঠ কি আর কিছু পাঠ করছে। তা দেখেছি অর্ধেক পাতা উল্টে যাবে।

নিজের বধের জন্য একটি নরুণেই হয়। পরকে মারতেই ঢাল-তরোয়াল—শাস্ত্রাদি।

নানা শাস্ত্রেরও কিছু প্রয়োজন নাই। যদি বিবেক না থাকে, শুধু পাণ্ডিত্যে কিছু হয় না। ষট্‌শাস্ত্র পড়লেও কিছু হয় না। নির্জনে গোপনে কেঁদে কেঁদে তাঁকে ডাক, তিনিই সব করে দেবেন।

ব্রাহ্মদর্শন। ক. তোমাদেরও ভক্তিযোগ, তোমরা হরিনাম কর, মায়ের নাম গুণগান কর, তোমরা ধন্য! তোমাদের ভাবটি বেশ। বেদান্তবাদীদের মতো তোমরা জগৎকে স্বপ্নবৎ বলো না। ওরূপ ব্রহ্মজ্ঞানী তোমরা নও, তোমরা ভক্ত। তোমরা ঈশ্বরকে ব্যক্তি বলো, এও বেশ। তোমরা ভক্ত। ব্যাকুল হয়ে ডাকলে তাঁকে অবশ্য পাবে।

খ. ব্রহ্মজ্ঞানীরা হরিনাম করে, খুব ভাল। ব্যাকুল হয়ে ডাকলে তাঁর কৃপা হবে, ঈশ্বর লাভ হবে।

সব পথ দিয়েই তাঁকে পাওয়া যায়। এক ঈশ্বরকে নানা নামে ডাকে। যেমন এক ঘাটের জল হিন্দুরা খায়, বলে জল; আর এক ঘাটে খৃষ্টানরা খায়, বলে ওয়াটার; আর এক ঘাটে মুসলমানরা খায়, বলে পানি।

ব্রাহ্মসমাজ। ব্রাহ্মসমাজের তোমরা জ্ঞানী নও, ভক্ত। যারা জ্ঞানী, তাদের বিশ্বাস যে ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, স্বপ্নবৎ। আমি, তুমি, সব স্বপ্নবৎ।

তিনি অন্তর্যামী। তাঁকে সরল মনে, শুদ্ধ মনে প্রার্থনা কর। তিনি সব বুঝিয়ে দিবেন। অহঙ্কার ত্যাগ করে তাঁর শরণাগত হও; সব পাবে।

দ্রঃ ঐশ্বর্যপ্রীতি।

ব্রাহ্মসমাজে মতুয়ার বুদ্ধি (Dogmatism)। শুনলাম, এখানে নাকি সাইন বোর্ড আছে। অন্যমতের লোক নাকি এখানে আসবার যো নাই। নরেন্দ্র বললে, সমাজে গিয়ে কাজ নাই, শিবনাথের বাড়ীতে যেও।

আমি বলি সকলেই তাঁকে ডাকছে। দ্বেষাদ্বেষীর দরকার নাই। কেউ বলছে সাকার, কেউ বলছে নিরাকার। আমি বলি, যার সাকারে বিশ্বাস, সে সাকারই চিন্তা করুক। যার নিরাকারে বিশ্বাস, সে নিরাকারই চিন্তা করুক। তবে এই বলা যে, মতুয়ার বুদ্ধি (Dogamtism) ভাল নয়; অর্থাৎ আমার ধর্ম ঠিক আর সকলের ভুল। আমার ধর্ম ঠিক; আর ওদের ধর্ম ঠিক কি ভুল, সত্য কি মিথ্যা, এ আমি বুঝতে পাচ্ছিনে—এ ভাব ভাল। কেন না ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার না করলে তাঁর স্বরূপ বুঝা যায় না। কবীর বলতো, 'সাকার আমার মা, নিরাকার আমার বাপ। কাকো নিন্দো, কাকো বন্দো, দোনো পাল্লা ভারী।'

ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যৎ। সনাতন ধর্ম ঋষিরা যা বলেছেন, তাই থেকে যাবে। তবে ব্রাহ্মসমাজ ও ঐ রকম সম্প্রদায়ও একটু একটু থাকবে। সবই ঈশ্বরের ইচ্ছায় হচ্ছে যাচ্ছে।

ভক্ত : ত্যাগী ও সংসারী। ঠিক ঠিক ত্যাগী ভক্ত আর সংসারী ভক্তে অনেক তফাৎ। ঠিক ঠিক সন্ন্যাসী—ঠিক ঠিক ত্যাগী ভক্ত—মৌমাছির মতো। মৌমাছি ফুল বই আর কিছুতে বসবে না। মধুপান বই আর কিছু পান করবে না। সংসারী ভক্ত অন্য মাছির মতো, সন্দেশে বসছে, আবার পচা ঘায়েও বসছে। বেশ ঈশ্বরের ভাবেতে রয়েছে, আবার কামিনীকাঞ্চন লয়ে মত্ত হয়।

ঠিক ঠিক ত্যাগী ভক্ত চাতকের মতো। চাতক স্বাতী নক্ষত্রের মেঘের জল বই আর কিছু খাবে না। সাত সমুদ্র নদী ভরপুর। সে অন্য জল খাবে না। কামিনী-কাঞ্চন স্পর্শ করবে না। কামিনীকাঞ্চন কাছে রাখবে না, পাছে আসক্তি হয়।

ভক্ত। 'মেকীভক্ত' 'জ্ঞানী ও ভক্ত' দ্রষ্টব্য।

ভক্ত ও কর্ম। ভক্ত বলে, 'মা, সকাম কর্মে আমার বড় ভয় হয়। সে কর্মে কামনা আছে। সে কর্ম করলেই ফল পেতে হবে। আবার অনাসক্ত হয়ে কর্ম করা কঠিন। সকাম কর্ম করতে গেলে, তোমায় ভুলে যাবো। তবে এমন কর্মে কাজ নাই। যতদিন না তোমায় লাভ করতে পারি, ততদিন পর্যন্ত যেন কর্ম কমে যায়। যেটুকু কর্ম থাকবে, সেটুকু কর্ম যেন অনাসক্ত হয়ে করতে পারি, আর সঙ্গে সঙ্গে যেন খুব ভক্তি হয়। আর যতদিন না তোমায় লাভ করতে পারি, ততদিন কোন নূতন কর্ম জড়াতে মন না যায়। তবে যখন তুমি আদেশ করবে তখন তোমার কর্ম করবো, নচেৎ নয়।

ভক্ত ও বিষয়ী। কে ভক্ত, কে বিষয়ী চিনতে পার না। তা সে তোমার দোষ নয়। প্রথম ঝড় উঠলে কোনটা তেঁতুল গাছ, কোনটা আম গাছ বুঝা যায় না।

ভক্ত ও ভগবান। এমনি আছে যে ভগবানের চেয়ে ভক্ত বড়—কেননা ভক্ত ভগবানকে হৃদয়ে বয়ে নিয়ে বেড়ায়। ভক্ত 'মোরে দেখে হীন, আপনাকে দেখে বড়।' যশোদা কৃষ্ণকে বাঁধতে গিছিলেন। যশোদার বিশ্বাস, আমি কৃষ্ণকে না দেখলে তাকে কে দেখবে! কখনও ভগবান চুম্বুক, ভক্ত ছুঁচ—ভগবান আকর্ষণ করে ভক্তকে টেনে লন। আবার কখনও ভক্ত চুম্বুক পাথর হন, ভগবান ছুঁচ হন। ভক্তের এত আকর্ষণ যে তার প্রেমে মুগ্ধ হয়ে ভগবান তাঁর কাছে গিয়ে পড়েন।

ভক্ত জ্ঞানী। দেহের সুখ-দুঃখ যাই হোক, ভক্তের জ্ঞান, ভক্তির ঐশ্বর্য থাকে, সে ঐশ্বর্য কখনও যাবার নয়। দেখ না—পাণ্ডবদের অত বিপদ! কিন্তু এ বিপদে তারা চৈতন্য একবারও হারায় নাই। তাদের মতো জ্ঞানী তাদের মতো ভক্ত কোথায়?

ভক্তমাল। বইখানিতে বেশ ভক্তদের কথা আছে। তবে একঘেয়ে। যাদের অন্য মত, তাদের নিন্দা আছে।

দ্রঃ মনের যোগ।

বৈষ্ণবদের একটি গ্রন্থ ভক্তমাল। বেশ বই, ভক্তদের সব কথা আছে। তবে একঘেয়ে। এক জায়গায় ভগবতীকে বিষ্ণুমন্ত্র লইয়ে তবে ছেড়েছে।

ভক্তি : অহৈতুকী ও শুদ্ধা। যা বলেছেন, তার নাম অহৈতুকী ভক্তি। মহেন্দ্র সরকারের কাছে আমি কিছু চাই না—কোন প্রয়োজন নাই, মহেন্দ্র সরকারকে দেখতে ভাল লাগে, এরই নাম অহৈতুকী ভক্তি। একটু আনন্দ হয় তা কি করবো?

অহল্যা বলেছিল, হে রাম! যদি শুকরযোনিতে জন্ম হয় তাতেও আমার আপত্তি নাই, কিন্তু যেন তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি থাকে, আমি আর কিছু চাই না। রাবণ বধের কথা স্মরণ করাবার জন্য নারদ অযোধ্যায় রামচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। তিনি সীতারাম দর্শন করে স্তব করতে লাগলেন। রামচন্দ্র স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, 'নারদ! আমি তোমার স্তবে সন্তুষ্ট হয়েছি, তুমি কিছু বর লও।' নারদ বললেন, 'রাম! যদি একান্ত আমায় বর দেবে, তো এই বর দাও যেন তোমার পাদপদ্মে আমার শুদ্ধাভক্তি থাকে, আর এই করো যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই।' রাম বললেন, 'আরও কিছু বর লও।' নারদ বললেন, 'আর কিছুই আমি চাই না, কেবল তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি।'

এঁর তাই। যেমন ঈশ্বরকে শুধু দেখতে চায়, আর কিছু ধন মান দেহসুখ—কিছুই চায় না। এরই নাম শুদ্ধাভক্তি।

আনন্দ একটু হয় বটে, কিন্তু বিষয়ের আনন্দ নয়। ভক্তির, প্রেমের আনন্দ। শম্ভু (মল্লিক) বলেছিল—যখন আমি তার বাড়িতে প্রায় যেতুম—'তুমি এখানে এস; অবশ্য আমার সঙ্গে আলাপ করে আনন্দ পাও তাই এস'—ঐটুকু আনন্দ আছে।

ভক্তি : (সকাম ও নিষ্কাম)। বেশী বিচার করা ভাল নয়, মার পাদপদ্মে ভক্তি থাকলেই হ'ল। বেশী বিচার করতে গেলে সব গুলিয়ে যায়। এ দেশে পুকুরের

জল উপর উপর খাও বেশ পরিষ্কার জল পাবে। বেশী নীচে হাত দিয়ে নাড়লে জল ঘুলিয়ে যায়। তাই তাঁর কাছে ভক্তি প্রার্থনা কর। ধ্রুবের ভক্তি সকাম। রাজ্যলাভের জন্য তপস্যা করেছিলেন। প্রহ্লাদের কিন্তু নিষ্কাম অহৈতুকী ভক্তি।

ভক্তি। যে ঠিক ভক্ত, তার কাছে হাজার বেদান্ত বিচার করো, আর 'স্বপ্নবৎ' বল তার ভক্তি যাবার নয়। ফিরে ঘুরে একটুখানি থাকবেই। একটা মুষল ব্যানা বনে পড়েছিল, তাতেই 'মুষলং কুলনাশনম্।'

শিব অংশে জন্মালে জ্ঞানী হয়; ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, এই বোধের দিকে মন সর্বদা যায়। বিষ্ণু অংশে জন্মালে প্রেম ভক্তি হয়, সে প্রেম ভক্তি যাবার নয়। জ্ঞান বিচারের পর এই প্রেম ভক্তি যদি কমে যায়, আবার এক সময় হুহু করে বেড়ে যায়; যদুবংশ ধ্বংস করেছিল মুষল, তারই মতো।

দ্রঃ কর্ম ও ভক্তি, 'রাগ ভক্তি', বৈধী ভক্তি, স্বতঃসিদ্ধভক্তি, কাঁচা ও পাকা ভক্তির জন্য প্রেমাভক্তির নানা রূপ। অহৈতুকী ভক্তি, প্রেমাভক্তি, ঊর্জিতাভক্তি।

ভক্তিই সার। ক. ভক্তিই সার। তাঁর নামগুণ কীর্তন সর্বদা করতে করতে ভক্তি লাভ হয়। আহা! শিবনাথের কি ভক্তি! যেন রসে ফেলা ছানাবড়া।

খ. ভক্তিই একমাত্র সার—ঈশ্বরে ভক্তি। তারা কি ভক্তি খোঁজে? তা হ'লে ভাল। ভগবান লাভ যদি উদ্দেশ্য হয় তা হলেই ভাল। চন্দ্রলোক, সূর্যলোক, নক্ষত্র-লোক, মহাত্মা এই নিয়ে কেবল থাকলে ঈশ্বরকে খোঁজা হয় না। তাঁর পাদপদ্মে ভক্তি হবার জন্য সাধন করা চাই, ব্যাকুল হয়ে ডাকা চাই। নানা জিনিস থেকে মন কুড়িয়ে এনে তাঁতে লাগাতে হয়।

দ্রঃ তীর্থে যাওয়া।

ভক্তি ও ঈশ্বর। ভক্তিই সার। সকাম ভক্তিও আছে; আবার নিষ্কাম ভক্তি, শুদ্ধা ভক্তি, অহৈতুকী ভক্তি এও আছে। কেশব সেন ওরা অহৈতুকী ভক্তি জানত না; কোন কামনা নাই, কেবল ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তি।

আবার আছে, ঊর্জিতা ভক্তি। যেন উথলে পড়ছে। ভাবে হাসে কাঁদে নাচে গায়। যেমন চৈতন্যদেবের। রাম বললেন লক্ষ্মণকে, ভাই যেখানে দেখবে ঊর্জিতা ভক্তি, সেইখানে জানবে আমি স্বয়ং বর্তমান।

ভক্তি কায়-মন-বাক্যে। দ্রঃ কায়-মন-বাক্যে ভক্তি।

ভক্তি : জ্ঞান মিশ্রিতা ও প্রেমা। ঈশ্বরে খুব ভালবাসা না হ'লে প্রেমাভক্তি হয় না। আর 'আমার' জ্ঞান। তিন বন্ধু বন দিয়ে যাচ্ছে, বাঘ এসে উপস্থিত। একজন বললে, 'ভাই! আমরা সব মারা গেলুম!' আর একজন বললে, 'কেন? মারা যাব কেন? এস ঈশ্বরকে ডাকি।' আর একজন বললে, 'না, তাঁকে আর কষ্ট দিয়ে কি হবে? এস, এই গাছে উঠে পড়ি।'

যে লোকটি বললে, 'আমরা মারা গেলুম', সে জানে না যে ঈশ্বর রক্ষাকর্তা আছেন; যে বললে, 'এস, আমরা ঈশ্বরকে ডাকি', সে জ্ঞানী; তার বোধ আছে যে ঈশ্বর সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় সব করছেন। আর যে বললে, তাঁকে কষ্ট দিয়ে কি হবে, এস গাছে উঠি; তার ভিতরে প্রেম জন্মেছে, ভালবাসা জন্মেছে। তা প্রেমের স্বভাবই এই যে, আপনারে বড় মনে করে, আর প্রেমের পাত্রকে ছোট

মনে করে। পাছে তার কষ্ট হয়। কেবল এ ইচ্ছা যে, যাকে ভালবাসে তার পায়ে কাঁটাটি পর্যন্ত না ফোটে।

ভক্তিপথ (নির্বিচার ভক্তি)। বেদান্ত, দর্শনের বিচারে ব্রহ্ম নির্গুণ। তাঁর কি স্বরূপ তা মুখে বলা যায় না। কিন্তু যতক্ষণ তুমি নিজে সত্য, ততক্ষণ জগৎও সত্য। ঈশ্বরের নানারূপও সত্য, ঈশ্বরকে ব্যক্তিবোধও সত্য।

ভক্তিপথ তোমাদের পথ। এ খুব ভাল—এ সহজ পথ। অনন্ত ঈশ্বরকে কি জানা যায়? আর তাঁকে জানবারই বা কি দরকার? এই দুর্লভ মানুষ জনম পেয়ে আমার দরকার তাঁর পাদপদ্মে যেন ভক্তি হয়।

যদি আমার একঘটি জলে তৃষ্ণা যায়, পুকুরে কত জল আছে, এ মাপবার আমার কি দরকার? আমি আধ বোতল মদে মাতাল হ'য়ে যাই, শুঁড়ির দোকানে কত মণ মদ আছে এ হিসাবে আমার কি দরকার? অনন্তকে জানার দরকারই বা কি?

দ্রঃ ইন্দ্রিয়নিগ্রহ কি আগে করতে হয়? নানকপন্থী।

ভক্তি : ভাব : চৈতন্যদেব। ভক্তি পাকলে ভাব ; তার পর মহাভাব—তার পর প্রেম : তার পর বস্তু লাভ (ঈশ্বরলাভ)।

গৌরাঙ্গের—মহাভাব, প্রেম।

এই প্রেম হলে জগৎ ত ভুল হয়ে যাবেই। আবার নিজের দেহ যে এত প্রিয় তাও ভুল হয়ে যায়! গৌরাঙ্গের এই প্রেম হয়েছিল। সমুদ্র দেখে যমুনা ভেবে ঝাঁপ দিয়ে পড়লো।

জীবের মহাভাব বা প্রেম হয় না—তাদের ভাব পর্যন্ত। আর গৌরাঙ্গের তিনটি অবস্থা হ'ত। কেমন?

অন্তর্দশায় তিনি সমাধিস্থ থাকতেন। অর্ধবাহ্যদশায় কেবল নৃত্য করতে পারতেন। বাহ্যদশায় নামসংকীর্তন করতেন।

ভক্তি যদি একবার হয়। ভক্তিপথেও তাঁকে পাওয়া যায়। যদি ঈশ্বরের পাদপদ্মে একবার ভক্তি হয়, যদি তাঁর নাম গুণগান করতে ভাল লাগে, তাহলে ইন্দ্রিয় সংযম আর চেষ্টা করে করতে হয় না। রিপুবশ আপনা আপনি হয়ে যায়।

যদি কারও পুত্রশোক হয়, সেদিন সে কি আর লোকের সঙ্গে ঝগড়া করতে পারে, না, নিমন্ত্রণে গিয়ে খেতে পারে? সে কি লোকের সামনে অহংকার করে বেড়াতে পারে, না, সুখ-সম্ভোগ করতে পারে?

বাদুলে পোকা যদি একবার আলো দেখতে পায়, তা হলে কি সে আর অন্ধকারে থাকে?

[সঙ্গে 'ঈশ্বরের আলো' দ্রষ্টব্য]

ভক্তিযোগ। ভক্তিযোগে সব পাওয়া যায়। আমি মার কাছে কেঁদে কেঁদে বলেছিলাম, 'মা যোগীরা যোগ করে যা জেনেছে, জ্ঞানীরা বিচার করে যা জেনেছে—আমায় জানিয়ে দাও—আমায় দেখিয়ে দাও!' মা আমায় সব দেখিয়ে দিয়েছেন। ব্যাকুল হয়ে তাঁর কাছে কাঁদলে তিনি সব জানিয়ে দেন। বেদ বেদান্ত পুরাণ তন্ত্র—এ সব শাস্ত্রে কি আছে ; সব তিনি আমায় জানিয়ে দিয়েছেন।

দ্রঃ যোগের প্রকার, পথ দুটি, কুলকুণ্ডলিনী-জাগরণ, ধর্মাধর্ম।

ভক্তিযোগ ও ব্রহ্মজ্ঞান। কেউ কেউ সমাধির পরও 'ভক্তের আমি' 'দাস আমি' নিয়ে থাকে। আমি দাস তুমি প্রভু, আমি ভক্ত তুমি ভগবান, এই অভিমান ভক্তের থাকে। ঈশ্বর লাভের পরও থাকে, সব 'আমি' যায় না। আবার এই অভিমান অভ্যাস করতে করতে ঈশ্বর লাভ হয়। এরই নাম ভক্তিযোগ।

ভক্তির পথ ধরে গেলে ব্রহ্মজ্ঞান হয়। ভগবান সর্বশক্তিমান, মনে করলে ব্রহ্মজ্ঞানও দিতে পারেন। ভক্তেরা প্রায় ব্রহ্মজ্ঞান চায় না। আমি দাস, তুমি প্রভু ; আমি ছেলে, তুমি মা—এই অভিমান রাখতে চায়।

ভক্তির জোর। ভক্তি মেয়েমানুষ, তাই অন্তঃপুর পর্যন্ত যেতে পারে। জ্ঞান বারবাড়ি পর্যন্ত যায়।

ঠিক পথ জানে না, কিন্তু ঈশ্বরে ভক্তি আছে, তাঁকে জানবার ইচ্ছা আছে—এরূপ লোক কেবল ভক্তির জোরে ঈশ্বর লাভ করে। একজন ভারী ভক্ত জগন্নাথ দর্শন করতে বেরিয়েছিল। পুরীর কোন পথ সে জানতো না, দক্ষিণ দিকে না গিয়ে পশ্চিম দিকে গিছল। পথ ভুলেছিল বটে, কিন্তু ব্যাকুল হয়ে লোকদের জিজ্ঞাসা করত। তারা বলে দিলে, 'এ পথ নয়, ঐ পথে যাও।' ভক্তটি শেষে পুরীতে গিয়ে জগন্নাথ দর্শন করলে। দেখ, না জানলেও কেউ না কেউ বলে দেয়।

ভক্তির তমঃ। তা সংসারে আছ, থাকলেই বা। কিন্তু কর্মফল সমস্ত ঈশ্বরকে সমর্পণ করতে হবে। নিজে কোন ফল কামনা করতে নাই।

তবে একটা কথা আছে। ভক্তি কামনা কামনার মধ্যে নয়। ভক্তি কামনা, ভক্তি প্রার্থনা—করতে পার।

ভক্তির তমঃ আনবে। মার কাছে জোর কর।

ত্রৈলোক্য বলেছিল, আমি যেকালে ওদের ঘরে জন্মেছি, তখন আমার হিস্যে আছে।

তোমার যে আপনার মা গো ! এ কি পাতানো মা, এ কি ধর্ম মা ! এতে জোর চলবে না তো কিসে জোর চলবে ?

ভক্তির বীজ। নির্বাণ যে চাই এমন কিছু না। এই রকম আছে যে, নিত্যকৃষ্ণ তাঁর নিত্যভক্ত। চিন্ময় শ্যাম, চিন্ময় ধাম !

যেমন চন্দ্র যেখানে, তারাগণও সেখানে। নিত্য কৃষ্ণ, নিত্য ভক্ত। তুমিই ত বল গো, অন্তর্বহির্যদিহরি-স্তপসা ততঃ কিম্‌—আর তোমায় ত বলেছি যে, বিষ্ণু অংশে ভক্তির বীজ যায় না। আমি এক জ্ঞানীর পাল্লায় পড়েছিলুম, এগার মাস বেদান্ত শুনালে। কিন্তু ভক্তির বীজ আর যায় না। ফিরে ঘুরে সেই 'মা মা'! যখন গান করতুম ন্যাংটা কাঁদতো—বলতো, 'আরে কেয়া রে !' দেখ, অত বড় জ্ঞানী কেঁদে ফেলতো। এইটে জেনে রেখো—আলেখ লতার জল পেটে গেলে গাছ হয়। ভক্তির বীজ একবার পড়লে অব্যর্থ হয়, ক্রমে গাছ, ফল, ফুল, দেখা দিবে।

মুষলং কুলনাশম্‌। মুষল যত ঘষেছিল, ক্ষয় হয়ে হয়ে একটু সামান্য ছিল। সেই সামান্যতেই যদুবংশ ধ্বংস হয়েছিল। হাজার জ্ঞান বিচার করো, ভিতরে

ভক্তির বীজ থাকলে, আবার ফিরে ঘুরে—হরি হরি হরিবোল।

ভক্তির ভেদ। ভক্তিই সার। আবার ভক্তির সত্ত্ব, ভক্তির রজঃ, ভক্তির তমঃ আছে। ভক্তির সত্ত্ব দীনহীন ভাব; ভক্তির তমঃ যেন ডাকাত-পড়া ভাব। আমি তাঁর নাম করছি, আমার আবার পাপ কি? তুমি আমার আপনার মা, দেখা দিতেই হবে।

ভক্তির রকম ভেদ। প্রকৃতি অনুসারে ভক্তি তিন রকম! ভক্তির সত্ত্ব, ভক্তির রজঃ, ভক্তির তমঃ।

ভক্তির সত্ত্ব—ঈশ্বরই টের পান। সেরূপ ভক্ত গোপন ভালবাসে—হয় ত মশারির ভিতর ধ্যান করে, কেউ টের পায় না। সত্ত্বের সত্ত্ব—বিশুদ্ধ সত্ত্ব—হলে ঈশ্বর দর্শনের আর দেরী নাই; যেমন অরুণোদয় হলে বুঝা যায় যে, সূর্যোদয়ের আর দেরী নাই।

ভক্তির রজঃ যাদের হয়, তাদের একটা ইচ্ছা হয়—লোকে দেখুক আমি ভক্ত। সে ষোড়শোপচার দিয়ে পূজা করে, গরদ পরে ঠাকুরঘরে যায়—গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, মালায় মুক্তা, মাঝে মাঝে একটি সোনার রুদ্রাক্ষ।

ভক্তির তমঃ যেমন ডাকাতপড়া ভক্তি। ডাকাত ঢেঁকি নিয়ে ডাকাতি করে, আটটা দারোগার ভয় নাই—মুখে 'মারো! লোটো!' উন্মাদের ন্যায় বলে—'হর, হর, হর; ব্যোম, ব্যোম! জয় কালী!' মনে খুব জোর, জ্বলন্ত বিশ্বাস!

ভক্তিলাভের পর সংসার। ভক্তি লাভের পর সংসার করা যায়। যেমন হাতে তেল মেখে কাঁটাল ভাঙ্গলে হাতে আর আঠা লাগে না। সংসার জলের স্বরূপ আর মানুষের মনটি যেন দুধ। জলে যদি দুধ রাখতে যাও, দুধে-জলে এক হয়ে যাবে। তাই নির্জন স্থানে দই পাততে হয়। দই পেতে মাখন তুলতে হয়। মাখন তুলে যদি জলে রাখ, তা হলে জলে মিশবে না; নির্লিপ্ত হয়ে ভাসতে থাকবে।

ভক্তের আমি। ক. ভক্তির আমি, বিদ্যার আমি, বালকের আমি—এতে দোষ নাই। শংকরাচার্য 'বিদ্যার আমি' রেখেছিলেন; লোকশিক্ষা দিবার জন্য। বালকের আমির আঁট নাই। বালক গুণাতীত, কোন গুণের বশ নয়। এই রাগ কল্লে, আবার কোথাও কিছু নাই, এই খেলাঘর কল্লে, আবার ভুলে গেল; এই খেলুড়ে-দের ভালবাসছে, আবার কিছুদিন তাদের না দেখলে ত সব ভুলে গেল। বালক সত্ত্ব রজঃ তমঃ কোন গুণের বশ নয়।

তুমি ঠাকুর, আমি ভক্ত—এটি ভক্তের ভাব, এ আমি 'ভক্তির আমি'। কেন ভক্তির আমি রাখে? তার মানে আছে। 'আমি' ত যাবার নয় তবে থাক শালা 'দাস আমি' 'ভক্তের আমি' হয়ে।

খ. যশোদা কৃষ্ণবিরহে কাতর হয়ে শ্রীমতীর কাছে গেলেন। তাঁর কষ্ট দেখে শ্রীমতী তাঁকে স্বরূপে দেখা দিলেন—আর বললেন 'কৃষ্ণ চিদাত্মা আর আমি চিৎশক্তি। মা তুমি আমার কাছে বর লও।' যশোদা বললেন, মা আমার ব্রহ্মজ্ঞান চাই না—কেবল এই বর দাও যেন ধ্যানে গোপালের রূপ সর্বদা দর্শন হয়, আর কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ যেন সর্বদা হয়, আর ভক্তদের যেন আমি সেবা করতে পারি—আর

তাঁর নাম গুণকীর্তন যেন আমি সর্বদা করতে পারি।

গোপীদের ইচ্ছা হয়েছিল, ভগবানের ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন করে। কৃষ্ণ তাদের যমুনায় ডুব দিতে বললেন। ডুব দেওয়াও যা অমনি বৈকুণ্ঠে সব্বাই উপস্থিত ;—ভগবানের সেই ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ রূপ দর্শন হ'ল, কিন্তু ভাল লাগল না। তখন কৃষ্ণকে তারা বললে, আমাদের গোপালকে দর্শন, গোপালের সেবা এই যেন থাকে ; আর আমরা কিছুই চাই না।

মথুরা যাবার আগে কৃষ্ণ ব্রহ্মজ্ঞান দিবার উদ্যোগ করেছিলেন। বলেছিলেন, আমি সর্বভূতের অন্তরে বাহিরে আছি। তোমরা কি একটি রূপ কেবল দেখছ ? গোপীরা বলে উঠলো, কৃষ্ণ তবে কি আমাদের ত্যাগ করে যাবে, তাই ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দিচ্ছে ?

গোপীদের ভাব কি জান ? আমরা রাইয়ের, রাই আমাদের।

ভক্তের ইচ্ছা অনিচ্ছা। ভক্ত ঈশ্বরের সাকার রূপ দেখতে চায় ও তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে চায় ;—প্রায় ব্রহ্মজ্ঞান চায় না। তবে ঈশ্বর ইচ্ছাময়, তাঁর যদি খুশি হয় তিনি ভক্তকে সকল ঐশ্বর্যের অধিকারী করেন। ভক্তিও দেন, জ্ঞানও দেন। কলকাতায় যদি কেউ একবার এসে পড়তে পারে তা হলে গড়ের মাঠ, সুসাইটি, (Asiatic Society, Museum) সবই দেখতে পায়।

ভক্তের গুণ : সহ্য করা। তুমি সাকারবাদীদের সঙ্গে মেশো বলে তোমার নাকি বড় নিন্দা হয়েছে ? যে ভগবানের ভক্ত তার কূটস্থ বুদ্ধি হওয়া চাই। যেমন কামারশালের নাই। হাতুড়ির ঘা অনবরত পড়ছে, তবু নির্বিকার। অসৎ লোকে তোমাকে কত কি বলবে, নিন্দা করবে। তুমি যদি আন্তরিক ভগবানকে চাও, তুমি সব সহ্য করবে। দুষ্টলোকের মধ্যে থেকে কি আর ঈশ্বরচিন্তা হয় না ? দেখ না, ঋষিরা বনের মধ্যে ঈশ্বরকে চিন্তা করতো। চারিদিকে বাঘ, ভাল্লুক, নানা হিংস্র জন্তু। অসৎলোকের, বাঘ ভাল্লুকের, স্বভাব ; তেড়ে এসে অনিষ্ট করবে।

ভক্তের থাক। ভক্ত এখানে যারা আসে—দুই থাক। এক থাক বলছে, আমায় উদ্ধার করো। হে ঈশ্বর। আর এক থাক, তারা অন্তরঙ্গ, তারা ও কথা বলে না। তাদের দুটি জিনিস জানলেই হ'ল ; প্রথম, আমি (শ্রীরামকৃষ্ণ) কে ? তারপর, তারা কে—আমার সঙ্গে সম্বন্ধ কি ?

ভক্তের পক্ষে ব্রহ্ম। ভক্তের পক্ষে সগুণ ব্রহ্ম। অর্থাৎ তিনি সগুণ—একজন ব্যক্তি হয়ে, রূপ হয়ে দেখা দেন। তিনিই প্রার্থনা শুনেন। তোমরা যে প্রার্থনা করো, তাঁকেই করো। তোমরা বেদান্তবাদী নও, জ্ঞানী নও, তোমরা ভক্ত। সাকার রূপ মানো আর না মানো এসে যায় না। ঈশ্বর একজন ব্যক্তি বলে বোধ থাকলেই হ'ল—যে ব্যক্তি প্রার্থনা শুনেন, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করেন, যে ব্যক্তি অনন্তশক্তি।

ভক্তিপথেই তাঁকে সহজে পাওয়া যায়।

ভক্তের ভগবান। জ্ঞানী ব্রহ্মকে জানতে চায়। ভক্তের ভগবান—ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ সর্বশক্তিমান ভগবান। কিন্তু বস্তুতঃ ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ—যিনি সচ্চিদানন্দ,

তিনিই সচ্চিদানন্দময়ী। যেমন মণির জ্যোতিঃ ও মণি ; মণির জ্যোতিঃ বললেই মণি বুঝায়, মণি বললেই জ্যোতিঃ বুঝায়। মণি না ভাবলে মণির জ্যোতিঃ ভাবতে পারা যায় না—মণির জ্যোতিঃ না ভাবলে মণি ভাবতে পারা যায় না।

এক সচ্চিদানন্দ শক্তিভেদে উপাধি ভেদ—তাই নানারূপ—সে তো তুমিই গো তারা। যেখানে কার্য (সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়) সেইখানেই শক্তি। কিন্তু জল স্থির থাকলেও জল, তরঙ্গ ভুড়ভুড়ি হলেও জল। সেই সচ্চিদানন্দই আদ্যাশক্তি—যিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করেন। যেমন কাপ্তেন যখন কোন কাজ করেন না তখনও যিনি, আর কাপ্তেন পূজা করছেন, তখনও তিনি ; আর কাপ্তেন লাট সাহেবের কাছে যাচ্ছেন, তখনও তিনি ; কেবল উপাধি বিশেষ।

ভক্তের ভাব। ক. ভক্তের ভাব কিরূপ জান ? হে ভগবান 'তুমি প্রভু, আমি তোমার দাস', 'তুমি মা, আমি তোমার সন্তান' আবার 'তুমি আমার পিতা বা মাতা।' তুমি পূর্ণ, আমি তোমার অংশ। ভক্ত এমন কথা বলতে ইচ্ছা করে না যে 'আমি ব্রহ্ম।'

খ. যার যেমন ভাব ঈশ্বরকে সে তেমনই দেখে। তমোগুণী ভক্ত ; সে দেখে মা পাঁঠা খায়, আর বলিদান দেয়। রজোগুণী ভক্ত নানা ব্যঞ্জন ভাত করে দেয়। সত্ত্বগুণী ভক্তের পূজার আড়ম্বর নাই। তার পূজা লোকে জানতে পারে না। ফুল নাই, তো বিল্বপত্র, গঙ্গাজল দিয়ে পূজা করে। দুটি মুড়কি দিয়ে কি বাতাসা দিয়ে শীতল দেয়। কখনও বা ঠাকুরকে একটু পায়েস রেঁধে দেয়।

আর আছে, ত্রিগুণাতীত ভক্ত। তাঁর বালকের স্বভাব। ঈশ্বরের নাম করাই তাঁর পূজা। শুদ্ধ তাঁর নাম!

ভক্তের লক্ষণ। ঠিক ভক্তের লক্ষণ আছে। গুরুর উপদেশ শুনে স্থির হয়ে থাকে। বেহুলার গানের কাছে জাত সাপ স্থির হয়ে শুনে ; কিন্তু কেউটে নয়। আর একটি লক্ষণ ; ঠিক ভক্তের ধারণা শক্তি হয়। শুধু কাঁচের উপর ছবির দাগ পড়ে না, কিন্তু কালি মাখান কাঁচের উপর ছবি উঠে, যেমন ফটোগ্রাফ। ভক্তি রূপ কালি।

আর একটি লক্ষণ। ঠিক ভক্ত জিতেন্দ্রিয় হয়, কামজয়ী হয়। গোপীদের কাম হতো না।

ভক্তের রকম: ভক্ত তিন রকম। অধম ভক্ত, মধ্যম ভক্ত, উত্তম ভক্ত। অধম ভক্ত বলে ঐ ঈশ্বর। তারা বলে সৃষ্টি আলাদা, ঈশ্বর আলাদা। মধ্যম ভক্ত বলে, ঈশ্বর অন্তর্যামী। তিনি হৃদয় মধ্যে আছেন। সে হৃদয়মধ্যে ঈশ্বরকে দেখে। উত্তম ভক্ত দেখে, তিনি এইসব হয়েছেন। তিনিই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন। সে দেখে ঈশ্বর অধো ঊর্ধ্বে পরিপূর্ণ।

ভক্তের সাধ। ঈশ্বর দর্শনের পর ভক্তের সাধ হয় তাঁর লীলা কি, দেখি। রামচন্দ্র রাবণ বধের পর রাক্ষসপুরী প্রবেশ করলেন। বুড়ী নিকষা দৌড়ে পালাতে লাগল। লক্ষ্মণ বললেন, 'রাম! একি বলুন দেখি, এই নিকষা এত বুড়ী, কত পুত্রশোক পেয়েছে—তার এত প্রাণের ভয়, পালাচ্ছে!' রামচন্দ্র নিকষাকে অভয় দান করে সম্মুখে আনিয়ে জিজ্ঞাসা করাতে নিকষা বললে, 'রাম, এতদিন বেঁচে

আছি বলে তোমার এত লীলা দেখলাম, তাই আরও বাঁচবার সাধ আছে। তোমার আরো কত লীলা দেখবো।' (সকলের হাস্য)।

(শিবনাথের প্রতি)—তোমাকে দেখতে ইচ্ছা করে। শুদ্ধাত্মাদের না দেখলে কি নিয়ে থাকব ? শুদ্ধাত্মাদের পূর্বজন্মের বন্ধু বলে বোধ হয়।

ভক্তের সাবধানতা। এই কয়েকটির কাছ থেকে সাবধান হতে হয়। প্রথম, বড় মানুষ। টাকা লোকজন অনেক, মনে করলে তোমার অনিষ্ট করতে পারে ; তাদের কাছে সাবধানে কথা কইতে হয়। হয়তো যা বলে, সায় দিয়ে যেতে হয়। তারপর কুকুর। যখন কুকুর তেড়ে আসে কি ঘেউ ঘেউ করে, তখন দাঁড়িয়ে মুখের আওয়াজ করে তাকে ঠাণ্ডা কর্তে হয়। তারপর ষাঁড়। গুঁতুতে এলে, তাকেও মুখের আওয়াজ করে ঠাণ্ডা কর্তে হয়। তারপর মাতাল। যদি রাগিয়ে দাও, তাহলে বলবে তোর চৌদ্দপুরুষ, তোর হেন তেন—গালাগালি দিবে। তাকে বলতে হয়, কি খুড়ো কেমন আছ ? তাহলে খুব খুসি হবে, তোমার কাছে বসে তামাক খাবে।

অসৎ লোক দেখলে আমি সাবধান হয়ে যাই। যদি কেউ এসে বলে, ওহে হুঁকো-টুকো আছে ? আমি বলি আছে।

কেউ কেউ সাপের স্বভাব। তুমি জান না, তোমায় ছোবল দেবে। ছোবল সামলাতে অনেক বিচার আনতে হয়। তা না হলে হয় তো তোমার এমন রাগ হয়ে গেল যে, তার আবার উলটে অনিষ্ট কর্তে ইচ্ছা হয়। তবে মাঝে মাঝে সৎসঙ্গ বড় দরকার। সৎসঙ্গ কল্লে তবে সদসৎ বিচার আসে।

ভক্তের হৃদয়। ভক্তের হৃদয় তাঁর আবাসস্থান। তিনি সর্বভূতে আছেন বটে, কিন্তু ভক্তহৃদয়ে বিশেষরূপে আছেন। যেমন কোন জমিদার তার জমিদারির সকল স্থানেই থাকিতে পারে। কিন্তু তিনি তাঁর অমুক বৈঠকখানায় প্রায়ই থাকেন, এই লোকে বলে। ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা।

ভগবান দর্শনের পর। সিদ্ধ অবস্থায় আলাদা কথা। ভগবানকে দর্শনের পর বেশী ভয় নাই ; অনেকটা নির্ভয়। ছাদে একবার উঠতে পারলে হয়। উঠবার পর ছাদে নাচাও যায়। সিঁড়িতে কিন্তু নাচা যায় না। আবার দেখ—যা ত্যাগ করে গেছি, ছাদে উঠবার পর তা আর ত্যাগ করতে হয় না। ছাদও ইট, চূণ, সুরকীর তৈয়ারী, আবার সিঁড়িও সেই জিনিসে তৈয়ারী। যে মেয়েমানুষের কাছে এত সাবধান হতে হয়, ভগবান দর্শনের পর বোধ হবে, সেই মেয়েমানুষ সাক্ষাৎ ভগবতী। তখন তাঁকে মাতৃজ্ঞানে পূজা করবে। আর তত ভয় নাই।

কথাটা এই, বুড়ী ছুঁয়ে যা ইচ্ছা কর।

ভগবানের আনন্দ। ক. যারা সংসারে ধর্ম করছে, তারা একবার যদি ভগবানের আনন্দ পায় তাদের আর কিছু ভাল লাগে না, কাজের সব আঁট কমে যায়, ক্রমে যত আনন্দ বাড়ে কাজ আর করতে পারে না, কেবল সেই আনন্দ খুঁজে খুঁজে বেড়ায়। ভগবানের আনন্দের কাছে বিষয়ানন্দ আর রমণানন্দ। একবার ভগবানের আনন্দের আস্বাদ পেলে সেই আনন্দের জন্য ছোটাছুটি করে বেড়ায়, তখন সংসার থাকে আর যায়।

চাতক তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, সাত সমুদ্র যত নদী পুষ্করিণী সব ভরপুর। তবু সে জল খাবে না। ছাতি ফেটে যাচ্ছে তবু খাবে না। স্বাতী নক্ষত্রের বৃষ্টির জলের জন্য হাঁ করে আছে। বিনা স্বাতীকি জল সব ধূর।

খ. এ দিকের আনন্দ পেলে ওটা ভাল লাগে না, ভগবানের আনন্দ লাভ করলে সংসার আলুনি বোধ হয়। শাল পেলে আর বনাত ভাল লাগে না।

ভগি তেলী। ও দেশে ভগি তেলী, কর্তাভজার দলের। ঐ মেয়ে মানুষ নিয়ে সাধন। একটি পুরুষ না হলে মেয়ে মানুষের সাধন ভজন হবে না। সেই পুরুষটিকে বলে 'রাগকৃষ্ণ'। তিনবার জিজ্ঞাসা করে, কৃষ্ণ পেয়েছিস ? সে মেয়েমানুষটা তিনবার বলে, পেয়েছি !

ভগি (ভগবতী) শূদ্র, তেলি। সকলে গিয়ে তার পায়ের ধুলো নিয়ে নমস্কার করত, তখন জমিদারের বড় রাগ হ'ল। আমি তাকে দেখেছি। জমিদার একটা দুষ্ট লোক পাঠিয়ে দেয়—তার পাল্লায় পড়ে তার আবার পেটে ছেলে হয়।

দ্রঃ কর্তাভজা।

ভবনদী পার হতে জানা। নৌকা করে কজন গঙ্গা পার হচ্ছিল। একজন পণ্ডিত বিদ্যার পরিচয় খুব দিচ্ছিল। 'আমি নানা শাস্ত্র পড়েছি—বেদ বেদান্ত—ষড়দর্শন।' একজনকে জিজ্ঞাসা করলে—'বেদান্ত জান ?' সে বললে, 'আজ্ঞা না।' 'সাংখ্য পাতঞ্জল জান ?—'আজ্ঞা না'।' দর্শন-টর্শন কিছুই পড় নাই ?—'আজ্ঞা না।' পণ্ডিত সগর্বে কথা কহিতেছেন। সে লোকটি চুপ করে বসে আছে। এমন সময় ভয়ংকর ঝড়—নৌকা ডুবতে লাগল। সেই লোকটি তখন বললে, পণ্ডিতজী, আপনি সাঁতার জানেন ? পণ্ডিত বললেন, না। সে বললে, আমি সাংখ্য পাতঞ্জল জানি না, কিন্তু সাঁতার জানি। নানা শাস্ত্র জানলে কি হবে ? ভবদনী পার হতে জানাই দরকার।

ভাগবত। দ্রঃ ধর্মস্বন্দ্ব

ভাগবত এবার বুঝেছি। এক রাজা রোজ ভাগবত শুনতো। পণ্ডিত পড়া শেষ হলে রাজাকে বলতো—রাজা বুঝেছ ? রাজাও রোজ বলে—আগে তুমি বোঝ ! পণ্ডিত বাড়ী গিয়ে রোজ ভাবে—রাজা এমন কথা বলে কেন যে তুমি আগে বোঝ। লোকটা সাধন ভজন কর্তো—ক্রমে চৈতন্য হ'ল। তখন দেখলে যে হরিপাদপদ্মই সার, আর সব মিথ্যা। সংসারে বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে গেল। কেবল একজনকে পাঠালে রাজাকে বলতে যে—রাজা, এইবার বুঝেছি।

ভাগবতী তনু। 'স্থূলদেহ সূক্ষ্মদেহ' দ্রষ্টব্য।

ভাগবতের পণ্ডিত। একজন একটি ভাগবতের পণ্ডিত চেয়েছিল। তার বন্ধু বললে, একটি উত্তম ভাগবতের পণ্ডিত আছে, কিন্তু তার একটু গোল আছে। তার নিজের অনেক চাষ-বাস দেখতে হয়। চারখানা লাঙ্গল, আটটা হেলে গরু। সর্বদা তদারক কর্তে হয়; অবসর নাই। যার পণ্ডিতের দরকার সে বললে, আমার এমন ভাগবতের পণ্ডিতের দরকার নাই, যার অবসর নাই। আমি এমন পণ্ডিত চাই যে আমাকে ভাগবত শুনাতে পারে।

ভাব। দ্রষ্টব্য : হনুমান ভাব। মহাভাব। ঈশ্বরলাভে ভাবাশ্রয়।

ভাব : গম্ভীরাত্মার। গম্ভীরাত্মা রূপসনাতনের ভাব কেউ টের পেতো না—যদি ডোবাতে হাতী নামে, তা হলেই তোলপাড় হয়ে যায়, কিন্তু সায়ের দীঘিতে হাতী নামলে তোলপাড় হয় না। কেউ হয়তো টেরও পায় না। শ্রীমতী সখীকে বললেন, সখি, তোরা তো কৃষ্ণের বিরহে কত কাঁদছিস, কিন্তু দেখ, আমি কি কঠিন, আমার চক্ষে এক বিন্দুও জল নাই। তখন বৃন্দা বললেন, সখি, তোর চোখে জল নাই তার অনেক মানে আছে। তোর হৃদয়ে বিরহ অগ্নি সদা জ্বলছে, চক্ষে জল উঠছে আর সেই অগ্নির তাপে শুকিয়ে যাচ্ছে।

ভাব ও বায়ু। ভাব হইলে বায়ু স্থির হয়; আর বলিতেছেন, অর্জুন যখন লক্ষ্য বিঁধেছিল, কেবল মাছের চোখের দিকে দৃষ্টি ছিল—আর কোন দিকে দৃষ্টি ছিল না। এমন কি চোখ ছাড়া আর কোন অঙ্গ দেখতে পায় নাই। এরূপ অবস্থায় বায়ু স্থির হয়, কুম্ভক হয়; শুধু পাণ্ডিত্য মিথ্যা—ঐশ্বর্য, বিভব, পদ, সব মিথ্যা।

ভাবগ্রাহী জনার্দন। ভগবান মন দেখেন। কে কি কাজে আছে, কে কোথায় পড়ে আছে তা দেখেন না। 'ভাবগ্রাহী জনার্দন'। যেমন ভাব তেমনি লাভ। দুজন বন্ধু পথে যাচ্ছে। এক জায়গায় ভাগবত পাঠ হচ্ছিল। একজন বন্ধু বললে, এস ভাই, একটু ভাগবত শুনি। আর একজন একটু উঁকি মেরে দেখলে। তারপর সে সেখান থেকে চলে গিয়ে বেশ্যালয়ে গেল। সেখানে খানিকক্ষণ পরে তার মনে বড় বিরক্তি এল। সে আপনা আপনি বলতে লাগল, 'ধিক আমাকে! বন্ধু আমার হরিকথা শুনছে, আর আমি কোথায় পড়ে আছি। এদিকে যে ভাগবত শুনছে, তারও ধিক্কার হয়েছে। সে ভাবছে, আমি কি বোকা! কি ব্যাড় ব্যাড় করে বকছে, আর আমি এখানে বসে আছি। বন্ধু আমার কেমন আমোদ আহ্লাদ করছে।' ওরা যখন মরে গেল, যে ভাগবত শুনছিল তাকে যমদূতে নিয়ে গেল, যে বেশ্যালয়ে গিছিল, তাকে বিষ্ণুদূতে বৈকুণ্ঠে নিয়ে গেল।

ভাবভক্তি। শ্রীমতী যত কৃষ্ণের দিকে এগুচ্ছেন ততই কৃষ্ণের দেহগন্ধ পাচ্ছিলেন। ঈশ্বরের নিকট যত যাওয়া যায় ততই তাঁতে ভাবভক্তি হয়। সাগরের নিকট নদী যতই যায়, ততই জোয়ার-ভাঁটা দেখা যায়।

জ্ঞানীর ভিতর একটানা গঙ্গা বহিতে থাকে। তার পক্ষে সব স্বপ্নবৎ। সে সর্বদা স্ব-স্বরূপে থাকে। ভক্তের ভিতর একটানা নয়; জোয়ার-ভাঁটা হয়। হাসে-কাঁদে, নাচে গায়। ভক্ত তাঁর সঙ্গে বিলাস করতে ভালবাসে—কখন সাঁতার দেয়, কখন ডুবে, কখন উঠে—যেমন জলের ভিতর বরফ টাপুর-টুপুর টাপুর-টুপুর—করে।

ভাবরোগ। তোমার অসুখ হয়েছে কেন তার মানে আছে। শরীরের ভিতর দিয়ে অনেক ভাব চলে গেছে, তাই ঐ রকম হয়েছে। যখন ভাব হয় তখন কিছু বোঝা যায় না, অনেকদিন পরে শরীরে আঘাত লাগে। আমি দেখেছি, বড় জাহাজ গঙ্গা দিয়ে যখন চলে গেল, তখন কিছু টের পাওয়া গেল না; ও মা! খানিকক্ষণ পরে দেখি, কিনারার উপরে জল ধপাস্ ধপাস্ করছে; আর তোলপাড় করে দিচ্ছে। হয়ত কিনারার খানিকটা ভেঙ্গে জলে পড়লো।

কুঁড়ে ঘরে হাতী প্রবেশ করলে ঘর তোলপাড় করে ভেঙ্গে চুরে দেয়। ভাবহস্তী

দেহঘরে প্রবেশ করে ; আর তোলপাড় করে।

হয় কি জান ? আগুন লাগলে কতকগুলো জিনিস পুড়িয়ে টুড়িয়ে ফেলে ; আর একটা হৈ হৈ কাণ্ড আরম্ভ করে দেয়। জ্ঞানাগ্নি প্রথমে কাম ক্রোধ এইসব রিপু নাশ করে ; তার পর অহং-বুদ্ধি নাশ করে। তারপর একটা তোলপাড় আরম্ভ করে।

তুমি মনে কচ্ছো সব ফুরিয়ে গেল। কিন্তু যতক্ষণ রোগের কিছু বাকী থাকে, ততক্ষণ তিনি ছাড়বেন না। হাসপাতালে যদি তুমি নাম লেখাও, আর চলে আসবার জো নাই। যতক্ষণ রোগের একটু কসুর থাকে, ততক্ষণ ডাক্তার সাহেব চলে আসতে দেবে না। তুমি নাম লিখালে কেন।

ভাবরক্ষা। আমি যার যা ভাব তার সেই ভাব রক্ষা করি। বৈষ্ণবকে বৈষ্ণবের ভাবটিই রাখতে বলি ; শাক্তকে শাক্তের ভাব। তবে বলি, এ কথা বোলো না—আমারই পথ সত্য আর সব মিথ্যা ভুল। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান—নানা পথ দিয়ে এক জায়গায়ই যাচ্ছে। নিজের নিজের ভাব রক্ষা করে, আন্তরিক তাঁকে ডাকলে, ভগবান লাভ হবে।

ভাবসমুদ্র। ভাবসমুদ্র উথলালে ডাঙ্গায় এক বাঁশ জল। আগে নদী দিয়ে সমুদ্রে আসতে হলে এঁকেবেঁকে ঘুরে আসতে হ'ত। বন্যে এলে ডাঙ্গায় একবাঁশ জল। তখন সোজা নৌকা চালিয়ে দিলেই হ'ল। আর ঘুরে যেতে হয় না। ধানকাটা হলে, আর আলের উপর দিয়ে ঘুরে ঘুরে আসতে হয় না। সোজা এক দিক্ দিয়ে গেলেই হয়।

ভাবাশ্রয়। ক. শুধু বিচার করলে কি হবে ? তাঁর জন্য ব্যাকুল হও, তাঁকে ভালবাসতে শেখ। জ্ঞান—বিচার—পুরুষ মানুষ, বাড়ীর বারবাড়ী পর্যন্ত যায়। ভক্তি—মেয়ে মানুষ অন্তঃপুর পর্যন্ত যায়।

একটা কোন রকম ভাব আশ্রয় করতে হয়। তবে ঈশ্বর লাভ হয়। সনকাদি ঋষিরা শান্ত রস নিয়ে ছিলেন। হনুমান দাসভাব নিয়ে ছিলেন। শ্রীদাম, সুদাম, ব্রজের রাখালদের—সখ্যভাব। যশোদার বাৎসল্য ভাব। ঈশ্বরেতে সন্তানবুদ্ধি। শ্রীমতীর মধুর ভাব।

হে ঈশ্বর। তুমি প্রভু, আমি দাস—এ ভাবটির নাম দাসভাব। সাধকের পক্ষে এ ভাবটি খুব ভাল।

খ. তাঁকে ডাকবার সময় একটা ভাব আশ্রয় করতে হয়। সখিভাব, দাসীভাব, সন্তান বা বীরভাব। আমার সন্তানভাব। এ ভাব দেখলে মায়াদেবী পথ ছেড়ে দেন। লজ্জায়। বীরভাব বড় কঠিন। শাক্ত বৈষ্ণব বাউলদের আছে। ওভাবে ঠিক থাকা বড় শক্ত। আবার আছে—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবে সব আছে—শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য। সব ভাব সিদ্ধ অবস্থায় ভাল লাগে। সে অবস্থায় কামগন্ধ থাকবে না। বৈষ্ণব শাস্ত্রে আছে চণ্ডীদাস ও রজকিনীর কথা—তাদের ভালবাসা কামগন্ধ বিবর্জিত। এ অবস্থার প্রকৃতিভাব। আপনাকে পুরুষ বলে বোধ থাকে না। রূপগোস্বামী মীরাবাঈ স্ত্রীলোক বলে তার সহিত দেখা করতে চান নাই। মীরাবাঈ বলে পাঠালেন, শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ ; বৃন্দাবনে সকলেই

সেই পুরুষের দাসী ; গোস্বামীর পুরুষ অভিমান করা কি ঠিক হয়েছে? শান্ত—ঋষিদের ছিল। তাদের অন্য কিছু ভোগ করবার বাসনা ছিল না। যেমন স্ত্রীর স্বামীতে নিষ্ঠা ; সে জানে আমার পতি কন্দর্প। দাস্য—যেমন হনুমানের। রামের কাজ করবার সময় সিংহতুল্য। স্ত্রীর দাস্য ভাব থাকে, স্বামীকে প্রাণপণে সেবা করে। মার কিছু কিছু থাকে ; যশোদারও ছিল। সখ্য—বন্ধুর ভাব, এস এস কাছে এসে বস ; শ্রীদামাদি কৃষ্ণকে কখন এঁটো ফল খাওয়াচ্ছে, কখন ঘাড়ে চড়চে। বাৎসল্য—যেমন যশোদার। স্ত্রীরও কতকটা থাকে ; স্বামীকে প্রাণ চিরে খাওয়ায়। ছেলেটি পেট ভরে খেলেই তবেই মা সন্তুষ্ট। যশোদা কৃষ্ণ খাবে বলে ননী হাতে করে বেড়াতেন। মধুর—যেমন শ্রীমতীর। স্ত্রীরও মধুর ভাব। এ ভাবের ভিতরে সকল ভাবই আছে—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য।

দ্রঃ সাধনা চাই। ঈশ্বর লাভে ভাবাশ্রয়।

ভাবের ঘরে চুরি। ভাবের ঘরে চুরি না থাকে, তারই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়। অর্থাৎ কেবল সরলভাবে ও বিশ্বাসেতেই তাঁকে পাওয়া যায়।

ভাল লোক। ভাল লোক, লক্ষ্মীমন্ত লোক বাড়ীতে এলে সকল বিষয়ে কেমন সুসার হয়ে যায়। কাকেও কিছুতে বেগ পেতে হয় না। আর হাবাতে হতচ্ছাড়া-গুলো এলে সকল বিষয়ে কষ্ট পেতে হয়। যেদিন ঘরে কিছু নাই, তার জন্য গেরস্থকে কষ্ট পেতে হবে, ঠিক সেই দিনই সে এসে উপস্থিত হয়।

ভালবাসায় অহঙ্কার যায়—তবে ঈশ্বর লাভ। আমি বুঝেছি, আর সব বোকা—এ বুদ্ধি করো না। সকলকে ভালবাসতে হয়। কেউ পর নয়। সর্বভূতেই সেই হরিই আছেন। তিনি ছাড়া কিছুই নাই। প্রহ্লাদকে ঠাকুর বললেন, তুমি বর নাও। প্রহ্লাদ বললেন, আপনার দর্শন পেয়েছি, আমার আর কিছু দরকার নাই। ঠাকুর ছাড়লেন না। তখন প্রহ্লাদ বললেন, যদি বর দেবে, তবে এই বর দাও, আমায় যারা কষ্ট দিয়েছে তাদের অপরাধ না হয়।

এর মানে এই যে, হরি একরূপে কষ্ট দিলেন। সেই লোকদের কষ্ট দিলে হরির কষ্ট হয়!

ভালবাসার গতি। সংসারী লোকদের ছেলের কথা বলতে বলতে লাল পড়ে। যদি কেউ ছেলের সুখ্যাত করে তো অমনি বলবে, ওরে তোর খুড়োর জন্য পা ধোবার জল আন।

যারা পায়রা ভালবাসে, তাদের কাছে পায়রার সুখ্যাত করলে বড় খুশি। যদি কেউ পায়রার নিন্দা করে, তা হলে বলে উঠবে, তোর বাপ-চৌদ্দ পুরুষ কখন কি পায়রার চাষ করেছে?

ভিক্ষা চাইলে। মাগনেসে ছোট হো যাতা। যার বাড়া নেই—স্বয়ং ভগবান যখন ভিক্ষা করতে গিয়েছিলেন, তখন তাঁকেও বামনরূপ ধরতে হয়েছিল। তাই অপরের কাছে কোন বিষয় চাইতে হলে ছোট হতে হয়।

ভুলিয়ে রেখেছেন। তিনি যদি ঈশ্বরের আনন্দ একবার দেন তা হলে আর কেউ সংসার করে না, সৃষ্টিও চলে না।

চালের আড়তে বড় বড় ঠেকের ভিতরে চাল থাকে। পাছে ইঁদুরগুলো ঐ চালের সন্ধান পায়, তাই দোকানদার একটা কুলোতে খই মুড়কি রেখে দেয়। ঐ খই মুড়কি মিষ্টি লাগে, তাই ইঁদুরগুলো সমস্ত রাত কড়র মড়র করে খায়। চালের সন্ধান আর করে না।

কিন্তু দ্যাখো, এক সের চালে চৌদ্দগুণ খই হয়। কামিনী-কাঞ্চনের আনন্দ অপেক্ষা ঈশ্বরের আনন্দ কত বেশী। তাঁর রূপ চিন্তা করলে রম্ভা তিলোত্তমার রূপ চিতার ভস্ম বলে বোধ হয়।

ভেক। মিথ্যা কিছুই ভাল নয়। মিথ্যা ভেক ভাল নয়। ভেকের মতো যদি মনটা না হয়, ক্রমে সর্বনাশ হয়। মিথ্যা বলতে বা করতে ক্রমে ভয় ভেঙ্গে যায়। তার চেয়ে সাদা কাপড় ভাল। মনে আসক্তি, মাঝে মাঝে পতনও হচ্ছে, আর বাহিরে গেরুয়া! বড় ভয়ঙ্কর।

ভৈরব-ভৈরবী চক্র। ঠিক ঠিক সাধন করতে পারে না, ধর্মের নাম করে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করে।

ভৈরব, ভৈরবী, এদেরও ঐ রকম। কাশীতে যখন আমি গেলুম, তখন একদিন ভৈরবীচক্রে আমায় নিয়ে গেল। একজন করে ভৈরব, একজন করে ভৈরবী। আমায় কারণ পান করতে বললে। আমি বললাম, মা, আমি কারণ ছুঁতে পারি না। তখন তারা খেতে লাগলো। আমি মনে কল্লাম, এইবার বুঝি জপ ধ্যান করবে। তা নয়, নৃত্য করতে আরম্ভ করলে! আমার ভয় হতে লাগলো, পাছে গঙ্গায় পড়ে যায়। চক্রটি গঙ্গার ধারে হয়েছিল।

স্বামী-স্ত্রী যদি ভৈরব-ভৈরবী হয়, তবে তাদের বড় মান।

(নরেন্দ্রাদি ভক্তের প্রতি)—কি জান? আমার ভাব মাতৃভাব, সন্তানভাব। মাতৃভাব অতি শুদ্ধভাব, এতে কোন বিপদ নাই। ভগ্নীভাব, এও মন্দ নয়। স্ত্রীভাব—বীরভাব বড় কঠিন। তারকের বাপ ঐ ভাবে সাধন করত। বড় কঠিন। ঠিক ভাব রাখা যায় না।

ভোগ। দ্রঃ ভোগ ও ত্যাগ।

ভোগান্ত। কামিনী-কাঞ্চন ভোগ। যে ঘরে আচার তেঁতুল আর জলের জালা, সে ঘরে বিকারের রোগী থাকলে মুস্কিল। টাকাকড়ি, মানসম্ভ্রম, দেহসুখ এই সব ভোগ একবার না হয়ে গেলে—ভোগান্ত না হলে—সকলের ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা আসে না।

মত পথ। দেখছো কত রকম মত। মত, পথ। অনন্ত মত অনন্ত পথ।

একটা জোর করে ধরতে হয়। ছাদে গেলে পাকা সিঁড়িতে উঠা যায়, একখানা মইয়ে উঠা যায়, দড়ির সিঁড়িতে উঠা যায়; এক গাছা দড়ি দিয়ে এক গাছা বাঁশ দিয়ে, উঠা যায়। কিন্তু এতে খানিকটা পা, ওতে খানিকটা পা দিলে হয় না। একটা দৃঢ় করে ধরতে হয়। ঈশ্বর লাভ করতে হলে, একটা পথ জোর করে ধরে যেতে হয়।

আর সব মতকে এক একটি পথ বলে জানবে। আমার ঠিক পথ, আর সকলের

মিথ্যা, এরূপ বোধ না হয়। বিদ্বেষভাব না হয়।

মতুয়ার বুদ্ধি। আন্তরিক হলে সব ধর্মের ভিতর দিয়াই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। বৈষ্ণবেরাও ঈশ্বরকে পাবে, শাক্তরাও পাবে, বেদান্তবাদীরাও পাবে, ব্রহ্মজ্ঞানীরাও পাবে ; আবার মুসলমান, খৃষ্টান, এরাও পাবে। আন্তরিক হলে সবাই পাবে। কেউ কেউ ঝগড়া করে বসে। তারা বসে, 'আমাদের শ্রীকৃষ্ণকে না ভজলে কিছুই হবে না' ; কি, 'আমাদের মা কালীকে না ভজলে কিছুই হবে না' ; 'আমাদের খৃষ্টান ধর্মকে না নিলে কিছুই হবে না।'

এ সব বুদ্ধির নাম মতুয়ার বুদ্ধি ; অর্থাৎ আমার ধর্ম ঠিক, আর সকলের মিথ্যা। এ বুদ্ধি খারাপ। ঈশ্বরের কাছে নানা পথ দিয়ে পেঁছান যায়।

মদ্যপান। ধর্মের নাম করে মদ্যপান করা ভাল নয় ; আমি দেখেছি, যেখানে ওরূপ করেছে, সেখানে ভাল হয় নাই।

মন। মন নিয়ে কথা। মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত। মন যে রঙে ছোপাবে সেই রঙে ছুপবে। যেমন ধোপাঘরের কাপড়। লালে ছোপাও লাল, নীলে ছোপাও নীল, সবুজ রঙে ছোপাও সবুজ। যে রঙে ছোপাও সেই রঙেই ছুপবে। দেখ না, যদি একটু ইংরাজী পড়ে, তো অমনি মুখে ইংরাজী কথা এসে পড়ে। ফুট-ফাট, ইট-মিট। আবার পায়ে বুটজুতা, শিস্ দিয়ে গান করা ; এই সব এসে জুটবে। আবার যদি পণ্ডিত সংস্কৃত পড়ে অমনি শ্লোক ঝাড়বে। মনকে যদি কুসঙ্গে রাখো, তো সেই রকম কথাবার্তা চিন্তা হয়ে যাবে। যদি ভক্তের সঙ্গে রাখো, তাহলে ঈশ্বরচিন্তা, হরিকথা, এই সব হবে।

মন নিয়েই সব। একপাশে পরিবার, একপাশে সন্তান। একজনকে এক ভাবে, সন্তানকে আর এক ভাবে, আদর করে। কিন্তু একই মন।

মন : সংসারী ও ত্যাগীর। সাংসারে থাকতে গেলে অমন হয়। কখনও উঁচু, কখনও নীচু। কখনও বেশ ভক্তি হচ্ছে, আবার কমে যায়। কামিনী-কাঞ্চন নিয়ে থাকতে হয় কিনা, তাই হয়। সংসারে ভক্ত কখন ঈশ্বরচিন্তা, হরিনাম করে ; কখন বা কামিনী-কাঞ্চনে মন দিয়ে ফেলে। যেমন সাধারণ মাছি—কখন সন্দেশে বসছে, কখন বা পচা ঘা বা বিষ্ঠাতেও বসে।

ত্যাগীদের আলাদা কথা। তারা কামিনী-কাঞ্চন থেকে মন সরিয়ে এনে কেবল ঈশ্বরকে দিতে পারে ; কেবল হরিরস পান করতে পারে। ঠিক ঠিক ত্যাগী হলে ঈশ্বর বই তাদের আর কিছু ভাল লাগে না। বিষয় কথা হলে উঠে যায় ; ঈশ্বরীয় কথা হলে শুনে। ঠিক ঠিক ত্যাগী হলে নিজেরা ঈশ্বরকথা বই আর অন্য বাক্য মুখে আনে না।

মৌমাছি কেবল ফুলে বসে—মধু খাবে বলে। অন্য কোন জিনিস মৌমাছির ভাল লাগে না।

মন ও যোগ। কথাটা এই ; মন স্থির না হলে যোগ হয় না, যে পথেই যাও। মন যোগীর বশ। যোগী মনের বশ নয়। জ্ঞানীর লক্ষণ—সাধনসিদ্ধ ও নিত্যসিদ্ধ।

মন মুখ এক। মন মুখ এক করাই হচ্ছে প্রকৃত সাধন। নতুবা মুখে বলছি 'হে ভগবান। তুমি আমার সর্বস্ব ধন' এবং বিষয়কেই সর্বস্ব জেনে বসে রয়েছি।

এরূপ লোকের সকল সাধনাই বিফল হয়।

মন নিয়ে কথা। পায়ে বন্ধন থাকলে কি হবে?—মন নিয়ে কথা।

মনেই বদ্ধ মুক্ত। দুই বন্ধু—একজন বেশ্যালয়ে গেল, একজন ভাগবত শুনছে। প্রথমটি ভাবছে, ধিক্ আমাকে—বন্ধু হরিকথা শুনছে আর আমি কোথা পড়ে রয়েছি। আর একজন ভাবছে—ধিক্ আমাকে, বন্ধু কেমন আমোদ আহ্লাদ করছে আর আমি শালা কি বোকা! দ্যাখো প্রথমটিকে বিষ্ণুদূতে নিয়ে গেল—বৈকুণ্ঠে। আর দ্বিতীয়টিকে যমদূতে নিয়ে গেল।

মন মত্তকরী। জীব ঈশ্বর চিন্তা করে, কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই, আবার ভুলে যায়; সংসারে আসক্ত হয়। যেমন এই হাতীকে স্নান করিয়ে দিলে, আবার ধূলা-কাদা মাখে। মন মত্তকরী! তবে হাতীকে নাইয়েই যদি আস্তাবলে সাঁধ করিয়ে দিতে পার, তাহলে আর ধূলা-কাদা মাখতে পারে না। যদি জীব মৃত্যুকালে ঈশ্বর চিন্তা করে, তা হলে শুদ্ধ মন হয়, সে মন কামিনী-কাঞ্চনে আবার আসক্ত হবার অবসর পায় না।

মন সব কুড়িয়ে আনা। মন সব কুড়িয়ে না আনলে কি হয়। ভাগবতে শুকদেবের কথা আছে—পথে যাচ্ছে যেন সঙ্গীন চড়ান। কোনদিকে দৃষ্টি নাই। এক লক্ষ্য—কেবল ভগবানের দিকে দৃষ্টি। এর নাম যোগ।

চাতক কেবল মেঘের জল খায়। গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, আর সব নদী জলে পরিপূর্ণ, সাত সমুদ্র ভরপুর, তবু সে জল খাবে না। মেঘের জল পড়বে তবে খাবে।

যার এরূপ যোগ হয়েছে, তার ঈশ্বরের দর্শন হতে পারে। থিয়েটারে গেলে যতক্ষণ না পর্দা উঠে ততক্ষণ লোকে বসে বসে নানা রকম গল্প করে—বাড়ীর কথা, আফিসের কথা, ইস্কুলের কথা এই সব। যাই পর্দা উঠে, অমনি কথাবার্তা সব বন্ধ। যা নাটক হচ্ছে, একদৃষ্টে তাই দেখতে থাকে। অনেকক্ষণ পরে যদি এক আধটা কথা কয় সে ঐ নাটকেরই কথা।

মাতাল মদ খাওয়ার পর কেবল আনন্দের কথাই কয়।

মনান্তর থাকলে। মনান্তর থাকলে, প্রথমে একবার কথাবার্তা কইতে—তাদের সঙ্গে ভাব করতে—চেষ্টা করবে। চেষ্টা করেও যদি না হয়, তার পর আর ও সব ভাববে না। তাঁর শরণাগত হও—তাঁর চিন্তা কর—তাঁকে ছেড়ে অন্য লোকের জন্য মন খারাপ করবার দরকার নাই।

সকলকে ভালবাসবে। ভাল ত বাসবে, সর্বভূতে ঈশ্বর আছেন বলে। কিন্তু দূর থেকে প্রণাম করবে।

মনুষ্যলীলা কেন? মনুষ্যলীলা কেন জান? এর ভিতর তাঁর কথা শুনতে পাওয়া যায়। এর ভিতর তাঁর বিলাস, এর ভিতর তিনি রসাস্বাদন করেন।

আর সব ভক্তদের ভিতর তাঁরই একটু একটু প্রকাশ। যেমন জিনিস অনেক চুসতে চুসতে একটু রস, ফুল চুসতে চুসতে একটু মধু।

বুঝেছ?

মনের নাশ। সপ্তম ভূমিতে মন পৌঁছিলে কি হয় মুখে বলা যায় না।

জাহাজ একবার কালাপানিতে গেলে আর ফেরে না। জাহাজের খপর আর পাওয়া যায় না। সমুদ্রের খপরও জাহাজের কাছে পাওয়া যায় না।

নুনের ছবি সমুদ্র মাপতে গিছিল। কিন্তু যাই নেমেছে, অমনি গলে গেছে! সমুদ্র কত গভীর কে খপর দিবেক? যে দিবে, সে মিশে গেছে। সপ্তম ভূমিতে মনের নাশ হয়, সমাধি হয়। কি বোধ হয়, মুখে বলা যায় না।

[সপ্তভূমি সম্পর্কে বক্তব্য 'অহং ও সমাধি' এবং 'ব্রহ্মজ্ঞানী ও জ্ঞানপথ' দ্রষ্টব্য।]

মনের যোগ। একজন মুসলমান নমাজ করতে করতে 'হো আল্লা' 'হো আল্লা' বলে চীৎকার করে ডাকছিল। তাকে একজন লোক বললে, তুই আল্লাকে ডাকছিস তা অতো চেঁচাচ্ছিস কেন? তিনি যে পিঁপড়ের পায়ের নূপুর শুনতে পান!

তাঁতে যখন মনের যোগ হয়, তখন ঈশ্বরকে খুব কাছে দেখে। হৃদয়ের মধ্যে দেখে।

কিন্তু একটি কথা আছে, যত এই যোগ হবে ততই বাহিরের জিনিস থেকে মন সরে আসবে। ভক্তমালে এক ভক্তের (বিল্বমঙ্গলের) কথা আছে। সে বেশ্যালয়ে যেতো। একদিন অনেক রাত্রে যাচ্ছে। বাড়িতে বাপ-মায়ের শ্রাদ্ধ হয়েছিল তাই দেরী হয়েছে। শ্রাদ্ধের খাবার বেশ্যাকে দেবে বলে হাতে করে লয়ে যাচ্ছে। তার বেশ্যার দিকে এত একাগ্র মন যে কিসের উপর দিয়ে যাচ্ছে, কোনখান দিয়ে যাচ্ছে, এ সব কিছু হুঁশ নাই। পথে এক যোগী চক্ষু বুজে ঈশ্বর-চিন্তা কচ্ছিল, তাঁর গায়ে পা দিয়ে চলে যাচ্ছে। যোগী রাগ করে বলে উঠলো, 'কি তুই দেখতে পাচ্ছিস না? আমি ঈশ্বরকে চিন্তা করছি, তুই গায়ের উপর পা দিয়ে চলে যাচ্ছিস?' তখন সে লোকটি বললে, আমায় মাপ করবেন, কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, বেশ্যাকে চিন্তা করে আমার হুঁশ নাই, আর আপনি ঈশ্বর-চিন্তা কচ্ছেন, আপনার সব বাহিরের হুঁশ আছে! এ কি রকম ঈশ্বর-চিন্তা। সে ভক্ত শেষে সংসার ত্যাগ করে ঈশ্বরের আরাধনায় চলে গিয়েছিল। বেশ্যাকে বলেছিল, তুমি আমার গুরু, তুমিই শিখিয়েছ কি রকম ঈশ্বরে অনুরাগ করতে হয়। বেশ্যাকে মা বলে ত্যাগ করেছিল।

মনোযোগ। মনটি পড়েছে ছড়িয়ে—কতক গেছে ঢাকা, কতক গেছে দিল্লী, কতক গেছে কুচবিহার। সেই মনকে কুড়ুতে হবে। কুড়িয়ে এক জায়গায় করতে হবে। তুমি যদি ষোল আনার কাপড় চাও, তা হলে কাপড়ওয়ালাকে ষোল আনা তো দিতে হবে। একটু বিঘ্ন থাকলে আর যোগ হবার যো নাই। টেলিগ্রাফের তারে যদি একটু ফুটো থাকে, তা হলে আর খবর যাবে না।

মন্দ বৈরাগ্য। একজন চাষা—মাঠে জল আনছিল। তার স্ত্রী যখন গেল আর বললে, অনেক বেলা হয়েছে এখন এস, এত বাড়াবাড়িতে কাজ নাই; তখন সে বেশী উচ্চবাচ্য না করে কোদাল রেখে স্ত্রীকে বললে—তুই যখন বলছিস তো চল! সে চাষার আর মাঠে জল আনা হল না। এটি মন্দ বৈরাগ্যের উপমা।

খুব রোক না হলে, চাষার যেমন মাঠে জল আসে না, সেইরূপ মানুষের ঈশ্বর-লাভ হয় না।

মন্দির প্রণাম। মন্দির দেখলে তাঁকেই মনে পড়ে—উদ্দীপন হয়। যেখানে তাঁর কথা হয় সেইখানে তাঁর আবির্ভাব হয়—আর সকল তীর্থ উপস্থিত হয়। এ সব জায়গা দেখলে ভগবানকেই মনে পড়ে।

একজন ভক্ত বাবলা গাছ দেখে ভাবাবিষ্ট হয়েছিল!—এই মনে করে যে এই কাঠে ঠাকুর রাধাকান্তের বাগানের জন্য কুড়ুলের বাঁট হয়।

একজন ভক্তের এরূপ গুরুভক্তি যে গুরুর পাড়ার লোককে দেখে ভাবে বিভোর হয়ে গেল!

মেঘ দেখে—নীলবসন দেখে—চিত্রপট দেখে—শ্রীমতীর কৃষ্ণের উদ্দীপন হ'ত। তিনি এই সব দেখে উন্মত্তের ন্যায় 'কোথায় কৃষ্ণ!' বলে ব্যাকুল হতেন।

দ্রঃ উদ্দীপন।

মমতা। 'প্রেমাভক্তি' দ্রষ্টব্য।

মহাভাব। শ্রীমতীর মহাভাব হ'ত; সখীরা কেহ ছুঁতে গেলে অন্য সখী বলতো 'কৃষ্ণবিলাসের অঙ্গ ছুঁসনি—এঁর দেহমধ্যে এখন কৃষ্ণ বিলাস করছেন।' ঈশ্বর অনুভব না হলে ভাব বা মহাভাব হয় না। গভীর জল থেকে মাছ এলে জলটা নড়ে, তেমন মাছ হলে জল তোলপাড় করে।—তাই ভাবে—হাসে-কাঁদে, নাচে-গায়।

অনেকক্ষণ ভাবে থাকা যায় না। আয়নার কাছে বসে কেবল মুখ দেখলে লোকে পাগল মনে করবে।

মহামায়া। তাঁর কৃপা পেতে গেলে আদ্যাশক্তিরূপিণী তাঁকে প্রসন্ন করতে হয়। তিনি মহামায়া। জগৎকে মুগ্ধ করে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করছেন। তিনি অজ্ঞান করে রেখে দিয়েছেন। সেই মহামায়া দ্বার ছেড়ে দিলে তবে অন্দরে যাওয়া যায়। বাহিরে পড়ে থাকলে বাহিরের জিনিস কেবল দেখা যায়—সেই নিত্য সচ্চিদানন্দ পুরুষকে জানতে পারা যায় না। তাই পুরাণে কথা আছে—চণ্ডীতে—মধু-কৈটভ বধের সময় ব্রহ্মাদি দেবতারা মহামায়ার স্তব করছেন।

মহামায়ার দয়া। মহামায়া দ্বার ছাড়লে তাঁর দর্শন হয়। মহামায়ার দয়া চাই। তাই শক্তির উপাসনা। দেখ না, কাছে ভগবান আছেন তবু তাঁকে জানবার যো নাই, মাঝে মহামায়া আছেন বলে। রাম-সীতা লক্ষ্মণ যাচ্ছেন। আগে রাম, মাঝে সীতা—সকলের পিছনে লক্ষ্মণ। রাম আড়াই হাত অন্তরে রয়েছেন তবু লক্ষ্মণ দেখতে পাচ্ছেন না।

তাঁকে উপাসনা করতে একটা ভাব আশ্রয় করতে হয়। আমার তিন ভাব—সন্তান-ভাব, দাস-ভাব আর সখী-ভাব। দাসী-ভাব, সখীভাবে অনেক দিন ছিলাম। তখন মেয়েদের মতো কাপড় গয়না ওড়না পরতুম। সন্তান-ভাব খুব ভাল।

বীরভাব ভাল না। নেড়া-নেড়ীদের, ভৈরব-ভৈরবীদের বীরভাব। অর্থাৎ প্রকৃতিকে স্ত্রীরূপে দেখা আর রমণের দ্বারা প্রসন্ন করা, এ ভাবে প্রায়ই পতন আছে।

মা। ক. মাকে কষ্ট দিয়ে কি ঈশ্বর সাধনা হয়? আমি বৃন্দাবনে রয়েযাচ্ছিলাম, তখন মাকে মনে পড়লো; ভাবলুম—মা যে কাঁদবে; তখন আবার সেজোবাবুর

সঙ্গে এখানে চলে এলুম।

খ· মা কি কম জিনিস গা ? চৈতন্যদেব কত বুঝিয়ে তবে মার কাছ থেকে চলে আসতে পারলেন। শচী বলেছিল, কেশব ভারতীকে কাটবো। চৈতন্যদেব অনেক করে বোঝালেন। বল্লেন, 'মা, তুমি না অনুমতি দিলে আমি যাব না। তবে সংসারে যদি আমায় রাখ, আমার শরীর থাকবে না। আর মা, যখন তুমি মনে করবে, আমাকে দেখতে পাবে। আমি কাছেই থাকব, মাঝে মাঝে দেখা দিয়ে যাব।' তবে শচী অনুমতি দিলেন।

মা যতদিন ছিল, নারদ ততদিন তপস্যায় যেতে পারেন নি। মার সেবা করতে হয়েছিল কি না ! মার দেহত্যাগ হলে তবে হরিসাধন করতে বেরুলেন।

বৃন্দাবনে গিয়ে আর আমার ফিরে আসতে ইচ্ছা হ'ল না। গঙ্গামার কাছে থাকবার কথা হ'ল। সব ঠিক ঠাক। এদিকে আমার বিছানা হবে, ওদিকে গঙ্গা-মার বিছানা হবে, আর কলকাতায় যাব না, কৈবর্তের ভাত আর কতদিন খাব ? তখন হৃদে বললে, না তুমি কলকাতায় চল। সে একদিকে টানে, গঙ্গামা আর একদিকে টানে। আমার খুব থাকবার ইচ্ছা। এমন সময়ে মাকে মনে পড়লো। অমনি সব বদলে গেল। মা বুড়ো হয়েছেন। ভাবলুম মার চিন্তা থাকলে ঈশ্বর-ফীশ্বর সব ঘুরে যাবে। তার চেয়ে তাঁর কাছে যাই। গিয়ে সেইখানে ঈশ্বরচিন্তা করবো, নিশ্চিন্ত হয়ে।

দ্রঃ মাতৃসেবা। বাপ-মা।

মাছি-মৌমাছি। 'ত্যাগী' দ্রষ্টব্য।

মাতৃভাব[১]। মা—কি মা ? জগতের মা। যিনি জগৎ সৃষ্টি করেছেন, পালন করছেন। যিনি তাঁর ছেলেদের সর্বদা রক্ষা করছেন। আর ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—যে যা চায়, তাই দেন। ঠিক ছেলে মা ছাড়া থাকতে পারে না। তার মা সব জানে। ছেলে খায়, দায়, বেড়ায় ; অত শত জানে না।

দ্রঃ 'কর্তাভজা।'

মাতৃভাব[২]। মাতৃভাব অতি শুদ্ধ ভাব। তন্ত্রে বামাচারের কথাও আছে ; কিন্তু সে ভাল নয় ; পতন হয়। ভোগ রাখলেই ভয়।

মাতৃভাব যেন নির্জলা একাদশী ; কোন ভোগের গন্ধ নাই। আর আছে ফল মূল খেয়ে একাদশী, আর লুচি ছক্কা খেয়ে একাদশী। আমার নির্জলা একা-দশী : আমি মাতৃভাবে ষোড়শীর পূজা করেছিলাম। দেখলাম স্তন মাতৃস্তন, যোনি মাতৃযোনি।

এই মাতৃভাব—সাধনের শেষ কথা—'তুমি মা, আমি তোমার ছেলে', এই শেষ কথা।

মাতৃসেবা। ক. যতক্ষণ মা আছে, মাকে দেখতে হবে। যতক্ষণ নিজের শরীরের খপর আছে, ততক্ষণ মার খপর নিতে হবে। নিজের কাশি হলে মরিচ মিছরি, মরিচ লবণের জোগাড় করতে হয়। এসব যতক্ষণ করতে হবে, ততক্ষণ মার খপরও নিতে হবে। তবে যখন নিজের শরীরের খপর নিতে পাচ্ছি না—তখন অন্য কথা। তখন ঈশ্বরই সব ভার লন। নাবালক নিজের ভার নিজে নিতে পারে

না। তাই তার অছি (গার্জেন) হয়। নাবালকের অবস্থা—যেমন চৈতন্যদেবের অবস্থা।

খ. মা ব্যভিচারিণী হলেও ত্যাগ করবে না। মা বা বাপ কি কম জিনিস গা? তাঁরা প্রসন্ন না হলে ধর্মটর্ম কিছুই হয় না। চৈতন্যদেব ত প্রেমে উন্মত্ত, তবু সন্ন্যাসের আগে কতদিন ধরে মাকে বোঝান। বললেন, মা! আমি মাঝে মাঝে এসে তোমাকে দেখা দিব। মা যতদিন ছিল, নারদ ততদিন তপস্যায় যেতে পারেন নি। মার সেবা করতে হয়েছিল কি না। মার দেহত্যাগ হলে তবে হরি-সাধন করতে বেরুলেন।

মাধব-প্রতিষ্ঠা। যদি হৃদয়-মন্দিরে মাধব প্রতিষ্ঠা করতে চাও, যদি ভগবান লাভ করতে চাও, শুধু ভোঁ ভোঁ করে শাঁক ফুঁকলে কি হবে! আগে চিত্তশুদ্ধি কর। মন শুদ্ধ হ'লে ভগবান পবিত্র আসনে এসে বসবেন। চামচিকার বিষ্ঠা থাকলে মাধবকে আনা যায় না। এগার জন চামচিকে একাদশ ইন্দ্রিয়—পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচ কর্মেন্দ্রিয় আর মন। আগে মাধব প্রতিষ্ঠা, তার পর ইচ্ছা হয় বক্তৃতা লেকচার দিও!

আগে ডুব দাও! ডুব দিয়ে রত্ন তোল, তার পরে অন্য কাজ।

মানুষ। ক. দেখ, অর্থ যার দাস, সেই মানুষ। যারা অর্থের ব্যবহার জানে না, তারা মানুষ হ'য়ে মানুষ নয়। আকৃতি মানুষের কিন্তু পশুর ব্যবহার!

খ. দয়া যার নাই সে মানুষ নয়।

মানুষের বিভিন্নতা। দ্রঃ 'ক্ষীরের পোর'।

মায়া। দেখো, যতদিন মায়া থাকে, ততদিন মানুষ থাকে ডাবের মতো। নারকেল যতদিন ডাব থাকে, তার নেয়াপাতি তুলতে গেলেই সঙ্গে মালার একটু উঠে আসবেই। আর যখন মায়া শেষ হ'য়ে যায় তখন হয় ঝুনো। ঐ শাঁস আর মালা পৃথক হ'য়ে যায়, শাঁসটা ভেতরে চপর চপর করে। আত্মা হয় আলাদা, শরীর হয় আলাদা। দেহটার সঙ্গে যোগ থাকে না।

দ্রঃ 'পানাপুকুর।'

মায়া ও উপাধি। 'উপাধি ও মায়া' দেখ।

মায়াকে চিনতে পারলে। তীব্র বৈরাগ্য হ'লে তবে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। যার তীব্র বৈরাগ্য হয়, তার বোধ হয়, সংসার দাবানল! জ্বলছে! মাগ-ছেলেকে দেখে যেন পাতকুয়া! সে রকম বৈরাগ্য যদি ঠিক ঠিক হয়, তা'লে বাড়ী ত্যাগ হয়ে পড়ে। শুধু অনাসক্ত হয়ে থাকা নয়। কামিনী কাঞ্চনই মায়া। মায়াকে যদি চিনতে পার, আপনি লজ্জায় পালাবে। একজন বাঘের ছাল পরে ভয় দেখাচ্ছে। যাকে ভয় দেখাচ্ছে সে বললে, আমি তোকে চিনিছি—তুই আমাদের 'হরে'। তখন সে হেসে চলে গেল—আর একজনকে ভয় দেখাতে গেল।

মায়া ত্রিগুণময়ী। মানুষ তাঁর মায়াতে পড়ে স্বরূপকে ভুলে যায়। সে যে বাপের অনন্ত ঐশ্বর্যের অধিকারী তা ভুলে যায়। তাঁর মায়া ত্রিগুণময়ী। এই তিন গুণই ডাকাত, সর্বস্ব হরণ করে; স্বরূপকে ভুলিয়ে দেয়। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিন গুণ। এদের মধ্যে সত্ত্বগুণই ঈশ্বরের পথ দেখিয়ে দেয়। কিন্তু ঈশ্বরের কাছে

সত্ত্বগুণও নিয়ে যেতে পারে না।

একজন ধনী বনপথ দিয়ে যাচ্ছিল এমন সময় তিনজন ডাকাত এসে তাকে ঘিরে ফেললে ও তার সর্বস্ব হরণ করলে। সব কেড়ে কুড়ে নিয়ে একজন ডাকাত বললে, আর একে রেখে কি হবে? একে মেরে ফেল, এই বলে তাকে কাটতে এল। দ্বিতীয় ডাকাত বললে, মেরে ফেলে কাজ নেই, একে আষ্টে-পিষ্টে বেঁধে এইখানেই ফেলে রেখে যাওয়া যাক। তাহলে পুলিশকে খবর দিতে পারবে না। এই বলে ওকে বেঁধে রেখে ডাকাতরা চলে গেল। খানিকক্ষণ পরে তৃতীয় ডাকাতটি ফিরে এল। এসে বললে, আহা তোমার বড় লেগেছে; না? আমি তোমার বন্ধন খুলে দিচ্ছি। বন্ধন খুলবার পর লোকটিকে সঙ্গে করে নিয়ে ডাকাত পথ দেখিয়ে চলতে লাগল। সরকারী রাস্তার কাছে এসে বললে, এই পথ ধরে যাও, এখন তুমি অনায়াসে নিজের বাড়ি যেতে পারবে। লোকটি বললে, সে কি মহাশয়, আপনিও চলুন; আপনি আমার কত উপকার করলেন। আমাদের বাড়িতে গেলে আমরা কত আনন্দিত হব। ডাকাতটি বললে, 'না আমার ওখানে যাবার যো নেই, পুলিশ ধরবে।' এই বলে সে পথ দেখিয়ে দিয়ে চলে গেল।

প্রথম ডাকাতটি তমোগুণ, যে বলেছিল, একে রেখে আর কি হবে; মেরে ফেল। তমোগুণে বিনাশ হয়। দ্বিতীয় ডাকাতটি রজোগুণ, রজোগুণে মানুষে সংসারে বদ্ধ হয়; নানা কাজ জড়ায়। রজোগুণে ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়। সত্ত্বগুণই কেবল ঈশ্বরের পথ দেখিয়ে দেয়। দয়া, ধর্ম, ভক্তি এ সব সত্ত্বগুণ থেকে হয়। সত্ত্বগুণ যেন সিঁড়ির শেষ ধাপ; তার পরেই ছাদ। মানুষের স্বধাম হচ্চে পরব্রহ্ম। ত্রিগুণাতীত না হ'লে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না।

মায়া-দয়া। আমার জিনিস, আমার জিনিস, বলে—সেই সকল জিনিসকে ভালবাসার নাম মায়া। সবাইকে ভালবাসার নাম দয়া। শুধু ব্রাহ্মসমাজের লোকগুলিকে ভালবাসি, কি শুধু পরিবারদের ভালবাসি, এর নাম মায়া। শুধু দেশের লোকগুলিকে ভালবাসার নাম মায়া; সব দেশের লোককে ভালবাসা, সব ধর্মের লোকদের ভালবাসা, এটি দয়া থেকে হয়, ভক্তি থেকে হয়।

মায়াতে মানুষ বদ্ধ হয়ে যায়, ভগবান থেকে বিমুখ হয়। দয়া থেকে ঈশ্বর লাভ হয়। শুকদেব, নারদ এঁরা দয়া রেখেছিলেন।

মায়া কাকে বলে জান? বাপ-মা, ভাই-ভগ্নী, স্ত্রী-পুত্র, ভাগিনা-ভাগিনী, ভাইপো-ভাইঝি, এই সব আত্মীয়ের প্রতি ভালবাসা। আর দয়া মানে—সর্বভূতে ভালবাসা।

মায়ার ছলনা। ভগবানের শরণাপন্ন কি সহজে হওয়া যায় গা? মহামায়ার এমনি কাণ্ড—হতে কি দেয়? যার তিনকুলে কেউ নাই তাকে দিয়ে একটা বিড়াল পুযিয়ে সংসার করাবে।—সেও বিড়ালের মাছ দুধ ঘুরে ঘুরে যোগাড় করবে, আর বলবে, মাছ দুধ না হলে বিড়ালটা খায় না, কি করি।

মায়ের প্রতি জোর। আপনার মা। জোর কর। যার যাতে সত্তা থাকে, তার তাতে টানও থাকে। মার সত্তা আমার ভিতর আছে বলে তাই তো মার দিকে অত টান

হয়। যে ঠিক শৈব, সে শিবের সত্তা পায়। কিছু কণা তার ভিতরে এসে পড়ে। যে ঠিক বৈষ্ণব তার নারায়ণের সত্তা ভিতরে আসে। আর এ সময় তো আর তোমার বিষয় কর্ম করতে হয় না। এখন দিন কতক তাঁর চিন্তা কর। দেখলে তো সংসারে কিছু নাই।

মার কথা। যে মা ও কথা বলে সে মা নয়; সে অবিদ্যারূপিণী। সে মার কথা না শুনলে কোন দোষ নাই। সে মা ঈশ্বর লাভের পথে বিঘ্ন দেয়। ঈশ্বরের জন্য গুরুজনের বাক্য লঙ্ঘনে দোষ নাই। ভরত রামের জন্য কৈকেয়ীর কথা শুনে নাই। গোপীরা কৃষ্ণদর্শনের জন্য পতিদের মানা শুনে নাই। প্রহ্লাদ ঈশ্বরের জন্য বাপের কথা শুনে নাই। বলি ভগবানের প্রীতির জন্য গুরু শুক্রাচার্যের কথা শুনে নাই। বিভীষণ রামকে পাবার জন্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাবণের কথা শুনে নাই।

তবে ঈশ্বরের পথে যেও না, একথা ছাড়া আর সব কথা শুনবি।

'মা' রূপে ভজনা। তুমি তাঁকে মা মা বলে প্রার্থনা করছিলে। এ খুব ভাল। কথায় বলে, মায়ের টান বাপের চেয়েও বেশী। মায়ের উপর জোর চলে, বাপের উপর চলে না। ত্রৈলোক্যের মায়ের জমিদারী থেকে গাড়ি গাড়ি ধন আসছিল, সঙ্গে কত লাল পাগড়ীওয়ালা লাঠি হাতে দ্বারবান। ত্রৈলোক্য রাস্তায় লোক জন নিয়ে দাঁড়িয়েছিল, জোর করে সব ধন কেড়ে নিলে। মায়ের ধনের উপর খুব জোর চলে। বলে নাকি ছেলের নামে তেমন নালিশ চলে না!

মালা জপ। আবার কেউ মালা জপ করছে; তার ভিতর থেকেই মাছ দর করে! জপ করতে করতে হয় ত আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়—ঐ মাছটা! যত হিসাব সেই সময়ে!

মিথ্যা। অভিনয় ও মিথ্যা দ্রষ্টব্য

মিথ্যাকথা। একজন বড় মিথ্যা কথা কইত, আবার এদিকে বলত—আমার ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে। কোনও লোক তাকে তিরস্কার করাতে সে বললে, কেন জগৎ তো স্বপ্নবৎ, সবই যদি মিথ্যা হল সত্য কথাটাই কি ঠিক। মিথ্যাটাও মিথ্যা, সত্যটাও মিথ্যা!

মুক্ত জীব। যারা মুক্ত জীব, তারা কামিনীকাঞ্চনের বশ নয়। কোন কোন গুটীপোকা অত যত্নের গুটী কেটে বেরিয়ে আসে। সে কিন্তু দু একটা।

মায়াতে ভুলিয়ে রাখে। দু-একজনের জ্ঞান হয়; তারা মায়ার ভেলকিতে ভোলে না; কামিনীকাঞ্চনের বশ হয় না। আঁতুড় ঘরের ধুলহাঁড়ির খোলা যে পায়ে পরে, তার বাজিকরের ড্যাম ড্যাম শব্দের ভেলকি লাগে না। বাজিকর কি করছে সে ঠিক দেখতে পায়।

দ্রঃ বদ্ধ ও মুক্ত।

মুক্তি। ক. মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত। আমি মুক্ত পুরুষ; সংসারেই থাকি বা অরণ্যেই থাকি, আমার বন্ধন কি? আমি ঈশ্বরের সন্তান; রাজাধিরাজের ছেলে; আমায় আবার বাঁধে কে? যদি সাপে কামড়ায়, বিষ নাই জোর করে বললে বিষ ছেড়ে যায়। তেমনি আমি বদ্ধ নই, আমি মুক্ত এই কথাটি রোক

করে বলতে বলতে তাই হয়ে যায়। মুক্তই হয়ে যায়।

'অহংকার থেকে মুক্তি' দ্রষ্টব্য।

খ. জ্ঞান বিচারের শেষে সমাধি হলে, আমি-টামি কিছু থাকে না। কিন্তু সমাধি হওয়া বড় কঠিন। 'আমি' কোন মতে যেতে চায় না। আর যেতে চায় না বলে, ফিরে এই সংসারে আসতে হয়।

'গরু হাম্বা হাম্বা (আমি, আমি) করে তাই এত দুঃখ। সমস্ত দিন লাঙ্গল দিতে হয়—গ্রীষ্ম নাই, বর্ষা নাই। কিম্বা তাকে কসাইয়ে কাটে। তাতেও নিস্তার নাই। চামারে চামড়া করে, জুতা তৈয়ারী করে। অবশেষে নাড়ী-ভুঁড়ি থেকে তাঁত হয়। ধুনুরীর হাতে পড়ে যখন তুঁহু তুঁহু (তুমি তুমি) করে, তখন নিস্তার হয়।

যখন জীব বলে, 'নাহং নাহং নাহং' আমি কেহ নই হে ঈশ্বর। তুমি কর্তা; আমি দাস, তুমি প্রভু—তখন নিস্তার; তখনই মুক্তি।

'অহঙ্কার' দ্রষ্টব্য।

মুক্তি তত্ত্ব। জ্ঞান হলেই মুক্তি। যেখানেই থাকো—ভাগাড়েই মৃত্যু হোক, আর গঙ্গাতীরেই মৃত্যু হোক, জ্ঞানীর মুক্তি হবে।

তবে অজ্ঞানের পক্ষে গঙ্গাতীর।

কাশীতে মৃত্যু হলে শিব সাক্ষাৎকার হন।—হয়ে বলেন, 'আমার এই যে সাকার রূপ এ মায়িক রূপ—ভক্তের জন্য এই রূপ ধারণ করি—এই দ্যাখ, অখণ্ড সচ্চিদানন্দে মিলিয়ে যাই! এই বলে সে রূপ অন্তর্ধান হয়।

পুরাণমতে চণ্ডালেরও যদি ভক্তি হয়, তার মুক্তি হবে। এ মতে নাম করলেই হয়। যাগ-যজ্ঞ, তন্ত্র-মন্ত্র—এসব দরকার নাই।

বেদমত আলাদা। ব্রাহ্মণ না হলে মুক্তি হয় না। আবার ঠিক মন্ত্র উচ্চারণ না হলে পূজা গ্রহণ হয় না। যাগ-যজ্ঞ, মন্ত্র-তন্ত্র—সব বিধি অনুসারে করতে হবে।

মুক্তি সকলের। সকলেরই মুক্তি হবে। তবে গুরুর উপদেশ অনুসারে চলতে হয়। বাঁকা পথে গেলে ফিরে আসতে কষ্ট হবে। মুক্তি অনেক দেরীতে হয়। হয়তো এ জন্মেও হ'ল না, আবার হয়তো অনেক জন্মের পর হ'ল। জনকাদি সংসারেও কর্ম করেছিলেন। ঈশ্বরকে মাথায় রেখে কাজ করতেন। নর্তকী যেমন মাথায় বাসন করে নাচে। আর পশ্চিমের মেয়েদের দেখ নাই? মাথায় জলের ঘড়া, হাসতে হাসতে কথা কইতে কইতে যাচ্ছে।

মুক্তির ডাক। সংসার আর মুক্তি দুইই ঈশ্বরের ইচ্ছা। তিনিই সংসারে অজ্ঞান করে রেখেছেন, আবার তিনি ইচ্ছা করে যখন ডাকবেন তখন মুক্তি হবে। ছেলে খেলতে গেছে, খাবার সময় মা ডাকে। যখন তিনি মুক্তি দিবেন তখন তিনি সাধুসঙ্গ করিয়ে নেন। আবার তাঁকে পাবার জন্য ব্যাকুলতা করে দেন।

দ্রঃ বন্ধন ও মুক্তি।

মুখহলসা, ভেতরবুঁদে, কানতুলসে, দীঘল ঘোমটা নারী।
পানা পুকুরের শীতল জল বড় মন্দকরী।

এই ক'টি লোকের কাছে সাবধান হবে ঃ প্রথম, মুখহলসা—হল্‌হল্‌ করে কথা কয় ; তারপর ভেতর বুঁদে—মনের ভিতর ডুবুরি নামালেও অন্ত পাবে না ; তারপর কান্‌তুলসে—কানে তুলসী দেয়, ভক্তি জানাবার জন্য ; দীঘল ঘোম্‌টা নারী—লম্বা ঘোম্‌টা, লোকে মনে করে ভারী সতী, তা নয়; আর পানাপুকুরের জল—নাইলে সান্নিপাতিক হয়।

মুমুক্ষু জীব। 'জীবের প্রকার' দেখ।

মুসলমান। দ্রষ্টব্য মনের যোগ।

মৃত্যু। মৃত্যুকে সর্বদা মনে রাখা উচিত। মরবার পর কিছুই থাকবে না। এখানে কতকগুলি কর্ম করতে আসা। যেমন পাড়াগাঁয়ে বাড়ি, কলকাতায় কর্ম করতে আসা। বড় মানুষের বাগানের সরকার, বাগান যদি কেউ দেখতে আসে, তা বলে, 'এ বাগান আমাদের।' কিন্তু কোন দোষ দেখে বাবু যদি ছাড়িয়ে দেয়, তার আমকাঠের সিন্দুকটা লয়ে যাবার যোগ্যতা থাকে না। দারোয়ানকে দিয়ে সিন্দুকটা পাঠিয়ে দেয়।

দ্রঃ জন্মমৃত্যু

মৃত্যুকাল। সংসারাসক্ত বদ্ধজীব মৃত্যুকালে সংসারের কথাই বলে। বাহিরে মালা জপলে, গঙ্গাস্নান করলে, তীর্থে গেলে—কি হবে? সংসার আসক্তি ভিতরে থাকলে মৃত্যুকালে সেটি দেখা যায়। কত আবল-তাবল বকে ; হয়তো বিকারের খেয়ালে 'হলুদ, পাঁচফোড়ন, তেজপাতা' ব'লে চেঁচিয়ে উঠলো। শুকপাখি সহজ বেলা রাধাকৃষ্ণ বলে, বিল্লি ধরলে নিজের বুলি বেরোয়, ক্যাঁ ক্যাঁ করে। গীতায় আছে মৃত্যুকালে যা মনে ক'রবে, পরলোকে তাই হবে। ভরত রাজা 'হরিণ', 'হরিণ', ক'রে দেহত্যাগ করেছিল, তাই হরিণ জন্ম হ'ল। ঈশ্বর চিন্তা করে দেহত্যাগ করলে ঈশ্বর লাভ হয়, আর এ সংসারে আসতে হয় না।

মৃত্যুর প্রস্তুতি। মৃত্যু সময়ের জন্য প্রস্তুত হওয়া ভাল। শেষ বয়সে নির্জনে গিয়ে কেবল ঈশ্বর চিন্তা ও তাঁর নাম করা। হাতি নেয়ে যদি আস্তাবলে যায় তাহলে আর ধুলো কাদা মাখতে পারে না। জয়নারায়ণ পণ্ডিতের কাশীতেই বাস আর কাশীতেই দেহত্যাগ হ'ল। বয়স হলে ঐ রকম চলে গিয়ে ঈশ্বরচিন্তা করা ভাল।

মেকী ভক্ত। একটি স্যাকরার দোকান ছিল। বড় ভক্ত, পরম বৈষ্ণব—গলায় মালা, কপালে তিলক, হস্তে হরিনামের মালা। সকলে বিশ্বাস করে ঐ দোকানেই আসে, ভাবে এরা পরম ভক্ত, কখনও ঠকাতে যাবে না। একদল খদ্দের এলে দেখতো কোনও কারিগর বলছে 'কেশব!' 'কেশব!' আর একজন কারিগর খানিক পরে নাম করছে 'গোপাল!' 'গোপাল!' আবার খানিকক্ষণ পরে একজন কারিগর বলছে, 'হরি' 'হরি', তারপর কেউ বলছে 'হর, হর!' কাজে কাজেই এত ভগবানের নাম দেখে খরিদ্দারেরা সহজেই মনে করতো, এ স্যাকরা অতি উত্তম লোক।—কিন্তু ব্যাপারটা কি জান? যে বললে, 'কেশব, কেশব!' তার মনের ভাব, এ সব (খদ্দের) কে? যে বললে 'গোপাল! গোপাল!' তার অর্থ এই যে আমি এদের চেয়ে চেয়ে দেখলুম, এরা গরুর পাল (হাস্য)! যে বললে 'হরি হরি'—তার অর্থ

এই যে, যদি গরুর পাল, তবে হরি অর্থাৎ হরণ করি। যে বললে, 'হর হর।' তার মানে এই, তবে হরণ কর, হরণ কর, এরা তো গরুর পাল!

মেয়েদের গান শেখা। তোমার মেয়েদের আর গান শিখিও না। আপনা আপনি গায় সে এক। যার তার কাছে গাইলে লজ্জা ভেঙ্গে যাবে, লজ্জা মেয়েদের বড় দরকার।

মেয়েমানুষ। মেয়েমানুষের কাছে খুব সাবধান হতে হয়। গোপাল ভাব! এ সব কথা শুনো না। মেয়ে ত্রিভুবন দিলে খেয়ে ফেলে। অনেক মেয়েমানুষ, জোয়ান ছোকরা দেখতে ভাল, দেখে নূতন মায়া ফাঁদে। তাই গোপাল ভাব!

যাদের কৌমার-বৈরাগ্য, যারা ছেলেবেলা থেকে ভগবানের জন্য ব্যাকুল হয়ে বেড়ায়, সংসারে ঢোকে না, তারা একটি থাক আলাদা। তারা নৈকষ্য কুলীন। ঠিক ঠিক বৈরাগ্য হলে তারা মেয়েমানুষের থেকে ৫০ হাত তফাতে থাকে, পাছে তাদের ভাব ভঙ্গ হয়। তারা যদি মেয়েমানুষের পাল্লায় পড়ে, তা হ'লে আর নৈকষ্য কুলীন থাকে না, ভঙ্গ ভাব হয়ে যায়; তাদের ঘর নীচু হয়ে যায়। যাদের ঠিক কৌমার-বৈরাগ্য তাদের উঁচু ঘর; অতি শুদ্ধ ভাব। গায়ে দাগটি পর্যন্ত লাগে না।

মেয়েরা। তোমরা উপবাস করে এসেছ কেন? খেয়ে আসতে হয়।

মেয়েরা আমার মা'র এক একটি রূপ কি না; তাই তাদের কষ্ট আমি দেখতে পারি না, জগন্মাতার এক একটি রূপ। খেয়ে আসবে, আনন্দে থাকবে।

মোড় ফেরান। তমোগুণের স্বভাব অহংকার। অহংকার অজ্ঞান থেকে হয়, তমোগুণ থেকে হয়।

পুরাণে আছে রাবণের রজোগুণ, কুম্ভকর্ণের তমোগুণ, বিভীষণের সত্ত্বগুণ। তাই বিভীষণ রামচন্দ্রকে লাভ করেছিলেন। তমোগুণের আর একটি লক্ষণ—ক্রোধ। ক্রোধে দিকবিদিক্ জ্ঞান থাকে না; হনুমান লংকা পোড়ালেন, এ জ্ঞান নাই যে সীতার কুটীর নষ্ট হবে।

আবার তমোগুণের আর একটি লক্ষণ—কাম। পাথুরেঘাটার গিরীন্দ্র ঘোষ বলেছিল, কাম-ক্রোধাদি রিপু—এরা তো যাবে না, এদের মোড় ফিরিয়ে দাও। ঈশ্বরের কামনা কর। সচ্চিদানন্দের সহিত রমণ কর। আর ক্রোধ যদি না যায়, তবে ভক্তির তমঃ আন। কি! আমি দুর্গানাম করেছি, উদ্ধার হব না? আমার আবার পাপ কি? বন্ধন কি? তারপর ঈশ্বর লাভ করবার লোভ কর। ঈশ্বরের রূপে মুগ্ধ হও। আমি ঈশ্বরের দাস, আমি ঈশ্বরের ছেলে, যদি অহংকার করতে হয়, তো এই অহংকার কর। এই রকমে ছয় রিপুর মোড় ফিরিয়ে দিতে হয়।

মোসাহেবের অবস্থা। মোসাহেবরা মনে করে, বাবু তাদের টাকা ঢেলে দেবে। কিন্তু বাবুর কাছে আদায় করা বড় কঠিন। একটা শৃগাল একটা বলদকে দেখে তার সঙ্গ আর ছাড়ে না। সে চরে বেড়ায়, ওটাও সঙ্গে সঙ্গে। শৃগালটা মনে করেছে ওর অণ্ডের কোষ ঝুলছে সেইটে কখনো না কখনো পড়ে যাবে আর আমি খাব। বলদটা কখনো ঘুমোয়, সেও কাছে শুয়ে ঘুমোয়; আর যখন উঠে চরে বেড়ায় সেও সঙ্গে সঙ্গে থাকে। কতদিন এইরূপে যায়, কিন্তু কোষটা পড়লো না;

তখন সে নিরাশ হয়ে চলে গেল। (সকলের হাস্য)। মোসাহেবদের এইরূপই অবস্থা।

যত মত তত পথ। দ্রঃ প্রতিপাদ্য সচ্চিদানন্দ। অনন্ত পথ-খ।

যদু মল্লিক। যদু মল্লিকের বাড়ী গিয়েছিলাম। একেবারে জিজ্ঞাসা করে গাড়ী-ভাড়া কত। যখন এরা বললে ৩ টাকা ২ আনা, তখন একবার আমাকে জিজ্ঞাসা করে আবার শুকুল ঠাকুর আড়ালে গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করছে। সে বললে, তিন টাকা চারি আনা। তখন আবার আমাদের কাছে দৌড়ে আসে; বলে, ভাড়া কত?

কাছে দালাল এসেছে। সে যদুকে বললে, বড়বাজারে ৪কাঠা জায়গা বিক্রী আছে নেবেন? যদু বলে, কত দাম? দামটা কিছু কমায় না? আমি বললুম, 'তুমি নেবে না কেবল ঢং করছো। না?' তখন আবার আমার দিকে ফিরে হাসে। বিষয়ী লোকদের দস্তুরই; ৫টা লোক আনাগোনা করবে বাজারে খুব নাম হবে।

যদৃচ্ছালাভ। যে ঠিক ভক্ত সে চেষ্টা না করলেও ঈশ্বর তার সব জুটিয়ে দেন। যে ঠিক রাজার বেটা, সে মাসোহারা পায়। উকিল-ফুকিলের কথা বলছি না—যারা কষ্ট করে, লোকের দাসত্ব করে টাকা আনে। আমি বলছি, ঠিক রাজার বেটা। যার কোন কামনা নাই সে টাকাকড়ি চায় না। টাকা আপনি আসে। গীতায় আছে—যদৃচ্ছালাভ।

সদ্‌ব্রাহ্মণ, যার কোন কামনা নাই, সে হাড়ীর বাড়ীর সিধে নিতে পারে। যদৃচ্ছালাভ। সে চায় না, কিন্তু আপনি আসে।

যশোদা ও নিরাকার সাকার তত্ত্ব। এক মতে আছে যশোদাদি গোপীগণ পূর্বজন্মে নিরাকারবাদী ছিলেন। তাঁদের তাতে তৃপ্তি হয় নাই। বৃন্দাবন লীলায় তাই শ্রীকৃষ্ণকে লয়ে আনন্দ। শ্রীকৃষ্ণ একদিন বললেন, তোমাদের নিত্যধাম দর্শন করাবো, এসো যমুনায় স্নান করতে যাই। তাঁরা যেই ডুব দিয়েছেন—একেবারে গোলক দর্শন। আবার তারপর অখণ্ড জ্যোতিঃ দর্শন। যশোদা তখন বললেন, কৃষ্ণ রে ও সব আর দেখতে চাই না—এখন তোর সেই মানুষরূপ দেখবো। তোকে কোলে করবো, খাওয়াবো।

দ্রঃ নিরকার সাকার দ্বন্দ্ব।

যাচাই করা। সে কি রে? জিনিসটা আনলি, তা দেখে আনলি না? দোকানী ব্যবসা করতে বসেছে, সে ত আর ধর্ম করতে বসে নাই? তার কথায় বিশ্বাস করে ঠকে এলি? ভক্ত হবি, তা বলে, বোকা হবি? লোকে তোকে ঠকিয়ে নেবে? ঠিক ঠিক জিনিস দিলে কি না দেখে তবে দাম দিবি; ওজনে কম দিলে কি না তা দেখে নিবি, আবার যে সব জিনিসের ফাউ পাওয়া যায়, সে সব জিনিস কিনতে গিয়ে ফাউটি পর্যন্ত ছেড়ে আসবি না। আবার পাঁচ দোকানে ঘুরে যাচাই করে নিবি।

যাত্রার লোকশিক্ষা। অষ্টপাশ। তা সব যায় না। দু-একটা পাশ তিনি রেখে দেন—লোকশিক্ষার জন্য। তুমি এই যাত্রাটি করেছো, তোমার ভক্তি দেখে কত

লোকের উপকার হচ্ছে। আর তুমি সব ছেড়ে দিলে এঁরা (যাত্রাওয়ালারা) কোথায় যাবেন।

তিনি তোমার দ্বারা কাজ করিয়ে নিচ্ছেন। কাজ শেষ হলে তুমি আর ফিরবে না। গৃহিণী সমস্ত সংসারের কাজ সেরে, সকলকে খাইয়ে-দাইয়ে—দাস-দাসীদের পর্যন্ত খাইয়ে-দাইয়ে—নাইতে যায়; তখন আর ডাকাডাকি করলেও ফিরে না।

যদৃচ্ছ লাভ। সংসারে টাকার দরকার বটে, কিন্তু ওগুলোর জন্য অত ভেবো না। যদৃচ্ছালাভ—এই ভাল সঞ্চয়ের জন্য অত ভেবো না। যারা তাঁকে মন প্রাণ সমর্পণ করে—যারা তাঁর ভক্ত, শরণাগত, তারা ওসব অতো ভাবে না। যত্র আয়—তত্র ব্যয়। এক দিক থেকে টাকা আসে, আর এক দিক থেকে খরচ হয়ে যায়। এর নাম যদৃচ্ছালাভ।

দ্রঃ টাকা

যিনি সাকার তিনিই নিরাকার। তোমার সাকার না নিরাকার ভাল লাগে? কি জান, যিনিই নিরাকার, তিনিই সাকার। ভক্তের চক্ষে তিনি সাকার রূপে দর্শন দেন। যেমন অনন্ত জলরাশি। মহাসমুদ্র। কূল কিনারা নাই, সেই জলের কোন কোন স্থানে বরফ হয়েছে; বেশী ঠান্ডাতে বরফ হয়। ঠিক সেইরূপ ভক্তি-হিমে সাকাররূপ দর্শন হয়। আবার যেমন সূর্য উঠলে বরফ গলে যায়—যেমন জল তেমনি জল, ঠিক সেইরূপ জ্ঞান-পথ—বিচার পথ—দিয়ে গেলে সাকাররূপে আর দেখা যায় না; আবার সব নিরাকার। জ্ঞানসূর্য উদয় হওয়াতে সাকার বরফ গলে গেল। কিন্তু দেখ, যাঁরই নিরাকার, তাঁরই সাকার।

দ্রঃ সাকার নিরাকার দ্বন্দ্ব।

যোগ। মোটামুটি দুই প্রকার যোগ—কর্মযোগ আর মনোযোগ, কর্মের দ্বারা যোগ আর মনের দ্বারা যোগ।

ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ আর সন্ন্যাস—এর মধ্যে প্রথম তিনটিতে কর্ম করতে হয়। সন্ন্যাসীর দন্ডকমন্ডলু ভিক্ষাপাত্র ধারণ করতে হয়। সন্ন্যাসী নিত্যকর্ম করে। কিন্তু হয় ত মনের যোগ নাই—জ্ঞান নাই, ঈশ্বরে মন নাই। কোন কোন সন্ন্যাসী নিত্যকর্ম কিছু কিছু রাখে—লোকশিক্ষার জন্য। গৃহস্থ বা অন্যান্য আশ্রমী যদি নিষ্কাম কর্ম করতে পারে, তা হলে তাদের কর্মের দ্বারা যোগ হয়।

পরমহংস অবস্থায়—যেমন শুকদেবাদির—কর্ম সব উঠে যায়। পূজা, জপ, তর্পণ, সন্ধ্যা এই সব কর্ম। এ অবস্থায় কেবল মনের যোগ। বাহিরের কর্ম কখন সাধ করে করে—লোকশিক্ষার জন্য। কিন্তু সর্বদা স্মরণ মনন থাকে।

দ্রঃ মন সব কুড়িয়ে আনা।

যোগ (মনোযোগ ও কর্মযোগ)। মনোযোগ ও কর্মযোগ। পূজা, তীর্থ, জীব-সেবা ইত্যাদি গুরুর উপদেশে কর্ম করার নাম কর্মযোগ। জনকাদি যা কর্ম করতেন তার নামও কর্মযোগ। যোগীরা যে স্মরণ মনন করেন তার নাম মনোযোগ।

যোগ ও মন। দ্রঃ মন ও যোগ।

যোগ তত্ত্ব। ইনি ষড়চক্রের গান গাইলেন। সে সব যোগের কথা। হঠযোগ আর রাজযোগ। হঠযোগী শরীরের কতকগুলো কসরৎ করে ; উদ্দেশ্য সিদ্ধাই, দীর্ঘ আয়ু হবে ; অষ্ট সিদ্ধি হবে ; এই সব উদ্দেশ্য। রাজযোগের উদ্দেশ্য ভক্তি, প্রেম, জ্ঞান, বৈরাগ্য। রাজযোগই ভাল।

বেদান্তের সপ্তভূমি, আর যোগশাস্ত্রের ষড়চক্র অনেক মেলে। বেদের প্রথম তিন ভূমি, আর ওদের মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর। এই তিন ভূমিতে গুহ্য, লিঙ্গ, নাভিতে মনের বাস। মন যখন চতুর্থ ভূমিতে উঠে অর্থাৎ অনাহত পদ্মে, জীবাত্মাকে তখন শিখার ন্যায় দর্শন হয়, আর জ্যোতিঃ দর্শন হয়। সাধক বলে—এ কি! এ কি!

পঞ্চম ভূমিতে মন উঠলে, কেবল ঈশ্বরের কথাই শুনতে ইচ্ছা হয়। এখানে বিশুদ্ধ চক্র। ষষ্ঠ ভূমি আর আজ্ঞাচক্র এক। সেখানে মন গেলে ঈশ্বর দর্শন হয়। কিন্তু যেমন লণ্ঠনের ভিতর আলো—ছুঁতে পারে না, মাঝে কাঁচ ব্যবধান আছে বলে।

জনক রাজা পঞ্চম ভূমি থেকে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দিতেন। তিনি কখনও পঞ্চম ভূমি, কখনও ষষ্ঠ ভূমিতে থাকতেন।

ষড়চক্র ভেদের পর সপ্তম ভূমি। ঘন, সেখানে গেলে মনের লয় হয়। জীবাত্মা পরমাত্মা এক হয়ে যায়। সমাধি হয়। দেহবুদ্ধি চলে যায় ; বাহ্যশূন্য হয় ; নানা জ্ঞান চলে যায় ; বিচার বন্ধ হয়ে যায়।

ত্রৈলঙ্গ স্বামী বলেছিল, বিচারে অনেক বোধ হচ্ছে ; নানা বোধ হচ্ছে। সমাধির পর শেষে একুশ দিনে মৃত্যু হয়।

কিন্তু কুলকুণ্ডলিনী জাগরণ না হলে চৈতন্য হয় না।

যোগভ্রষ্ট। পূর্বজন্মে ঈশ্বরচিন্তা করতে করতে হয়ত হঠাৎ ভোগ করবার লালসা হয়েছে। এরূপ হলে যোগভ্রষ্ট হয়। আর পরজন্মে ঐরূপ জন্ম হয়।

যোগভ্রষ্ট হয় কেন। গর্ভে ছিলাম যোগে ছিলাম, ভূমে পড়ে খেলাম মাটি। ওরে ধাত্রীতে কেটেছে নাড়ী, মায়ার বেড়ী কিসে কাটি।

কামিনী-কাঞ্চনই মায়া। মন থেকে ঐ দুটি গেলেই যোগ। আত্মা—পরমাত্মা চুম্বক পাথর, জীবাত্মা যেন একটি ছুঁচ—তিনি টেনে নিলেই যোগ! কিন্তু ছুঁচে যদি মাটি মাখা থাকা চুম্বক টানে না,—মাটি সাফ করে দিলে আবার টানে। কামিনী-কাঞ্চন মাটি পরিষ্কার করতে হয়।

যোগমায়া। যোগমায়া অর্থাৎ পুরুষ প্রকৃতির যোগ। যা কিছু দেখছ সবই পুরুষ প্রকৃতির যোগ। শিবকালীর মূর্তি শিবের উপর কালী দাঁড়িয়ে আছেন। শিব শব হয়ে পড়ে আছেন। কালী শিবের দিকে চেয়ে আছেন। এই সমস্তই পুরুষ-প্রকৃতির যোগ। পুরুষ নিষ্ক্রিয়, তাই শিব শব হয়ে আছেন। পুরুষের যোগে প্রকৃতি সমস্ত কাজ করছেন। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করছেন।

যোগাযোগ। ঈশ্বরদর্শন [যোগাযোগ ও ব্যাকুলতা] দ্রষ্টব্য।

যোগীর প্রকার। ক. যোগী দুই প্রকার—বহুদক আর কুটীচক। যে সাধু অনেক তীর্থ করে বেড়াচ্ছে—যার মনে এখনও শান্তি হয় নাই, তাকে বহুদক বলে।

যে যোগী সব ঘুরে মন স্থির করেছে, যার শান্তি হয়ে গেছে—সে এক জায়গায় আসন করে বসে—আর নড়ে না। সেই এক স্থানে বসেই তার আনন্দ। তার তীর্থে যাওয়ার কোন প্রয়োজন করে না। যদি সে তীর্থে যায় সে কেবল উদ্দীপনের জন্য।

খ. যোগী দু রকম। ব্যক্ত যোগী আর গুপ্ত যোগী। সংসারে গুপ্ত যোগী। কেউ তাকে টের পায় না। সংসারীর পক্ষে মনে ত্যাগ, বাহিরে ত্যাগ নয়।

যোগের প্রকার। মোটামুটি যোগ তিন প্রকার: জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, আর ভক্তি-যোগ।

জ্ঞানযোগ—জ্ঞানী, ব্রহ্মকে জানতে চায়; নেতি নেতি বিচার করে। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা এই বিচার করে। সদসৎ বিচার করে। বিচারের শেষ যেখানে, সেখানে সমাধি হয়, আর ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়।

কর্মযোগ—কর্ম দ্বারা ঈশ্বরে মন রাখা। তুমি যা শিখাচ্ছ। অনাসক্ত হয়ে প্রাণায়াম, ধ্যানধারণাদি কর্মযোগ। সংসারী লোকেরা যদি অনাসক্ত হয়ে ঈশ্বরে ফল সমর্পণ করে, তাতে ভক্তি রেখে, সংসারের কর্ম করে, সেও কর্মযোগ। ঈশ্বরে ফল সমর্পণ করে পূজা জপাদি কর্ম করার নামও কর্মযোগ। ঈশ্বর-লাভই কর্মযোগের উদ্দেশ্য।

ভক্তিযোগ—ঈশ্বরের নাম গুণ কীর্তন এই সব করে তাঁতে মন রাখা। কলিযুগের পক্ষে ভক্তিযোগ সহজ পথ। ভক্তিযোগই যুগধর্ম।

কর্মযোগ বড় কঠিন—প্রথমতঃ, আগেই বলেছি, সময় কৈ? শাস্ত্রে যে সব কর্ম করতে বলেছে, তার সময় কৈ? কলিতে আয়ু কম। তারপর অনাসক্ত হয়ে, ফল কামনা না করে, কর্ম করা ভারী কঠিন। ঈশ্বর লাভ না করলে ঠিক অনাসক্ত হওয়া যায় না। তুমি হয় তো জান না, কিন্তু কোথা থেকে আসক্তি এসে পড়ে। জ্ঞানযোগও এ যুগে ভারী কঠিন। জীবের একে অন্নগত প্রাণ, তাতে আয়ু কম। আবার দেহবুদ্ধি কোন মতে যায় না। এদিকে দেহবুদ্ধি না গেলে একেবারে জ্ঞানই হবে না। জ্ঞানী বলে, আমি সেই ব্রহ্ম; আমি শরীর নই, আমি ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ, শোক, জন্ম মৃত্যু, সুখ দুঃখ এ সকলের পার। যদি রোগ, শোক, সুখ, দুঃখ এ সব বোধ থাকে, তুমি জ্ঞানী কেমন করে হবে? এদিকে কাঁটায় হাত কেটে যাচ্ছে, দরদর করে রক্ত পড়ছে, খুব লাগছে—অথচ বলছে, কৈ হাত তো কাটে নাই। আমার কি হয়েছে?

যোগের বিষয়। যোগের বিষয় গোটাকতক মোটামুটি তোমায় বলে দিতে হবে। কি জান, ডিমের ভিতর ছানা বড় না হলে পাখী ঠোকরায় না। সময় হলেই পাখী ডিম ফুটোয়।

তবে একটু সাধনা করা দরকার। গুরুই সব করেন—তবে শেষটা একটু সাধনা করিয়ে লন। বড় গাছ কাটবার সময় প্রায় সবটা কাটা হলে পর একটু সরে দাঁড়াতে হয়। তারপর গাছটা মড় মড় করে আপনিই ভেঙ্গে পড়ে।

যখন খাল কেটে জল আনে, আর একটু কাটলেই নদীর সঙ্গে যোগ হয়ে যাবে, তখন যে কাটে সে সরে দাঁড়ায়। তখন মাটিটা ভিজে আপনিই পড়ে যায়, আর

নদীর জল হুড় হুড় করে খালে আসে।
অহংকার উপাধি, এ সব ত্যাগ হলেই ঈশ্বরকে দর্শন করা যায়। 'আমি পণ্ডিত', 'আমি অমুকের ছেলে', 'আমি ধনী', 'আমি মানী'—এ সব উপাধি ত্যাগ হলেই দর্শন।
ঈশ্বর সত্য আর সব অনিত্য, সংসার অনিত্য এর নাম বিবেক। বিবেক না হলে উপদেশ গ্রাহ্য হয় না।
সাধনা করতে করতে তাঁর কৃপায় সিদ্ধ হয়। একটু খাটা চাই। তার পরেই দর্শন ও আনন্দ লাভ।

রমণ। মেয়েদের সঙ্গে বসা কি বেশীক্ষণ আলাপ, তাকেও রমণ বলেছে। রমণ আট প্রকার। মেয়েদের কথা শুনছি ; শুনতে শুনতে আনন্দ হচ্ছে ; ও এক রকম রমণ। মেয়েদের কথা বলছি (কীর্তনম্) ও এক রকম রমণ ; মেয়েদের সঙ্গে নির্জনে চুপি চুপি কথা কচ্ছি, ও এক রকম। মেয়েদের কোন জিনিস কাছে রেখে দিয়েছি, আনন্দ হচ্ছে, ও এক রকম। স্পর্শ করা এক রকম। তাই গুরু-পত্নী যুবতী হলে পাদস্পর্শ করতে নাই ; সন্ন্যাসীদের এই সব নিয়ম।
সংসারীদের আলাদা কথা ; দু একটি ছেলে হলে ভাই-ভগ্নীর মতো থাকবে ; তাদের অন্য সাত রকম রমণে তত দোষ নাই।
রস ও রসিক। দ্রঃ রাধাকৃষ্ণ লীলার অর্থ।
রসুন গোলা। দ্রঃ বড়বেলায় দামড়া।
রাখাল (স্বামী ব্রহ্মানন্দ)। আহা, আজকাল রাখালের স্বভাবটি কেমন হয়েছে! ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখ—দেখতে পাবে,মাঝে মাঝে ঠোঁট নড়ছে। অন্তরে ঈশ্বরের নাম জপ করে কিনা ; তাই ঠোঁট নড়ে।
এ সব ছোকরারা নিত্য সিদ্ধের থাক। ঈশ্বরের জ্ঞান নিয়ে জন্মেছে। একটু বয়স হলেই বুঝতে পারে, সংসার গায়ে লাগলে আর রক্ষা নাই। বেদেতে হোমাপাখীর কথা আছে, সে পাখী আকাশেই থাকে, মাটির উপর কখন আসে না। আকাশেই ডিম পাড়ে। ডিম পড়তে থাকে ; কিন্তু এত উঁচুতে পাখী থাকে যে, পড়তে পড়তে ডিম ফুটে যায়। তখন পাখীর ছানা বেরিয়ে পড়ে, সেও পড়তে থাকে। কিন্তু তখনও এত উঁচু যে পড়তে পড়তে ওর পাখা উঠে ও চোখ ফোটে। তখন সে দেখতে পায় যে আমি মাটির উপর পড়ে যাব। মাটিতে পড়লেই মৃত্যু। মাটি দেখাও যা, অমনি মার দিকে চোঁচা দৌড়। একবারে উড়তে আরম্ভ করে দিল। যাতে মার কাছে পেঁছিতে পারে। এক লক্ষ্য মার কাছে যাওয়া।
এ সব ছোকরারা ঠিক সেই রকম। ছেলেবেলাই সংসার দেখে ভয়। এক চিন্তা কিসে মার কাছে যাব, কিসে ঈশ্বরলাভ হয়।
যদি বল. বিষয়ীদের মধ্যে থাকা, বিষয়ীদের ঔরসে জন্ম, তবে এমন ভক্তি—এমন জ্ঞান হয় কেমন করে ? তার মানে আছে। বিষ্ঠাকুড়ে যদি ছোলা পড়ে, তা হলে তাতে ছোলা গাছই হয়। সে ছোলাতে কত ভাল কাজ হয়। বিষ্ঠাকুড়ে পড়েছে বলে কি অন্য গাছ হবে ?

আহা রাখালের স্বভাব আজকাল কেমন হয়েছে। তা হবে নাই বা কেন ? ওল যদি ভাল হয়, তার মুখীটিও ভাল হয়। যেমন বাপ, তার তেমনি ছেলে।

রাগভক্তি। রাগভক্তি এলে, অর্থাৎ ঈশ্বরে ভালবাসা এলে তবে তাঁকে পাওয়া যায়। বৈধী ভক্তি হতেও যেমন যেতেও তেমন। এত জপ, এত ধ্যান করবে, এত যাগ-যজ্ঞ-হোম করবে, এই এই উপচারে পূজা করবে, পূজার সময় এই এই মন্ত্র পাঠ করবে, এই সকলের নাম বৈধী-ভক্তি। হ'তেও যেমন, যেতেও তেমন। কত লোকে বলে, আর ভাই, কত হবিষ্য করলুম, কতবার বাড়িতে পূজা আনলুম, কিন্তু কি হ'ল ?

দ্রঃ প্রেমভক্তির নানারূপ।

রাগভক্তি কাদের হয় ? রাগভক্তির কিন্তু পতন নাই। কাদের রাগভক্তি হয় ? যাদের পূর্বজন্মে অনেক কাজ করা আছে। অথবা যারা নিত্যসিদ্ধ। যেমন একটা প'ড়ো বাড়ির বনজঙ্গল কাটতে কাটতে নল-বসান ফোয়ারা একটা পেয়ে গেল। মাটি-সুরকি ঢাকা ছিল ; যাই সরিয়ে দিলে অমনি ফর ফর করে জল উঠতে লাগলো।

যাদের রাগভক্তি তারা এমন কথা বলে না, ভাই, কত হবিষ্যি করলাম—কিন্তু কি হ'ল! যারা নতুন চাষ করে তাদের যদি ফসল না হয়, জমি ছেড়ে দেয়। খানদানি চাষা ফসল হ'ক আর না হ'ক, আবার চাষ করবেই। তাদের বাপ-পিতামহ চাষাগিরি করে এসেছে, তারা জানে যে চাষ করেই খেতে হবে।

রানীভবানী। দ্রঃ 'হঠাৎ বৈরাগ্য'।

রাধা। রাধাই আদ্যাশক্তি বা প্রকৃতি—পুরুষ ও প্রকৃতি, ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ, রাধা প্রকৃতি, চিচ্ছক্তি—আদ্যাশক্তি। রাধা প্রকৃতি, ত্রিগুণময়ী। এঁর ভিতরে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিনগুণ। যেমন পেঁয়াজ ছাড়িয়ে যাও, প্রথমে লাল কালোর আমেজ, তার পর লাল, তার পর সাদা বেরুতে থাকে। বৈষ্ণব-শাস্ত্রে আছে, কামরাধা, প্রেমরাধা, নিত্যরাধা। কামরাধা চন্দ্রাবলী ; প্রেমরাধা শ্রীমতী ; নিত্যরাধা নন্দ দেখেছিলেন—গোপাল কোলে।

রাধা (নিত্য)। নিত্যরাধা নন্দ ঘোষ দেখেছিলেন। প্রেম-রাধা বৃন্দাবনে লীলা করেছিলেন, কাম-রাধা চন্দ্রাবলী।

কামরাধা, প্রেমরাধা। আরও এগিয়ে গেলে নিত্যরাধা। প্যাঁজ ছাড়িয়ে গেলে প্রথমে লাল খোসা, তারপরে ঈষৎ লাল, তারপরে সাদা, তারপরে আর খোসা পাওয়া যায় না। ঐটি নিত্যরাধার স্বরূপ—যেখানে নেতি নেতি বিচার বন্ধ হ'য়ে যায়।

নিত্য রাধাকৃষ্ণ, আর লীলা রাধাকৃষ্ণ। যেমন সূর্য আর রশ্মি। নিত্য সূর্যের স্বরূপ, লীলা রশ্মির স্বরূপ।

রাধাকৃষ্ণের যুগল। রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তিরও মানে ঐ যোগ। ঐ যোগের জন্য বঙ্কিম ভাব। সেই যোগ দেখাবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণের নাকে মুক্তা, শ্রীমতীর নাকে নীল পাথর। শ্রীমতীর গৌর বরণ মুক্তার ন্যায় উজ্জ্বল। শ্রীকৃষ্ণের শ্যামবর্ণ, তাই শ্রীমতীর নীল পাথর। আবার শ্রীকৃষ্ণ পীতবসন ও শ্রীমতী নীলবসন

পরেছেন।

রাধাকৃষ্ণ যুগলের ব্যাখ্যা। শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে বঙ্কিম হয়েছিলেন। শ্রীমতীর প্রেমে ত্রিভঙ্গ হয়েছিলেন। কৃষ্ণরূপের ব্যাখ্যা কেউ কেউ করে, শ্রীরাধার প্রেমে ত্রিভঙ্গ। কালো কেন জানো? আর চৌদ্দপো, অত ছোট কেন? যতক্ষণ ঈশ্বর দূরে, ততক্ষণ কালো দেখায়; যেমন সমুদ্রের জল দূর থেকে নীলবর্ণ দেখায়। সমুদ্রের জলের কাছে গেলে ও হাতে করে তুললে আর কালো থাকে না, তখন খুব পরিষ্কার, সাদা। সূর্য দূরে বলে খুব ছোট দেখায়; কাছে গেলে আর ছোট থাকে না। ঈশ্বরের স্বরূপ ঠিক জানতে পারলে আর কালোও থাকে না, ছোটও থাকে না। সে অনেক দূরের কথা, সমাধিস্থ না হ'লে হয় না। যতক্ষণ আমি তুমি আছে, ততক্ষণ নাম-রূপও আছে। তাঁরই সব লীলা। আমি তুমি যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ তিনি নানারূপে প্রকাশ হন।

শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ, শ্রীমতী তাঁর শক্তি—আদ্যাশক্তি। পুরুষ আর প্রকৃতি। যুগল মূর্তির মানে কি? পুরুষ আর প্রকৃতি অভেদ, তাঁদের ভেদ নাই। পুরুষ, প্রকৃতি না হ'লে থাকতে পারে না; প্রকৃতিও পুরুষ না হ'লে থাকতে পারে না। একটি বললেই আর একটি তার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে হবে। যেমন অগ্নি আর দাহিকা শক্তি। দাহিকা শক্তি ছাড়া অগ্নিকে ভাবা যায় না। আর অগ্নি ছাড়া দাহিকা শক্তি ভাবা যায় না। তাই যুগলমূর্তিতে শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টি শ্রীমতীর দিকে, ও শ্রীমতীর দৃষ্টি কৃষ্ণের দিকে। শ্রীমতীর গৌর বর্ণ বিদ্যুতের মতো; শ্রীমতী নীলাম্বর পরেছেন। আর শ্রীমতী নীলকান্ত মণি দিয়ে অঙ্গ সাজিয়েছেন। শ্রীমতীর পায়ে নূপুর তাই শ্রীকৃষ্ণ নূপুর পরেছেন; অর্থাৎ প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের অন্তরে বাহিরে মিল।

রাধাকৃষ্ণ লীলার অর্থ। কথাটা এই, তাঁকে ভালবাসা, তাঁর মাধুর্য আস্বাদন করা। তিনি রস, ভক্ত রসিক, সেই রস পান করে। তিনি পদ্ম, ভক্ত অলি। ভক্ত পদ্মের মধু পান করে।

ভক্ত যেমন ভগবান না হ'লে থাকতে পারে না, ভগবানও ভক্ত না হলে থাকতে পারেন না। তখন ভক্ত হন রস, ভগবান হন রসিক, ভক্ত হন পদ্ম, ভগবান হন অলি। তিনি নিজের মাধুর্য আস্বাদন করবার জন্য দুটি হয়েছেন, তাই রাধা-কৃষ্ণ লীলা।

রাধিকাতত্ত্ব। রাধিকা বিশুদ্ধসত্ত্ব, প্রেমময়ী। যোগমায়ার ভিতর তিন গুণেই আছে, সত্ত্ব রজঃ তমঃ। শ্রীমতীর ভিতর বিশুদ্ধ সত্ত্ব বই আর কিছুই নাই। নরেন্দ্র এখন শ্রীমতীকে খুব মানে, সে বলে, সচ্চিদানন্দকে যদি ভালবাসতে শিখতে হয় ত রাধিকার কাছে শেখা যায়।

সচ্চিদানন্দ নিজে রসাস্বাদন করতে রাধিকার সৃষ্টি করেছেন। সচ্চিদানন্দ-কৃষ্ণের অঙ্গ থেকে রাধা বেরিয়েছেন। সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণই 'আধার' আর নিজে শ্রীমতী-রূপে 'আধেয়'—নিজের রস আস্বাদন করতে—অর্থাৎ সচ্চিদানন্দকে ভালবেসে আনন্দ সম্ভোগ করতে।

তাই বৈষ্ণবদের গ্রন্থে আছে, রাধা জন্মগ্রহণ করে চোখ খুলেন নাই; অর্থাৎ এই

ভাব যে—এ চক্ষে আর কাকে দেখব ? রাধিকাকে দেখতে যশোদা যখন কৃষ্ণকে কোলে করে গেলেন, তখন কৃষ্ণকে দেখবার জন্য রাধা চোখ খুললেন।

রাম নাম করা। রাম নাম করা বেশ। যে রাম দশরথের ছেলে, আবার জগৎ সৃষ্টি করেছেন ; আর সর্বভূতে আছেন। আর অতি নিকটে আছেন। অন্তরে বাহিরে।

'ওহি রাম দশরথকী বেটা, ওহি রাম ঘট ঘটমে লেটা,
ওহি রাম জগৎ পশেরা, ওহি রাম সব সে নিয়ারা।'

রামপ্রসাদ। গানে রামপ্রসাদ সিদ্ধ। ব্যাকুল হয়ে গান গাইলে ঈশ্বর দর্শন হয়।

রামের ইচ্ছা। কোন এক গ্রামে একটি তাঁতী থাকে। বড় ধার্মিক, সকলেই তাকে বিশ্বাস করে আর ভালবাসে। তাঁতী হাটে গিয়ে কাপড় বিক্রী করে। খরিদ্দার দাম জিজ্ঞাসা করলে বলে, রামের ইচ্ছা, সুতার দাম এক টাকা, রামের ইচ্ছা মেহন্নতের দাম চারি আনা, রামের ইচ্ছা, মুনাফা দুই আনা। কাপড়ের দাম রামের ইচ্ছা এক টাকা ছয় আনা। লোকের এত বিশ্বাস যে, তৎক্ষণাৎ দাম ফেলে দিয়ে কাপড় নিত। লোকটি ভারী ভক্ত, রাত্রিতে খাওয়াদাওয়ার পরে অনেকক্ষণ চন্ডীমন্ডপে বসে ঈশ্বরচিন্তা করে, তাঁর নামগুণ কীর্তন করে। একদিন অনেক রাত হয়েছে, লোকটির ঘুম হচ্ছে না, বসে আছে, এক একবার তামাক খাচ্ছে ; এমন সময় সেই পথ দিয়ে একদল ডাকাত ডাকাতি করতে যাচ্ছে। তাদের মুটের অভাব হওয়াতে ঐ তাঁতীকে এসে বললে, আয় আমাদের সঙ্গে—এই বলে হাত ধরে টেনে নিয়ে চললো। তারপর একজন গৃহস্থের বাড়ি গিয়ে ডাকাতি করলে। কতকগুলো জিনিস তাঁতীর মাথায দিলে। এমন সময় পুলিশ এসে পড়লো। ডাকাতেরা পালাল, কেবল তাঁতীটি মাথায় মোটসহ ধরা পড়লো। সে রাত্রি তাকে হাজতে রাখা হ'ল। পরদিন ম্যাজিষ্টার সাহেবের কাছে বিচার। গ্রামের লোক জানতে পেরে সব এসে উপস্থিত। তাঁরা সকলে বললে, 'হুজুর! এ লোক কখনও ডাকাতি করতে পারে না।' সাহেব তখন তাঁতীকে জিজ্ঞাসা করলে, 'কিগো, তোমার কি হয়েছে বল।' তাঁতী বললে, হুজুর! রামের ইচ্ছা, আমি রাত্রিতে ভাত খেলুম। তারপর রামের ইচ্ছা, আমি চন্ডীমন্ডপে বসে আছি, রামের ইচ্ছা, অনেক রাত হ'ল। আমি, রামের ইচ্ছা, তাঁর চিন্তা করছিলাম আর তাঁর নাম গুণ গান করছিলাম ; এমন সময় রামের ইচ্ছা, একদল ডাকাত সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল। রামের ইচ্ছা, তারা আমায় ধরে টেনে লয়ে গেল। রামের ইচ্ছা, তারা এক গৃহস্থের বাড়ি ডাকাতি করলে। রামের ইচ্ছা, আমার মাথায় মোট দিলে। এমন সময় রামের ইচ্ছা, পুলিশ এসে পড়ল। রামের ইচ্ছা, আমি ধরা পড়লুম। তখন রামের ইচ্ছা, পুলিশের লোকেরা হাজতে দিল। আজ সকালে রামের ইচ্ছা, হুজুরের কাছে এনেছে।'

অমন ধার্মিক লোক দেখে, সাহেব তাঁতীটিকে ছেড়ে দিবার হুকুম দিলেন। তাঁতী রাস্তায় বন্ধুদের বললে, রামের ইচ্ছা, আমাকে ছেড়ে দিয়েছে। সংসার করা, সন্ন্যাস করা, সবই রামের ইচ্ছা। তাই তাঁর উপর সব ফেলে দিয়ে সংসারে কাজ কর। তা না হ'লে আর কিই বা করবে ?

দ্রঃ আত্মসমর্পণ।

রাশ ঠেলা। হাঁ, তাঁর কৃপা হ'লে জ্ঞানের কি আর অভাব থাকে ? দেখ না, আমি ত মুখ্যু, কিছুই জানি না, তবে এ সব কথা বলে কে? আবার এ জ্ঞানের ভাণ্ডার অক্ষয়। ওদেশে ধান মাপে, 'রামে রাম', বলতে বলতে। একজন মাপে, আর যাই ফুরিয়ে আসে, আর একজন রাশ ঠেলে দেয়। তার কর্মই ঐ, ফুরালেই রাশ ঠেলে। আমিও যা কথা কয়ে যাই, ফুরিয়ে আসে আসে হয়, মা আমার অমনি তাঁর অক্ষয় জ্ঞান-ভাণ্ডারের রাশ ঠেলে দেন।

রিপু দগ্ধ হয়। দ্রঃ কামাদি রিপু দগ্ধ হয়।

রূপ-সনাতনের ভাব। 'ভাব [গম্ভীরাত্মার]' দ্রষ্টব্য।

রোক। 'বিষয়ীর রোক' দ্রষ্টব্য।

রোগ শোক। দ্রঃ টেক্স আদায়।

লক্ষণ পার্থক্য। ঘুমুবার সময় সকলের নিঃশ্বাস সমানভাবে পড়ে না। ভোগীর এক ভাবে আর ত্যাগীর অন্য ভাবে পড়ে। শৌচাদির সময় ভোগীর মূত্রের ধারা বাঁদিকে আর ত্যাগীর ডানদিকে হেলিয়ে পড়ে। যোগীর মল শূকরে ছোঁয় না। ঘুমুবার সময় জোরে নিঃশ্বাস পড়লে অল্পায়ু হয়।

দ্রঃ শরীরের লক্ষণ

লক্ষ্যভেদ। লক্ষ্য ভেদের সময় দ্রোণাচার্য অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি কি দেখতে পাচ্ছ ?—এই রাজাদের কি দেখতে পাচ্ছ ? অর্জুন বল্লেন—না। 'আমাকে দেখতে পাচ্ছ ?'—'না'—'গাছ দেখতে পাচ্ছ ?'—'না'। 'গাছের উপর পাখি দেখতে পাচ্ছ ?'—'না'। 'তবে কি দেখতে পাচ্ছ ?'—'শুধু পাখির চোখ'। যে শুধু পাখির চোখটি দেখতে পায় সেই লক্ষ্য বিঁধতে পারে।

যে কেবল দেখে, ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু, সেই চতুর। অন্য খবরে আমাদের কাজ কি ? হনুমান বলেছিল, আমি তিথি নক্ষত্র অতো জানি না—কেবল রাম চিন্তা করি।

লজ্জা ঘৃণা ভয়। ভগবানের শরণাগত হ'য়ে এখন লজ্জা, ভয় এ সব ত্যাগ কর। 'আমি হরিনামে যদি নাচি, লোকে আমায় কি বলবে'—এ সব ভাব ত্যাগ কর। লজ্জা, ঘৃণা, ভয় তিন থাকতে নয়। লজ্জা ঘৃণা ভয় জাতি অভিমান গোপন ইচ্ছা এ সব পাশ। এ সব গেলে জীবের মুক্তি হয়।

লক্ষ্মীছাড়া। ছেঁড়া কাপড়, ছেঁড়া জুতা ইত্যাদি ব্যবহারে মানুষ লক্ষ্মীছাড়া ও হতশ্রী হয়।

লাল চুসী। দ্রঃ আদিকাণ্ড।

লীলা ও নিত্য। ওঙ্কার ধ্বনি দ্রষ্টব্য।

লীলা : সব নিয়ে। এ সংসার তাঁর লীলা, খেলার মতো। এই লীলায় সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্য, জ্ঞান অজ্ঞান, ভাল মন্দ, সব আছে। দুঃখ পাপ এ সব গেলে লীলা চলে না। তাঁর ইচ্ছা যে তিনি এইসব নিয়ে খেলা করেন। চোর চোর খেলায় বুড়িকে আগে থাকতে ছুঁলে দৌড়াদৌড়ি করতে হয় না, সকলেই যদি ছুঁয়ে ফেলে, খেলা কেমন করে হয় ? সকলেই ছুঁয়ে ফেললে বুড়ি অসন্তুষ্ট হয়।

খেলা চললে বুড়ির আহ্লাদ।

লেকচার। হাজার লেকচার দাও বিষয়ী লোকদের কিছু করতে পারবে না। পাথরের দেওয়ালে কি পেরেক মারা যায় ? পেরেকের মাথা ভেঙ্গে যাবে তো দেওয়ালের কিছু হবে না। তরোয়ালের চোট মারলে কুমীরের কি হবে ? সাধুর কমণ্ডলু (তুম্বা) চার ধাম করে আসে কিন্তু যেমন তেঁতো তেমনি তেঁতো। তোমার লেকচারে বিষয়ী লোকদের বড় কিছু হচ্ছে না। তবে তুমি ক্রমে ক্রমে জানতে পারবে। বাছুর একবারে দাঁড়াতে পারে না। মাঝে মাঝে পড়ে যায়, আবার দাঁড়ায় ; তবে দাঁড়াতে ও চলতে শিখে।

'বিবেক বৈরাগ্য' দ্রষ্টব্য।

'লোক শিক্ষা দেওয়া 'খ' দ্রষ্টব্য।

লেকচার দেওয়া। ক. তোমাদের কলকাতার লোকের ওই এক। কেবল লেকচার দেওয়া, আর বুঝিয়ে দেওয়া। আপনাকে কে বোঝায় তার ঠিক নাই। তুমি বুঝাবার কে ? যাঁর জগৎ, তিনি বুঝাবেন। যিনি এই জগৎ করেছেন, চন্দ্র, সূর্য, ঋতু, মানুষ, জীব-জন্তু করেছেন ; জীব-জন্তুদের খাবার উপায়, পালন করবার জন্য মা-বাপ করেছেন, মা-বাপের স্নেহ করেছেন তিনিই বুঝাবেন। তিনি এত উপায় করেছেন, আর এ উপায় করবেন না ? যদি বুঝাবার দরকার হয় তিনিই বুঝাবেন।

খ. চিত্তশুদ্ধির পর ভক্তিলাভ করলে, তবে তাঁর কৃপায় তাঁকে দর্শন হয়। দর্শনের পর আদেশ পেলে তবে লোকশিক্ষা দেওয়া যায়। আগে থাকতে লেকচার দেওয়া ভাল নয়। একটা গান আছে—ভাবছো কি মন একলা বসে।

লোক পরিত্রাণ। মানুষের কি সাধ্য অপরকে সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত করে। যাঁর এই ভুবনমোহিনী মায়া, তিনিই সেই মায়া থেকে মুক্ত করতে পারেন। সচ্চিদানন্দগুরু বই আর গতি নাই। যারা ঈশ্বর লাভ করে নাই, যারা তাঁর আদেশ পায় নাই, যারা ঈশ্বরের শক্তিতে শক্তিমান হয় নাই, তাদের কি সাধ্য জীবের ভববন্ধন মোচন করে।

লোকমান্য। দ্রঃ আদিকাণ্ড।

লোকশিক্ষা। ক. যদি আদেশ হয়ে থাকে, তাহলে লোকশিক্ষায় দোষ নাই। আদেশ পেয়ে যদি কেউ লোকশিক্ষা দেয়, তাকে কেউ হারাতে পারে না।

বাগবাদিনীর কাছ থেকে যদি একটি কিরণ আসে, তাহলে এমন শক্তি হয় যে, বড় বড় পণ্ডিতগুলো কেঁচোর মতো হয়ে যায়।

প্রদীপ জ্বাললে বাদুলে পোকাগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে আপনি আসে—ডাকতে হয় না। তেমনি যে আদেশ পেয়েছে, তাব লোক ডাকতে হয় না ; অমুক সময়ে লেকচার হবে বলে, খবর পাঠাতে হয় না। তার নিজের এমনি টান যে লোক তাঁর কাছে আপনি আসে। তখন রাজা, বাবু, সকলে দলে দলে আসে। আর বলতে থাকে আপনি কি লবেন ? আম, সন্দেশ, টাকা-কড়ি, শাল এই সব এনেছি ; আপনি কি লবেন ? আমি সে সকল লোককে বলি, দূর কর—আমার ও সব ভাল লাগে না, আমি কিছু চাই না।

চুম্বক পাথর কি লোহাকে বলে, তুমি আমার কাছে এস ? এস বলতে হয় না, লোহা আপনি চুম্বক পাথরের টানে ছুটে আসে।
এরূপ লোক, পণ্ডিত নয় বটে। তা' বলে মনে করো না যে তার জ্ঞানের কিছু কমতি হয়। বই পড়ে কি জ্ঞান হয় ? যে আদেশ পেয়েছে তার জ্ঞানের শেষ নাই। সে জ্ঞান ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে—ফুরায় না।
ও দেশে ধান মাপবার সময় একজন মাপে, আর একজন রাশ ঠেলে দেয়। তেমনি যে আদেশ পায় সে যত লোকশিক্ষা দিতেথাকে, মা তাহার পেছন থেকে জ্ঞানের রাশ ঠেলে ঠেলে দেন। জ্ঞান আর ফুরায় না।
মার যদি একবার কটাক্ষ হয়, তাহলে কি জ্ঞানের অভাব থাকে ?
খ. ভগবতী নিজে—পঞ্চমুণ্ডীর উপরে বসে কঠোর তপস্যা করছিলেন—লোক-শিক্ষার জন্য। শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম, তিনিও রাধাযন্ত্র কুড়িয়ে পেয়ে লোক-শিক্ষার জন্য তপস্যা করেছিলেন।
দ্রঃ কর্ম আর কেন ? থিয়েটার আর করা কেন ?

লোকশিক্ষা ও অহংকার। আদেশ না থাকলে 'আমি লোকশিক্ষা দিচ্ছি' এই অহংকার হয়। অহংকার হয় অজ্ঞানে। অজ্ঞানে বোধ হয়, আমি কর্তা। ঈশ্বরই কর্তা, ঈশ্বরই সব করছেন, আমি কিছু করছি না, এ বোধ হলে তো সে জীব-ন্মুক্ত। 'আমি কর্তা আমি কর্তা', এই বোধ থেকেই যত দুঃখ, অশান্তি।

লোকশিক্ষা ও চাপরাস। চাপরাস ও লোকশিক্ষা দেখ।

লোকশিক্ষা দানের শক্তি। কেউ কেউ জ্ঞানলাভের পর লোকশিক্ষার জন্য কর্ম করে, যেমন জনক ও নারদাদি। লোকশিক্ষার জন্য শক্তি থাকা চাই। ঋষিরা নিজের জ্ঞানের জন্য বিচরণ করে বেড়াতেন। তাঁরা বীরপুরুষ।
হাবাতে কাঠ যখন ভেসে যায়, পাখী একটি বসলে ডুবে যায়, কিন্তু বাহাদুরী যখন ভেসে যায়, তখন গরু, মানুষ, এমন কি হাতী পর্যন্ত তার উপর যেতে পারে। স্টীমবোট আপনিও পারে যায়, আবার কত মানুষকে পার করে দেয়।
নারদাদি আচার্য বাহাদুরী কাঠের মতো, স্টীমবোট-এর মতো।
কেউ খেয়ে গামছা দিয়ে মুখ মুছে থাকে, পাছে কেউ টের পায়। (সকলের হাস্য)। আবার কেউ কেউ একটা আম পেলে কেটে একটু একটু সকলকে দেয়, আর আপনিও খায়।
নারদাদি আচার্য সকলের মঙ্গলের জন্য জ্ঞান লাভের পরও ভক্তি লয়েছিলেন।

লোকশিক্ষা দেওয়া। ক. লোকশিক্ষা দেওয়া বড় কঠিন। যদি তিনি সাক্ষাৎকার হন আর আদেশ দেন, তাহলে হতে পারে। নারদ শুকদেবাদির আদেশ হয়েছিল। শংকরের আদেশ হয়েছিল। আদেশ না হলে কে তোমার কথা শুনবে ? আবার মনে মনে আদেশ হলে হয় না। তিনি সত্য-সত্যই সাক্ষাৎকার হন, আর কথা কন। তখন আদেশ হতে পারে। সে কথার জোর কত। পর্বত টলে যায়। শুধু লেকচার ? দিন কতক লোক শুনবে, তারপর ভুলে যাবে। সে কথার অনু-সারে কাজ করবে না।
খ. কেউ ডুব দিতে চায় না। সাধন নাই ভজন নাই, বিবেক-বৈরাগ্য নাই, দু-

চারটে কথা শিখেই অমনি লেকচার !

লোকশিক্ষা দেওয়া কঠিন।…ভগবানকে দর্শনের পর যদি কেউ তাঁর আদেশ পায়, তা হলে লোকশিক্ষা দিতে পারে।

ল্যাজখসা। যখন কেশব সেনকে বাগানে প্রথম দেখলুম, বলেছিলাম—এরই ল্যাজ খসেছে। সভাশুদ্ধ লোক হেসে উঠলো। কেশব বললে, তোমরা হেসো না, এর কিছু মানে আছে, এঁকে জিজ্ঞাসা করি। আমি বললাম, যতদিন বেঙাচির ল্যাজ না খসে, ততদিন কেবল জলে থাকতে হয়, আড়ায় উঠে ডাঙ্গায় বেড়াতে পারে না ; যেই ল্যাজ খসে, অমনি লাফ দিয়ে ডাঙ্গায় পড়ে। তখন জলেও থাকে, আবার ডাঙ্গায়ও থাকে। তেমনি মানুষের যতদিন অবিদ্যার ল্যাজ না খসে, ততদিন সংসার জলে পড়ে থাকে। অবিদ্যার ল্যাজ খসলে—অজ্ঞান হলে, তবে মুক্ত হয়ে বেড়াতে পারে, আবার ইচ্ছা হলে সংসারে থাকতে পারে।

শক্তি। 'ব্রহ্ম ও শক্তি' দেখ।

ব্রহ্মা ও কালী দ্রষ্টব্য।

শক্তি পূজার পদ্ধতি। শক্তিই জগতের মূলাধার। সেই আদ্যাশক্তির ভিতরে বিদ্যা ও অবিদ্যা দুই আছে—অবিদ্যা—মুগ্ধ করে। অবিদ্যা—যা থেকে কামিনী-কাঞ্চন—মুগ্ধ করে। বিদ্যা—যা থেকে ভক্তি, দয়া, জ্ঞান, প্রেম ঈশ্বরের পথে ল'য়ে যায়।

সেই অবিদ্যাকে প্রসন্ন করতে হবে। তাই শক্তির পূজা পদ্ধতি।

তাঁকে প্রসন্ন করবার জন্য নানাভাবে পূজো—দাসী ভাব, বীর ভাব, সন্তান ভাব। বীরভাব—অর্থাৎ রমণ দ্বারা তাঁকে প্রসন্ন করা।

শক্তি সাধনা—সব ভারী উৎকট সাধনা ছিল, চালাকি নয়।

শক্তি বিশেষ। ক. যা কিছু দেখছ, সবই তাঁর শক্তি। তাঁর শক্তি ব্যতিরেকে কারু কিছু করবার জো নাই। তবে একটি কথা আছে, তাঁর শক্তি সব স্থানে সমান নয়। বিদ্যাসাগর বলেছিল, 'ঈশ্বর কি কারুকে বেশী শক্তি দিয়েছেন ?' আমি বললুম, শক্তি কম বেশী যদি না দিয়ে থাকেন, তোমায় আমরা দেখতে এসেছি কেন ? তোমার কি দুটো শিং বেরিয়েছে ? তবে দাঁড়ালো যে, ঈশ্বর বিভুরূপে সর্বভূতে আছেন ; কেবল শক্তিবিশেষ।

খ. শক্তি মানতে হয়। বিদ্যাসাগর বললে, তিনি কি কারুকে বেশী শক্তি দিয়েছেন ? আমি বললাম, তবে একজন লোক একশ' জনকে মারতে পারে কেন ? কুইন ভিক্টোরিয়ার এত মান, নাম কেন—যদি শক্তি না থাকতো ? আমি বললাম, তুমি মানো কি না ? তখন বলে, 'হাঁ মানি।'

শক্তির অভেদ। পূর্ণ জ্ঞানের পর অভেদ। যেমন মণির জ্যোতিঃ আর মণি, অভেদ। মণির জ্যোতিঃ ভাবলেই মণি ভাবতে হয়। দুধ আর দুধের ধবলত্ব অভেদ। একটাকে ভাবলেই আর একটাকে ভাবতে হয়। কিন্তু এ অভেদ জ্ঞান—পূর্ণজ্ঞান না হ'লে হয় না। পূর্ণজ্ঞানে সমাধি হয়, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব ছেড়ে চ'লে যায়—তাই অহংতত্ত্ব থাকে না। সমাধিতে কি বোধ হয় মুখে বলা যায়

না। নেমে একটু আভাসের মতো বলা যায়। যখন সমাধি ভঙ্গের পর 'ও' ও'' বলি, আমি একশো হাত নেমে এসেছি। ব্রহ্ম বেদবিধির পার, মুখে বলা যায় না। সেখানে 'আমি' 'তুমি' নাই।

যতক্ষণ 'আমি' 'তুমি' আছে, যতক্ষণ 'আমি প্রার্থনা কি ধ্যান করছি' এ জ্ঞান আছে, ততক্ষণ 'তুমি' (ঈশ্বর) প্রার্থনা শুনছো, এ জ্ঞানও আছে; ঈশ্বরকে ব্যক্তি ব'লে বোধ আছে। তুমি প্রভু, আমি দাস ; তুমি পূর্ণ, আমি অংশ ; তুমি মা, আমি ছেলে ; এ বোধ থাকবে। এই ভেদ বোধ ; আমি একটি, তুমি একটি। এ ভেদ বোধ তিনিই করাচ্ছেন। তাই পুরুষ-মেয়ে আলো-অন্ধকার, এই সব বোধ হচ্ছে। যতক্ষণ এই ভেদ বোধ, ততক্ষণ শক্তি (Personal God) মানতে হবে। তিনিই আমাদের ভিতর 'আমি' রেখে দিয়েছেন। হাজার বিচার কর, 'আমি' আর যায় না। আর তিনি ব্যক্তি হয়ে দেখা দেন।

তাই যতক্ষণ 'আমি' আছে—ভেদবুদ্ধি আছে—ততক্ষণ ব্রহ্ম নির্গুণ বলবার যো নাই। ততক্ষণ সগুণব্রহ্ম মানতে হবে। এই সগুণ ব্রহ্মকে বেদ, পুরাণ, তন্ত্রে কালী বা আদ্যাশক্তি বলে গেছে।

দ্রঃ আদ্যাশক্তি, ভক্তের ভগবান।

শক্তির এলাকা। 'সমাধি' দেখ।

শক্তির তারতম্য। তিনি সর্বত্র আছেন। তবে একটা কথা আছে—শক্তিবিশেষ। তিনি কোনখানে অবিদ্যাশক্তির প্রকাশ, কোনখানে বিদ্যাশক্তির। কোন আধারে শক্তি বেশী, কোন আধারে শক্তি কম। তাই সব মানুষ সমান নয়।

শক্তির লীলাতেই অবতার। যিনিই ব্রহ্ম তিনিই শক্তি। তাঁকেই মা বলে ডাকি। যখন তিনি নিষ্ক্রিয় তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলি, আবার যখন সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার কার্য করেন, তখন তাঁকে শক্তি বলি। যেমন স্থির জল, আর জলে ঢেউ হয়েছে। শক্তিলীলাতেই অবতার। অবতার প্রেমভক্তি শিখাতে আসেন। অবতার যেন গাভীর বাঁট। দুগ্ধ বাঁটের থেকেই পাওয়া যায়।

মানুষে তিনি অবতীর্ণ হন। যেমন ঘুঁটির ভিতর মাছ এসে জমে।

দ্রঃ অবতার।

শঙ্করাচার্য। শঙ্করাচার্য এদিকে ব্রহ্মজ্ঞানী ; আবার প্রথম প্রথম ভেদ-বুদ্ধিও ছিল। তেমন বিশ্বাস ছিল না। চন্ডাল মাংসের ভাঁড় লয়ে আসছে, উনি গঙ্গা-স্নান করে উঠেছেন। চন্ডালের গায়ে গা লেগে গেছে। বলে উঠলেন, এই তুই আমায় ছুঁলি। চন্ডাল বললে, ঠাকুর, তুমিও আমায় ছোঁও নাই, আমিও তোমায় ছুঁই নাই। যিনি শুদ্ধ আত্মা, তিনি শরীর ন'ন, পঞ্চভূত ন'ন, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব ন'ন। তখন শঙ্করের জ্ঞান হয়ে গেল।

শম্ভু মল্লিক। শম্ভু মল্লিক হাসপাতাল, ডাক্তারখানা, স্কুল, রাস্তা, পুষ্করিণীর কথা বলেছিল। আমি বললাম, সম্মুখে যেটা পড়লো, না করলে নয়, সেইটাই নিষ্কাম হয়ে করতে হয়। ইচ্ছা করে বেশী কাজ জড়ানো ভালো নয়, ঈশ্বরকে ভুলে যেতে হয়। কালীঘাটে দানই করতে লাগলো ; কালীদর্শন আর হ'ল না। (হাস্য)। আগে যো সো করে ধাক্কাধুক্কি খেয়েও কালীদর্শন করতে হয়, তার-

পর দান যত করো আর নাকরো। ইচ্ছা হয় খুব করো। ঈশ্বর লাভের জন্যই কর্ম। শম্ভুকে তাই বললুম, যদি ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হয়, তাঁকে কি বলবে কতকগুলো হাসপাতাল, ডিস্পেনসারি করে দাও? (হাস্য)। ভক্ত কখনও তা বলে না। বরং বলবে, 'ঠাকুর! আমায় পাদপদ্মে স্থান দাও, নিজের সঙ্গে সর্বদা রাখো, পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি দাও।'

দ্রঃ বিশ্বাসের জোর। আদিকান্ড। দয়া (ইংরাজী মতে)। অনাসক্তি।

শরীরের লক্ষণ। ১. শরীরের লক্ষণ দেখে অনেকটা বুঝা যায়, তার হবে কি না। খল হলে হাত ভারি হয়। নাক টেপা হওয়া ভাল নয়। শম্ভুর নাকটি টেপা ছিল। তাই অত জ্ঞান থেকেও তত সরল ছিল না। উনপাঁজুরে লক্ষণ ভাল নয়। আর হাড় থেকে কনুয়ের গাঁট মোটা, হাত ছিনে। আর বিড়াল চক্ষু—বিড়ালের মতো কটা চোখ। ঠোঁট—ডোমের মতো হলে নীচু বুদ্ধি হয়। বিষ্ণুঘরের পুরুত কয়মাস একটিং কর্মে এসেছিল। তার হাতে খেতুম না—হঠাৎ মুখ দিয়ে বলে ফেলেছিলুম, 'ও ডোম'। তারপর সে একদিন বললে, 'হাঁ, আমাদের ঘর ডোম পাড়ায়। আমি ডোমের বাসন, চাঙ্গারী বুনতে পারি।' আরো খারাপ লক্ষণ—এক চক্ষু আর ট্যারা। বরং এক চক্ষু কানা ভাল, তো ট্যারা ভাল নয়। ভারি দুষ্ট আর খল হয়।

২. চলনেতে লক্ষণ ভাল মন্দ টের পাওয়া যায়। পুরুষাঙ্গের উপর চামড়াটি মুসলমানদের মতো যদি কাটা হয়, সে একটি খারাপ লক্ষণ। আবার পুরুষ মেয়ের অন্য অন্য লক্ষণ আছে। খারাপ লক্ষণ, ট্যারা, চোখ কোটর, উন পাঁজর, বিড়াল চোখ, বাছুরে গাল (তোবড়ান গাল) বেঁটে, ডোর কাটা কাটা গা, ভাল লক্ষণ নয়। অনেক দেরিতে জ্ঞান হয়। মুখ থ্যাবড়ানো লক্ষণ তত ভাল নয়। নষ্ট মেয়ে বুঝতে পারতুম। বিধবা সোজা সিঁতে কেটেছে, আর খুব অনুরাগের সহিত গায়ে তেল মাখছে। লজ্জা কম, বসবার রকমই আলাদা। যাদের পশ্চাদ্‌ভাগ ডেঁয়ো পিঁপড়ের পশ্চাদ্ভাগের মতো উঁচু, তাদের কামপ্রবৃত্তি বেশি হয়। সর্বত্যাগীর চেহারা শুষ্ক।

শরীরের লক্ষণ ও স্বভাব। পুরুষের পদ্মপত্রের মতো চোখ হলে অন্তরে সদ্ভাব ও সাধুভাব থাকে। বৃষের ন্যায় চোখ হলে কাম প্রবল হয়। যোগীর চোখ ঊর্ধ্বদৃষ্টি ও তাতে লাল আভা থাকে। দেবচক্ষু বেশি বড় হয় না, কিন্তু আকর্ণ টানা। কারও সঙ্গে কথা কইতে কইতে আড়চোখে চাওয়া কিম্বা সমস্ত শরীর দেখা যাদের স্বভাব, তারা সাধারণ মানুষের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান। ভক্তের শরীর সাধারণতঃ নরম ও হাত পায়ের গাঁটগুলি শিথিল হয়—সেগুলো সহজে ঘুরান ফিরান যায়। রোগা হলেও শরীরের হাড় ও শিরাগুলি এমন ভাবে থাকে যে তাতে বেশি কোণ দেখা যায় না।

শান্তি। ব্রহ্মজ্ঞান হলে সংসারাসক্তি, কামিনী-কাঞ্চনে উৎসাহ—সব চলে যায়। সব শান্তি হয়ে যায়। কাঠ পোড়বার সময় অনেক পড়্ পড়্ শব্দ আর আগুনের ঝাঁজ। যখন সব শেষ হয়ে গেল, ছাই পড়ল—তখন আর শব্দ থাকে না। আসক্তি গেলেই উৎসাহ যায়—শেষে শান্তি।

ঈশ্বরের যত নিকটে এগিয়ে যাবে ততই শান্তি। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ প্রশান্তিঃ। গঙ্গার যত নিকটে যাবে ততই শীতল বোধ হবে। স্নান করলে আরও শান্তি।

শালগ্রাম। তিনিই এই সব হয়েছেন, কোন কোন জিনিসে বেশী প্রকাশ।

শালগ্রাম তোমরা বুঝি মান না—ইংলিশম্যানরা মানে না। তা তোমরা মানো আর নাই মানো। সুলক্ষণ শালগ্রাম—বেশ চক্র থাকবে—গোমুখী আর আর সব লক্ষণ থাকবে—তা হলে ভগবানের পূজা হয়।

শাস্ত্র। শাস্ত্রের ভিতর কি ঈশ্বরকে পাওয়া যায়? শাস্ত্র পড়ে হদ্দ অস্তিমাত্র বোধ হয়। কিন্তু নিজে ডুব না দিলে ঈশ্বর দেখা দেন না। ডুব দেবার পর তিনি নিজে জানিয়ে দিলে তবে সন্দেহ দূর হয়। বই হাজার পড়, মুখে হাজার শ্লোক বল, ব্যাকুল হয়ে তাঁতে ডুব না দিলে তাঁকে ধরতে পারবে না। শুধু পাণ্ডিত্যে মানুষকে ভোলাতে পারবে, কিন্তু তাঁকে পারবে না।

শাস্ত্র, বই শুধু, এ সব তাতে কি হবে? তাঁর কৃপা না হলে কিছু হবে না; যাতে তাঁর কৃপা হয়, ব্যাকুল হয়ে তার চেষ্টা করো; কৃপা হলে তাঁর দর্শন হবে। তিনি তোমাদের সঙ্গে কথা কইবেন।

'বইশাস্ত্র উপায় বলে' দ্রষ্টব্য।

শাস্ত্রপাঠ ও ঈশ্বর দর্শন। শাস্ত্র কত পড়বে? শুধু বিচার করলে কি হবে? আগে তাঁকে লাভ করবার চেষ্টা কর, গুরুবাক্যে বিশ্বাস করে কিছু কর্ম কর। গুরু না থাকেন, তাঁকে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা কর, তিনি কেমন—তিনিই জানিয়ে দিবেন।

বই পড়ে কি জানবে? যতক্ষণ না হাটে পৌঁছান যায় ততক্ষণ দূর হতে কেবল হো হো শব্দ। হাটে পৌঁছলে আর এক রকম। তখন স্পষ্ট দেখতে পাবে, শুনতে পাবে। 'আলু নাও' 'পয়সা দাও' স্পষ্ট শুনতে পাবে।

সমুদ্র দূর হতে হো হো শব্দ করছে। কাছে গেলে কত জাহাজ যাচ্ছে, পাখী উড়ছে, ঢেউ হচ্ছে—দেখতে পাবে।

বই পড়ে ঠিক অনুভব হয় না। অনেক তফাত। তাঁকে দর্শনের পর বই, শাস্ত্র, সায়েন্স সব খড়কুটো বোধ হয়।

বড়বাবুর সঙ্গে আলাপ দরকার। তাঁর কখানা বাড়ি, কটা বাগান, কত কোম্পানীর কাগজ, এ আগে জানবার জন্য অত ব্যস্ত কেন? চাকরদের কাছে গেলে তারা দাঁড়াতেই দেয় না—কোম্পানির কাগজের খবর কি দিবে! কিন্তু যো-সো করে বড়বাবুর সঙ্গে একবার আলাপ কর, ধাক্কা খেয়েই হোক, আর বেড়া ডিঙ্গিয়েই হোক—তখন কত বাড়ি, কত বাগান, কত কোম্পানীর কাগজ, তিনিই বলে দেবেন। বাবুর সঙ্গে আলাপ হলে আবার চাকর, দ্বারবান সব সেলাম করবে।

শাস্ত্রাদি নিয়ে বিচার কতদিন। শাস্ত্রাদি নিয়ে বিচার কতদিন? যতদিন না ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার হয়। ভ্রমর গুন গুন করে কতক্ষণ? যতক্ষণ ফুলে না বসে। ফুলে বসে মধুপান করতে আরম্ভ করলে আর শব্দ নাই।

তবে একটি আছে, ঈশ্বরকে দর্শনের পরও কথা চলতে পারে। সে কথা কেবল

ঈশ্বরেরই আনন্দের কথা—যেমন মাতালের 'জয় কালী' বলা। আর ভ্রমর ফুলে বসে মধুপান করার পর আধ আধ স্বরে গুন গুন করে।

শাস্ত্রের অর্থ। শাস্ত্রের দুই রকম অর্থ—শব্দার্থ ও মর্মার্থ। মর্মার্থটুকু লতে হয়; যে অর্থ ঈশ্বরের বাণীর সঙ্গে মিলে। চিঠির কথা, আর যে ব্যক্তি চিঠি লিখেছে তার মুখের কথা, অনেক তফাত। শাস্ত্র হচ্ছে চিঠির কথা; ঈশ্বরের বাণী মুখের কথা। আমি মার মুখের কথার সঙ্গে না মিললে কিছুই লই না।

(নানা) শাস্ত্রের আয়োজন। দ্রঃ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।

শাস্ত্রের মানে। সাধন না করলে শাস্ত্রের মানে বোঝা যায় না। সিদ্ধি সিদ্ধি বল্লে কি হবে? পণ্ডিতেরা শ্লোক সব ফড়র ফড়র করে বলে—কিন্তু তাতে কি হবে? সিদ্ধি গায় মাখলেও নেশা হয় না—খেতে হয়।

শুধু বল্লে কি হবে 'দুধে আছে মাখন', 'দুধে আছে মাখন'? দুধকে দই পেতে মন্থন কর—তবে ত হবে।

শাঁখ বাজান। দ্রঃ হৃদয়মন্দির।

শিব ও রামের যুদ্ধ। 'আপন লোকের যুদ্ধ' দেখ।

শিবপূজা। শিবপূজার ভাব কি জান? শিবলিঙ্গের পূজা, মাতৃস্থানের ও পিতৃস্থানের পূজা। ভক্ত এই বলে পূজা করে, ঠাকুর দেখো যেন আর জন্ম না হয়। শোণিত-শুক্রের মধ্য দিয়া মাতৃস্থান দিয়া আর যেন আসতে না হয়।

শিবনাথ শাস্ত্রী। শিবনাথকে দেখলে আমার বড় আনন্দ হয়, যেন ভক্তিরসে ডুবে আছে; আর যাকে অনেকে গুণে-মানে, তাতে নিশ্চয়ই ঈশ্বরের কিছু শক্তি আছে। তবে শিবনাথের একটা ভারী দোষ আছে—কথার ঠিক নাই। আমাকে বলেছিল যে একবার ওখানে (দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়িতে) যাবে কিন্তু যায় নাই, আর কোন খবরও পাঠায় নাই, ওটা ভাল নয়।

দেখ শিবনাথের ভারী ঝঞ্ঝাট। খবরের কাগজ লিখতে হয়, আর অনেক কর্ম করতে হয়। বিষয়-কর্ম করলেই অশান্তি হয়, অনেক ভাবনা-চিন্তা জোটে।

দ্রঃ ভক্তিসার। ঈশ্বরচিন্তায় কি বেহেড হয়?

শিয়ালদহ। 'জ্ঞানদীপ' দ্রষ্টব্য।

শিশুর কান্না। ছেলে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে কেন কাঁদে? 'গর্ভে ছিলাম, যোগে ছিলাম।' ভূমিষ্ঠ হয়ে এই বলে কাঁদে—কাঁহা এ কাঁহা এ; এ কোথায় এলুম, ঈশ্বরের পাদপদ্ম চিন্তা ক'রছিলাম, এ আবার কোথায় এলাম।

শুকদেব। দ্রঃ 'ব্রহ্মজ্ঞান ও শুকদেব', 'গুরুশিষ্যবোধ। ঈশ্বরকোটি।

শুচিবাই। শুচিবাই, ছেড়ে দাও। যাদের শুচিবাই, তাদের জ্ঞান হয় না। আচার যতটুকু দরকার, ততটুকু করবে। বেশী বাড়াবাড়ি করো না। শুচিবাইগ্রস্ত লোকদের কেবল অশুদ্ধ বিচার করতে গিয়ে সর্বদা একটা অশুচির ভাব থেকে যায়। তাই ঈশ্বর চিন্তা তাদের মধ্যে ঢোকা বড় কঠিন।

শুচিবায় (বাতিক)—আর দেখ, বেশী আচার করো না। একজন সাধুর আচার করো না। একজন সাধুর বড় জলতৃষ্ণা পেয়েছে, ভিস্তি জল নিয়ে যাচ্ছিল সাধুকে জল দিতে চাইলে। সাধু বললে, তোমার ডোল (চামড়ার মোশক)

কি পরিষ্কার ? ভিস্তি বললে, মহারাজ, আমার ডোল খুব পরিষ্কার, কিন্তু তোমার ডোলের ভিতর মলমূত্র অনেক রকম ময়লা আছে। তাই বলছি, আমার ডোল থেকে জল খাও, এতে দোষ হবে না। তোমার ডোল অর্থাৎ তোমার দেহ, তোমার পেট !

শুদ্ধসত্ত্ব। যদি কারো শুদ্ধসত্ত্ব (গুণ) আসে, সে কেবল ঈশ্বর চিন্তা করে, তার আর কিছুই ভাল লাগে না। কেউ কেউ প্রারব্ধের গুণে জন্ম থেকে শুদ্ধ সত্ত্বগুণ পায়। কামনাশূন্য হ'য়ে কর্ম ক'রতে চেষ্টা করলে, শেষে শুদ্ধসত্ত্ব লাভ হয়। রজোমিশান সত্ত্বগুণ থাকলে ক্রমে নানা দিকে মন হয়, তখন জগতের উপকার ক'রবো এই সব অভিমান এসে জোটে। জগতের উপকার এই সামান্য জীবের পক্ষে করতে যাওয়া বড় কঠিন। তবে যদি কেউ পরোপকারের জন্য কামনাশূন্য হয়ে কর্ম করে, তাতে দোষ নাই ; একে নিষ্কাম কর্ম বলে। এরূপ কর্ম ক'রতে চেষ্টা করা খুব ভাল। কিন্তু সকলে পারে না। বড় কঠিন। সকলেরই কর্ম ক'রতে হবে; দু-একটি লোক কর্ম ত্যাগ করতে পারে। দু-একজন লোকের শুদ্ধসত্ত্ব দেখতে পাওয়া যায়। এই নিষ্কাম কর্ম ক'রতে ক'রতে রজো-মিশান সত্ত্বগুণ ক্রমে শুদ্ধসত্ত্ব হ'য়ে দাঁড়ায়।

শুদ্ধসত্ত্ব হ'লেই ঈশ্বরলাভ তাঁর কৃপায় হয়।

সাধারণ লোকে এই শুদ্ধসত্ত্বের অবস্থা বুঝতে পারে না

শুদ্ধাত্মা। তুমি শুদ্ধাত্মাকে ঈশ্বর বল কেন ? শুদ্ধাত্মা নিষ্ক্রিয়, তিন অবস্থায় সাক্ষিস্বরূপ যখন সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় কার্য ভাবি তখন তাঁকে ঈশ্বর বলি। শুদ্ধাত্মা কিরূপ—যেমন চুম্বক পাথর অনেক দূরে আছে, কিন্তু ছুঁচ নড়ছে—চুম্বকপাথর চুপ করে আছে, নিষ্ক্রিয়।

শুদ্ধাভক্তি। ঈশ্বরেতে শুদ্ধা ভক্তি যদি না হয়, তা হলে কোন গতি নাই। কেউ যদি ঈশ্বরলাভ করে সংসারে থাকে, তার কোন ভয় নাই। নির্জনে মাঝে মাঝে সাধন করে কেউ যদি শুদ্ধা ভক্তি লাভ করতে পারে, সংসারে থাকলে তার কোন ভয় নাই। চৈতন্যদেবের সংসারী ভক্তও ছিল। তারা সংসারে নামমাত্র থাকত। অনাসক্ত হয়ে থাকতো।

দ্রঃ ধর্মাধর্ম ত্যাগ করলে কি বাকী থাকে ? এবং আত্মকথার অন্তর্গত 'শুদ্ধাভক্তির প্রার্থনা' ও কলাইয়ের ডালের খদ্দের। ভক্তি [অহৈতুকী ও শুদ্ধা] দ্রষ্টব্য

শুদ্ধা ভক্তির প্রার্থনা। আমি মা'র কাছে একমাত্র ভক্তি চেয়েছিলাম। মা'র পাদ-পদ্মে ফুল দিয়ে হাত জোড় করে বলেছিলাম, 'মা, এই লও তোমার অজ্ঞান, এই লও তোমার জ্ঞান, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও। এই লও তোমার শুচি, এই লও তোমার অশুচি, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও। এই লও তোমার পাপ, এই লও তোমার পুণ্য, আমায় শুদ্ধ ভক্তি দাও। এই লও তোমার ভাল, এই লও তোমার মন্দ, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও। এই লও তোমার ধর্ম, এই লও তোমার অধর্ম, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও।'

শুনা। 'পড়া-শুনা-বোঝা' দ্রষ্টব্য।

শূন্য ও এক। জীব জগৎ—চতুর্বিংশতি তত্ত্ব—এ সব, তিনি আছেন বলে সব

আছে। তাঁকে বাদ দিলে কিছুই থাকে না। ১-এর পিঠে অনেক শূন্য দিলে সংখ্যা বেড়ে যায়। ১-কে পুঁছে ফেললে শূন্যের কোনও পদার্থ থাকে না।

শোক। তা শোক হবে না গা? আত্মজ! রাবণ বধ হ'ল; লক্ষ্মণ দৌড়িয়ে গিয়ে দেখলেন। দেখেন যে, হাড়ের ভিতর এমন জায়গা নাই—যেখানে ছিদ্র নাই। তখন বললেন, রাম! তোমার বাণের কি মহিমা! রাবণের শরীরের এমন স্থান নাই, যেখানে ছিদ্র না হয়েছে! তখন রাম বললেন, ভাই হাড়ের ভিতর যে সব ছিদ্র দেখছ, ও বাণের জন্য নয়। শোকে তার হাড় জরজর হয়েছে। ঐ ছিদ্র-গুলি সেই শোকের চিহ্ন। হাড় বিদীর্ণ করেছে।

শোক করে কি হবে। কি জান, ঈশ্বরই সত্য আর সব অনিত্য। জীব, জগৎ, বাড়ি-ঘর-দ্বার, ছেলেপিলে, এ সব বাজীকরের ভেলকি। বাজীকর কাঠি দিয়ে বাজনা বাজাচ্ছে, আর বলছে, লাগ লাগ লাগ। ঢাকা খুলে দেখ, কতকগুলো পাখী আকাশে উড়ে গেল। কিন্তু বাজীকরই সত্য, আর সব অনিত্য। এই আছে, এই নাই!

কৈলাসে শিব বসে আছেন, নন্দী কাছে আছেন। এমন সময় একটা ভারী শব্দ হ'ল। নন্দী জিজ্ঞাসা করলে, ঠাকুর! এ কিসের শব্দ হ'ল? শিব বললেন, রাবণ জন্মগ্রহণ করলে, তাই শব্দ। খানিক পরে আবার একটি ভয়ানক শব্দ হ'ল। নন্দী জিজ্ঞাসা করলে—এবার কিসের শব্দ? শিব হেসে বললেন, এবার রাবণ বধ হ'ল! জন্ম-মৃত্যু—এ সব ভেলকির মতো! এই আছে, এই নাই! ঈশ্বরই সত্য আর সব অনিত্য। জলই সত্য, জলের ভুড়ভুড়ি, এই আছে, এই নাই; ভুড়ভুড়ি জলে মিশে যায় —যে জলে উৎপত্তি সে জলেই লয়।

ঈশ্বর যেন মহাসমুদ্র, জীবেরা যেন ভুড়ভুড়ি; তাঁতেই জন্ম, তাঁতেই লয়।

ছেলেমেয়ে—যেমন একটা বড় ভুড়ভুড়ি সঙ্গে পাঁচ-ছটা ছোট ভুড়ভুড়ি।

ঈশ্বরই সত্য। তাঁর উপরে কিরূপে ভক্তি হয়, তাঁকে কেমন করে লাভ করা যায়, এখন এই চেষ্টা করো। শোক করে কি হবে?

শ্যামরূপ। কালীরূপ ও বর্ণ দেখ।

শ্যামার স্বরূপ / শ্যামার রং কালো। সে দূর বলে। কাছে গেলে কোন রঙ নাই। দীঘির জল দূর থেকে কাল দেখায়, কাছে গিয়ে হাতে করে তোল, কোন রঙ নাই। ঈশ্বরের যত কাছে যাবে ততই ধারণা হবে, তাঁর নাম, রূপ নাই। পোঁছিয়ে একটু দূরে এলে আবার 'আমার শ্যামা মা!' যেন ঘাসফুলের রঙ। শ্যামা পুরুষ না প্রকৃতি? একজন ভক্ত পূজা করেছিল। একজন দর্শন করতে এসে দেখে ঠাকুরের গলায় পৈতে। সে বললে, তুমি মার গলায় পৈতে পরিয়ে রেখেছ? ভক্তটি বললে, ভাই, তুমিই মাকে চিনেছ। আমি এখনও চিনতে পারি নাই, তিনি পুরুষ কি প্রকৃতি। তাই পৈতে পরিয়েছি।

যিনি শ্যামা, তিনিই ব্রহ্ম। যাঁরই রূপ, তিনিই অরূপ। যিনি সগুণ, তিনিই নির্গুণ। ব্রহ্ম শক্তি—শক্তি ব্রহ্ম। অভেদ। সচ্চিদানন্দময় আর সচ্চিদানন্দময়ী।

শ্রীমন্ত-খুল্লনা। 'সুখ-দুঃখ' দ্রষ্টব্য।

সংসার আশ্রমের জ্ঞান। জ্ঞান দ্রষ্টব্য।

সংসার কি মিথ্যা? যতক্ষণ তাঁকে না জানা যায়, ততক্ষণ মিথ্যা। তখন তাঁকে ভুলে মানুষ 'আমার আমার' করে; মায়ায় বদ্ধ হয়ে কামিনী কাঞ্চনে মুগ্ধ হয়ে আরও ডোবে। মায়াতে এমনই মানুষ অজ্ঞান হয় যে পালাবার পথ থাকলেও পালাতে পারে না।

সংসারবাস। সংসারে থাকবে না তো কোথায় যাবে? আমি দেখছি যেখানে থাকি, রামের অযোধ্যায় আছি। এই জগৎ সংসার রামের অযোধ্যা। রামচন্দ্র গুরুর কাছে জ্ঞানলাভ করবার পর বললেন, আমি সংসার ত্যাগ করবো। দশরথ তাঁকে বুঝাবার জন্য বশিষ্ঠকে পাঠালেন। বশিষ্ঠ দেখলেন, রামের তীব্র বৈরাগ্য। তখন বললেন, 'রাম, আগে আমার সঙ্গে বিচার কর, তারপর সংসার ত্যাগ করো। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, সংসার কি ঈশ্বর ছাড়া? তা যদি হয় তুমি ত্যাগ কর।' রাম দেখলেন, ঈশ্বরই জীব জগৎ সব হয়েছেন। তাঁর সত্তাতে সমস্ত সত্য বলে বোধ হচ্ছে। তখন রামচন্দ্র চুপ করে রইলেন।

'গৃহকেল্লা' দ্রষ্টব্য।

সংসারবাস: জীবন্মুক্তের। একজন কেরাণী জেলে গেছিল। জেল খাটা শেষ হলে, সে জেল থেকে বেরিয়ে এল। এখন জেল থেকে এসে, সে কি কেবল ধেই ধেই করে নাচবে? না, কেরাণীগিরিই করবে?

সংসারী যদি জীবন্মুক্ত হয়, সে মনে করলে অনায়াসে সংসারে থাকতে পারে। যার জ্ঞান লাভ হয়েছে, তার এখান সেখান নাই। তার সব সমান। যার সেখানে আছে, তার এখানেও আছে।

সংসার মিথ্যা। তোমরা তো নিজে নিজে দেখছো সংসার অনিত্য। এই বাড়িই দেখো না কেন? কত লোক এলো গেলো! কত জন্মালো কত দেহত্যাগ করলে! সংসার এই আছে এই নাই। অনিত্য। যাদের এতো 'আমার আমার' করছো চোখ বুজলেই নাই। কেউ নাই, তবু নাতির জন্য কাশী যাওয়া হয় না। 'আমার হারুর কি হবে?' 'গতায়াতের পথ আছে তবু মীন পালাতে নারে। গুটীপোকা আপন নালে আপনি মরে।' এরূপ সংসার মিথ্যা, অনিত্য।

সংসারী আমি: আমি (ক) দ্রষ্টব্য

সংসারী তিনের দাস। সংসারী লোকগুলো তিনজনের দাস, তাদের কি পদার্থ থাকে? মেগের দাস, টাকার দাস, মনিবের দাস। একজনের নাম করবো না। আটশো টাকা মাইনে কিন্তু মেগের দাস, উঠতে বললে উঠে, বসতে বললে বসে।

দ্রঃ দাসত্বের যন্ত্রণা।

সংসারী ভক্ত। যে সংসারী ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তি রেখে সংসার করে, সে ধন্য—সে বীরপুরুষ। যেমন কারু মাথায় দু মণ বোঝা আছে, আর বর যাচ্ছে, মাথায় বোঝা—তবু সে বর দেখছে। খুব শক্তি না থাকলে হয় না। যেমন পাঁকাল মাছ পাঁকে থাকে, কিন্তু গায়ে একটুকুও পাঁক নাই। পানকৌটি জলে সর্বদা ডুব মারে, কিন্তু পাখা একবার ঝাড়া দিলেই আর গায়ে জল থাকে না।

দ্রঃ পাঁকাল মাছ তুঃ সংসারে থাকতে হলে ঝড়ের এঁটোপাতা। নষ্ট স্ত্রীর মতো।

সংসারীর ঈশ্বর ভজনা

ক. **শবসাধনার তুলনা।** যখন শব সাধন করে, মাঝে মাঝে শবটা হাঁ করে ভয় দেখায়। তাই চাল ছোলা ভাজা রাখতে হয়। তার মুখে মাঝে মাঝে দিতে হয়। শবটা ঠাণ্ডা হলে তবে নিশ্চিন্ত হয়ে জপ করতে পারবে। তাই পরিবারদের ঠাণ্ডা রাখতে হয়। তাদের খাওয়া দাওয়ার যোগাড় করে দিতে হয়, তবে সাধন ভজনের সুবিধা হয়।

খ. **নষ্ট স্ত্রীর তুলনা।** সংসারে নষ্ট স্ত্রীর মতো থাকবে। নষ্ট স্ত্রী বাড়ির সব কাজ খুব মন দিয়ে করে, কিন্তু তার মন উপপতির উপর রাত দিন পড়ে থাকে। সংসারের কাজ কর, কিন্তু মন সর্বদা ঈশ্বরের উপর রাখবে।

গ. **ফোঁড়ার তুলনা।** সংসার ধর্ম; তাতে দোষ নাই। কিন্তু ঈশ্বরের পাদপদ্মে মন রেখে কামনাশূন্য হয়ে কাজকর্ম করবে। এই দেখ না, যদি কারু পিঠে একটা ফোঁড়া হয়, সে যেমন সকলের সঙ্গে কথাবার্তা কয়, হয়ত কাজকর্মও করে কিন্তু যেমন ফোঁড়ার দিকে তার মন পড়ে থাকে, সেই রকম।

ঘ. **দাসীর তুলনা।** সব কাজ করবে কিন্তু মন ঈশ্বরেতে রাখবে। স্ত্রী, পুত্র, বাপ, মা, সকলকে নিয়ে থাকবে ও সেবা করবে। যেন কত আপনার লোক। কিন্তু মনে জানবে যে তারা তোমার কেউ নয়। বড় মানুষের বাড়ির দাসী সব কাজ কচ্ছে, কিন্তু দেশে নিজের বাড়ির দিকে মন পড়ে আছে। আবার সে মনিবের ছেলেদের আপনার ছেলের মতো মানুষ করে। বলে, 'আমার রাম' 'আমার হরি'। কিন্তু মনে বেশ জানে—এরা আমার কেউ নয়। যেমন জবাব দিলে—ব্যস আর কোন সম্পর্ক নাই।

ঙ. **কচ্ছপের তুলনা।** কচ্ছপ জলে চরে বেড়ায়, কিন্তু তার মন কোথায় পড়ে আছে জান?—আড়ায় পড়ে আছে। যেখানে তার ডিমগুলি আছে। সংসারের সব কর্ম করবে, কিন্তু ঈশ্বরে মন ফেলে রাখবে। ঈশ্বরে ভক্তি লাভ না করে যদি সংসার করতে যাও, তাহলে আরও জড়িয়ে পড়বে। বিপদ, শোক, তাপ, এসবে অধৈর্য হয়ে যাবে। আর যত বিষয়চিন্তা করবে, ততই আসক্তি বাড়বে।

চ. **পাঁকাল মাছের তুলনা।** যে সংসারী ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তি রেখে সংসার করে সে ধন্য, সে বীরপুরুষ। যেমন কারু মাথায় দু মণ বোঝা আছে, আর বর যাচ্ছে। মাথায় বোঝা—তবুও সে বর দেখছে। খুব শক্তি না থাকলে হয় না। যেমন পাঁকাল মাছ পাঁকে থাকে, কিন্তু গায়ে একটুও পাঁক নাই। পানকৌটী জলে সর্বদা ডুব মারে, কিন্তু পাখা একবার ঝাড়া দিলেই আর গায়ে জল থাকে না। তোমরা সংসার কর অনাসক্ত হয়ে। গায়ে কাদা লাগবে কিন্তু ঝেড়ে ফেলবে, পাঁকাল মাছের মতো। কলঙ্ক সাগরে সাঁতার দেবে—তবু গায়ে কলঙ্ক লাগবে না।

ছ. **নর্তকী ও ঘড়া কাঁখে মেয়েদের তুলনা।** জনকাদি সংসারেও কর্ম করেছিলেন; ঈশ্বরকে মাথায় রেখে কাজ করতেন। নর্তকী যেমন মাথায় বাসন করে নাচে। আর পশ্চিমের মেয়েদের দেখ নাই? মাথায় জলের ঘড়া, হাসতে হাসতে—

কথা কইতে কইতে যাচ্ছে। সংসার করবে, অথচ মাথায় কলসী ঠিক রাখবে, অর্থাৎ ঈশ্বরের দিকে মন ঠিক রাখবে।

জ. পিঁপড়ের তুলনা। পিঁপড়ের মতো সংসারে থাক, এই সংসারে নিত্য অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে। বালিতে চিনিতে মিশান—পিঁপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে। জলে দুধে একসঙ্গে রয়েছে—চিদানন্দরস আর বিষয়রস। হংসের মতো দুধটুকু নিয়ে জলটি ত্যাগ করবে। গোলমালে মাল আছে—গোল ছেড়ে মালটি নেবে।

ঝ. সার্কাসের তুলনা। বিবি কেমন এক পায়ে ঘোড়ার উপর দাঁড়িয়ে আছে, আর ঘোড়া বন বন করে দৌড়ুচ্ছে। কত কঠিন, অনেক দিন ধরে অভ্যাস করেছে, তবে ত হয়েছে। একটু অসাবধান হলেই হাত পা ভেঙ্গে যাবে, আবার মৃত্যুও হতে পারে, সংসার করা ঐরূপ কঠিন। অনেক সাধন ভজন করলে ঈশ্বরের কৃপায় কেউ কেউ পেরেছে।

সংসারীর কপটতা। সংসারী লোক কপট হয়—সরল হয় না। মুখে বলে ঈশ্বরকে ভালবাসি কিন্তু বিষয়ে যত টান, কামিনী-কাঞ্চনে যত ভালবাসা, তার অতি অল্প অংশও ঈশ্বরের দিকে দেয় না। অথচ মুখে বলে ঈশ্বরকে ভালবাসি।

সংসারীর কেন ব্যাকুলতা হয় না। দ্রঃ ব্যাকুলতা কেন হয় না সংসারীর

সংসারীর ত্যাগ। ক. না গো! তোমাদের সব ত্যাগ করতে হবে কেন? তোমরা রসে বসে বেশ আছো। সা-রে-গা-তে। তোমরা বেশ আছো। নক্স খেলা জান? আমি বেশী কাটিয়ে জ্বলে গেছি। তোমরা খুব সেয়ানা। কেউ দশে আছো; কেউ ছয়ে আছো; কেউ পাঁচে আছো। বেশী কাটাও নাই; তাই আমার মতো জ্বলে যাও নাই। খেলা চলছে—এ তো বেশ।

সত্যি বলছি তোমরা সংসার করছো এতো দোষ নাই। তবে ঈশ্বরের দিকে মন রাখতে হবে। তা না হলে হবে না। এক হাতে কর্ম করো, আর এক হাতে ঈশ্বরকে ধরে থাকো। কর্ম শেষ হলে দুই হাতে ঈশ্বরকে ধরবে।

সংসার একেবারে ত্যাগ করবার কি দরকার? আসক্তি গেলেই হ'ল। তবে সাধন চাই। ইন্দ্রিয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়।

কেল্লার ভিতর থেকে যুদ্ধ করাই আরও সুবিধা—কেল্লা থেকে অনেক সাহায্য পাওয়া যায়। সংসার ভোগের স্থান, এক-একটি জিনিস ভোগ করে অমনি ত্যাগ করতে হয়। আমার সাধ ছিল সোনার গোট পরি। তা শেষে পাওয়াও গেল, সোনার গোট পরলুম; পারার পর কিন্তু তৎক্ষণাৎ খুলতে হবে।

পেঁয়াজ খেলুম আর বিচার করতে লাগলুম—মন, এর নাম পেঁয়াজ। তারপর মুখের ভিতর একবার এদিক-ওদিক, একবার সেদিক করে তারপর ফেলে দিলুম।

সংসারীর ত্রিগুণ। 'ত্রিগুণ ক' দেখ।

সংসারীর ধর্ম-কর্ম। সংসারে ধর্ম ধর্ম এরা করছে। যেমন একজন ঘরে আছে, সব বন্ধ—ছাদের ফুটো দিয়ে একটু আলো আসছে। মাথার উপর ছাদ থাকলে কি সূর্যকে দেখা যায়? একটু আলো এলে কি হবে? কামিনী-কাঞ্চন ছাদ! ছাদ তুলে না ফেললে কি সূর্যকে দেখা যায়! সংসারী লোক যেন ঘরের ভিতর বন্দী হয়ে আছে।

সংসারীর সাধনা। ক. জ্ঞানের পর সংসারে থাকা যায়। কিন্তু আগে ত জ্ঞান করতে হবে। সংসার-রূপ জলে মন-রূপ দুধ রাখলে মিশে যাবে, তাই মন-রূপ দুধকে দই পেতে নির্জনে মন্থন করে—মাখন তুলে সংসার-রূপ জলে রাখতে হয়।

তা হলেই হলো, সাধনের দরকার—প্রথমাবস্থায় নির্জনে থাকা বড় দরকার। অশ্বত্থ গাছ যখন চারা থাকে তখন বেড়া দিতে হয়, তা না হলে ছাগল গরুতে খেয়ে ফেলে, কিন্তু গুঁড়ি মোটা হলে বেড়া খুলে দেওয়া যায়। এমন কি হাতী বেঁধে দিলেও কিছু হয় না।

তাই প্রথমাবস্থায় মাঝে মাঝে নির্জনে যেতে হয়। সাধনের দরকার। ভাত খাবে; বসে বসে বলছো, কাঠে অগ্নি আছে, ঐ আগুনে ভাত রাঁধা হয়; তা বললে কি ভাত তৈয়ের হয়? আর একখানা কাঠ এনে কাঠে কাঠে ঘষতে হয়, তবে আগুন বেরোয়।

দ্রঃ সংসারে থাকার রীতি।

খ. তবে সংসারীর কি উপায় নাই?—হাঁ, অবশ্য আছে। দিন কতক নির্জনে সাধন করতে হয়। নির্জনে করলে ভক্তিলাভ হয়, জ্ঞানলাভ হয়; তারপর গিয়ে সংসার কর, দোষ নাই। যখন নির্জনে সাধন করবে, সংসার থেকে একেবারে তফাতে যাবে। তখন যেন স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, মাতা, পিতা, ভাই, ভগিনী, আত্মীয়-কুটুম্ব কেউই কাছে না থাকে। নির্জনে সাধনের সময় ভাববে, আমার কেউ নাই; ঈশ্বরই আমার সর্বস্ব। আর কেঁদে কেঁদে তাঁর কাছে জ্ঞানভক্তির জন্য প্রার্থনা করবে।

যদি বল কত দিন সংসার ছেড়ে নির্জনে থাকবো? তা একদিন যদি এই রকম করে থাক, সেও ভাল; তিন দিন থাকলে আরও ভাল; বা বারোদিন, এক মাস, তিন মাস, একবৎসর, যে যেমন পারে। জ্ঞান ভক্তি লাভ করে সংসার করলে আর বেশী ভয় নাই।

হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙ্গলে হাতে আঠা লাগে না। চোর চোর যদি খেল বুড়ি ছুঁয়ে ফেললে আর ভয় নাই। একবার পরশমণিকে ছুঁয়ে সোনা হও, সোনা হবার পর হাজার বৎসর যদি মাটিতে পোঁতা থাক, মাটি থেকে তোলবার সময় সোনাই থাকবে।

মনটি দুধের মতো। যেই মনকে যদি সংসার জলে রাখ, তা হলে দুধে জলে মিশে যাবে। তাই দুধকে নির্জনে দই পেতে মাখন তুলতে হয়। যখন নির্জনে সাধন করে মনরূপ দুধ থেকে জ্ঞান ভক্তি রূপ মাখন তোলা হ'ল, তখন সেই মাখন অনায়াসে সংসার-জলে রাখা যায়। সে মাখন কখনও সংসার-জলের সঙ্গে মিশে যাবে না—সংসার জলের উপর নির্লিপ্ত হয়ে ভাসবে।

সংসারীর স্বভাব। যাদের দেখি ঈশ্বরে মন নাই, তাদের আমি বলি, 'তোমরা একটু ঐখানে গিয়ে বস। অথবা বলি, যাও বেশ বিল্ডিং (রাসমণির কালীবাটীর মন্দির সকল) দেখ গে।'

আবার দেখছি যে, ভক্তদের সঙ্গে হাবাতে লোক এসেছে। তাদের ভারী বিষয়-

বুদ্ধি। তাদের ঈশ্বরীয় কথা ভাল লাগে না। ওরা হয়ত আমার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে ঈশ্বরীয় কথা বলছে। এদিকে এরা আর বসে থাকতে পারে না, ছটফট করছে। বার বার তাদের কানে কানে ফিস ফিস করে বলছে, 'কখন যাবে—কখন যাবে।' তারা হয়ত বললে, 'দাঁড়াও না হে, আর একটু পরে যাব।' তখন এরা বিরক্ত হয়ে বলে, 'তবে তোমরা কথা কও, আমরা নৌকায় গিয়ে বসি।'

সংসারীর হরি-নাম। হরিনাম দ্রষ্টব্য।

সংসারে এত দুঃখ কেন? এ সংসারে তাঁর লীলা; খেলার মতো। এই লীলায় সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্য, জ্ঞান অজ্ঞান, ভাল মন্দ, সব আছে। দুঃখ পাপ এ সব গেলে লীলা চলে না।

চোর চোর খেলায় বুড়ীকে ছুঁতে হয়। খেলার গোড়াতেই বুড়ী ছুঁলে বুড়ী সন্তুষ্ট হয় না। ঈশ্বরের (বুড়ীর) ইচ্ছা যে খেলাটা খানিকক্ষণ চলে। তারপর—

'ঘুড়ি লক্ষের দুটো একটা কাটে,
হেসে দাও মা, হাত-চাপড়ী।'

অর্থাৎ ঈশ্বর দর্শন করে দুই একজন মুক্ত হয়ে যায়, অনেক তপস্যার পর তাঁর কৃপায়। তখন মা আনন্দে হাততালি দেন, 'ভো। কাটা!' এই বলে।

সংসারে থাকার রীতি। পিঁপড়ের মতো সংসারে থাক, এই সংসারে নিত্য-অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে। বালিতে চিনিতে মিশান—পিঁপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে। জলে দুধে একসঙ্গে রয়েছে। চিদানন্দরস আর বিষয়রস। হংসের মতো দুধটুকু নিয়ে জলটি ত্যাগ করবে।

আর পানকৌটির মতো। গায়ে জল লাগছে, ঝেড়ে ফেলবে। আর পাঁকাল মাছের মতো। পাঁকে থাকে কিন্তু গা দেখ পরিষ্কার উজ্জ্বল।

গোলমালে মাল আছে—গোল ছেড়ে মালটি নেবে।

দ্রঃ ঝড়ের এঁটো পাতা।

সংসারে থাকা। 'ঝড়ের এঁটো পাতা' দ্রষ্টব্য

সংসারে থাকতে হলে। সংসারে থাকবে তো একখানি আমমোক্তারনামা লিখে দাও—বকলমা দিয়ে দাও। উনি যা হয় করবেন। তুমি থাকবে বড়লোকের বাড়ির ঝি-এর মতো। বাবুর ছেলে-পুলেকে কত আদর করছে, নাওয়াচ্ছে, ধোয়াচ্ছে, খাওয়াচ্ছে যেন তারই ছেলে; কিন্তু মনে মনে জানছে, 'এ আমার নয়'; যেমন জবাব দিলে—ব্যস, আর কোন সম্পর্ক নাই।

যেমন কাঁঠাল খেতে হলে হাতে তেল মেখে নিতে হয়, তেমনি ঐ তেল মেখে নিও তাহলে আর সংসারে জড়াবে না, লিপ্ত হবে না।

দ্রঃ নষ্ট স্ত্রীর মতো।

সংসারে থেকে কি ভগবানকে পাওয়া যায়? অবশ্য পাওয়া যায়। তবে যা বললুম সাধুসঙ্গ আর সর্বদা প্রর্থনা করতে হয়। তাঁর কাছে কাঁদতে হয়। মনের ময়লাগুলো ধুয়ে গেলে তাঁর দর্শন হয়। মনটি যেন মাটি-মাখানো লোহার সূচ—ঈশ্বর চুম্বক পাথর, মাটি না গেলে চুম্বক পাথরের সঙ্গে যোগ হয় না। কাঁদতে কাঁদতে সূচের মাটি ধুয়ে যায়, মাটি অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভ, পাপবুদ্ধি,

বিষয়বুদ্ধি। মাটি ধুয়ে গেলেই সূচকে চুম্বক পাথরে টেনে লবে—অর্থাৎ ঈশ্বর দর্শন হবে। চিত্তশুদ্ধি হলে তবে তাঁকে লাভ হয়। জ্বর হয়েছে, দেহেতে রস অনেক রয়েছে তাতে কুইনাইনে কি কাজ হবে। সংসারে হবে না কেন? ঐ সাধুসঙ্গ, কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা, মাঝে মাঝে নির্জনে বাস, একটু বেড়া না দিলে, ফুটপাথের চারা গাছ, ছাগল গরুতে খেয়ে ফেলে।

দ্রঃ ঈশ্বর দর্শন কি করা যায়? নিরাকার ব্রহ্মের সাক্ষাৎ হয় কি? সংসারে থেকে কি ভগবানকে পাওয়া যায়?

সংসারে থেকে সাধনা। সংসারে থেকে সাধন করা বড় কঠিন। অনেক ব্যাঘাত। তা আর তোমাদের বলতে হবে না, রোগ শোক, দারিদ্র্য আবার স্ত্রীর সঙ্গে মিল নাই; ছেলে অবাধ্য, মূর্খ, গোঁয়ার।

তবে উপায় আছে। মাঝে মাঝে নির্জনে গিয়ে তাঁকে প্রার্থনা করতে হয়, তাঁকে লাভ করবার জন্য চেষ্টা করতে হয়।

সংসারের সুবিধা। তা তোমরা সংসারে আছ তা হলেই বা; এতে সাধনের আরও সুবিধা, যেমন কেল্লা থেকে যুদ্ধ করা। যখন শব সাধন করে, মাঝে মাঝে শবটা হাঁ করে ভয় দেখায়। তাই ছোলাভাজা রাখতে হয়। তার মুখে মাঝে মাঝে দিতে হয়। শবটা ঠান্ডা হলে তবে নিশ্চিন্ত হয়ে জপ করতে পারবে। তাই পরিবারদের ঠান্ডা রাখতে হয়। তাদের খাওয়া দাওয়া যোগাড় করে দিতে হয়, তবে সাধন-ভজনের সুবিধা হয়।

সংসারের স্বরূপ। সংসার যেন বিশালাক্ষীর দ, নৌকা দহে একবার পড়লে আর রক্ষা নাই। সেঁকুল কাঁটার মতো—এক ছাড়ে তো আর একটি জড়ায়। গোলকধান্দায় একবার ঢুকলে বেরনো মুশকিল। মানুষ যেন ঝলসা পোড়া হয়ে যায়।

সংস্কার। পুরানো সংস্কার কি এমনি যায়? একজন হিন্দু বড় ভক্ত ছিল—সর্বদা জগদম্বার পূজা আর নাম করত। মুসলমানদের যখন রাজ্য হলো তখন সেই ভক্তকে ধরে মুসলমান করে দিল, আর বললে, 'তুই এখন মুসলমান হয়েছিস, বল আল্লা। কেবল আল্লা নাম জপ কর।' সে অনেক কষ্টে আল্লা, আল্লা বলতে লাগলো। কিন্তু এক একবার বলে ফেলতে লাগলো 'জগদম্বা!' তখন মুসলমানেরা তাকে মারতে যায়। সে বলে, 'দোহাই শেখজী। আমায় মারবেন না, আমি তোমাদের আল্লা নাম করতে খুব চেষ্টা করছি, কিন্তু আমাদের জগদম্বা আমার কণ্ঠা পর্যন্ত রয়েছেন, তোমাদের আল্লাকে ঠেলে ঠেলে দিচ্ছেন।'

দ্রঃ পূর্বজন্মের সংস্কার।

সগুণ ব্রহ্ম। 'শক্তির অভেদ', 'আদ্যাশক্তি দর্শনের উপায়' দ্রষ্টব্য।

সঙ্গ। যেরূপ সঙ্গের মধ্যে থাকবে, সেরূপ স্বভাব হয়ে যায়। তাই ছবিতেও দোষ। আবার নিজের যেরূপ স্বভাব, সেইরূপ সঙ্গ লোকে খোঁজে। পরমহংসেরা দু পাঁচজন ছেলে কাছে রেখে দেয়—কাছে আসতে দেয়—পাঁচ ছয় বছরের। ও অবস্থায় ছেলেদের ভিতর থাকতে ভাল লাগে। ছেলেরা সত্ত্ব রজঃ তমঃ কোন গুণের বশ নয়।

গাছ দেখলে তপোবন মনে পড়ে—ঋষি তপস্যা করছে, উদ্দীপন হয়।
'সৎসঙ্গ' 'সধুসঙ্গ' দ্রষ্টব্য।

সঙ্গীর খোঁজ। আমি কামিনীকাঞ্চন-ত্যাগী খুঁজছি। মনে করি, এ বুঝি থাকবে। সকলেই এক একটা ওজর করে।

একটা ভূত সঙ্গী খুঁজছিল। শনি মঙ্গলবারে অপঘাতে মৃত্যু হ'লে ভূত হয়, তাই সে ভূতটা যেই দেখতো কেউ ছাদ থেকে পড়ে গেছে, কি হোঁচট খেয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়েছে, অমনি দৌড়ে যেত—এই মনে করে যে, এটার অপঘাত মৃত্যু হয়েছে, এবার ভূত হবে, আর আমার সঙ্গী হবে। কিন্তু তার এমনি কপাল যে দেখে, সব শালারা বেঁচে উঠে! সঙ্গী আর জোটে না।

সচ্চিদানন্দ। যে ধর্মই হোক যে মতই হোক; সকলেই সেই এক ঈশ্বরকে ডাকছে; তাই কোন ধর্ম কোন মতকে অশ্রদ্ধা বা ঘৃণা করতে নাই। বেদে তাঁকেই বলছে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম; ভাগবতাদি পুরাণে তাঁকেই বলছে সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণ; তন্ত্রে বলেছে সচ্চিদানন্দ শিব। সেই এক সচ্চিদানন্দ।

বৈষ্ণবদের নানা থাক থাক আছে। বেদে তাঁকে ব্রহ্ম বলে, এক দল বেষ্ণবেরা তাঁকে বলে আলেক নিরঞ্জন। আলেক অর্থাৎ যাঁকে লক্ষ্য করা যায় না, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দেখা যায় না। তারা বলে, রাধা আর কৃষ্ণ আলেকের দুটি ফুট।

বেদান্ত মতে অবতার নাই, বেদান্তবাদীরা বলে রাম, কৃষ্ণ, এরা সচ্চিদানন্দ সাগরের দুটি ঢেউ।

এক বই ত দুই নাই; যে যা বলে, যদি আন্তরিক ঈশ্বরকে ডাকে, তার কাছে নিশ্চয় পঁহুছিবে। ব্যাকুলতা থাকলেই হ'ল।

দ্রঃ পানা পুকুর।

সচ্চিদানন্দ প্রেম। কিরূপ প্রেম? ঈশ্বরকে কিরূপ ভালবাসতে হবে? গৌরী বলতো রামকে জানতে গেলে সীতার মতো হতে হয়; ভগবানকে জানতে ভগবতীর মতো হতে হয়—ভগবতী যেমন শিবের জন্য কঠোর তপস্যা করেছিলেন সেইরূপ তপস্যা করতে হয়; পুরুষকে জানতে গেলে প্রকৃতভাব আশ্রয় করতে হয়—সখী-ভাব, দাসীভাব, মাতৃভাব।

সচ্চিদানন্দ সমুদ্র। তিনি যেন সচ্চিদানন্দ সমুদ্র। কূল-কিনারা নাই। ভক্তিহিমে সেই সমুদ্রের স্থানে স্থানে জল বরফ হয়ে যায়, যেন জল বরফ আকারে জমাট বাঁধে; অর্থাৎ ভক্তের কাছে তিনি সাক্ষাৎ হয়ে কখন কখন সাকার রূপ হয়ে দেখা দেন। আবার জ্ঞানসূর্য উঠলে সে বরফ গলে যায়।

অর্থাৎ 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা' এই বিচারের পর সমাধি হ'লে রূপ-টূপ উড়ে যায়। তখন আর ঈশ্বরকে ব্যক্তি বলে বোধ হয় না। কী তিনি মুখে বলা যায় না। কে বলবে? যিনি বলবেন তিনিই নাই। তাঁর 'আমি' আর খুজে পান না। তখন ব্রহ্ম নির্গুণ। তখন তিনি কেবল বোধে বোধ হন। মন বুদ্ধি দ্বারা তাঁকে ধরা যায় না।

তাই বলে, ভক্তি—চন্দ্র; জ্ঞান—সূর্য। শুনেছি, খুব উত্তরে আর দক্ষিণে সমুদ্র আছে। এত ঠাণ্ডা যে, জল জমে মাঝে মাঝে বরফের চাঁই হয়। জাহাজ

চলে না। সেখানে গিয়ে আটকে যায়। ভক্তিপথে মানুষ আটকে যায়। বটে, কিন্তু তাতে হানি হয় না, সেই সচ্চিদানন্দ সাগরের জলই জমাট বেঁধে বরফ হয়েছে। যদি আরও বিচার করতে চাও, যদি 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা' এই বিচার কর, তাতেও ক্ষতি নাই। জ্ঞানসূর্যেই বরফ গলে যাবে; তবে সেই সচ্চিদানন্দ-সাগরই রইল।

দ্রঃ সাকার-নিরাকার স্বন্দ্ব। গৃহী ও সচ্চিদানন্দ সাগর।

সচ্চিদানন্দ সাগরে মগ্ন হও। আমি নরেন্দ্রকে বলেছিলাম—ঈশ্বর রসের সমুদ্র, তুই এ সমুদ্রে ডুব দিবি কি না বল। আচ্ছা, মনে কর খুলিতে এক খুলি রস রয়েছে আর তুই মাছি হয়েছিস। কোথা বসে রস খাবি বল? নরেন্দ্র বললে, আমি খুলির আড়ায় বসে মুখ বাড়িয়ে খাবো। কেন না বেশী গেলে ডুবে যাব। তখন আমি বললাম, বাবা, এ সচ্চিদানন্দ সাগর—এতে মরণের ভয় নাই, এ সাগর অমৃতের সাগর। যারা অজ্ঞান তারাই বলে যে, ভক্তি প্রেমের বাড়াবাড়ি করতে নাই। ঈশ্বরপ্রেমের কি বাড়াবাড়ি আছে? তাই তোমায় বলি, সচ্চিদানন্দসাগরে মগ্ন হও।

ঈশ্বরলাভ হ'লে ভাবনা কি? তখন আদেশও হবে, লোকশিক্ষাও হবে।

সঞ্চয়। ক. (সাধুর) সাধুরা ঈশ্বরের উপর ষোল আনা নির্ভর করবেই। তাদের সঞ্চয় করতে নাই।

খ. (সংসারীর) এটি সংসারীর পক্ষে নয়। সংসারীর পক্ষে সংসার প্রতিপালন করতে হয়। তাই সঞ্চয়ের দরকার। পনছী (পাখী) আউর দরবেশ (সাধু) সঞ্চয় করে না। কিন্তু পাখীর ছানা হলে সঞ্চয় করে; ছানার জন্যে মুখে করে খাবার আনে।

গ. 'অবধূতের আর এক গুরু' দ্রষ্টব্য।

সৎসঙ্গ। একটু কষ্ট করে সৎসঙ্গ করতে হয়। বাড়ীতে কেবল বিষয়ের কথা। রোগ লেগেই আছে। পাখী দাঁড়ে বসে রাম রাম বলে। বনে উড়ে গেলে আবার ক্যাঁ ক্যাঁ করবে।

দ্রঃ 'সাধুসঙ্গ', 'ভক্তের সাবধানতা'।

সতের স্বভাব। সতের কি স্বভাব জান? সে কাউকেও কষ্ট দেয় না—ব্যতিব্যস্ত করে না। নিমন্ত্রণে গিয়েছে, কারু কারু এমন স্বভাব—হয়ত বললে—আমি আলাদা বসবো। ঠিক ঈশ্বরে ভক্তি থাকলে বেতালে পা পড়ে না—কারুকে মিথ্যা কষ্ট দেয় না।

আর অসতের সঙ্গ ভাল না। তাদের কাছ থেকে তফাৎ থাকতে হয়। গা বাঁচিয়ে চলতে হয়।

সত্তা হরণ করে। হরিপদ ঘোষপাড়ার এক মাগীর পাল্লায় পড়েছে। ছাড়ে না। বলে, কোলে করে খাওয়ায়। বলে নাকি গোপাল ভাব। আমি অনেক সাবধান করে দিয়েছি। বলে বাৎসল্য ভাব। ঐ বাৎসল্য থেকে আবার তাচ্ছল্য হয়।

কি জান? মেয়েমানুষ থেকে অনেক দূরে থাকতে হয়, তবে যদি ভগবান লাভ হয়। যাদের মতলব খারাপ, সে সব মেয়েমানুষের কাছে আনাগোনা করা, কি

তাদের হাতে কিছু খাওয়া বড় খারাপ। এরা সত্তা হরণ করে।

সত্যকথা। ক. সত্য কথা কলির তপস্যা। কলিতে অন্য তপস্যা কঠিন। সত্যে থাকলে ভগবানকে পাওয়া যায়। তুলসীদাস বলেছে, 'সত্যকথা, অধীনতা, পর-স্ত্রী মাতৃসমান—এইসে হরি না মিলে তুলসী ঝুট জবান।'

খ. এই রকম আছে যে, সত্য কথাই কলির তপস্যা। সত্যকে আঁট করে ধরে থাকলে ভগবানলাভ হয়। সত্যে আঁট না থাকলে ক্রমে ক্রমে সব নষ্ট হয়। আমি এই ভেবে যদিও কখন বলে ফেলি যে বাহ্যে যাব, যদি বাহ্যে না'ও পায় তবুও একবার গাড়ুটা সঙ্গে করে ঝাউতলার দিকে যাই। ভয় এই—পাছে সত্যের আঁট যায়। আমার এই অবস্থার পর মাকে ফুল হাতে করে বলেছিলাম, 'মা! এই নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও তোমার অজ্ঞান, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও মা; এই নাও তোমার শুচি, এই নাও তোমার অশুচি, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও মা; এই নাও তোমার ভাল, এই নাও তোমার মন্দ, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও মা; এই নাও তোমার পুণ্য, এই নাও তোমার পাপ, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও।' যখন এই সব বলেছিলুম, তখন এ কথা বলতে পারি নাই, 'মা! এই নাও তোমার সত্য, এই নাও তোমার অসত্য।' সব মাকে দিতে পারলুম, 'সত্য' মাকে দিতে পারলুম না।

সত্যকথার বাতিক। হ্যাঁগা, সত্য কথা কইতে হবে বলে কি আমার ছুচিবাই হলো নাকি! যদি হঠাৎ বলে ফেলি, খাব না, তবে খিদে পেলেও আর খাবার যো নাই! যদি বলি ঝাউতলায় আমার গাড়ু নিয়ে অমুক লোকের যেতে হবে—আর কেউ নিয়ে গেলে তাকে আবার ফিরে যেতে বলতে হবে। একি হ'ল বাপু! এর কি কোন উপায় নাই!

আবার সঙ্গে কিছু আনবার যো নেই। পান, খাবার—কোন জিনিস সঙ্গে করে আনবার যো নাই। তা হ'লে সঞ্চয় হ'ল কি না। হাতে মাটি নিয়ে আসবার যো নাই।

সত্যের আঁট। সাংসারে থাকতে গেলে সত্য কথার খুব আঁট চাই। সত্যতেই ভগবানকে লাভ করা যায়। আমার সত্য কথার আঁট এখন তবু একটু কমছে, আগে ভারী আঁট ছিল। যদি বলতুম 'নাইবো', গঙ্গায় নামা হ'ল, মন্ত্রোচ্চারণ হ'ল, মাথায় একটু জলও দিলুম, তবু সন্দেহ হ'ল, বুঝি পুরো নাওয়া হ'ল না! অমুক জায়গায় হাগতে যাবো তা সেইখানেই যেতে হবে। রামের বাড়ী গেলুম কলকাতায়। বলে ফেলেছি, লুচি খাবো না। যখন খেতে দিলে, তখন আবার খিদে পেয়েছে। কিন্তু লুচি খাবো না বলেছি, তখন মেঠাই দিয়ে পেট ভরাই। দ্রঃ 'সত্য কথার বাতিক'।

সন্ন্যাসীর পক্ষে (কামনী কাঞ্চন)। 'কামিনী কাঞ্চন' দ্রষ্টব্য

সন্ন্যাসীর নিয়ম। সন্ন্যাসীর বড় কঠিন নিয়ম। স্ত্রীলোকের চিত্রপট পর্যন্ত দেখবে না। এটি সংসারী লোকদের পক্ষে নয়।

স্ত্রীলোক যদি খুব ভক্তও হয়, তবুও মেশামিশি করা উচিত নয়। জিতেন্দ্রিয় হলেও লোকশিক্ষার জন্য ত্যাগীর এ সব করতে হয়।

সাধুর ষোল আনা ত্যাগ দেখলে অন্য লোকে ত্যাগ করতে শিখবে। তা না হলে তারা পড়ে যাবে। সন্ন্যাসী জগৎগুরু।

সন্ন্যাসীর সাধন। গেরো দেওয়া, সেলাই করা, পরদা গুটোনো, দোর বাক্স চাবি দিয়ে বন্ধ করা, এসব বারণ করেছিলাম—তাই ঠিক ধারণা। যে ত্যাগ করবে,তার এই সব সাধন করতে হয়। সন্ন্যাসীর পক্ষে এই সব সাধন।

সাধনের অবস্থায় 'কামিনী দাবানল স্বরূপ—কালসাপের স্বরূপ।' সিদ্ধ অবস্থায় ভগবান দর্শনের পর—তবে মা আনন্দময়ী। তবে মার এক একটি রূপ বলে দেখবে।

সন্তান পালন কতদিন। সাবালক হওয়া পর্যন্ত। পাখী বড় হলে যখন সে আপনার ভার নিতে পারে, তখন তাকে ধাড়ী ঠোকরায়, কাছে আসতে দেয় না।

সন্তানভাব। তাঁকে কে জানবে? আমি জানবার চেষ্টা করি না। আমি কেবল মা বলে ডাকি। মা যা করেন। তাঁর ইচ্ছা হয় জানাবেন, না ইচ্ছা হয়, নাই বা জানাবেন। আমার বিড়াল-ছাঁর স্বভাব। বিড়াল-ছাঁ কেবল মিউ মিউ করে ডাকে। তারপর মা যেখানে রাখে—কখনও হেঁসেলে রাখছে, কখনও বাবুদের বিছানায়। ছোট ছেলে মাকে চায়। মার কত ঐশ্বর্য সে জানে না। জানতে চায়ও না। সে জানে, আমার মা আছে আমার ভাবনা কি? চাকরাণীর ছেলেও জানে আমার মা আছে। বাবুর ছেলের সঙ্গে যদি ঝগড়া হয়, তা বলে, আমি মাকে বলে দেব! আমার মা আছে। আমারও সন্তানভাব।

সন্দেহ ভঞ্জন। আত্মার সাক্ষাৎকার না হলে সন্দেহ ভঞ্জন হয় না।

তাঁর কৃপা হলে আর ভয় নাই। বাপের হাত ধ'রে গেলেও বরং ছেলে পড়তে পারে? কিন্তু ছেলের হাত যদি বাপ ধরে—আর ভয় নাই। তিনি কৃপা করে যদি সন্দেহ ভঞ্জন করেন আর দেখা দেন আর কষ্ট নাই।—তবে তাঁকে পাবার জন্য খুব ব্যাকুল হয়ে ডাকতে ডাকতে—সাধনা করতে করতে তবে কৃপা হয়। ছেলে অনেক দৌড়াদৌড়ি কচ্ছে দেখে মার দয়া হয়। মা লুকিয়ে ছিল, এসে দেখা দেয়।

সব পূর্ব-নির্ধারিত। যাকে যা দেবার তাঁর সব ঠিক করা আছে। সরার মাপে শাশুড়ী বৌদের ভাত দিত। তাতে কিছু ভাত কম হতো। একদিন সরাখানি ভেঙে যাওয়াতে বৌরা আহ্লাদ করছিল। তখন শাশুড়ী বললে 'নাচ কোঁদ বৌমা, আমার হাতের আটকেল (আন্দাজ) আছে।'

সময় (ধ্যান-ভজনের)। যাদের সময় আছে, তারা ধ্যান ভজন করবে।

যারা একান্ত পারবে না তারা দুবেলা খুব দুটো করে প্রণাম করবে। তিনি ত অন্তর্যামী—বুঝছেন যে, এরা কি করে। অনেক কাজ করতে হয়। তোমাদের ডাকবার সময় নাই—তাঁকে আমমোক্তারি (বকলম)দাও। কিন্তু তাঁকে লাভ না করলে—তাঁকে দর্শন না করলে, কিছুই হ'ল না।

সময় না হলে। সময় না হলে কিছু হয় না। কারু কারু ভোগ-কর্ম অনেক বাকি থাকে। তাই জন্য দেরীতে হয়। ফোঁড়া কাঁচা অবস্থায় অস্ত্র করলে হিতে বিপ-

রীত হয়। পেকে মুখ হলে তবে ডাক্তার অস্ত্র করে। ছেলে বলেছিল, মা এখন আমি ঘুমুই আমার বাহ্যে পেলে তখন তুমি তুলো। মা বললে, বাবা বাহ্যেতেই তোমায় তুলবে, আমায় তুলতে হবে না।

সময় সাপেক্ষতা। সময় না হলে কিছু হয় না। একটি ছেলে শুতে যাবার সময় মাকে বলেছিল, আমার যখন হাগা পাবে আমাকে তুলিও। মা বললেন, বাবা, হাগাতেই তোমাকে তোলাবে, আমায় তুলতে হবে না।

সময় হওয়া। ক. সময় না হলে ত্যাগ ভাল না। ফল পাকলে ফুল আপনি ঝরে। কাঁচা বেলায় নারিকেলের বেল্লো টানাটানি করতে নাই—ও রকম করে ভাঙ্গলে গাছ খারাপ হয়।

খ. ভোগ আর কর্ম শেষ না হলে ব্যাকুলতা আসে না। বৈদ্য বলে, দিন কাটুক —তারপর সামান্য ঔষধে উপকার হবে। নারদ রামকে বললেন, রাম! তুমি অযোধ্যায় বসে রইল, রাবণ বধ কেমন করে হবে? তুমি যে সেইজন্য অবতীর্ণ হয়েছ। রাম বললেন, নারদ! সময় হউক, রাবণের কর্মক্ষয় হউক, তবে তার বধের উদ্যোগ হবে।

সময় হলেই হয়। তুমি এইটি জেনো, হাজার শিক্ষা দাও—সময় না হলে ফল হবে না। ছেলে বিছানায় শোবার সময় মাকে বললে, 'মা আমার যখন হাগা পাবে, তখন তুমি আমায় উঠিও'। মা বললে, বাবা, হাগাই তোমাকে উঠাবে, এ জন্য তুমি কিছু ভেবো না।

সেইরূপ ভগবানের জন্য ব্যাকুল হওয়া ঠিক সময় হলেই হয়।

সময়ের উপযুক্ততা। সময় না হলে কিছু হয় না। কারু কারু ভোগ, কর্ম অনেক বাকি থাকে। তাই জন্য দেরিতে হয়। ফোঁড়া কাঁচা অবস্থায় অস্ত্র করলে হিতে বিপরীত হয়। পেকে মুখ হলে তবে ডাক্তার অস্ত্র করে। ছেলে বলেছিল, মা এখন আমি ঘুমুই, আমার হাগা পেলে তখন তুমি তুলো। মা বললে, বাবা হাগাতেই তোমায় তুলবে, আমায় তুলতে হবে না।

সময়ের মূল্য। সময় না হলে কিছু হয় না। যখন রোগ ভাল হয়ে এল, তখন কবিরাজ বললে, এই পাতাটি মরিচ দিয়ে বেটে খেও। তারপর রোগ ভাল হ'ল। তা মরিচ দিয়ে ঔষধ খেয়ে ভাল হ'ল, না আপনি ভাল হ'ল, কে বলবে? লক্ষ্মণ লবকুশকে বললেন, তোরা ছেলেমানুষ, তোরা রামচন্দ্রকে জানিস না। তাঁর স্পর্শে অহল্যা পাষাণী মানবী হয়ে গেল। লবকুশ বললে, ঠাকুর—সব জানি, সব শুনেছি; পাষাণী যে মানবী হ'ল সে মুনিবাক্য ছিল; গৌতমমুনি বলেছিলেন যে, ত্রেতাযুগে রামচন্দ্র ঐ আশ্রমের কাছ দিয়ে যাবেন, তাঁর পাদস্পর্শে তুমি আবার মানবী হবে। তা এখন রামের গুণে--না মুনিবাক্যে, তা কে বলবে বল?

সমাধি। ক. সমাধি হলে সব কর্মত্যাগ হয়ে যায়। পূজা-জপাদি কর্ম, বিষয়-কর্ম সব ত্যাগ হয়। প্রথমে কর্মের বড় হৈ চৈ থাকে। যত ঈশ্বরের দিকে এগুবে ততই কর্মের আড়ম্বর কমে। এমন কি তাঁর নাম গুণ গান পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়। (শিবনাথের প্রতি) যতক্ষণ তুমি সভায় আসনি তোমার নাম, গুণ কথা

অনেক হয়েছে। যেই তুমি এসে পড়েছ, অমনি সে সব কথা বন্ধ হয়ে গেল। তখন তোমার দর্শনেতেই আনন্দ। তখন লোকে বলে, এই যে শিবনাথবাবু এসেছেন। তোমার বিষয়ে অন্য সব কথা বন্ধ হয়ে যায়।

আমার এই অবস্থার পর গঙ্গাজলে তর্পণ করতে গিয়ে দেখি যে হাতের আঙুলের ভিতর দিয়ে জল গলে পড়ে যাচ্ছে। তখন হলধারীকে কাঁদতে কাঁদতে জিজ্ঞাসা করলাম, দাদা, একি হ'ল? হলধারী বললে একে গলিতহস্ত বলে। ঈশ্বর দর্শনের পর তর্পণাদি কর্ম থাকে না।

সংকীর্তনে প্রথমে বলে 'নিতাই আমার মাতা হাতী। —নিতাই আমার মাতা হাতী।' ভাব গাঢ় হলে শুধু বলে 'হাতী! হাতী!' তারপর কেবল হাতী, এই কথাটি মুখে থাকে। শেষে 'হা' বলতে বলতে ভাব সমাধি হয়। তখন সে ব্যক্তি, এতক্ষণ কীর্তন করছিল চুপ হয়ে যায়।

যেমন ব্রাহ্মণভোজনে—প্রথমে খুব হৈ চৈ। যখন সকলে পাতা সম্মুখে করে বসলো, তখন অনেক হৈ চৈ কমে গেল, কেবল 'লুচি আন' 'লুচি আন' শব্দ হতে থাকে। তারপর যখন লুচি তরকারি খেতে আরম্ভ করে, তখন বার আনা শব্দ কমে গেছে। যখন দই এল তখন সুপ সুপ (সকলের হাস্য)—শব্দ নাই বললেও হয়। খাবার পর নিদ্রা। তখন সব চুপ।

তাই বলছি, প্রথম প্রথম কর্মের খুব হৈ চৈ থাকে। ঈশ্বরের পথে যত এগুবে ততই কর্ম কমবে। শেষে কর্ম ত্যাগ আর সমাধি।

গৃহস্থের বৌ অন্তঃসত্ত্বা হলে শাশুড়ী কর্ম কমিয়ে দেয়, দশমাসে কর্ম প্রায় করতে হয় না। ছেলে হলে একেবারে কর্মত্যাগ। মা ছেলেটি নিয়ে কেবল নাড়াচাড়া করে, ঘরকন্নার কাজ শাশুড়ী, ননদ, জা, এরা করে।

খ. সমাধি কাকে বলে? যেখানে মনের লয় হয়। জ্ঞানীর জড়সমাধি হয়, 'আমি' থাকে না। ভক্তিযোগের সমাধিকে চেতনাসমাধি বলে। এতে সেব্য সেবকের 'আমি' থাকে—রস রসিকের 'আমি' আস্বাদ্য-আস্বাদকের 'আমি'—ঈশ্বর সেব্য—ভক্ত সেবক; ঈশ্বর রসস্বরূপ—ভক্ত রসিক; ঈশ্বর আস্বাদ্য—ভক্ত আস্বাদক। চিনি হব না, চিনি খেতে ভালবাসি।

সমাধি ও অহং। সোনার একটু কণা, সোনার চাপে যত ঘসো না কেন, তবু একটু কণা থেকে যায়। আর যেমন বড় আগুন আর তার একটি ফুলকি। বাহ্যজ্ঞান চলে যায়, কিন্তু প্রায় তিনি একটু 'অহং' রেখে দেন—বিলাসের জন্য। আমি তুমি থাকলে তবে আস্বাদন হয়। কখন কখন সে আমিটুকুও তিনি পুঁছে ফেলেন। এর নাম জড় সমাধি—নির্বিকল্প সমাধি। তখন কি অবস্থা হয় মুখে বলা যায় না। নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গেছিল, একটু নেমেই গলে গেল। 'তদাকারকারিত'। তখন কে আর উপরে এসে সংবাদ দেবে, সমুদ্র কত গভীর!

সমাধি ও সিদ্ধির পর। লাভের পর তাঁকে সবতাতেই দেখা যায়। মানুষে তাঁর বেশী প্রকাশ। মানুষের মধ্যে সত্ত্বগুণী ভক্তের ভিতর আরও বেশী প্রকাশ—যাদের কামিনী-কাঞ্চন ভোগ করবার একেবারে ইচ্ছা নাই। সমাধিস্থ ব্যক্তি যদি

নেমে আসে, তাহলে সে কিসে মন দাঁড় করাবে? তাই কামিনীকাঞ্চনত্যাগী সত্ত্বগুণী শুদ্ধভক্তের সঙ্গ দরকার হয়। না হলে সমাধিস্থ লোক কি নিয়ে থাকে?

সমাধিতত্ত্ব। সচ্চিদানন্দ লাভ হলে সমাধি হয়। তখন কর্মত্যাগ হয়ে যায়। আমি ওস্তাদের নাম কচ্ছি এমন সময় ওস্তাদ এসে উপস্থিত, তখন আর তার নাম করবার কি প্রয়োজন। মৌমাছি ভন ভন করে কতক্ষণ? যতক্ষণ না ফুলে বসে। কিন্তু সাধকের পক্ষে কর্মত্যাগ করলে হবে না। পূজা, জপ, ধ্যান, সন্ধ্যা, কবচাদি, তীর্থ সবই করতে হয়।

লাভের পর যদি কেউ বিচার করে, সে যেমন মৌমাছি মধু পান করতে করতে আধ আধ গুন গুন করে।

সমাধির এলাকা। হাজার বিচার কর, সমাধিস্থ না হলে শক্তির এলাকা ছাড়িয়ে যাবার যো নাই। 'আমি ধ্যান করছি', 'আমি চিন্তা করছি' এ সব শক্তির এলাকার মধ্যে।

সমাধির পর দেহ। সমাধিস্থ হবার পর প্রায় শরীর থাকে না। কারু কারু লোকশিক্ষার জন্য শরীর থাকে—যেমন নারদাদির। আর চৈতন্যদেবের মতো অবতারদের। কূপ খোঁড়া হয়ে গেলে, কেউ কেউ ঝুড়ি কোদাল বিদায় করে দেয়। কেউ কেউ রেখে দেয়। —ভাবে, যদি পাড়ার কারুর দরকার হয়। এরূপ মহাপুরুষ জীবের দুঃখে কাতর। এরা স্বার্থপর নয় যে, আপনাদের জ্ঞান হলেই হ'ল। স্বার্থপর লোকের কথা তো জান। এখানে মোত বললে মুতবে না, পাছে তোমার উপকার হয়। এক পয়সার সন্দেশ দোকান থেকে আনতে দিলে চুষে চুষে এনে দেয়।

কিন্তু শক্তিবিশেষ। সামান্য আধার লোকশিক্ষা দিতে ভয় করে। হাবাতে কাঠ নিজে একরকম করে ভেসে যায়, কিন্তু একটা পাখি এসে বসলে ডুবে যায়। কিন্তু নারদাদি বাহাদুরী কাঠ। এ কাঠ নিজেও ভেসে যায়, আবার উপরে কত মানুষ, গরু হাতী পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে।

সমাধির প্রকার। সমাধি পাঁচ প্রকার: ১ম—পিঁপড়ের গতি, মহাবায়ু উঠে পিঁপড়ের মত। ২য়:—মীনের গতি। ৩য়:—তীর্যক গতি। ৪র্থ:—পাখির গতি, পাখি যেমন এ ডাল থেকে ও ডালে যায়। ৫ম:—কপিবৎ, বানরের গতি, মহাবায়ু যেন লাফ দিয়ে মাথায় উঠে গেল আর সমাধি হ'ল।

আবার দু রকম আছে; ১ম—স্থিত সমাধি; একেবারে বাহ্যশূন্য; অনেকক্ষণ হয়ত অনেকদিন রহিল। ২য়:—উন্মনা সমাধি; হঠাৎ মনটা চারিদিক থেকে কুড়িয়ে এনে ঈশ্বরেতে যোগ করে দেওয়া।

সমাধির প্রকার ও প্রকরণ। বিষয়চিন্তা মনকে সমাধিস্থ হতে দেয় না।

একেবারে বিষয়বুদ্ধি ত্যাগ হলে স্থিত-সমাধি হয়। আমার স্থিত-সমাধিতে দেহ ত্যাগ হতে পারে, কিন্তু ভক্তি ভক্ত নিয়ে একটু থাকবার বাসনা আছে। তাই একটু দেহের উপরেও মন আছে।

আর এক আছে উন্মনা-সমাধি। ছড়ানো মন হঠাৎ কুড়িয়ে আনা। বেশীক্ষণ এ

সমাধি থাকে না, বিষয়চিন্তা এসে ভঙ্গ হয়—যোগীর যোগ ভঙ্গ হয়।

ও দেশে দেয়ালের ভিতর গর্তে নেউল থাকে। গর্তে যখন থাকে বেশ আরামে থাকে। কেউ কেউ ন্যাজে ইট বেঁধে দেয়—তখন ইটের জোরে গর্ত থেকে বেরিয়ে পড়ে। যতবার গর্তের ভিতর গিয়ে আরামে বসবার চেষ্টা করে—ততবারই ইটের জোরে বাইরে এসে পড়ে। বিষয়-চিন্তা এমনি—যোগীকে যোগভ্রষ্ট করে।

বিষয়ী লোকদের এক একবার সমাধির অবস্থা হতে পারে। সূর্যোদয়ে পদ্ম ফোটে, কিন্তু সূর্য মেঘেতে ঢাকা পড়লে আবার পদ্ম মুদিত হয়ে যায়। বিষয় মেঘে।

সমাধিস্থ হওয়া। থিয়েটার-এ অভিনয় দেখ নাই? লোক সব পরস্পর কথা কচ্ছে, এমন সময় পর্দা উঠে গেল; তখন সকলের সমস্ত মনটা অভিনয়ে যায়; আর বাহ্যদৃষ্টি থাকে না—এরই নাম সমাধিস্থ হওয়া।

আবার পর্দা পড়ে গেলে বাহিরে দৃষ্টি। মায়ারূপ যবনিকা পড়ে গেলে আবার মানুষ বহির্মুখ হয়।

সরলতা। দেখছো না, ভগবান যেখানে অবতার হয়েছেন, সেইখানেই সরলতা। দশরথ কত সরল। নন্দ—শ্রীকৃষ্ণের বাবা কত সরল। লোকে বলে, আহা কি স্বভাব, ঠিক যেন নন্দ ঘোষ।

সরলতা ও বিশ্বাস। সরল না হলে ঈশ্বরে চট করে বিশ্বাস হয় না। বিষয়-বুদ্ধি থেকে ঈশ্বর অনেক দূরে। বিষয়-বুদ্ধি থাকলে নানা সংশয় উপস্থিত হয়, আর নানা রকম অহংকার এসে পড়ে—পাণ্ডিত্যের অহংকার, ধনের অহংকার, এই সব। ইনি (ডাক্তার) কিন্তু সরল।

সর্বধর্ম সমন্বয়—যদি বল কোন মূর্তির চিন্তা করবে; যে মূর্তি ভাল লাগে তারই ধ্যান করবে। কিন্তু জানবে যে সবই এক।

কারুর উপর বিদ্বেষ করতে নাই। শিব, কালী, হরি—সবই একেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ। যে এক করেছে সেই ধন্য।

বাহিঃ শৈব, হৃদে কালী, মুখে হরিবোল।

সর্বভূতে ঈশ্বর। 'ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন' দেখ।

সহজ অবস্থা। দ্রঃ বাউলমতে।

সহবাস। সহবাস স্বদারার সঙ্গে, তাতে দোষ নেই।

সহ্যগুণ। সহ্যগুণের চেয়ে আর গুণ নেই। যে সয়, সেই রয়। যে না সয় সে নাশ হয়। সকল বর্ণের মধ্যে 'স' তিনটি—শ, ষ, স,। সকলের সহ্যগুণ থাকা চাই। সতের রাগ কি রকম জান? যেমন জলের দাগ। জলে একটা দাগ দিলে তখনই যেমন আবার মিলিয়ে যায় তেমনি সতের রাগ হয়, আর তখনই থেমে যায়। ক্রোধে চণ্ডাল, ক্রোধের বশীভূত হতে আছে? হীনবুদ্ধি লোক কত কি অন্যায় কথা বলে, তা নিয়ে বিবাদ বিসম্বাদ করতে গেলে ওতেই জীবনটা কাটাতে হয়। ঐ সব জায়গায় ভাববি লোক না পোক (পোকা), ওদের কথা উড়িয়ে দিবি।

সাকার নিরাকার দ্বন্দ্ব। ক. তাঁর ইতি করা যায় না। তিনি নিরাকার আবার

সাকার। ভক্তের জন্য তিনি সাকার। যারা জ্ঞানী অর্থাৎ জগৎকে যাদের স্বপ্নবৎ মনে হয়েছে, তাদের পক্ষে তিনি নিরাকার। ভক্ত জানে আমি একটি জিনিস, জগৎ একটি জিনিস। তাই ভক্তের ঈশ্বর 'ব্যক্তি' হয়ে দেখা দেন। জ্ঞানী—যেমন বেদান্তবাদী—কেবল নেতি নেতি বিচার করে। বিচার করে জ্ঞানীর বোধে বোধ হয় যে, 'আমি মিথ্যা জগৎও মিথ্যা—স্বপ্নবৎ।' জ্ঞানী ব্রহ্মকে বোধে বোধ করে। তিনি যে কি মুখে বলতে পারে না।

কি রকম জান? যেন সচ্চিদানন্দ সমুদ্র—কূল-কিনারা নাই—ভক্তিহিমে স্থানে স্থানে জল বরফ হয়ে যায়—বরফ আকারে জমাট বাঁধে। অর্থাৎ ভক্তের কাছে তিনি ব্যক্তভাবে, কখন কখন সাকার রূপ ধরে থাকেন। জ্ঞান-সূর্য উঠলে সে বরফ গলে যায়, তখন আর ঈশ্বরকে ব্যক্তি বলে বোধ হয় না—তাঁর রূপও দর্শন হয় না। কি তিনি মুখে বলা যায় না। কে বলবে? যিনি বলবেন, তিনিই নাই। তাঁর 'আমি' আর খুঁজে পান না।

দ্রঃ 'দৃঢ় হও', সচ্চিদানন্দ সমুদ্র বিশ্বাস।

খ. হাঁ, ঈশ্বর সাকার আবার নিরাকার, আবার সাকার-নিরাকারেরও পার। তাঁর ইতি করা যায় না।

গ. জ্ঞানীরা নিরাকার চিন্তা করে। তারা অবতার মানে না। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করছেন, তুমি পূর্ণ ব্রহ্ম; কৃষ্ণ অর্জুনকে বল্লেন, আমি পূর্ণ ব্রহ্ম কি না দেখবে এস। এই বলে একটা জায়গায় নিয়ে গিয়ে বল্লেন, তুমি কি দেখছ? অর্জুন বল্লে, আমি এক বৃহৎ গাছ দেখছি—তাতে থোলো থোলো কালোজামের মতো ফল ফলে রয়েছে। কৃষ্ণ বল্লেন, আরো কাছে এসে দেখ দেখি ও থোলো থোলো কালো ফল নয়—থোলো থোলে কৃষ্ণ অসংখ্য ফলে রয়েছে—আমার মতো। অর্থাৎ সেই পূর্ণব্রহ্মরূপ বৃক্ষ থেকে অসংখ্য অবতার হয়ে যাচ্ছে।

কবীর দাসের নিরাকারের উপর খুব ঝোঁক ছিল। কৃষ্ণের কথায় কবীর দাস বলত, ওঁকে কি ভজব?—গোপীরা হাততালি দিত আর উনি বানর নাচ নাচতেন। (সহাস্যে) আমি সাকারবাদীর কাছে সাকার আবার নিরাকারবাদীর কাছে নিরাকার।

দ্রঃ কুবীর গোঁসাই। যিনি সাকার তিনিই নিরাকার। যশোদা ও নিরাকার-সাকার তত্ত্ব।

ঘ. সাকার পূজা, মাটিতে গড়া ঠাকুর পূজা, এ সব কি ভাল? তোমরা সাকার মান না, তা বেশ; তোমাদের পক্ষে মূর্তি নয়, ভাব। তোমরা টানটুকু নেবে, যেমন কৃষ্ণের উপর রাধার টান; ভালবাসা। সাকারবাদীরা যেমন মা কালী, মা দুর্গার পূজা করে, 'মা' 'মা' বলে কত ডাকে কত ভালবাসে, সেই ভাবটি তোমরা লবে, মূর্তি না-ই বা মানলে।

সাকার নিরাকার সমন্বয়। দুই সত্য। সাকার নিরাকার দুই সত্য। শুধু নিরাকার বলা কিরূপ জান? যেমন রোশনচৌকির একজন পোঁ ধরে থাকে—তার বাঁশীর সাত ফোকর সত্ত্বেও। কিন্তু আর একজন দেখ কত রাগ-রাগিণী বাজায়! সেরূপ সাকারবাদীরা দেখ ঈশ্বরকে কত ভাবে সম্ভোগ করে। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর—নানাভাবে।

কি জান, অমৃতকুণ্ডে কোনও রকমে পড়া। তা স্তব করেই হোক অথবা কেউ ধাক্কা মেরেছে আর তুমি কুণ্ডে পড়ে গেছ, একই ফল। দুই জনেই অমর হবে।

ব্রাহ্মদের পক্ষে জল বরফ উপমা ঠিক। সচ্চিদানন্দ যেমন অনন্ত জলরাশি। মহা-সাগরের জল, ঠাণ্ডা দেশে স্থানে স্থানে যেমন বরফের আকার ধারণ করে, সেই-রূপ ভক্তিহিমে সেই সচ্চিদানন্দ (সগুণ ব্রহ্ম) ভক্তের জন্য সাকার রূপ ধারণ করেন। ঋষিরা সেই অতীন্দ্রিয় চিন্ময় রূপ দর্শন করেছিলেন আবার তাঁর সঙ্গে কথা কয়েছিলেন। ভক্তের প্রেমের শরীর, 'ভাগবতীতনু' দ্বারা সেই চিন্ময় রূপ দর্শন হয়।

আবার আছে, ব্রহ্ম অবাঙ্মনসোগোচর। জ্ঞান-সূর্যের তাপে সাকার বরফ গলে যায়। ব্রহ্মজ্ঞানের পর, নির্বিকল্প সমাধির পর, আবার সেই অনন্ত, বাক্যমনের অতীত, অরূপ নিরাকার ব্রহ্ম।

ব্রহ্মের স্বরূপ মুখে বলা যায় না, চুপ হয়ে যায়। অনন্তকে কে মুখে বোঝাবে! পাখি যত উপরে উঠে, তার উপর আরও আছে, আপনি কি বল?

সাক্ষাৎকারের লক্ষণ। সাক্ষাৎকারের লক্ষণ কি জান? বালক স্বভাব হয়। কেন বালক স্বভাব হয়? ঈশ্বর নিজে বালক স্বভাব কি না। তাই যে তাঁকে দর্শন করে, তারও বালকস্বভাব হয়ে যায়।

সাধক (সাত্ত্বিক, রাজসিক)। সাধক নানা রকম। সাত্ত্বিক সাধনা গোপনে, সাধক সাধন ভজন গোপন করে, দেখলে প্রকৃত লোকের মতো বোধ হয়, মশারীর ভিতর ধ্যান করে।

রাজসিক সাধক বাহিরের আড়ম্বর রাখে, গলায় জপের মালা, ভেক, গেরুয়া গরদের কাপড়, সোনার দানা দেওয়া জপের মালা। যেমন সাইন বোর্ড মেরে বসা।

সাধক। প্রবর্তক-সাধক-সিদ্ধ।

সাধকের স্বভাব। দুরকম সাধক আছে : এক রকম সাধকের বানরের ছার স্বভাব, আর এক রকম সাধকের বিড়ালের ছার স্বভাব। বানরের ছা নিজে যো সো করে মাকে আঁকড়িয়ে ধরে। সেইরূপ কোন কোন সাধক মনে করে, এত জপ করতে হবে, এত ধ্যান করতে হবে, এত তপস্যা করতে হবে, তবে, ভগবানকে পাওয়া যাবে। এ সাধক নিজে চেষ্টা করে ভাগবানকে ধরতে যায়।

বিড়ালের ছা কিন্তু নিজে মাকে ধরতে পারে না। সে পড়ে কেবল মিউ মিউ করে ডাকে। মা যা করে। মা কখনও বিছানার উপর কখনও ছাদের উপর কাঠের আড়ালে, রেখে দিচ্ছে ; মা তাকে মুখে করে এখানে ওখানে লয়ে রাখে, সে নিজে মাকে ধরতে জানে না। সেইরূপ কোন কোন সাধক নিজে হিসাব করে কোন সাধন করতে পারে না—এত জপ করবো, এত ধ্যান করবো ইত্যাদি। সে কেবল ব্যাকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে তাঁকে ডাকে। তিনি তাঁর কান্না শুনে আর থাকতে পারেন না, এসে দেখা দেন।

সাধন ও সিদ্ধি। কেবল শুনলে কি হবে? কিছু করো।

সিদ্ধি সিদ্ধি মুখে বললে কি হবে ? তাতে কি নেশা হয় ?
সিদ্ধি বেটে গায়ে মাখলেও নেশা হয় না। কিছু খেতে হয়। কোনটা একচল্লিশ নম্বরের সুতা, কোনটা চল্লিশ নম্বরের—সুতোর ব্যবসা না করলে এ সব কি বলা যায় ? যাদের সুতার ব্যবসা আছে, তাদের পক্ষে অমুক নম্বরের সুতা দেওয়া কিছু শক্ত নয়। তাই বলি, কিছু সাধন কর। তখন স্থূল সূক্ষ্ম,কারণ মহাকারণ কাকে বলে সব বুঝতে পারবে।

প্রকৃত সাধন। দ্রঃ মন মুখ এক।

সাধন চাই। ক. সাধনের খুব দরকার, ফস করে কি আর ঈশ্বর দর্শন হয় ?
একজন জিজ্ঞাসা করলে, কৈ ঈশ্বরকে দেখতে পাই না কেন ? তা মনে উঠলো, বললুম বড়মাছ ধরবে, তার আয়োজন কর। চারা (চার) কর। হাতসুতো, ছিপ যোগাড় কর। গন্ধ পেয়ে, গম্ভীর জল থেকে মাছ আসবে। জল নড়লে টের পাবে, বড় মাছ এসেছে।
মাখন খেতে ইচ্ছা। তা দুধে আছে মাখন, দুধে আছে মাখন—করলে কি হবে ? খাটতে হয় তবে মাখন উঠে। ঈশ্বর আছেন, ঈশ্বর আছেন, বললে কি ঈশ্বরকে দেখা যায় ? সাধন চাই।
খ. অন্তরে কি আছে জানবার জন্য একটু সাধন চাই।
প্রথমটা একটু উঠে পড়ে লাগতে হয়। তারপর আর বেশী পরিশ্রম করতে হবে না। যতক্ষণ ঢেউ, ঝড়, তুফান আর বাঁকের কাছ দিয়ে যেতে হয়, ততক্ষণ মাঝির দাঁড়িয়ে হাল ধরতে হয়—সেইটুকু পার হয়ে গেলে আর না। যদি বাঁক পার হল আর অনুকূল হাওয়া বইল তখন মাঝি আরাম করে বসে, হালে হাতটা ঠেকিয়ে রাখে—তারপর পাল টাঙ্গাবার বন্দোবস্ত করে তামাক সাজতে বসে। কামিনী-কাঞ্চনের ঝড় তুফানগুলো কাটিয়ে গেলে তখন শান্তি।
কারু কারু যোগীর লক্ষণ দেখা যায়। কিন্তু তাদেরও সাবধান হওয়া উচিত। কামিনী-কাঞ্চনই যোগের ব্যাঘাত। যোগভ্রষ্ট হয়ে সংসারে এসে পড়ে—হয়ত ভোগের বাসনা কিছু ছিল। সেইগুলো হয়ে গেলে আবার ঈশ্বরের দিকে যাবে, —আবার সেই যোগের অবস্থা। সটকা কল জান ?"
দ্রঃ ভাবাশ্রয়

সাধনপন্থা কলিযুগে। জ্ঞানযোগ ভারী কঠিন। দেহাত্মবুদ্ধি না গেলে জ্ঞান হয় না। কলিযুগে অন্নগত প্রাণ—দেহাত্মবুদ্ধি, অহংবুদ্ধি যায় না। তাই কলি যুগের পক্ষে ভক্তিযোগ। ভক্তিপথ সহজ পথ। আন্তরিক ব্যাকুল হয়ে তাঁর নাম গুণগান কর, প্রার্থনা কর ভগবানকে লাভ করবে, কোন সন্দেহ নাই।

সাধনসিদ্ধ। 'সিদ্ধ' দ্রষ্টব্য।

সাধনা : প্রত্যক্ষ জ্ঞান—শুধু শাস্ত্র পড়লে হয় না। দেখলাম বিদ্যাসাগরকে—অনেক পড়া আছে, কিন্তু অন্তরে কি আছে দেখে নাই। ছেলেদের লেখাপড়া শিখিয়ে আনন্দ। ভগবানের আনন্দের আস্বাদ পায় নাই। শুধু পড়লে কি হবে ? ধারণা কই ? পাঁজিতে লিখেছে, বিশ আড়া জল, কিন্তু পাঁজি টিপলে এক ফোঁটাও পড়ে না।

সাধনার নানা অবস্থা। বহির্মুখ অবস্থায় স্থূল দেখে। অন্নময় কোষে মন থাকে। তার পর সূক্ষ্ম শরীর। লিঙ্গ শরীর। মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষে মন থাকে। তার পর কারণ শরীর; যখন মন কারণ শরীরে আসে, তখন আনন্দ—আনন্দময় কোষে মন থাকে। এইটি চৈতন্যদেবের—অর্ধবাহ্য দশা।

তার পর মন লীন হয়ে যায়। মনের নাশ হয়। মহাকারণে নাশ হয়। মনের নাশ হলে আর খবর নাই। এইটি চৈতন্যদেবের অন্তর্দশা।

অন্তর্মুখ অবস্থা কি রকম জান? দয়ানন্দ বলেছিল, অন্দরে এসো, কপাট বন্ধ করে। অন্দর বাড়ীতে যে-সে যেতে পারে না।

আমি দীপশিখাকে নিয়ে আরোপ করতুম। লালচে রংটাকে বলতুম স্থূল, তার ভিতর সাদা সাদা ভাগ্যটাকে বলতুম সূক্ষ্ম, সব ভিতরে কাল খড়কের মতো ভাগটাকে বলতুম কারণশরীর।

সাধনের প্রয়োজন। ঈশ্বরকে জানতে হলে, অবতারকে চিনতে গেলে, সাধনের প্রয়োজন। দীঘিতে বড় বড় মাছ আছে, চার ফেলতে হয়। দুধেতে মাখন আছে মন্থন করতে হয়। সরিষার ভিতর তেল আছে সরিষাকে পিষাতে হয়। মেথিতে হাত রাঙ্গা হয়, মেথি বাটতে হয়।

সাধু (পুটুলিওয়ালা)। দেখ বিজয়, সাধুর সঙ্গে যদি পুটলি-পাটলা থাকে, পনেরটা গাঁটওয়ালা যদি কাপড় বুচকি থাকে তাহলে তাদের বিশ্বাস করো না। আমি বটতলায় ঐ রকম সাধু দেখেছিলাম। দু'তিনজন বসে আছে, কেউ ডাল বাছছে, কেউ কেউ কাপড় সেলাই করছে, আর বড় মানুষের বাড়ির ভাণ্ডারার গল্প করছে। বলছে, আরে ও বাবুনে লাখো রুপেয়া খরচ কিয়া; সাধু লোককো বহুৎ খিলায়া—পুরী, জিলেবী, পেঁড়া, বরফী, মালপুয়া, বহুৎ চিজ তৈরী কিয়াথা।

দ্রঃ পণ্ডিত ও সাধু।

সাধুমহাত্মায় বিশ্বাস। ঐটুকু বুঝা শক্ত, তিনিই স্বরাট তিনিই বিরাট; যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা। তিনি মানুষ হতে পারেন না, এ কথা জোর করে আমরা ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে কি বলতে পারি? আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এ সব কথা কি ধারণা হতে পারে? এক সের ঘটিতে কি চার সের দুধ ধরে?

তাই সাধু মহাত্মারা যাঁরা ঈশ্বর লাভ করেছেন, তাঁদের কথা বিশ্বাস করতে হয়। সাধুরা ঈশ্বরচিন্তা লয়ে থাকেন, যেমন উকিলরা মোকদ্দমা লয়ে থাকে। তোমার কাকভুষণ্ডীর কথা কি বিশ্বাস হয়?

সাধুর প্রভেদ। জ্ঞানী সাধু আর বিজ্ঞানী সাধুর প্রভেদ আছে। জ্ঞানী সাধুর বসবার ভঙ্গী আলাদা। গোঁপে চাড়া দিয়ে বসে। কেউ এলে বলে, 'কেমন বাবু তোমার কিছু জিজ্ঞাসা আছে?'

যে ঈশ্বরকে সর্বদা দর্শন করছে, তাঁর সঙ্গে কথা কচ্চে (বিজ্ঞানী) তার স্বভাব আলাদা; কখনও জড়বৎ, কখনও পিশাচবৎ, কখনও বালকবৎ, কখনও উন্মাদবৎ। কখনও সমাধিস্থ হয়ে বাহ্যশূন্য হয়—জড়বৎ হয়ে যায়।

ব্রহ্মময় দেখে তাই পিশাচবৎ; শুচি অশুচি বোধ থাকে না। হয় তো বাহ্যে

করতে করতে কুল খাচ্ছে, বালকের মত। স্বপ্নদোষের পর অশুদ্ধি বোধ করে না—শুক্রে শরীর হয়েছে এই ভেবে।
বিষ্ঠা মূত্র জ্ঞান নাই; সব ব্রহ্মময়। ভাত ও ডাল অনেকদিন রাখলে বিষ্ঠার মতন হয়ে যায়।
আবার উন্মাদবৎ; তার রকম সকম দেখে লোকে মনে করে পাগল।
আবার কখনও বালকবৎ; কোন পাশ নেই, লজ্জা, ঘৃণা, সংকোচ প্রভৃতি।
ঈশ্বর দর্শনের পর এই অবস্থা। যেমন চুম্বকের পাহাড়ের কাছ দিয়ে জাহাজ যাচ্ছে, জাহাজের স্ক্রু, পেরেক আলগা হয়ে খুলে যায়। ঈশ্বর দর্শনের পর কাম ক্রোধাদি আর থাকে না।

সাধুর লক্ষণ। যাঁর মন প্রাণ অন্তরাত্মা ঈশ্বরে গত হয়েছে, তিনিই সাধু। যিনি কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী, তিনিই সাধু। যিনি সাধু তিনি স্ত্রীলোককে ঐহিক চক্ষে দেখেন না, সর্বদাই তাদের অন্তরে থাকেন—যদি স্ত্রীলোকের কাছে আসেন, তাঁকে মাতৃবৎ দেখেন ও পূজা করেন। সাধু সর্বদা ঈশ্বর চিন্তা করেন ঈশ্বরীয় কথা বই কথা কন না। আর সর্বভূতে ঈশ্বর আছেন জেনে তাদের সেবা করেন। মোটামুটি এইগুলি সাধুর লক্ষণ।

সাধুর শ্রেণী। সাধুর তিন শ্রেণী। উত্তম, মধ্যম, অধম। উত্তম যারা খাবার জন্য চেষ্টা করে না। মধ্যম ও অধম, যেমন দন্ডী-ফন্ডী। মধ্যম, তারা 'নমো নারায়ণ' বলে দাঁড়ায়। যারা অধম তারা না দিলে ঝগড়া করে।
উত্তম শ্রেণীর সাধুর অজগরবৃত্তি। বসে খাওয়া পাবে। অজগর নড়ে না। একটি ছোকরা সাধু—বাল-ব্রহ্মচারী, ভিক্ষা করতে গেছিল, একটি মেয়ে এসে ভিক্ষা দিলে। তার বক্ষে স্তন দেখে সাধু মনে করলে বুকে ফোঁড়া হয়েছে, তাই জিজ্ঞাসা করলে। পরে বাড়ির গিন্নিরা বুঝিয়ে দিলে যে, ওর গর্ভে ছেলে হবে বলে ঈশ্বর স্তনেতে দুগ্ধ দিবেন; তাই ঈশ্বর আগে থাকতে তার বন্দোবস্ত করচেন। এই কথা শুনে ছোকরা সাধুটি অবাক। তখন সে বললে, তবে আমার ভিক্ষে করবার দরকার নেই; আমার জন্যও খাবার আছে।

সাধুর হরিনাম। হরিনাম দ্রষ্টব্য।

সাধুসঙ্গ। যে কর্মই লোকে করুক না কেন, সংসারী ব্যক্তির মাঝে মাঝে সাধুসঙ্গ বড় দরকার। ঈশ্বরে ভক্তি থাকলে লোকে সাধুসঙ্গ আপনি খুঁজে লয়। আমি উপমা দিই—গাঁজাখোর গাঁজাখোরের সঙ্গে থাকে, অন্য লোক দেখলে মুখ নীচু করে চলে যায়, বা লুকিয়ে পড়ে। কিন্তু আর একজন গাঁজাখোর দেখলে মহা আনন্দ। হয়তো কোলাকুলি করে। আবার শকুনি শকুনির সঙ্গে থাকে।
সৎসঙ্গ দ্রষ্টব্য।
খ. মাঝে মাঝে সাধুসঙ্গ ভাল। রোগ মানুষের লেগেই আছে। সাধুসঙ্গে অনেক উপশম হয়।
দ্র: গৃহত্যাগে প্রয়োজন কি ?

সাধুসঙ্গে উপকার। ঈশ্বরে অনুরাগ হয়। তাঁর উপর ভালবাসা হয়। ব্যাকুলতা না এলে কিছুই হয় না। সাধুসঙ্গ করতে করতে ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল

হয়। যেমন বাড়িতে কারুর অসুখ হ'লে সর্বদাই মন ব্যাকুল হয়ে থাকে, কিসে রোগী ভাল হয়। আবার কারু যদি কর্ম যায়, সে ব্যক্তি যেমন আফিসে আফিসে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, ব্যাকুল হতে হয় সেইরূপ। যদি কোন আফিসে বলে কর্ম খালি নেই, আবার তার পরদিন এসে জিজ্ঞাসা করে, আজ কি কর্ম খালি হয়েছে ?

সাধুসঙ্গ করলে আর একটি উপকার হয়। সদসৎ বিচার। সৎ, নিত্য পদার্থ অর্থাৎ ঈশ্বর। অসৎ অর্থাৎ অনিত্য। অসৎপথে মন গেলেই বিচার করতে হয়। হাতী পরের কলাগাছ খেতে শুঁড় বাড়ালে সেই সময় মাহুত ডাঙ্গস মারে।

সাধুসঙ্গে ব্যর্থতা। সাধুর কমণ্ডলু চার ধাম ঘুরে আসে, কিন্তু যেমন তেতো, তেমনি তেতো থাকে। মলয়ের হাওয়া যে গাছে লাগে, সে সব চন্দন হয়ে যায়! কিন্তু শিমুল, অশ্বত্থ, আমড়া এরা চন্দন হয় না। কেউ কেউ সাধুসঙ্গ করে, গাঁজা খাবার জন্য। সাধুরা গাঁজা খায় কি না, তাই তাদের কাছে এসে বসে গাঁজা সেজে দেয় আর প্রসাদ পায়।

সাম্প্রদায়িকতা বর্জন। দ্রঃ বিদ্বেষ ভাব বর্জন।

সার্কাস ও সংসার। দেখ্‌লে, বিবি কেমন এক পায়ে ঘোড়ার উপর দাঁড়িয়ে আছে, আর ঘোড়া বন বন করে দৌড়ুচ্ছে! কত কঠিন, অনেকদিন ধরে অভ্যাস করছে, তবে ত হয়েছে। একটু অসাবধান হ'লেই হাত-পা ভেঙে যাবে, আবার মৃত্যুও হতে পারে। সংসার করা ঐরূপ কঠিন। অনেক সাধন-ভজন করলে ঈশ্বরের কৃপায় কেউ কেউ পেরেছে। অধিকাংশ লোক পারে না। সংসার করতে-গিয়ে আরও বদ্ধ হয়ে যায়, আরও ডুবে যায়, মৃত্যু-যন্ত্রণা হয়! কেউ কেউ, যেমন জনকাদি অনেক তপস্যার বলে সংসার করেছিলেন। তাই সাধন-ভজন খুব দরকার, তা না হলে সংসারে ঠিক থাকা যায় না।

দ্রঃ অভ্যাস।

সিদ্ধ। সিদ্ধ কে ? যার নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি হয়েছে যে ঈশ্বর আছেন, আর তিনিই সব করছেন ; যিনি ঈশ্বরকে দর্শন করছেন।

দ্রঃ প্রবর্তক। প্রবর্তক-সাধক-সিদ্ধ। সিদ্ধের সিদ্ধ। রামপ্রসাদ। বাউলমতে।

সিদ্ধ [সাধনসিদ্ধ কৃপাসিদ্ধ]। কেউ কেউ অনেক কষ্টে ক্ষেত্রে জল ছেঁচে আনে ; আনতে পারলে ফসল হয়। কারু জল ছেঁচতে হ'ল না, বৃষ্টির জলে ভেসে গেল। কষ্ট ক'রে জল আনতে হ'ল না। এই মায়ার হাত থেকে এড়াতে গেলে কষ্ট করে সাধন করতে হয়। কৃপাসিদ্ধের কষ্ট করতে হয় না। সে কিন্তু দু এক জনা।

আর নিত্যসিদ্ধ, এদের জন্মে জন্মে জ্ঞান চৈতন্য হয়ে আছে। যেমন ফোয়ারা বুজে আছে। মিস্ত্রী এটা খুলতে ওটা খুলতে ফোয়ারাটাও খুলে দিলে, আর ফর ফর করে জল বেরুতে লাগল। নিত্যসিদ্ধের প্রথম অনুরাগ যখন লোকে দেখে, তখন অবাক হয়। বলে এত ভক্তি বৈরাগ্য প্রেম কোথায় ছিল।

সিদ্ধ অবস্থায়। সব ভাব সিদ্ধ অবস্থায় ভাল লাগে। সে অবস্থায় কামগন্ধ থাকবে না। বৈষ্ণব শাস্ত্রে আছে চণ্ডীদাস ও রজকিনীর কথা—তাদের ভালবাসা

কামগন্ধ বিবর্জিত।

এ অবস্থায় প্রকৃতিভাব। আপনাকে পুরুষ বলে বোধ থাকে না। রূপ গোস্বামী মীরাবাঈ স্ত্রীলোক বলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান নাই। মীরাবঈ বলে পাঠালেন, 'শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ, বৃন্দাবনে সকলেই সেই পুরুষের দাসী; গোস্বামীর পুরুষ অভিমান করা কি ঠিক হয়েছে?'

দ্রঃ ভগবান দর্শনের পর।

সিদ্ধাই। ক. যারা শিষ্য করে বেড়ায়, তারা হালকা থাকের লোক। আর যারা সিদ্ধাই অর্থাৎ নানা রকম শক্তি চায় তারাও হালকা থাক। যেমন গঙ্গা হেঁটে পার হয়ে যাব, এই শক্তি। অন্য দেশে একজন কি কথা বলছে তাই বলতে পারা, এই এক শক্তি। ঈশ্বরে শুদ্ধ ভক্তি হওয়া এই সব লোকের ভারী কঠিন।

খ. সিদ্ধাই থাকা এক মহাগোল। ন্যাঙটা আমায় শিখালে—একজন সিদ্ধ সমুদ্রের ধারে বসে আছে, এমন সময় একটা ঝড় এলো। ঝড়ে তার কষ্ট হ'ল বলে সে বললে ঝড় থেমে যাক। তার বাক্য মিথ্যে হবার নয়। একখানা জাহাজ পালভরে যাচ্ছিল। ঝড় হঠাৎ থামাও যা আর জাহাজ টুপ করে ডুবে গেল। এক জাহাজ লোক সেই সঙ্গে ডুবে গেল। এখন এতগুলি লোক যাওয়াতে যে পাপ হ'ল, সব ওর হ'ল। সেই পাপে সিদ্ধাইও গেল, আবার নরকও হ'ল।

একটি সাধুর খুব সিদ্ধাই হয়েছিল, আর সেই জন্য অহঙ্কার হয়েছিল। কিন্তু সাধুটি লোক ভাল ছিল, আর তপস্যাও ছিল। ভগবান ছদ্মবেশে সাধুর বেশ ধরে একদিন তার কাছে এলেন। এসে বললেন, 'মহারাজ! শুনেছি আপনার খুব সিদ্ধাই হয়েছে'। সাধু খাতির করে তাঁকে বসালেন। এমন সময় একটা হাতী সেখান দিয়ে যাচ্ছে। তখন নূতন সাধুটি বললেন, 'আচ্ছা মহারাজ, আপনি মনে করলে এই হাতীটাকে মেরে ফেলতে পারেন?' সাধু বললেন, 'য়্যাসা হোনে শক্তা'। এই বলে ধুলো পড়ে হাতীটার গায়ে দেওয়াতে সে ছটফট করে মরে গেল। তখন যে সাধুটি এসেছে, সে বললে, 'আপনার কি শক্তি! হাতীটাকে মেরে ফেললেন!' সে হাসতে লাগল। তখন ও সাধুটি বললে, 'আচ্ছা, হাতীটাকে আবার বাঁচাতে পারেন?' সে বললে, 'ওভি হোনে শক্তা হ্যায়।' এই বলে আবার যাই ধুলো পড়ে দিলে, অমনি হাতীটা ধড়মড় করে উঠে পড়লো। তখন এ সাধুটি বললে, আপনার কি শক্তি! কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। এই যে হাতী মারলেন, আর হাতী বাঁচালেন, আপনার কি হ'ল? নিজের কি উন্নতি হ'ল? এতে কি আপনি ভগবানকে পেলেন? এই বলে সাধুটি অন্তর্ধান হলেন।

গ. সিদ্ধাইয়ের জন্য লোক পঞ্চ-মকার তন্ত্রমতে সাধন করে। কিন্তু কি হীন-বুদ্ধি! কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন, 'ভাই! অষ্টসিদ্ধির মধ্যে একটি সিদ্ধি থাকলে তোমার একটু শক্তি বাড়তে পারে—কিন্তু আমায় পাবে না।' সিদ্ধাই থাকলে মায়া যায় না—মায়া থেকে আবার অহঙ্কার। কি হীনবুদ্ধি! ঘৃণার স্থান থেকে তিন টোসা কারণ বারি খেয়ে লাভ কি হ'ল?—না, মোকদ্দমা জেতা!

সিদ্ধাই-এর অহঙ্কার। কি জান? সিদ্ধাই থাকলে অহঙ্কার হয়, ঈশ্বরকে

ভুলে যায়।

একজন বাবু এসেছিল—ট্যারা। বলে, আপনি পরমহংস তা বেশ, একটু স্বস্ত্যয়ন করতে হবে। কি হীনবুদ্ধি। 'পরমহংস'; আবার স্বস্ত্যয়ন করতে হবে। স্বস্ত্যয়ন করে ভাল করা—সিদ্ধাই। অহঙ্কারে ঈশ্বর-লাভ হয় না। অহঙ্কার কিরূপ জান? যেন উঁচু ঢিপি, বৃষ্টির জল জমে না, গড়িয়ে যায়। নীচু জমিতে জল জমে আর অঙ্কুর হয়; তারপর গাছ হয়; তারপর ফল হয়।

সিদ্ধি। সিদ্ধি কিনা বস্তু লাভ। 'অষ্টসিদ্ধি'র সিদ্ধি নয়। সে (অণিমা লঘিমাদি) সিদ্ধির কথা কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন, ভাই, যদি দেখ যে, অষ্টসিদ্ধির একটি সিদ্ধি কারও আছে, তাহলে জেনো যে, সে ব্যক্তি আমাকে পাবে না, কেননা, সিদ্ধি থাকলেই অহঙ্কার থাকবে, আর অহঙ্করে লেশ থাকলে ভগবানকে পাওয়া যায় না।

সিদ্ধের রকম ভেদ। কারু কারু সাধন না করেও ঈশ্বর লাভ হয়—তাদের নিত্যসিদ্ধ বলে। যারা জপ-তপাদি সাধন করে ঈশ্বর লাভ করেছে তাদের বলে সাধনসিদ্ধ। আবার কেউ কৃপাসিদ্ধ—যেমন হাজার বছরের অন্ধকার ঘর, প্রদীপ নিয়ে গেলে একক্ষণে আলো হয়ে যায়।

আবার আছে হঠাৎসিদ্ধ—যেমন গরীবের ছেলে বড় মানুষের নজরে পড়ে গেছে। বাবু তাকে মেয়ে বিয়ে দিলে, সেই সঙ্গে বাড়ি ঘর গাড়িদাস-দাসী সব হয়ে গেল।

আর আছে স্বপ্নসিদ্ধ—স্বপ্ন দর্শন হ'ল।

সিদ্ধের সিদ্ধ। সিদ্ধের সিদ্ধ কে? যিনি তাঁর সঙ্গে আলাপ করেছেন। শুধু দর্শন নয়; কেউ পিতৃভাবে, কেউ বাৎসল্যভাবে, কেউ সখ্যভাবে, কেউ মধুর ভাবে; তাঁর সঙ্গে আলাপ করেছেন।

কাঠে আগুন নিশ্চিত আছে, এই বিশ্বাস; আর কাঠ থেকে আগুন বার করে ভাত রেঁধে, খেয়ে শান্তি আর তৃপ্তি লাভ করা; দুটি ভিন্ন জিনিস।

ঈশ্বরীয় অবস্থার ইতি করা যায় না। তারে বাড়া তারে বাড়া আছে।

[সঙ্গে 'প্রবর্তক' ও সিদ্ধ' দ্রষ্টব্য]

সুখ-দুঃখ। কি জান, সুখ-দুঃখ দেহধারণের ধর্ম। কবিকঙ্কণ চন্ডীতে আছে যে, কালুবীর জেলে গিছিল; তার বুকে পাষাণ দিয়ে রেখেছিল।—কিন্তু কালুবীর ভগবতীর বরপুত্র। দেহধারণ করলেই সুখ-দুঃখ ভোগ আছে।

শ্রীমন্ত বড় ভক্ত। আর তার মা খুল্লনাকে ভগবতী কত ভালবাসতেন। সেই শ্রীমন্তের কত বিপদ। মশানে কাটতে নিয়ে গিছিল।

একজন কাঠুরে পরম ভক্ত, ভগবতীর দর্শন পেলে; তিনি কত ভালবাসলেন, কত কৃপা করলেন। কিন্তু তার কাঠুরের কাজ আর ঘুচলো না। সেই কাঠ কেটে আবার খেতে হবে। কারাগারে চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী ভগবান দেবকীর দর্শন হ'ল। কিন্তু কারাগার ঘুচলো না।

কি জান, প্রারব্ধ কর্মের ভোগ। যে ক'দিন ভোগ আছে, দেহ ধারণ করতে হয়। একজন কাণা গঙ্গাস্নান করলে। পাপ সব ঘুচে গেল। কিন্তু কাণাচোখ আর

ঘুচলো না। পূর্বজন্মের কর্ম ছিল তাই ভোগ।

সুরা। ভজনানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, এই আনন্দই সুরা ; প্রেমের সুরা। মানবজীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরে প্রেম, ঈশ্বরকে ভালবাসা। ভক্তিই সার। জ্ঞান বিচার করে ঈশ্বরকে জানা বড়ই কঠিন।

সুতোর আঁস। কি জান, কামনা থাকলে ভগবানকে পাওয়া যায় না। ধর্মের সূক্ষ্ম গতি। সূঁচে সুতা পরাচ্ছ—কিন্তু সুতার ভিতর একটু আঁস থাকলে ছুঁচের ভিতর প্রবেশ করবে না।

দ্রঃ ঈশ্বর লাভের উপায়।

সৃষ্টির বিচিত্রতা। তিনি ভাল লোক করেছেন, মন্দ লোক করেছেন, ভক্ত করেছেন, অভক্ত করেছেন—বিশ্বাসী করেছেন, অবিশ্বাসী করেছেন। তাঁর লীলার ভিতর সব বিচিত্রতা, তাঁর শক্তি কোনখানে বেশী প্রকাশ, কোনখানে কম প্রকাশ। সূর্যের আলো মৃত্তিকার চেয়ে জলে বেশী প্রকাশ, আবার জল অপেক্ষা দর্পণে বেশী প্রকাশ। আবার ভক্তদের ভিতর থাক থাক আছে, উত্তম ভক্ত, মধ্যম ভক্ত, অধম ভক্ত। গীতাতে এ সব আছে।

সৃষ্টির বীজ। 'ঈশ্বরের কাজ' দ্রষ্টব্য।

সৃষ্টির বৈচিত্র্যের কারণ। ঈশ্বরের সৃষ্টিতে নানা রকম জীবজন্তু, গাছপালা আছে। জানোয়ারের মধ্যে ভাল আছে, মন্দ আছে, বাঘের মত হিংস্র জন্তুও আছে। গাছের মধ্যে অমৃতের ন্যায় ফল হয় এমন আছে, আবার বিষ ফলও আছে। সংসারী জীব আছে, আবার ভক্ত আছে। তাঁর জগতে সকল রকম আছে। সাধু লোকও তিনি করেছেন, দুষ্ট লোকও তিনি করেছেন, সদ্‌বুদ্ধি তিনিই দেন, অসদ্‌ বুদ্ধিও তিনিই দেন। দুষ্ট লোকেরও দরকার আছে। একটি তালুকের প্রজারা বড়ই দুর্দান্ত ছিল। তখন গোলক চৌধুরীকে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল। তাঁর নামে প্রজারা কাঁপতে লাগল—এত কঠোর শাসন। সবই দরকার। সীতা বললেন, রাম, অযোধ্যায় সব যদি অট্টালিকা হ'ত তো বেশ হ'ত, অনেক বাড়ি দেখছি ভাঙা পুরানো। রাম বললেন, সীতা, সব বাড়ি সুন্দর থাকলে মিস্ত্রীরা কি করবে ? ঈশ্বর সব রকম করেছেন—ভালো গাছ, বিষগাছ আবার আগাছাও করেছেন।

দ্রঃ লীলা সব নিয়ে।

সেজোবাবু। (মথুর) দ্রঃ 'ধর্মবিদ্বেষ', 'ঈশ্বরের ঐশ্বর্য বর্ণনা'।

সেব্য-সেবক। সোঽহং না সেব্য-সেবক ?

সংসারীর পক্ষে সেব্য-সেবক খুব ভাল। সব করা যাচ্ছে, সে-অবস্থায় 'আমিই সেই' এ ভাব কেমন করে আসে। যে বলে আমিই সেই, তার পক্ষে জগৎ স্বপ্নবৎ, তার নিজের দেহ-মনও স্বপ্নবৎ, তার আমিটা পর্যন্ত স্বপ্নবৎ, কাজে কাজেই সংসারের কাজ সে করতে পারে না। তা সেবক ভাব দাস ভাব, খুব ভালো। হনুমানের দাস-ভাব ছিল। রামকে হনুমান বলেছিলেন, 'রাম, কখন ভাবি তুমি পূর্ণ, আমি অংশ ; তুমি প্রভু আমি দাস ; আর যখন তত্ত্বজ্ঞান হয়, তখন দেখি তুমিই আমি, আমিই তুমি।

তত্ত্বজ্ঞানের সময় সোঽহং হতে পারে, কিন্তু সে দূরের কথা।

সোঽহং। দ্রঃ আমিই সেই।

সোঽহম তত্ত্বের সমালোচনা। যতক্ষণ আবরণ রয়েছে, ততক্ষণ বেদান্তবাদীর সোঽহম্ অর্থাৎ 'আমিই সেই পরব্রহ্ম' এ কথা ঠিক খাটে না। জলেরই তরঙ্গ, তরঙ্গের কিছু জল নয়। যতক্ষণ আবরণ রয়েছে ততক্ষণ মা—মা বলে ডাকা ভাল। তুমি মা, আমি তোমার সন্তান ; তুমি প্রভু আমি তোমার দাস। সেব্য-সেবক ভাবই ভাল। এই দাস ভাব থেকে আবার সব ভাব আসে—শান্ত, সখ্য প্রভৃতি। মনিব যদি দাসকে ভালবাসে, তাহলে আবার তাকে বলে, আয়, আমার কাছে বস ; তুইও যা, আমিও তা। কিন্তু দাস যদি মনিবের কাছে সেধে বসতে যায়, মনিব রাগ করবে না ?

স্ত্রী। তাঁর স্ত্রীর উপর ভালবাসা হবে না ? এটি জগন্মাতার ভুবনমোহিনী মায়া। স্ত্রীকে বোধ হয় যে পৃথিবীতে অমন আপনার লোক আর হবে না—আপনার লোক, জীবনে মরণে, ইহকালে পরকালে।

এই স্ত্রী নিয়ে মানুষ কি না দুঃখ ভোগ করছে, তবু মনে করে যে এমন আত্মীয় আর কেউ নেই। কি দুরবস্থা। কুড়ি টাকা মাইনে—তিনটে ছেলে হয়েছে—তাদের ভাল করে খাওয়াবার শক্তি নাই, বাড়ির ছাদ দিয়ে জল পড়ছে, মেরামত করবার পয়সা নাই—ছেলের নতুন বই কিনে দিতে পারে না—ছেলের পৈতে দিতে পারে না—এর কাছে আট আনা ওর কাছে চার আনা ভিক্ষে করে।

বিদ্যারূপিণী যথার্থ সহধর্মিণী। স্বামীকে ঈশ্বরের পথে যেতে বিশেষ সহায়তা করে। দু-একটি ছেলের পর দুজনে ভাই-ভগিনীর মতো থাকে। দুজনেই ঈশ্বরের ভক্ত—দাস-দাসী। তাদেরসংসার, বিদ্যার সংসার। ঈশ্বরই একমাত্র আপনা লোক—অনন্তকালের আপনার। সুখে-দুঃখে তাঁকে ভুলে না—যেমন পাণ্ডবেরা।

দ্রঃ 'অবিদ্যা স্ত্রী'।

স্ত্রীই শক্তিরূপা। যত স্ত্রীলোক, সকলে শক্তিরূপা। সেই আদ্যাশক্তিই স্ত্রী হয়ে স্ত্রীরূপ ধরে রয়েছেন। অধ্যাত্মে আছে, রামকে নারদাদি স্তব করছেন, হে রাম, যত পুরুষ সব তুমি ; আর প্রকৃতির যত রূপ সীতা ধারণ করেছেন। তুমি ইন্দ্র, সীতা ইন্দ্রাণী ; তুমি শিব, সীতা শিবাণী ; তুমি নরী সীতা নারী। বেশ, আর কি বলব—যেখানে পুরুষ, সেখানে তুমি ; যেখানে স্ত্রী, সেখানে সীতা।

স্ত্রী-জাতি। বিদ্যারূপিণী স্ত্রীও আছে, আবার অবিদ্যা-রূপিণী স্ত্রীও আছে। বিদ্যারূপিণী স্ত্রী ভগবানের দিকে লয়ে যায় ; আর অবিদ্যারূপিণী ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়, সংসারে ডুবিয়ে দেয়।

তাঁর মহামায়াতে এই জগৎ সংসার। এই মায়ার ভিতর বিদ্যামায়া অবিদ্যা-মায়া দুইই আছে। বিদ্যামায়া আশ্রয় করলে সাধুসঙ্গ, জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম, বৈরাগ্য এই সব হয়। অবিদ্যা-মায়া—পঞ্চভূত আর ইন্দ্রিয়ের বিষয়, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ ; যত ইন্দ্রিয়ের ভোগের জিনিস ; এরা ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়।

স্ত্রী : ভালমন্দ বিচার। স্ত্রী (ভালমন্দ) সংসারীরা বুঝতে পারে না, কে ভাল স্ত্রী, কে মন্দ স্ত্রী ; কে বিদ্যাশক্তি, কে অবিদ্যাশক্তি। যে ভাল স্ত্রী, বিদ্যাশক্তি,

তার কাম ক্রোধ এ সব কম, ঘুম কম, স্বামীর মাথা ঠেলে দেয়। যে বিদ্যাশক্তি তার স্নেহ, দয়া, ভক্তি, লজ্জা এই সব থাকে। সে সকলেরই সেবা করে বাৎসল্য ভাবে, আর স্বামীর যাতে ভগবানে ভক্তি হয় তার সাহায্য করে। বেশী খরচ করে না, পাছে স্বামীর বেশী খাটতে হয়, পাছে ঈশ্বর চিন্তার অবসর না হয়। আবার পুরুষ মেয়ের অন্য অন্য লক্ষণ আছে। খারাপ লক্ষণ—টেরা, চোখ কোটরে, উন পাঁজর, বিড়াল চোখ, বাছুরে গাল।

স্ত্রীর ভালবাসা। আর একজন শিষ্য গুরুকে বলেছিল, 'আমার স্ত্রী বড় যত্ন করে, ওর জন্য গুরুদেব যেতে পারছি না।' শিষ্যটি হটযোগ করত। গুরু তাকেও একটি ফন্দি শিখিয়ে দিলেন। একদিন তার বাড়িতে খুব কান্নাকাটি পড়েছে। পাড়ার লোকেরা এসে দেখে, হটযোগী ঘরে আসনে বসে আছে—এঁকে বেঁকে আড়ষ্ট হয়ে। সবাই বুঝতে পারলে তার প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে। স্ত্রী আছড়ে কাঁদছে—ওগো আমাদের কি হল গো—ওগো তুমি আমাদের কি করে গেলে গো—ওগো দিদিগো এমন হবে তা জানতাম না গো। এদিকে আত্মীয় বন্ধুরা খাট এনেছে, ওকে ঘর থেকে বার করছে। এখন একটি গোল হ'ল। এঁকে বেঁকে আড়ষ্ট হয়ে থাকতে সে দরজা দিয়ে বেরুচ্ছে না। তখন একজন প্রতিবেশী একটি কাটারি লয়ে দরজার চৌকাট কাটতে লাগল। স্ত্রী অস্থির হয়ে কাঁদছিল, সে দুম্ দুম্ শব্দ শুনে দৌড়ে এল। এসে কাঁদতে কাঁদতে জিজ্ঞাসা করলে, ওগো কি হয়েছে গো? তারা বললে, ইনি বেরুচ্ছেন না তাই চৌকাট কাটছি। তখন স্ত্রী বললে, 'ওগো অমন কর্ম করো না গো—আমি এখন রাঁড় বেওয়া হলুম। আমার আর দেখবার লোক কেউ নাই; কটি নাবালক ছেলেকে মানুষ করতে হবে। এ দোয়ার গেলে আর ত হবে না। ওগো ওঁর যা হবার তা তো হয়ে গেছে—ওঁর হাত পা কেটে দাও।' তখন হটযোগী দাঁড়িয়ে পড়ল। তার তখন ঔষধের ঝোঁক চলে গেছে। দাঁড়িয়ে বলছে, 'তবে রে শালী; আমার হাত পা কাটবে।' এই বলে বাড়ি ত্যাগ করে গুরুর সঙ্গে চলে গেল। অনেকে ঢং করে শোক করে। কাঁদতে হবে জেনে আগে নৎ খোলে, আর আর গহনা সব খোলে, খুলে বাক্সের ভিতর চাবি দিয়ে রেখে দেয়। তারপর আছড়ে এসে পড়ে কাঁদে। 'ওগো, দিদি গো, আমার কি হ'ল গো।'

স্ত্রীর প্রতি কি কর্তব্য। তুমি বেঁচে থাকতে থাকতে ধর্মোপদেশ দেবে, ভরণ-পোষণ করবে। যদি সতী হয়, তোমার অবর্ত্তমানে তার খাবার যোগাড় করে রাখতে হবে।

দ্রঃ পরিবারের উপর কর্তব্য কতদিন?

স্ত্রী-সঙ্গ। স্ত্রীলোক সম্বন্ধে খুব সাবধানে না থাকলে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। তাই সংসারে কঠিন। 'কজ্জুল কি ঘরমে যেত্তা সেয়ান হোয়ে, থোড়া বুঁদ লাগে পর লাগে। যুবতী কি সাত্‌মে যেত্তা সেয়ান হোয়ে, থোড়া কাম জাগে পর জাগে।' যত শিয়ান হও না কেন, কাজলের ঘরে থাকলে গায়ে কালি লাগবে। যুবতীর সঙ্গে নিষ্কামেরও কাম হয়। তবে জ্ঞানীর পক্ষে স্বদারায় কখন কখন গমন দোষের নয়। যেমন মলমূত্র ত্যাগ তেমনিই রেতঃ ত্যাগ—পায়খানা আর মনে

নাই। আধা ছানার গোল্ডা কখন বা খেলে। সংসারীর পক্ষে তত দোষের নয়।

স্ত্রী-সঙ্গ (সন্তানবানের)। লজ্জা হয় না। ছেলে হয়ে গেছে আবার স্ত্রী-সঙ্গ ঘৃণা করে না।—পশুদের মতো ব্যবহার। নাল, রক্ত, মল, মূত্র এ সব ঘৃণা করে না। যে ভগবানের পাদপদ্ম চিন্তা করে, তার পরমাসুন্দরী রমণী চিতার ভস্ম বলে বোধ হয়। যে শরীর থাকবে না—যার ভিতর কৃমি, ক্লেদ, শ্লেষ্মা, যত প্রকার অপবিত্র জিনিস—সেই শরীর নিয়ে আনন্দ। লজ্জা হয় না।

স্ত্রী-সঙ্গ (সন্ন্যাসীর)। ছোকরাদের সাধনার অবস্থা—এখন কেবল ত্যাগ। সন্ন্যাসী স্ত্রীলোকের চিত্রপট পর্যন্ত দেখবে না। আমি ওদের বলি, মেয়েমানুষ ভক্ত হলেও তাদের সঙ্গে বসে কথা কবে না; দাঁড়িয়ে একটু কথা কবে। সিদ্ধ হলেও এইরূপ করতে হয়—নিজের সাবধানের জন্য, আর লোকশিক্ষার জন্য। আমিও মেয়েরা এলে একটু পরে বলি, তোমরা ঠাকুর দেখগে। তাতে যদি না উঠে, নিজে উঠে পড়ি। আমায় দেখে আবার সবাই শিখবে।

স্ত্রী-স্বরূপ। স্ত্রীলোক নিয়ে মায়ার সংসার করা। তাতে ঈশ্বরকে ভুলে যায়। যিনি জগতের মা, তিনিই এই মায়ার রূপ—স্ত্রীলোকের রূপ ধরেছেন। এটি ঠিক জানলে আর মায়ার সংসার করতে ইচ্ছা হয় না। সব স্ত্রীলোককে ঠিক মা বোধ হলে তবে বিদ্যার সংসার করতে পারে। ঈশ্বর দর্শন না হলে স্ত্রীলোক কি বস্তু বোঝা যায় না।

স্থূলদেহ, সূক্ষ্মদেহ। পঞ্চভূত লয়ে যে দেহ, সেইটি স্থূলদেহ। মন, বুদ্ধি, অহংকার আর চিত্ত, এই লয়ে সূক্ষ্মশরীর। যে শরীরে ভগবানের আনন্দলাভ হয়, আর সম্ভোগ হয়, সেইটি কারণ শরীর। তন্ত্রে বলে, 'ভাগবতী তনু'। সকলের অতীত 'মহাকরণ' (তুরীয়) মুখে বলা যায় না।

স্বতঃসিদ্ধ বৈধীভক্তি। 'প্রেমাভক্তির নানারূপ' দ্রষ্টব্য।

স্বপ্ন ও জাগরণ (বেদান্তমতে)। দ্রঃ 'জাগরণ ও স্বপ্ন (বেদান্তমতে)'

স্বাধীন ইচ্ছা। ক. তিনি সব কচ্ছেন। যদি বল তা হলে লোকে পাপ করতে পারে। তা নয়—যার ঠিক বোধ হয়েছে—'ঈশ্বর কর্তা আমি অকর্তা তার আর বেতালে পা পড়ে না।

ইংলিশম্যান-রা যাকে স্বাধীন ইচ্ছা (Free Will) বলে, সেই স্বাধীন ইচ্ছাবোধ তিনিই দিয়ে রাখেন।

যারা তাঁকে লাভ করে নাই, তাদের ভিতর ঐ স্বাধীন ইচ্ছাবোধ না দিলে পাপের বৃদ্ধি হ'ত। নিজের দোষে পাপ কচ্ছি, এ বোধ যদি তিনি না দিতেন, তা হলে পাপের আরও বৃদ্ধি হ'ত।

যারা তাঁকে লাভ করেছে, তারা জানে দেখতেই 'স্বাধীন ইচ্ছা'—বস্তুতঃ তিনিই যন্ত্রী আমি যন্ত্র। তিনি ইঞ্জিনিয়ার, আমি গাড়ী।

খ. সকলই ঈশ্বরাধীন। তাঁরই লীলা। তিনি নানা জিনিস করেছেন। ছোট, বড়, বলবান, দুর্বল, ভাল, মন্দ। ভাললোক; মন্দলোক। এ সব তাঁর মায়া; খেলা। এই দেখ না, বাগানের সব গাছ কিছু সমান হয় না।

যতক্ষণ ঈশ্বরকে লাভ না হয়, ততক্ষণ মনে হয় আমরা স্বাধীন। এ ভ্রম তিনিই

রেখে দেন, তা না হলে পাপের বৃদ্ধি হ'ত। পাপকে ভয় হ'ত না। পাপের শাস্তি হ'ত না।

স্বরূপে থাকার উপায়। কিরূপে স্বস্বরূপে থাকা যায় ন্যাংটা, উপদেশ দি তো—মন বুদ্ধিতে লয় করো, বুদ্ধি আত্মাতে লয় করো, তবে স্বস্বরূপে থাকবে।

স্মরণ মনন। বিষয়ীদের পূজা, জপ, তপ, যখনকার তখন। যারা ভগবান বই জানে না তারা নিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর নাম করে। কেউ মনে মনে সর্বদাই 'রাম', 'ওঁ রাম' জপ করে। জ্ঞানপথের লোকেরাও 'সোহং' জপ করে। কারও কারও সর্বদাই জিহ্বা নড়ে। সর্বদাই স্মরণ মনন থাকা উচিত।

দ্রঃ জপ

ষড়চক্র ভেদ। কামিনী-কাঞ্চনে মন থাকলে যোগ হয় না। সাধারণ জীবের মন লিঙ্গ, গুহ্য ও নাভিতে সাধ্য-সাধনার পর কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রতা হন। ঈড়া, পিঙ্গলা আর সুষুম্ন নাড়ী; সুষুম্নার মধ্যে ছটি পদ্ম আছে। সর্বনীচে মূলাধার। তারপর স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা। এইগুলিকে ষড়চক্র বলে।

কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রতা হলে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর এই সব পদ্ম ক্রমে পার হয়ে হৃদয়মধ্যে অনাহত পদ্ম—সেইখানে এসে অবস্থান করে। তখন লিঙ্গ, গুহ্য, নাভি থেকে মন সরে চৈতন্য হয় আর জ্যোতিঃ দর্শন হয়। সাধু অবাক হয়ে জ্যোতিঃ দ্যাখে আর বলে, 'একি!' 'একি!'

ষড়চক্র ভেদ হলে কুণ্ডলিনী সহস্রার পদ্মে গিয়ে মিলিত হন। কুণ্ডলিনী সেখানে গেলে সমাধি হয়।

হঠযোগ। ক. হঠযোগে শরীরের উপর বেশী মনোযোগ দিতে হয়। ভিতর প্রক্ষালন করবে বলে বাঁশের নলে গুহ্যদ্বার রক্ষা করে। লিঙ্গ দিয়ে দুধ ঘি টানে। জিহ্বাসিদ্ধি অভ্যাস করে। আসন করে শূন্যে কখন কখন উঠে। ও সব বায়ুর কার্য। একজন বাজি দেখাতে দেখাতে তালুর ভিতর জিহ্বা প্রবেশ করে দিয়েছিল। অমনি তার শরীর স্থির হয়ে গেল। লোকে মনে করলে, মরে গেছে। অনেক বৎসর সে গোর দেওয়া রহিল। বহুকালের পরে সেই গোর কোন সূত্রে ভেঙ্গে গিয়েছিল। সেই লোকটার তখন হঠাৎ চৈতন্য হ'ল। চৈতন্য হবার পরই, সে চেঁচাতে লাগল—লাগ ভেল্কি, লাগ ভেল্কি। এ সব বায়ুর কার্য।

হঠযোগ বেদান্তবাদীরা মানে না।

হঠযোগ আর রাজযোগ। রাজযোগ মনের দ্বারা যোগ হয়—ভক্তির দ্বারা, বিচারের দ্বারা যোগ হয়। ঐ যোগই ভাল। হঠযোগ ভাল নয়; কলিতে অন্নগত প্রাণ।

খ. হাঁ, ও এক রকম তপস্যা বটে, কিন্তু হঠযোগ দেহাভিমানী সাধু—কেবল দেহের দিকে মন।

হঠযোগী। হঠযোগীরা দেহাভিমানী সাধু। কেবল নেতি ধৌতি করছে—কেবল দেহের যত্ন। ওদের উদ্দেশ্য আয়ু বৃদ্ধি করা। দেহ নিয়ে রাত দিন সেবা। ও ভাল নয়।

হঠযোগীর দশা। শরীর, টাকা, এ সব অনিত্য। এর জন্য, এত কেন? দেখ না হঠ-যোগীদের দশা। শরীর কিসে দীর্ঘায়ু হবে এই দিকেই নজর। ঈশ্বরের দিকে লক্ষ্য নাই। নেতি, ধৌতি,—কেবল পেট সাফ করছেন। নল দিয়ে দুধ গ্রহণ করছেন।

একজন স্যাকরা তার তালুতে জীব উল্টে গিছলো, তখন তার জড় সমাধির মত হয়ে গেল।—আর নড়ে-চড়ে না। অনেক দিন ঐ ভাবে ছিল, সকলে এসে পূজা করতো। কয়েক বৎসর পরে তার জিভ হঠাৎ সোজা হয়ে গেল। তখন আগেকার মত চৈতন্য হ'ল, আবার স্যাকরার কাজ করতে লাগলো।

ও সব শরীরের কার্য, ওতে প্রায় ঈশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে না। শালগ্রামের ভাই (তার ছেলের বংশলোচনের কারবার ছিল)—বিরাশি রকম আসন জানত—আর নিজে যোগসমাধির কথা কত বলতো। কিন্তু ভিতরে ভিতরে কামিনী-কাঞ্চনে মন। দাওয়ান মদন ভট্টের কত হাজার টাকার একখানা নোট পড়ে ছিল। টাকার লোভে সে টপ করে খেয়ে ফেলেছে—গিলে ফেলেছে—পরে কোনও রূপে বার করবে। কিন্তু নোট আদায় হ'ল। শেষে তিন বৎসর মেয়াদ।

হঠাৎ বৈরাগ্য। অনেকটা পূর্বজন্মের সংস্কারেতে হয়। লোকে মনে করে হঠাৎ হচ্ছে।

একজন সকালে একপাত্র মদ খেয়েছিল তাতেই বেজায় মাতাল, ঢলাঢলি আরম্ভ করলে, লোকে অবাক। এক পাত্রে এত মাতাল কেমন করে হ'ল? একজন বললে, ওরে, সমস্ত রাত্রি মদ খেয়েছে।

হনুমান সোনার লংকা দগ্ধ করলে। লোকে অবাক। একটা বানর এসে সব পুড়িয়ে দিলে। কিন্তু আবার বলেছে, আদত কথা এই— সীতার নিঃশ্বাসে আর রামের কোপে পুড়েছিল।

আর দেখ লালাবাবু—এত ঐশ্বর্য; পূর্বজন্মের সংস্কার না থাকলে ফস করে কি বৈরাগ্য হয়? আর রাণীভবানী—মেয়েমানুষ হয়ে এত জ্ঞান ভক্তি।

শেষ জন্মে সত্ত্বগুণ থাকে, ভগবানে মন হয়; তাঁর জন্য মন ব্যাকুল হয়, নানা বিষয় কর্ম থেকে মন সরে আসে।

হনুমান। হনুমান সাকার নিরাকার সাক্ষাৎকার করে রামমূর্তিতে নিষ্ঠ করে থাকলো। চিদঘন আনন্দের মূর্তি—সেই রামমূর্তি।

দ্রঃ হঠাৎ বৈরাগ্য।

হনুমান ভাব। আমার ভাব কি রকম জান? হনুমানকে একজন জিজ্ঞাসা করে-ছিল, আজ কি তিথি? হনুমান বললে, 'আমি বার, তিথি, নক্ষত্র এ সব কিছু জানি না; কেবল এক রাম চিন্তা করি।' আমার ঠিক ঐ ভাব।

হরিনামে নিমন্ত্রণ। তা যদি না বলেই থাকে, হরিনামে দোষ কি? যেখানে হরি-নাম, সেখানে না বললেও যাওয়া যায়। নিমন্ত্রণ দরকার নাই।

হরি-নাম। সংসারত্যাগী সাধু—সে তো হরিনাম করবেই। তার ত আর কোন কাজ নাই। সে যদি ঈশ্বর চিন্তা করে তো আশ্চর্যের বিষয় নয়। সে যদি ঈশ্বর চিন্তা না করে, সে যদি হরিনাম না করে তা হলে বরং সকলে নিন্দা করবে।

সংসারী লোক যদি হরিনাম করে, তা হলে বাহাদুরী আছে। দেখ, জনক রাজা খুব বাহাদুর। সে দুখানি তরবার ঘুরাত। একখানা জ্ঞান ও একখানা কর্ম। একদিকে পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান আর একদিকে সংসারের কর্ম করছে। নষ্ট মেয়ে সংসারের সব কাজ খুঁটিয়ে করে কিন্তু সর্বদাই উপপতিকে চিন্তা করে।

সাধুসঙ্গ সর্বদা দরকার, সাধু ঈশ্বরের সঙ্গে আলাপ করে দেন।

হরিভক্তি। দ্রঃ তপস্যার কি প্রয়োজন।

হাজরা। হাজরার সবই হয়েছে, একটু সংসারে মন আছে—ছেলেরা রয়েছে, কিছু টাকা ধার রয়েছে। মামীর সব অসুখ সেরে গেছে, একটু কসুর আছে।

দ্রঃ হাবাত লোক ভাললোক।

হিন্দুতে ব্রাহ্মতে তফাৎ। তফাৎ আর কি? এইখানে রোশনচৌকি বাজে, একজন সানাইয়ে ভোঁ ধরে থাকে আর একজন তারই ভিতর 'রাধা আমার মান করেছে' ইত্যাদি রং পরং তুলে নেয়। ব্রাহ্মেরা নিরাকার ভোঁ ধরে বসে আছে। আর হিন্দুরা রং পরং তুলে নিচ্ছে।

জল আর বরফ—নিরাকার আর সাকার। যা জল তাই ঠান্ডায় বরফ হয়, জ্ঞানের গরমীতে বরফ জল হয়, ভক্তির হিমে জল বরফ হয়।

সেই একই জিনিস, নানা লোকে নানা নাম করে। যেমন পুকুরের চারিপাশে চার ঘাট। এ ঘাটের লোক জল নিচ্ছে; জিজ্ঞাসা কর, বলবে 'জল।' ও ঘাটে যারা জল নিচ্ছে বলবে 'পানি।' আর এক ঘাটে 'ওয়াটার'; আর এক ঘাটে 'অ্যাকোয়া'; জল তো একই।

হিন্দুধর্ম। কিন্তু খোট্টাদের কি ভক্তি দেখেছ। যথার্থই হিন্দুভাব। এই সনাতন ধর্ম।—ঠাকুরকে নিয়ে যাবার সময় কত আনন্দ দেখলে। আনন্দ এই ভেবে যে, ভগবানের সিংহাসন আমরা বয়ে নিয়ে যাচ্ছি।

হিন্দুধর্মই সনাতন ধর্ম! ইদানিং যে সকল ধর্ম দেখছো এ সব তাঁরই ইচ্ছাতে হবে যাবে—থাকবে না? তাই আমি বলি, ইদানিং যে সকল ভক্ত, তাদেরও চরণে ভ্যো নমঃ। হিন্দুধর্ম বরাবর আছে আর বরাবর থাকবে।

হীনবুদ্ধির কথা। অচলানন্দ ছেলেপিলের খবর নিত না। আমায় বলতো, 'ছেলে ঈশ্বর দেখবেন,—এ সব ঈশ্বরেচ্ছা!' আমি শুনে চুপ করে থাকতুম। বলি ছেলেদের দ্যাখে কে? ছেলেপুলে পরিবার ত্যাগ করেছি বলে, টাকা রোজগারের একটা ছুতো না করা হয়। লোকে ভাববে ইনি সব ত্যাগ করেছেন—আর অনেক টাকা এসে পড়বে।

মোকদ্দমা জিতবো, খুব টাকা হবে, মোকদ্দমা জিতিয়ে দেব বিষয় পাইয়ে দেবো, —এই জন্য সাধন? এ ভারী হীনবুদ্ধির কথা।

হৃদয় (রামকৃষ্ণ ভাগিনেয়) ক. হৃদে কিন্তু আমার অনেক করেছিল—অনেক সেবা করেছিল—হাতে করে গু পরিষ্কার করতো। তেমনি শেষে শাস্তিও দিয়েছিল। এত শাস্তি দিত যে, পোস্তার উপর গিয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে দেহত্যাগ করতে গিছিলাম। কিন্তু আমার অনেক করেছিল—এখন সে কিছু (টাকা) পেলে মনটা স্থির হয়। কিন্তু কোন বাবুকে আবার বলতে যাব! কে বলে দেবে?

খ. আমার সেবাও যত করেছে, যন্ত্রণাও তেমনি দিয়েছে। আমি যখন পেটের ব্যারামে দুখানা হাড় হয়ে গেছি—কিছু খেতে পারতুম না তখন আমায় বললে, 'এই দেখ আমি কেমন খাই, তোমার মনের গুণে খেতে পারো না।' আবার বলতো, 'বোকা— আমি না থাকলে তোমার সাধুগিরি বেরিয়ে যেতো।' একদিন এ রকম করে যন্ত্রণা দিলে যে পোস্তার উপর দাঁড়িয়ে জোয়ারের জলে দেহত্যাগ করতে গিয়েছিলুম।

হৃদয়-মন্দির। হৃদয়-মন্দির আগে পরিষ্কার করতে হয়; ঠাকুর প্রতিমা আনতে হয়; পূজার আয়োজন করতে হয়। কোন আয়োজন নাই, ভোঁ ভোঁ করে শাঁক বাজান, তাতে কি হবে?

হোমাপাখি। নিত্যসিদ্ধ হোমাপাখীর ন্যায়। তার মা উচ্চ আকাশে থাকে। প্রসবের পর ছানা পৃথিবীর দিকে পড়তে থাকে। পড়তে পড়তে ডানা ওঠে ও চোখ ফুটে। কিন্তু মাটির গায়ে আঘাত না লাগতে লাগতে মার দিকে চোঁচা দৌড় দেয়। কোথায় মা। কোথায় মা। দেখ না প্রহ্লাদের 'ক' লিখতে চক্ষে ধারা।

দ্রঃ রাখাল (ব্রহ্মানন্দ স্বামী)। নিত্যসিদ্ধের থাক।

দ্বিতীয় পর্ব

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আত্মচরিতাভিধান

ও

সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের

● সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী ●

১৮৩৬ ॥ ০ রামকৃষ্ণ দেবের জন্ম।

কামারপুকুর গ্রাম। হুগলি জেলা। ঢেঁকিঘরে অস্থায়ী সূতিকাগার তৈরী হয়। জন্ম হয় বাংলা ১২৪২ সনের ৬ই ফাল্গুন, বুধবার, শুক্লা দ্বিতীয়া তিথির ব্রাহ্মমুহূর্তের ১২/১৩ মিনিট আগে। পাশ্চাত্য মতে ১৮ ফেব্রুয়ারী।

রা ৩
×
শু ২৬
ল
চ ২৫
বৃ ৬
র বু ২৪
×
ম ২২
×
×
×
শ ১৫
কে ১৭

০ জ্যোতির্বিদ গণনায়: পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্র, কুম্ভ রাশি, কুম্ভলগ্ন, লগ্নপতি শনি নবমে তুঙ্গী, চতুর্থে রাহু, দশমে কেতু; রাহু ও কেতু তুঙ্গে, দ্বিতীয়ে ও দ্বাদশে শুক্র ও মঙ্গল তুঙ্গী; বুধ ও বৃহস্পতি বক্রী, বুধ ও মঙ্গল অন্তর্গত।

০ বংশ-পরিচয় ॥ পিতামহ মাণিকরাম চট্টোপাধ্যায়, পিতা ক্ষুদিরাম। মাতা চন্দ্রমণি বা চন্দ্রা। অগ্রজ রামকুমার ও রামেশ্বর, অগ্রজা কাত্যায়নী, অনুজা সর্বমঙ্গলা।

[জন্মপূর্বে বিষ্ণুর স্বপ্নাদেশ স্মরণে নাম গদাধর। দাদাদের নামের সঙ্গে মিল রেখে রামকৃষ্ণ। রাশনাম, শম্ভুরাম।]

[বাল্য ও কৈশোর কামারপুকুরে অতিবাহিত]

১৮৪১ ॥ ০ স্থানীয় জমিদার লাহাবাবুদের পাঠশালায় যোগদান ও প্রথম ভাব সমাধি। [কথামৃত অনুসারে দশ-বার বছর বয়সে। কিন্তু তা সম্ভবত ঠিক নয়। পিতৃবিয়োগের পূর্বেই তাঁর ভাবসমাধি হয়।]

[রামকৃষ্ণদেব নিজেকে অজ্ঞ বললেও তাঁর নকল করা পুঁথি থেকে

তাঁর সুন্দর হস্তাক্ষর এবং বিদ্যাবত্তার পরিচয় মেলে। সাধারণ যোগ-বিয়োগ গুণ-ভাগের বাইরে তাঁর গণিত-ব্যুৎপত্তি ছিল না]

০ এ সময়ে তিনি লাহাবাবুদের পান্থশালায় সাধুদের সংস্পর্শে আসেন।

১৮৪২ ।। ০ পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু।

[বাঙলা ১২৪৯ সনের বিজয়া দশমীর দিন অপরাহ্নে মৃত্যু হয়]।

১৮৪৩ ।। ০ বিশালাক্ষী দেবী দেখবার সময় দ্বিতীয়বার ভাবসমাধি।

[বয়স আনুমানিক আট বৎসর]

১৮৪৫ ।। ০ উপনয়ন হয়। বয়স ৯ উত্তীর্ণ।

[ধনী কামারণী তাঁর ভিক্ষা-মা হলেন।]

১৮৪৭ ।। ০ অনুমান করা হয়, এই বৎসরেই পাইনদের বাড়ির যাত্রাভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন। শিবের ভূমিকায় গদাধর। ভাবসমাধি হয়।

১৮৫০ ।। ০ বড়দা রামকুমার কলকাতায় এসে ঝামাপুকুরে টোল খুললেন। এবং অধ্যাপনা করতে থাকলেন।

১৮৫৩ ।। ০ শ্রীরামকৃষ্ণের আনুমানিক ১৭ বৎসর বয়সে তাঁর দাদা তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসেন। ঝামাপুকুরে গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে (বর্তমান ৪৬ নং বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রীট) বাস করতে থাকেন। দাদার বিদ্যাকে 'চাল কলা বাঁধা বিদ্যা' বলে শিখলেন না। কয়েকটি সমৃদ্ধ পরিবারে গৃহদেবতার পূজার্চনা।

১৮৫৫ ।। ০ বাঙলা ১২৬২ সনের ১৮ জ্যৈষ্ঠ রানী রাসমণি দক্ষিণেশ্বরে মন্দির প্রতিষ্ঠা করলেন। রামকুমার পৌরোহিত্য গ্রহণ করলেন। প্রথমে অনিচ্ছুক হলেও পরে গদাধর কালীমন্দিরে বেশকারীর কাজ গ্রহণ করলেন (আগস্ট মাসে)।

০ কয়েক দিনের মধ্যে ৺রাধাকান্তজীর পূজার ভার গ্রহণ। সমবয়সী ভাগ্নে হৃদয়রাম সঙ্গী।

কেনারাম ভট্টাচার্যের কাছে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ এবং ৺ভবতারিণীর পূজক পদ গ্রহণ।

১৮৫৭ ।। ০ অগ্রজ রামকুমারের মৃত্যু।

০ রামকৃষ্ণ জগন্মাতার দিব্য দর্শনলাভ করেন। ভাবোন্মাদ অবস্থায় ভূকৈলাসের বৈদ্যের ওষুধ পান।

১৮৫৮ ।। ০ খুড়তুতো ভাই রামতারক চট্টোপাধ্যায় কালীমন্দিরের পূজকরূপে যোগদান করেন। কথামৃতে একে হলধারী বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

০ পানিহাটি বৈষ্ণব মহোৎসবে গেলেন রামকৃষ্ণ। এখানে তাঁর সঙ্গে বৈষ্ণবচরণের পরিচয় ঘটে।

১৮৫৯ ।। ০ অসুস্থ হয়ে পড়েন, ফলে কামারপুকুরে ফিরে যান। ওঝা দিয়ে ঝাড়ান হয়। চন্ড নামান।

০ বৈশাখ মাসে বিবাহ। জয়রামবাটির রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মেয়ে সারদামণির বয়স তখন পাঁচ, রামকৃষ্ণের তেইশ।

১৮৬০ ॥ ০ দক্ষিণেশ্বরে ফিরে এলেন।
০ মথুরবাবু রামকৃষ্ণের মধ্যে শিবকালী মূর্তি প্রত্যক্ষ করলেন।
০ রামকৃষ্ণের দ্বিতীয়বার দিব্যোন্মাদ অবস্থা হ'ল।
০ মথুরবাবু চিকিৎসার আয়োজন করলেন।

১৮৬১ ॥ ০ রানী রাসমণির মৃত্যু।
০ যোগেশ্বরী ভৈরবীর দক্ষিণেশ্বরে আগমন। তিনি রামকৃষ্ণদেবকে চৌষট্টি তন্ত্র মতে সাধনা করান। তিনিই প্রথম রামকৃষ্ণদেবকে অবতাররূপে ঘোষণা করেন। সমগ্র তন্ত্রসাধনা শেষ হয় ১৮৬৪ সালে। বিভিন্ন পণ্ডিত তাঁর অবতারত্ব স্বীকার করেন।

১৮৬৩ ॥ ০ পদ্মলোচন পণ্ডিতের সঙ্গে পরিচয়।
০ মথুরবাবুর অন্নমেরু ব্রতানুষ্ঠান। রামকৃষ্ণদেবের আদেশে মথুরবাবু সাধুসেবার ব্যবস্থা করেন।
০ জটাধারী রামাইত সাধুর আগমন। রামকৃষ্ণের বাৎসল্য ও ভাবের সাধনা। রামলালা দান ও প্রস্থান।
০ মধুরভাব সাধনা। নারীবেশ গ্রহণ ও মথুরবাবুর বাড়িতে মেয়েদের মধ্যে সখীর মতো অবস্থান। শ্রীরাধাকৃষ্ণ দর্শন। মধুর ভাবসিদ্ধি।
০ চন্দ্রমণির দক্ষিণেশ্বরে আগমন।

১৮৬৪ ॥ ০ অদ্বৈত সাধক তোতাপুরীর দক্ষিণেশ্বরে আগমন। রামকৃষ্ণদেব তাঁর কাছে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং বেদান্ত মতে সাধনা করেন। তিনদিনে সিদ্ধিলাভ করেন।
০ তোতাপুরী ঘোষণা করেন, একদেহে রাম ও কৃষ্ণ—তাই নাম রামকৃষ্ণ।
০ হলধারী ও তোতাপুরীর অধ্যাত্ম রামায়ণ পাঠকালে ঠাকুরের রামসীতা মূর্তি দর্শন।

১৮৬৫ ॥ ০ হলধারী অবসর গ্রহণ করে। তার জায়গায় আসে তাঁর ভাইপো অক্ষয়।
০ অদ্বৈতবাদী তোতাপুরী রামকৃষ্ণদেবের প্রভাবে শ্রীশ্রীকালীকে জগন্মাতারূপে স্বীকার করলেন।
০ তোতাপুরীর সদলে প্রস্থান।

১৮৬৬ ॥ ০ রামকৃষ্ণদেব ছয়মাস অদ্বৈতভূমিতে অবস্থান করেন।
০ মথুরবাবুর স্ত্রী জগদম্বা দেবীর কঠিন পীড়া গ্রহণ করলেন রামকৃষ্ণদেব। জগদম্বা সুস্থ হলেন। রামকৃষ্ণদেব কঠিন আমাশয় রোগে আক্রান্ত হন। হৃদয়রাম নিষ্ঠাভরে সেবা করে।
০ গোবিন্দ রায়ের কাছে মুসলমান ধর্মমতে সাধনা।

১৮৬৭ ॥ ০ ব্রাহ্মণী ও হৃদয়রামের সঙ্গে কামারপুকুরে গেলেন রামকৃষ্ণ।
০ সারদামণি জয়রামবাটি থেকে কামারপুকুরে এলেন স্বামীর কাছে। ভৈরবী ব্রাহ্মণী বিদায় গ্রহণ করলেন।

o প্রায় সাতমাস পরে ফিরে এলেন দক্ষিণেশ্বরে। সারদামণি ফিরে যান জয়রামবাটিতে।

১৮৬৮ ।। o জানুয়ারী মাসে (১২৭৪ সনের মাঘে) বহুলোকজন সহ সস্ত্রীক-মথুর বাবুর তীর্থযাত্রা। সঙ্গে মহাসমাদরে নিলেন রামকৃষ্ণদেবকে। তাঁর সঙ্গী হৃদয়রাম।

o বৈদ্যনাথ ধাম (দেওঘর)-এ দরিদ্রসেবা।

o কাশী গমন। ত্রৈলঙ্গস্বামীর দর্শন ও ইঙ্গিতে শাস্ত্রালোচনা।

o প্রয়াগ ঘুরে আবার কাশীতে এসে পক্ষকাল অবস্থান। ভৈরবীচক্র।

o বৃন্দাবন। রাধাকুন্ড, শ্যামকুন্ড, গিরিগোবর্ধন দর্শন। নিধুবনে গঙ্গা-মায়ীর সঙ্গে সাক্ষাৎ। বৈষ্ণব ভেক গ্রহণ।

o আবার কাশীতে। ভৈরবী ব্রাহ্মণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ।

o জ্যৈষ্ঠে (১২৭৫ সন) দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্তন। পঞ্চবটীতে মহোৎসব।

o হৃদয়রামের স্ত্রীর মৃত্যু ও হৃদয়ের পুনঃবিবাহ।

১৮৬৯ ।। o অক্ষয়ের মৃত্যুতে রামকৃষ্ণদেবের মনঃক্লেশ।

১৮৭০ ।। o মথুরবাবু জমিদারী পরিচালন উপলক্ষে রাণাঘাটে আসেন। সঙ্গে রামকৃষ্ণদেব। কলাইঘাটা গ্রামে দরিদ্রসেবা।

o কলকাতা কলুটোলায় হরিসভার অধিবেশনে ভাবাবেশে রামকৃষ্ণের চৈতন্যদেবের আসন গ্রহণ। বৈষ্ণবদের ক্ষোভ।

o কালনার বিখ্যাত বৈষ্ণবসাধক ভগবানদাস বাবাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ। বাবাজী রামকৃষ্ণদেবকে চৈতন্যস্থলাভিষিক্ত হবার যোগ্য ব্যক্তি বলে ঘোষণা করলেন।

o নবদ্বীপ মাহাত্ম্য দর্শন।

১৮৭১ ।। o গৌরী পন্ডিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ।

o জুলাইমাসে মথুরবাবুর দেহত্যাগ।

১৮৭২ ।। o ২৩ মার্চ সারদাদেবীর দক্ষিণেশ্বরে আগমন।

১৮৭৩ ।। o ষোড়শীপূজা (১১ জ্যৈষ্ঠ ১২৮০, ২৬ মার্চ, ১৯৭৩) 'শ্রীমা'র আবির্ভাব।

o শ্রীমার কামারপুকুরে প্রত্যাবর্তন।

o ডিসেম্বরে মধ্যমভ্রাতা রামেশ্বরের মৃত্যু।

১৮৭৪ ।। o শম্ভুচরণ মল্লিক রামকৃষ্ণদেবের সেবার ভার নিলেন।

o শ্রীমার দক্ষিণেশ্বরে পুনরাগমন। শ্রীমার জন্য শম্ভু মল্লিকের গৃহ-নির্মাণ।

o শম্ভু মল্লিকের মুখে বাইবেল শ্রবণ। যদু মল্লিকের বাগানবাড়িতে এবং পঞ্চবটীতে যীশুখৃষ্টের দর্শনলাভ।

১৮৭৫ ।। o বেলঘরিয়ায় জয়রাম সেনের বাগানবাড়িতে হৃদয়রামের সঙ্গে গিয়ে কেশব সেনের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকার।

o কাপ্তেন, মহেন্দ্র কবিরাজ, মহিমাচরণ, কৃষ্ণনগরের কিশোরী ইত্যাদির

সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন।

০ ভাববশে চৈতন্যদেবের নগরকীর্তন দৃশ্য দর্শন।

০ কামারপুকুরের কাছে সিওড় গ্রামে গমন। ফুলুই শ্যামবাজারের নটবর গোস্বামীর বাড়িতে বৈষ্ণবদের কীর্তন শ্রবণ।

০ শ্রীমার পীড়া শ্রবণে জয়রামবাটি গমন।

১৮৭৬ ॥ ০ মাতা চন্দ্রমণির মৃত্যু। বারবার চেষ্টা করেও রামকৃষ্ণদেব তাঁর তর্পণ করতে পারেন নি।

১৮৭৭-৭৮ ॥ ০ ভক্তবৃদ্ধি। কেশব সেনের পত্রিকার প্রবন্ধ থেকে রামকৃষ্ণ-কৌতূহলের বৃদ্ধি। নিত্য ভক্ত সমাগম।

০ কেশব সেনের সঙ্গে গাঢ় সম্পর্ক।

১৮৭৯ ॥ ০ ডাঃ রামচন্দ্র দত্ত, মনোমোহন মিত্রের ঘনিষ্ঠতা।

০ লাটু (পরে অদ্ভুতানন্দ স্বামী)-র আগমন।

০ বুড়ো গোপাল (অদ্বৈতানন্দ) চুনী, তারক ইত্যাদির আগমন।

১৮৮০ ॥ ০ শ্রীমা দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে কামারপুকুরে গেলেন।

১৮৮১ ॥ ০ মথুরবাবুর পত্নী জগদম্বা দাসীর মৃত্যু।

০ নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ), রাখাল (ব্রহ্মানন্দ), বাবুরাম (প্রেমানন্দ)।

০ নিরঞ্জন (নিরঞ্জনানন্দ), ভবনাথ, বলরাম ইত্যাদির আগমন।

১৮৮২ ॥ ০ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতকার মহেন্দ্র গুপ্তের (মাস্টারমশাই, শ্রীম) এলেন দক্ষিণেশ্বরে।

১৮৮৩ ॥ ০ শশী (রামকৃষ্ণানন্দ), শরৎ (সারদানন্দ), তারক (শিবানন্দ), অধর, ছোটগোপালের সঙ্গলাভ।

১৮৮৪ ॥ ০ কেশব সেনের মৃত্যু।

০ শ্রীমার পুনর্বার দক্ষিণেশ্বরে আগমন।

০ গঙ্গাধর (অখন্ডানন্দ), কালী (অভেদানন্দ), হরিনাথ (তুরীয়ানন্দ), নট ও নাট্যকার গিরিশ ঘোষ প্রভৃতির আগমন।

১৮৮৫ ॥ ০ ব্যাধির সূচনা। গলায় যন্ত্রণা। অসুস্থদেহে পানিহাটি মহোৎসবে যোগ দিয়ে রোগবৃদ্ধি। চিকিৎসার জন্য কলকাতা বাগবাজারে দুর্গাচরণ স্ট্রীটের এক বাড়িতে অবস্থান। শিষ্যগণের সেবা।

০ সুবোধ (সুবোধানন্দ), হরিপ্রসন্ন (বিজ্ঞানানন্দ), তুলসী (নির্মলানন্দ), পূর্ণ, ছোট নরেন ইত্যাদির আগমন।

১৮৮৬ ॥ ০ ১ জানুয়ারী 'কল্পতরু' দিবস উদ্‌যাপন। ভক্তদের আশীর্বাদ ও শক্তি দান।

০ ১৫ আগস্ট (শ্রাবণ সংক্রান্তি ১২৯৩) রামকৃষ্ণদেবের দেহত্যাগ। বয়স ৫১ বৎসর।

০ কাশীপুর শ্মশানক্ষেত্রে শেষকৃত্য সমাধান।

———

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের আত্মচরিতাভিধান

অক্ষরের মানে। যখন বাইশ তেইশ বছর বয়স কালীঘরে বললে, তুই কি অক্ষর হতে চাস? অক্ষর মানে জানি না। জিজ্ঞাসা করলুম, হলধারী বললে, ক্ষর মানে জীব, অক্ষর মানে পরমাত্মা।

অচলানন্দ। অচলানন্দ এখানে এসে মাঝে মাঝে থাকত। খুব কারণ করত। আমার সন্তানভাব শুনে শেষে জিদ। জিদ করে বলতে লাগল—স্ত্রীলোক লয়ে বীর-ভাবে সাধন তুমি কেন মানবে না? শিবের কলম মানবে না? শিব তন্ত্র লিখে গেছেন, তাতে সব ভাবের সাধন আছে—বীরভাবেরও সাধন আছে। আমি বললুম, কে জানে বাপু, আমার ওসব কিছুই ভাল লাগে না। আমার সন্তান-ভাব।

অচলানন্দ ছেলেপিলের খবর নিতো না। আমায় বলত, ছেলে ঈশ্বর দেখবেন, এসব ঈশ্বরেচ্ছা। আমি শুনে চুপ করে থাকতুম। একদিন একজন বড়মানুষ এসেছিল। আমায় বলে, মহাশয়, এ মোকদ্দমাটি কিসে জিত হয় আপনার করে দিতে হবে। আপনার নাম শুনে এসেছি। আমি বললুম, বাপু, সে আমি নই, তোমার ভুল হয়েছে। সে অচলানন্দ।

অবতার। এখানে অপর লোক কেউ নাই। সেদিন—হরিশ কাছে ছিল—দেখলাম—খোলটি (দেহটি) ছেড়ে সচ্চিদানন্দ বাহিরে এল, এসে বললে, আমি যুগে যুগে অবতার। তখন ভাবলাম, বুঝি মনের খেয়ালে ঐ সব কথা বলছে। তার-পর চুপ করে থেকে দেখলাম—তখন দেখি আপনি বলছে, শক্তির আরাধনা চৈতন্যও করেছিল।

অবতারত্ব স্বীকার। ভক্ত তোমরা, তোমাদের বলতে কি; আজকাল ঈশ্বরের চিন্ময় রূপ দর্শন হয় না। এখন সাকার নররূপ এইটে বলে দিচ্ছে। আমার স্বভাব ঈশ্বরের রূপ দর্শন-স্পর্শন-আলিঙ্গন করা। এখন বলে দিচ্ছে, 'তুমি দেহ ধারণ করেছ, সাকার নররূপ লয়ে আনন্দ কর।'

তিনি ত সকল ভূতেই আছেন, তবে মানুষের ভিতর বেশী প্রকাশ।

মানুষ কি কম গা? ঈশ্বর চিন্তা করতে পারে, অনন্তকে চিন্তা করতে পারে, অন্য জীব জন্তু পারে না।

অন্য জীব জন্তুর ভিতরে, গাছপালার ভিতরে, আবার সর্বভূতে তিনি আছেন, কিন্তু মানুষে বেশী প্রকাশ।

অভিনয় দর্শন। দেখলাম সাক্ষাৎ তিনিই সব হয়েছেন। যারা সেজেছে তাদের দেখলাম সাক্ষাৎ আনন্দময়ী মা। যারা গোলোকে রাখাল সেজেছে তাদের দেখলাম সাক্ষাৎ নারায়ণ। তিনিই সব হয়েছেন। তবে ঠিক ঈশ্বর দর্শন হ'চ্ছে কি না

তার লক্ষণ আছে। একটি লক্ষণ আনন্দ। সঙ্কোচ থাকে না। যেমন সমুদ্র—উপরে হিল্লোল, কল্লোল—নীচে গভীর জল। যার ভগবান দর্শন হয়েছে সে কখনও পাগলের ন্যায়, কখনও পিশাচের ন্যায়—শুচি-অশুচি ভেদ জ্ঞান নেই। কখন বা জড়ের ন্যায়; কেননা অন্তরে-বাহিরে ঈশ্বরকে দর্শন ক'রে অবাক হয়ে থাকে। কখন বালকের ন্যায়। আঁট নাই, বালক যেমন কাপড় বগলে করে বেড়ায়। এই অবস্থায় কখন বাল্যভাব, কখন পৌগণ্ড ভাব—ফষ্টি-নষ্টি করে, কখন যুবার ভাব—যখন কর্ম করে, লোকশিক্ষা দেয়, তখন সিংহতুল্য।

অভেদদর্শন। আমি একদিন দেখলাম, এক—চৈতন্য অভেদ। প্রথমে দেখালে, অনেক মানুষ জীবজন্তু রয়েছে,—তার ভিতর বাবুরা আছে, ইংরেজ, মুসলমান, আমি নিজে, মুদ্দফরাস, কুকুর, আবার একজন দেড়ে মুসলমান। হাতে এক সানকি, তাতে ভাত রয়েছে। সেই সানকির ভাত সবাইয়ের মুখে একটু একটু দিয়ে গেল, আমিও একটু আস্বাদ করলুম।

আর একদিন দেখালে—বিষ্ঠা, মূত্র, অন্ন, ব্যঞ্জন সব রকম খাবার জিনিস, সব পড়ে রয়েছে। হঠাৎ ভিতর থেকে জীবাত্মা বেরিয়ে গিয়ে একটি আগুনের শিখার মত সব আস্বাদ করলে। যেন জিহ্বা লক্ লক্ করতে করতে সব জিনিস একবার আস্বাদ করলে। বিষ্ঠা, মূত্র, সব আস্বাদ করলে। দেখালে যে সব এক—অভেদ।

অহংকার বোধ। পাছে অহংকার হয় বলে গৌরী 'আমি' বলত না। বলত ইনি। আমিও তার দেখাদেখি বলতুম ইনি। আমি খেয়েছি না বলে বলতুম ইনি খেয়েছেন। সেজোবাবু তাই দেখে একদিন বললে, সে কি বাবা, তুমি ওসব কেন বলবে? ওসব ওরা বলুক, ওদের অহংকার আছে। তোমার তো আর অহংকার নাই। তোমার ওসব বলার দরকার নাই।

আঁকা ও আঁক। দেখ, আমি ছেলেবেলায় চিত্র আঁকতে বেশ পারতুম; কিন্তু শুভঙ্করী আঁক ধাঁধা লাগতো। গণনা অঙ্ক পারলাম না।

আল্লামন্ত্র গ্রহণ। গোবিন্দ রায়ের কাছে আল্লামন্ত্র নিলুম, কুঠিতে প্যাঁজ দিয়ে রান্না ভাত হ'ল। খানিক খেলুম। মণি মল্লিকের বাগানে ব্যন্নুন রান্না খেলুম, কিন্তু কেমন একটা ঘেন্না হ'ল।

ঈশ্বর দর্শন[১]। তাঁকে কিন্তু দর্শন করলে সব সংশয় চলে যায়। শুনা এক, দ্যাখা এক। শুনলে ষোলো আনা বিশ্বাস হয় না। সাক্ষাৎকার হলে আর বিশ্বাসের কিছু বাকী থাকে না।

ঈশ্বর দর্শন করলে কর্ম ত্যাগ হয়। আমার ঐ রকমে পূজা উঠে গেল। কালীঘরে পূজা করতাম। হঠাৎ দেখিয়ে দিলে, সব চিন্ময়—কোষা-কুষি, বেদী, ঘরের চৌকাঠ—সব চিন্ময়। মানুষ, জীব, জন্তু—সব চিন্ময়। তখন উন্মত্তের ন্যায় চতুর্দিকে পুষ্প বর্ষণ করতে লাগলাম।—যা দেখি তাই পূজা করি।

একদিন পূজার সময় শিবের মাথায় বজ্র দিচ্ছি এমন সময় দেখিয়ে দিলে, এই

বিরাট মূর্তিই শিব। তখন শিব গড়ে পূজা বন্ধ হ'ল। ফুল তুলছি হঠাৎ দেখিয়ে দিলে যে ফুলের গাছগুলি যেন এক একটা ফুলের তোড়া।

ঈশ্বর দর্শন[২]। কালীঘরে একদিন ন্যাংটা আর হলধারী অধ্যাত্ম (রামায়ণ) পড়ছে। হঠাৎ দেখলাম নদী, তার পাশে বন, সবুজ রং গাছপালা—রাম লক্ষ্মণ জাঙ্গিয়া পরা, চলে যাচ্ছেন। একদিন কুঠীর সম্মুখে অর্জুনের রথ দেখলাম। —সারথির বেশে ঠাকুর বসে আছেন। সে এখনও মনে আছে।

আর একদিন, দেশে কীর্তন হচ্ছে—সম্মুখে গৌরাঙ্গ মূর্তি।

একজন ন্যাংটা সঙ্গে সঙ্গে থাকত—তার ধনে হাত দিয়ে ফচকিমি করতুম। তখন খুব হাসতুম। এ ন্যাংটো মূর্তি আমারই ভিতর থেকে বেরুত। পরমহংস মূর্তি —বালকের ন্যায়।

ঈশ্বরীয় রূপ কত যে দর্শন হয়েছে, তা বলা যায় না। সেই সময়ে বড় পেটের ব্যামো। ঐ সকল অবস্থায় পেটের ব্যামো বড় বেড়ে যেত। তাই রূপ দেখলে শেষে থু-থু করতুম—কিন্তু পেছনে গিয়ে ভূতে পাওয়ার মতো আবার আমায় ধরত! ভাবে বিভোর হয়ে থাকতুম, দিন-রাত কোথা দিয়ে যেত। তার পরদিন পেট ধুয়ে ভাব বেরুত!

২. আমায় মা কালীঘরে দেখিয়ে দিলেন, মা-ই সব হয়েছেন। দেখিয়ে দিলেন সব চিন্ময়। প্রতিমা চিন্ময়, বেদী চিন্ময়, কোশাকুশি চিন্ময়, চৌকাঠ চিন্ময়, মার্বেলের পাথর সব চিন্ময়। ঘরের ভিতর দেখি সব যে বসে রয়েছে। সচ্চিদানন্দ বসে, কালীঘরের সম্মুখে একজন দুষ্টু লোককে দেখলুম, কিন্তু তারও ভিতরে তাঁর শক্তি জ্বল জ্বল করছে দেখলুম।

তাইতে বিড়ালকে ভোগের লুচি খাইয়েছিলুম। দেখলুম মা-ই সব হয়েছেন। বিড়াল পর্যন্ত। তখন খাজাঞ্চি মেজবাবুকে চিঠি লিখলে যে ভট্টাচায্যি মশাই ভোগের লুচি বেড়ালদের খাওয়াচ্ছেন। মেজবাবু আমার অবস্থা বুঝত। পত্রের উত্তরে লিখলে, উনি যা করেন তাতে কোন কথা বোলো না।

ঈশ্বর দর্শন ও পরে। হত্যা দিয়ে পড়েছিলাম! মাকে বল্লাম, আমি মুখ্যু—তুমি আমায় জানিয়ে দাও—বেদ, পুরাণ, তন্ত্রে—নানা শাস্ত্রে—কি আছে।

মা বল্লেন, বেদান্তের সার—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। যে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের কথা বেদে আছে, তাঁকে তন্ত্রে বলে, সচ্চিদানন্দঃ শিবঃ—আবার তাঁকেই পুরাণে বলে সচ্চিদানন্দঃ কৃষ্ণঃ।

গীতা দশবার বল্লে যা হয়, তাই গীতার সার। অর্থাৎ ত্যাগী ত্যাগী!

তাঁকে যখন লাভ হয়, বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, তন্ত্র—কত নীচে পড়ে থাকে। (হাজরাকে) তখন ওঁ উচ্চারণ করবার যো নাই।—এটি কেন হয়? সমাধি থেকে অনেক নেমে না এলে ওঁ উচ্চারণ করতে পারি না।

প্রত্যক্ষ দর্শনের পর যা যা অবস্থা হয় শাস্ত্রে আছে, সে সব হয়েছিল। বালকবৎ, উন্মাদবৎ, পিশাচবৎ, জড়বৎ।

আর শাস্ত্রে যেরূপ আছে, সেরূপ দর্শনও হ'ত।

কখন দেখতাম জগৎময় আগুনের স্ফুলিঙ্গ!

কখন চারিদিকে যেন পারার হ্রদ—ঝক্ ঝক্ করছে। আবার কখনও রূপা গলার মতো দেখতাম।

কখন দেখতাম রংমশালের আলো যেন জ্বলছে!

তা হলেই হ'ল, শাস্ত্রের সঙ্গে ঐক্য হচ্ছে।

আবার দেখালে, তিনিই জীব, জগৎ, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন। ছাদে উঠে আবার সিঁড়িতে নামা। অনুলোম বিলোম।

উঃ। কি অবস্থাতেই রেখেছে!—একটা অবস্থা যায় তো আর একটা আসে। যেন ঢেঁকির পাট। এক দিক নীচু হয় ত আর এক দিক উঁচু হয়।

যখন অন্তর্মুখ—সমাধিস্থ—তখনও দেখছি তিনি। আবারযখন বাহিরের জগতে মন এলো, তখনও দেখছি তিনি।

যখন আরশির এ পিঠ দেখছি তখনও তিনি! আবার যখন উল্টো পিঠ দেখছি তখনও তিনি।

ঈশ্বর-নির্ভরতা। আমি তো মুখ্যু, আমি কিছু জানি না, তবে এ সব বলে কে? আমি বলি, মা, আমি যন্ত্র,তুমি যন্ত্রী; আমি ঘর, তুমি ঘরণী; আমি রথ, তুমি রথী; যেমন করাও তেমনি করি, যেমন বলাও তেমনি বলি, যেমন চালাও তেমনি চলি; 'নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু।' তাঁরই জয়; আমি তো কেবল যন্ত্র মাত্র। শ্রীমতী যখন সহস্রধারা কলসী লয়ে যাচ্ছিলেন, জল একটুকুও পড়ে নাই, সকলে তাঁর প্রশংসা করতে লাগল; এমন সতী হবে না। তখন শ্রীমতী বল্লেন, তোমরা আমার জয় কেন দাও; বল, কৃষ্ণের জয়, কৃষ্ণের জয়। আমি তাঁর দাসী মাত্র।

ঈশ্বরের আবির্ভাব। ছেলেবেলায় তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল। এগারো বছরের সময় মাঠের উপর কি দেখলুম। সবাই বললে, বেহুঁশ হয়ে গিছলুম, কোন সাড় ছিল না। সেই দিন থেকে আর এক রকম হয়ে গেলুম। নিজের ভিতর আর একজনকে দেখতে লাগলুম। যখন ঠাকুর পূজা করতে যেতুম, হাতটা অনেক সময় ঠাকুরের দিকে না গিয়ে নিজের মাথার উপর আসতো, আর ফুল মাথায় দিতুম। যে ছোকরা আমার কাছে থাকতো, সে আমার কাছে আসতো না; বলতো, তোমার মুখে কি এক জ্যোতিঃ দেখছি, তোমার বেশী কাছে যেতে ভয় হয়!

ঈশ্বরের রূপ। যদু মল্লিকের বাগানে নরেন্দ্র বললে, তুমি ঈশ্বরের রূপ-টুপ যা দেখ, ও মনের ভুল। তখন অবাক হয়ে ওকে বললাম, কথা কয় যে রে? নরেন্দ্র বললে, ও অমন হয়। তখন মার কাছে এসে কাঁদতে লাগলাম। বললাম, মা, এ কি হ'ল। এ সব কি মিছে? নরেন্দ্র এমন কথা বললে। তখন দেখিয়ে দিলে—চৈতন্য—অখণ্ড চৈতন্য—চৈতন্যময় রূপ। আর বললে, 'এ সব কথা মেলে কেমন করে যদি মিথ্যা হবে!' তখন বলেছিলাম, 'শালা তুই আমায় অবিশ্বাস করে দিছলি, তুই আর আসিস্ নি!'

উদ্দীপন। কি অবস্থাই গেছে। একটু সামান্যতেই একেবারে উদ্দীপন হয়ে যেত। সুন্দরী পূজা কল্লুম: চৌদ্দ বছরের মেয়ে। দেখলুম সাক্ষাৎ মা। টাকা দিয়ে

প্রণাম কল্লুম।

রামলীলা দেখতে গেলুম। একেবারে দেখলুম, সাক্ষাৎ সীতা, রাম, লক্ষ্মণ, হনুমান, বিভীষণ। তখন যারা সেজেছিল, তাদের সব পূজা করতে লাগলুম।

কুমারীদের এনে তখন পূজা করতুম। দেখতুম, সাক্ষাৎ মা।

একদিন বকুলতলায় দেখলুম, নীল বসন পরে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে, বেশ্যা। দপ করে একেবারে সীতার উদ্দীপন। ও মেয়েকে ভুলে গেলুম; কিন্তু দেখলুম, সাক্ষাৎ সীতা লংকা থেকে উদ্ধার হয়ে রামের কাছে যাচ্ছেন। অনেকক্ষণ বাহ্য-শূন্য হয়ে সমাধি অবস্থা হয়ে রইল।

আর একদিন গড়ের মাঠে বেড়াতে গিছলুম। বেলুন উঠবে—অনেক লোকের ভিড়। হঠাৎ নজরে পড়ল, একটি সাহেবের ছেলে, গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ত্রিভঙ্গ হয়ে। যাই দেখা, অমনি শ্রীকৃষ্ণের উদ্দীপন। সমাধি হয়ে গেল।

শিওড়ে রাখাল ভোজন করালুম। তাদের হাতে হাতে সব জল পান দিলুম। দেখলুম সাক্ষাৎ ব্রজের রাখাল। তাদের জলপান থেকে আবার খেতে লাগলুম। প্রায় হুঁশ থাকতো না। সেজোবাবু জানবাজারের বাড়ীতে নিয়ে দিন কতক রাখলে। দেখতে লাগলুম, সাক্ষাৎ মার দাসী হয়েছি। বাড়ীর মেয়েরা আদবেই লজ্জা করতো না। যেমন ছোট ছেলেকে বা মেয়েকে দেখলে কেউ লজ্জা করে না। আন্দির সঙ্গে—বাবুর মেয়েকে জামাই-এর কাছে শোয়াতে যেতুম।

এখনও একটু তাতেই উদ্দীপন হয়ে যায়। রাখাল জপ কর্তে কর্তে বিড় বিড় করতো। আমি দেখে স্থির থাকতে পারতুম না। একেবারে ঈশ্বরের উদ্দীপন হয়ে বিহ্বল হয়ে যেতুম।

উন্মাদ অবস্থা। ক. আমার উন্মাদ অবস্থা। নারায়ণ শাস্ত্রী এসে দেখলে, বাঁশ ঘাড়ে করে বেড়াচ্ছি। তখন সে লোকদের কাছে বললে, ওহ্, উন্মত্ত্ হ্যায়। সে অবস্থায় জাত বিচার কিছু থাকতো না। একজন নীচ জাতি, তার মাগ শাক রেঁধে পাঠাতো, আমি খেতুম।

কালীবাড়ীতে কাঙ্গালীরা খেয়ে গেল, তাদের পাতা মাথায় আর মুখে ঠেকালুম। হলধারী তখন আমায় বললে, তুই করছিস কি? কাঙ্গালীদের এঁটো খেলি, তোর ছেলেপিলের বিয়ে হবে কেমন করে? আমার তখন রাগ হ'ল। হলধারী আমার দাদা হয়। তা হলে কি হয়? তাকে বললাম, তবে রে শালা, তুমি না গীতা, বেদান্ত পড়? তুমি না শিখাও ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা? আমার আবার ছেলে-পুলে হবে তুমি ঠাউরেছ। তোর গীতাপাঠের মুখে আগুন।

খ. এমনি অবস্থায় মা রেখেছেন যে ঢাকাঢাকি করবার জো নাই। বালকের অবস্থা।

রাখাল আমার অবস্থা বোঝে না। পাছে কেউ দেখতে পায়. নিন্দা করে, গায়ে কাপড় দিয়ে ভাঙ্গা হাত ঢেকে দেয়। মধু ডাক্তারকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে সব কথা বলছিলো। তখন চেঁচিয়ে বল্লাম—কোথা গো মধুসূদন, দেখবে এস, আমার হাত ভেঙ্গে গেছে।

সেজোবাবু আর সেজো গিন্নী যে ঘরে শুতো সেই ঘরে আমিও শুতাম। তারা ঠিক ছেলেটির মতন আমায় যত্ন করত। তখন আমার উন্মাদ অবস্থা। সেজো-বাবু বলতো, বাবা তুমি আমাদের কোন কথাবার্তা শুনতে পাও? আমি বলতাম, পাই।

সেজো গিন্নি সেজোবাবুকে সন্দেহ করে বলেছিল, যদি কোথাও যাও—ভট্‌চায্যি মশায় তোমার সঙ্গে যাবেন। এক জায়গায় গেলো—আমায় নীচে বসালে। তারপর আধ ঘণ্টা পরে এসে বলে, চল বাবা, গাড়িতে উঠবে চল। সেজো গিন্নি জিজ্ঞাসা করলে, আমি ঠিক ঐ সব বললুম। আমি বললুম, দ্যাখগা, একটা বাড়ীতে আমরা গেলুম—উনি আমায় নীচে বসালে—উপরে আপনি গেল; আধ ঘণ্টা পরে এসে বলে, চল বাবা চল। সেজো গিন্নি যা হয় বুঝে নিলে। মাড়েদের এক সরিক এখানকার গাছের ফল, কপি গাড়ী করে বাড়ীতে চালান করে দিত। অন্য সরিকরা জিজ্ঞাসা করাতে আমি ঠিক তাই বললুম।

৩. চিনে স্যাঁকরা দ্রষ্টব্য।

কাপ্তেন। ক. কাপ্তেন যেদিন আমায় প্রথম দেখলে সেদিন রাত্রে রয়ে গেল। কলকাতায় কাপ্তেনের বাড়িতে গিছলুম, ফিরে আসতে অনেক রাত হয়েছিল। তার বাড়ি হয়ে রামের বাড়ি যাবো। তাই কাপ্তেনকে বললুম, গাড়িভাড়া দাও। কাপ্তেন তার মাগকে বললে। সে মাগও তেমনি—ক্যা হুয়া ক্যা হুয়া করতে লাগল। শেষে কাপ্তেন বললে যে, ওরাই (রামেরা) দেবে। কাপ্তেন বলে, আমার স্ত্রী জ্ঞানী। ভূতে যাকে পায়, সে জানে না যে ভূতে পেয়েছে। সে বলে, বেশ আছি।

খ. কাপ্তেনের বাপ খুব ভক্ত ছিল। ইংরেজের ফৌজে সুবাদারের কাজ করত। যুদ্ধক্ষেত্রে পূজার সময়ে পূজা করত। একহাতে শিবপূজা, একহাতে তরবার-বন্দুক। খানসামা শিব গড়ে গড়ে দিচ্ছে। শিবপূজো না করলে জল খাবে না। ছয় হাজার টাকা মাহিনা বছরে। ওদের বংশই ভক্ত।

গ. কাপ্তেনের অনেক গুণ। রোজ নিত্যকর্ম, নিজে ঠাকুরপূজো—স্নানের মন্ত্রই কত। কাপ্তেন খুব একজন কর্মী। পূজো, জপ, আরতি, পাঠ, স্তব এসব নিত্য-কর্ম করে। যখন পূজো করতে বসে ঠিক একটি ঋষির মতো। এদিকে কর্পূরের আরতি। ছোট কাপড়খানি পরে আরতি করে। একবার তিনবাতিওলা প্রদীপে আরতি করে—তারপর আবার এক বাতিওলা প্রদীপে। সেসময় কথা কয় না। আমায় ইশারা করে আসনে বসতে বললে। এদিকে গান গাইতে পারে না, কিন্তু পূজো করতে আসনে বসে সুন্দর স্তব-পাঠ করে। তখন আর একটি মানুষ। যেন তন্ময় হয়ে যায়। পূজো করে যখন ওঠে, চোখের ভাব—ঠিক যেন বোলতা কামড়েছে। আর সর্বদা গীতা-ভাগবত এসব পাঠ করে। আমি দুএকটা ইংরাজী কথা কয়েছিলুম, তা রাগ করলে। বলে, ইংরাজী পড়া লোক ভ্রষ্টাচারী। তার মার কাছে নীচে বসে, মা আসনের উপর বসবে।

ঘ. লোকটা ভারী আচারী। আমি কেশব সেনের কাছে যেতুম, তাই এখানে

একমাস আসে নাই। বলে, কেশব সেন ভ্রষ্টাচার—ইংরাজের সঙ্গে খায়, ভিন্ন জাতে মেয়ের বিয়ে দিয়েছে, জাত নাই। আমি বললুম, আমার সে সবে দরকার কি? কেশব হরিনাম করে, দেখতে যাই, ঈশ্বরীয় কথা শুনতে যাই। আমি কুলটি খাই, কাঁটায় আমার কি কাজ। তবু আমায় ছাড়ে না, বলে, তুমি কেশব সেনের ওখানে কেন যাও। তখন আমি বললুম, একটু বিরক্ত হয়ে, আমি হরিনাম শুনতে যাই—আর তুমি লাটসাহেবের বাড়িতে যাও কেমন করে? তারা ম্লেচ্ছ, তাদের সঙ্গে থাকো কি করে? এইসব বলার পর তবে একটু থামে।

ঙ. আমার অবস্থা, কাপ্তেন বললে, উড্ডীয়মান ভাব। জীবাত্মা আর পরমাত্মা, জীবাত্মা যেন একটি পাখী আর পরমাত্মা আকাশ—চিদাকাশ। কাপ্তেন বললে, তোমার জীবাত্মা চিদাকাশে উড়ে যায়, তাই সমাধি। কাপ্তেন বাঙ্গালীদের নিন্দা করলে। বললে, বাঙ্গালীরা নির্বোধ। কাছে মানিক রয়েছে, চিনলে না।

তবে কি জান, রাতদিন বিষয়কর্ম। মাগ ছেলে ঘিরে রয়েছে, যখনই যাই দেখি। আবার লোকজন হিসাবের খাতা মাঝে মাঝে আনে। এক একবার ঈশ্বরেও মন যায়। যেমন বিকারের রোগী। বিকারের ঘোর লেগেই আছে, এক একবার চটকা ভাঙ্গে, তখন 'জল খাবো' বলে চেঁচিয়ে ওঠে। আবার জল দিতে দিতে অজ্ঞান হয়ে যায়—কোনো হুঁশ থাকে না। আমি তাই ওকে বললুম, তুমি কর্মী। কাপ্তেন বললে, আজ্ঞা, আমার পূজা এই সব করতে আনন্দ হয়। জীবের কর্ম বই আর উপায় নাই। আমি বললুম, কিন্তু কর্ম কি চিরকাল করতে হবে? মৌমাছি ভন্‌ভন্‌ কতক্ষণ করে? যতক্ষণ না ফুলে বসে। মধুপানের সময় ভন্‌ভনানি চলে যায়। কাপ্তেন বললে, আপনার মতো কি পূজা আর কর্ম ত্যাগ করতে পারি? তার কিন্তু কথার ঠিক নাই। কখনও বলে, এসব জড়, কখনও বলে, এসব চৈতন্য। আমি বলি, জড় আবার কি? সবই চৈতন্য।

চ. কাপ্তেন সংসারী বটে, কিন্তু ভারী ভক্ত। বেদ-বেদান্ত, শ্রীমদ্‌ভাগবত, গীতা অধ্যাত্ম—এসব কন্ঠস্থ। খুব ভক্তি। আমি বরাহনগরের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, তা আমায় ছাতা ধরে। ওর বাড়িতে লয়ে গিয়ে কত যত্ন। বাতাস করে—পা টিপে দেয়—আর নানা তরকারী করে খাওয়ায়। আমি একদিন ওর বাড়িতে পাইখানায় বেহুঁশ হয়ে গেছি। ও তো অত আচারী, পাইখানার ভিতর আমার কাছে গিয়ে পা ফাঁক করে বসিয়ে দেয়। অত আচারী, ঘৃণা করলে না। কাপ্তেনের পরিবার আমায় বললে যে, সংসার ওর ভাল লাগে না। তাই মাঝে বলছিল, সংসার ছেড়ে দেবো। মাঝে মাঝে 'ছেড়ে দেবো' করত। আগে হঠযোগ করেছিল—তাই আমার সমাধি কি ভাবাবস্থা হলে মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। কাপ্তেনের পরিবার—তার আবার আলাদা ঠাকুর, গোপাল। এবার তত কৃপণ দেখলুম না। সেও গীতা-টীতা জানে। ওদের কি ভক্তি। আমি যেখানে খাব, সেখানেই আঁচাব। খড়কে কাটাটি পর্যন্ত। পাঁঠার চচ্চড়ি করে। কাপ্তেন বলে, পনর দিন থাকে। কিন্তু তার পরিবার বললে নাহি নাহি, সাতরোজ। কিন্তু বেশ লাগল। ব্যঞ্জন সব একটু একটু। আমি বেশী খাই বলে আজকাল আমায় বেশী দেয়। তারপর খাবার পর হয় কাপ্তেন, নয় তার পরিবার বাতাস করবে।

ছ. কাপ্তেনের সঙ্গে একটি ওদের দেশের মেয়ে এসেছিল। ভারী ভক্ত, বিবাহ হয় নাই। বেশ এস্‌রাজ বাজিয়ে গান করলে। গীতগোবিন্দ গান কণ্ঠস্থ। তার গান শুনতে দ্বারিকবাবুরা বসেছিল। আমি বললুম, এরা শুনতে চাচ্ছে, লোক ভাল। যখন গীতগোবিন্দ গান গাইলে তখন দ্বারিকবাবু রুমালে চক্ষের জল পুছতে লাগল। 'বিয়ে কর নাই কেন' জিজ্ঞাসা করাতে বললে, ঈশ্বরের দাসী, আবার কার দাসী হব। আর সব্বাই তাকে দেবী বলে খুব মানে—যেমন পুঁথিতে আছে।

জ. কাপ্তেনের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। আমি বললুম, পুরুষ আর প্রকৃতি ছাড়া আর কিছুই নাই। নারদ বলেছিলেন, হে রাম, যত পুরুষ দেখতে পাও সব তোমার অংশ। আর যত স্ত্রী দেখতে পাও, সব সীতার অংশ। কাপ্তেন খুব খুশি। বললে, আপনারই ঠিক বোধ হয়েছে। সব পুরুষ রামের অংশে রাম, সব স্ত্রী সীতার অংশে সীতা। এই কথা এই বললে, আবার তারপরই ছোকরাদের নিন্দা আরম্ভ করলে। বলে, ওরা ইংরাজী পড়ে, যা তা খায়। ওরা তোমার কাছে সর্বদা যায়, সে ভাল নয়। ওতে তোমার খারাপ হতে পারে। আমি প্রথমে বললুম, যায় তা কি করি। তারপর জ্যান (প্রাণ) থেতলে দিলুম। বললুম, যে লোকের বিষয়বুদ্ধি আছে সে লোক থেকে ঈশ্বর অনেক দূরে। বিষয়বুদ্ধি যদি না থাকে, সে ব্যক্তির তিনি হাতের ভিতর—অতি নিকটে। কাপ্তেন রাখালের কথায় বলে যে ও সকলের বাড়িতে খায়। বুঝি হাজরার কাছে শুনেছে। তখন বললুম, লোকে হাজার তপ-জপ করুক, যদি বিষয়বুদ্ধি থাকে, তাহলে কিছুই হবে না। আর শূকর মাংস খেয়ে যদি ঈশ্বরে মন থাকে সে ব্যক্তি ধন্য। তার ক্রমে ঈশ্বর লাভ হবেই। হাজরা এত তপ-জপ করে, কিন্তু ওর মধ্যে দালালী করবে—এই চেষ্টায় থাকে। তখন কাপ্তেন বলে, হ্যাঁ, তা ও বাৎ ঠিক হ্যায়। তারপর আমি বললুম, এই তুমি বললে, সব পুরুষ রামের অংশে রাম, সব স্ত্রী সীতার অংশে সীতা। আবার এখন এমন কথা বলছ। কাপ্তেন বললে, তা তো, কিন্তু তুমি সকলকে তো ভালবাস না। আমি বললুম, 'আপো নারায়ণ' সবই জল। কিন্তু কোনো জল খাওয়া যায় কোনোটিতে নাওয়া যায়, কোনও জল শৌচ করা যায়। এই যে তোমার মাগ-মেয়ে বসে আছে, আমি দেখছি সাক্ষাৎ আনন্দময়ী। কাপ্তেন তখন বলতে লাগল, হ্যাঁ হ্যাঁ, ও ঠিক হ্যায়। তখন আবার আমার পায়ে ধরতে যায়।

ঝ. কাপ্তেনের সঙ্গে সৌরীন্দ্র ঠাকুরের বাড়ি গিছলুম। তাকে দেখে বললুম, তোমাকে রাজা-টাজা বলতে পারবো না, কেন না সেটা মিথ্যা কথা হবে। আমার সঙ্গে খানিকটা কথা কইলে। তারপর দেখলুম, সাহেব-টাহেব আনাগোনা করতে লাগল। রজোগুণী লোক, নানাকাজ লয়ে আছে। যতীন্দ্রকে খবর পাঠানো হ'ল। সে বলে পাঠালে, আমার গলায় বেদনা হয়েছে।

কামড়াব কেন ? কুট্‌স করে কেন কামড়াব ? আমি ত লোকদের বলি, এও কর ; ওও কর ; সংসারও কর, ঈশ্বরকেও ডাক। সব ত্যাগ করতে বলি না। (সহাস্যে) কেশব সেন একদিন লেকচার দিলে ; বললে, 'হে ঈশ্বর, এই কর, যেন আমরা

ভক্তিনদীতে ডুব দিতে পারি, আর ডুব দিয়ে যেন সচ্চিদানন্দ সাগরে গিয়ে পড়ি।' মেয়েরা সব চিকের ভিতরে ছিল। আমি কেশবকে বললাম, একেবারে সবাই ডুব দিলে কি হবে। তা হ'লে এদের (মেয়েদের) দশা কি হবে? এক একবার আড়ায় উঠো; আবার ডুব দিও, আবার উঠো। কেশব আর সকলে হাসতে লাগলো। হাজরা বলে, তুমি রজোগুণী লোক বড় ভালবাস। যাদের টাকাকড়ি মানসম্ভ্রম খুব আছে। তা যদি হ'ল তবে হরিশ, নোটো ওদের ভালবাসি কেন? নরেন্দ্রকে নরেন্দ্রকে কেন ভালবাসি? তার তো কলাপোড়া খাবার নুন নাই।

কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণ। কুলকুণ্ডলিনী না জাগলে চৈতন্য হয় না। মূলাধারে কুলকুণ্ডলিনী। চৈতন্য হলে তিনি সুষুম্না নাড়ীর মধ্য দিয়ে স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর এই সব চক্র ভেদ করে, শেষে শিরোমধ্যে গিয়ে পড়েন। এরই নাম মহাবায়ুর গতি—তবেই শেষে সমাধি হয়।

শুধু পুঁথি পড়লে চৈতন্য হয় না—তাঁকে ডাকতে হয়। ব্যাকুল হলে তবে কুলকুণ্ডলিনী জাগেন। শুনে, বই পড়ে জ্ঞানের কথা!—তাতে কি হবে।

এই অবস্থা যখন হ'ল, তার ঠিক আগে আমায় দেখিয়ে দিলে—কিরূপে কুলকুণ্ডলিনীশক্তি জাগরণ হয়ে, ক্রমে ক্রমে সব পদ্মগুলি ফুটে যেতে লাগলো, আর সমাধি হ'ল। এ অতি গুহ্য কথা। দেখলাম, ঠিক আমার মতন বাইশ তেইশ বছরের ছোকরা, সুষুম্না নাড়ীর ভিতর গিয়ে জিহ্বা দিয়ে যোনিরূপ পদ্মের সঙ্গে রমণ করছে। প্রথমে গুহ্য, লিঙ্গ, নাভি। চতুর্দল, ষড়দল, দশদল, পদ্ম সব অধোমুখ হয়েছিল—ঊর্ধ্বমুখ হ'ল।

হৃদয়ে যখন এলো—বেশ মনে পড়ছে—জিহ্বা দিয়ে রমণ করবার পর দ্বাদশদল অধোমুখ পদ্ম ঊর্ধ্বমুখ হ'ল, আর প্রস্ফুটিত হ'ল; তারপর কণ্ঠে ষোড়শদল, আর কপালে দ্বিদল। শেষে সহস্রদল পদ্ম প্রস্ফুটিত হ'ল। সেই অবধি আমার এই অবস্থা।

কেশব দর্শন। কেশব সেনকে দেখবার আগে নারায়ণ শাস্ত্রীকে বল্লুম, তুমি একবার যাও, দেখে এস কেমন লোক। সে দেখে বল্লে, লোকটা জপে সিদ্ধ। সে জ্যোতিষ জানতো—বল্লে, 'কেশব সেনের ভাগ্য ভাল। আমি সংস্কৃতে কথা কইলাম, সে ভাষায় (বাঙ্গালায়) কথা কইল।'

তখন আমি হৃদেকে সঙ্গে করে বেলঘরের বাগানে গিয়ে দেখলাম। দেখেই বলেছিলাম 'এঁরই ন্যাজ খসেছে—ইনি জলেও থাকতে পারেন, ডাঙ্গাতে থাকতে পারেন।'

আমাকে পরোখ করবার জন্য তিনজন ব্রহ্মজ্ঞানী ঠাকুরবাড়ীতে পাঠিয়েছিল। তার ভিতর প্রসন্নও ছিল। রাত দিন আমায় দেখবে, দেখে কেশবের কাছে খবর দিবে। আমার ঘরের ভিতর রাত্রে ছিল—কেবল 'দয়াময়, দয়াময়' করতে লাগল—আর আমাকে বলে, 'তুমি কেশব বাবুকে ধর তা হলে তোমার ভাল হবে।' আমি বল্লাম, 'আমি সাকার মানি' তবুও 'দয়াময়, দয়াময়' করে। তখন আমার একটা অবস্থা হ'ল। হয়ে বল্লাম, 'এখান থেকে যা।' ঘরের মধ্যে কোন মতে থাকতে দিলাম না। তারা বারান্দায় গিয়ে শুয়ে রইল।

কেশব সেন। ক. কেশব এত পণ্ডিত, ইংরাজীতে লেকচার দিত, কত লোকে তাকে মানত। স্বয়ং কুইন ভিক্টোরিয়া তার সঙ্গে বসে কথা কয়েছে। সে কিন্তু এখানে যখন আসত, শুধু গায়ে। সাধু দর্শন করতে হলে হাতে কিছু আনতে হয়, তাই ফল হাতে করে আসত। একেবারে অভিমানশূন্য। সরল ছিল। একদিন ওখানে (কালীবাড়ি) গিছল। অতিথিশালা দেখে বেলা চারটের সময় বলে, অতিথি-কাঙালদের কখন খাওয়ানো হবে ?

খ. একদিন লেকচার দিলে। বললে, হে ঈশ্বর, এই কর যেন আমরা ভক্তি নদীতে ডুব দিতে পারি, ডুব দিয়ে যেন সচ্চিদানন্দ সাগরে পড়ি। মেয়েরা সব চিকের ভিতরে ছিল। আমি কেশবকে বললুম, একেবারে সবাই ডুব দিলে কি হবে ? তাহলে এদের—মেয়েদের দশা কি হবে ? এক একবার আড়ায় উঠো, আবার ডুব দিও, আবার উঠো। কেশব আর সকলে হাসতে লাগল।

গ. তাদের উপাসনা দেখলুম। অনেকক্ষণ ভগবানের ঐশ্বর্যের কথা বলার পর বললে, এবার আমরা তাঁর ধ্যান করি। ভাবলুম, কতক্ষণ না জানি ধ্যান করবে। ওমা, দু মিনিট চোখ বুজতে না বুজতেই হয়ে গেল। এরকম ধ্যান করে কি তাঁকে পাওয়া যায় ? যখন তারা সব ধ্যান করছিল, তখন সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলুম পরে কেশবকে বললুম, তোমাদের অনেকের ধ্যান দেখলুম, কি মনে হল জান ? দক্ষিণেশ্বরে ঝাউতলায় কখনো কখনো হনুমানের পাল চুপ করে বসে থাকে। যেন কত ভাল, কিছু জানে না। আসলে তা নয়, তারা তখন বসে বসে ভাবছে, কোন গেরস্তের চালে লাউ-কুমড়োটা আছে, কার বাগানে কলা-বেগুন হয়েছে। খানিকক্ষণ পরেই উপ করে সেখানে গিয়ে পড়ে আর তা ছিঁড়ে লয়ে পেট ভরতি করে। অনেকের ধ্যান দেখলুম ঠিক সেইরকম। সকলে শুনে হাসতে লাগল।

ঘ. আমি আবার কেশবের জন্য মার কাছে ডাব-চিনি মেনেছিলুম। শেষরাত্রে ঘুম ভেঙ্গে যেত আর মার কাছে কাঁদতুম, বলতুম, মা, কেশবের অসুখ ভাল করে দাও। কেশব না থাকলে আমি কলকাতা গেলে কার সঙ্গে কথা কব। তাই ডাব-চিনি মেনেছিলুম। কেশবের মৃত্যুর কথা শুনে বোধ হ'ল যেন আমার একটা অঙ্গ পড়ে গেছে।

ঙ. কেশব সেন খুব আসত। এখানে এসে অনেক বদলে গেল। ইদানিং খুব লোক হয়েছিল। এখানে অনেকবার এসেছিল দলবল নিয়ে। আবার একলা একলা আসবার ইচ্ছা ছিল।

কেশবের আগে তেমন সাধুসঙ্গ হয় নাই।

কলুটোলার বাড়িতে দেখা হ'ল ; হৃদে সঙ্গে ছিল। কেশব সেন যে ঘরে ছিল, সেই ঘরে আমাদের বসালে। টেবিলে কি লিখছিল, অনেকক্ষণ পরে কলম ছেড়ে কেদারা থেকে নেমে বসল ; তা আমাদের নমস্কার-টমস্কার করা নাই।

এখানে মাঝে মাঝে আসত। আমি একদিন ভাবাবস্থাতে বললাম, সাধুর সম্মুখে পা তুলতে নাই। ওতে রজোগুণ বৃদ্ধি হয়। তারা এলেই আমি নমস্কার করতুম, তখন ওরা ক্রমে ভূমিষ্ঠ হয়ে নমস্কার করতে শিখলে।

চ. আর কেশবকে বললাম, তোমরা হরিনাম করো, কলিতে তাঁর নাম গুণকীর্তন করতে হয়। তখন ওরা খোল করতাল দিয়ে হরিনাম ধরলে।

হরিনামে বিশ্বাস আমার আরও হ'ল কেন? এই ঠাকুরবাড়িতে সাধুরা মাঝে মাঝে আসে; একটি মুলতানের সাধু এসেছিল, গঙ্গাসাগরের লোকের জন্য অপেক্ষা করছিল। এদের বয়সের সাধু। সেই বলেছিল, উপায় নারদীয় ভক্তি।

ছ. কেশব একদিন এসেছিল; রাত দশটা পর্যন্ত ছিল। প্রতাপ আর কেউ কেউ বললে, আজ থেকে যাব; সব বটতলায় (পঞ্চবটীতে) বসে। কেশব বললে, না কাজ কাছে, যেতে হবে।

তখন আমি হেসে বললাম, আঁষচুপড়ীর গন্ধ না হলে কি ঘুম হবে না? একজন মেছুনী মালীর বাড়িতে অতিথি হয়েছিল; মাছ বিক্রি করে আসছে; চুপড়ী হাতে আছে। তাকে ফুলের ঘরে শুতে দেওয়া হ'ল। অনেক রাত পর্যন্ত ফুলের গন্ধে ঘুম হচ্ছে না; বাড়ির গিন্নী সেই অবস্থা দেখে বললে, কি গো, তুই ছটফট করছিস কেন? সে বললে, কে জানে বাবু, বুঝি এই ফুলের গন্ধে ঘুম হচ্ছে না; আমার আঁষচুপড়ীটা আনিয়ে দিতে পার? তা হলে বোধ হয় ঘুম হতে পারে। শেষে আঁষচুপড়ী আনাতে জল ছিটে দিয়ে নাকের কাছে রেখে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোতে লাগল।

গল্প শুনে কেশবের দলের লোকেরা হো হো করে হাসতে লাগল।

জ. কেশব সন্ধ্যার পর ঘাটে উপাসনা করলে। উপাসনার পর আমি কেশবকে বললুম, দেখ ভগবানই একরূপে ভাগবত হয়েছেন, তাই বেদ, পুরাণ, তন্ত্র এ সব পূজা করতে হয়। আবার একরূপে তিনি ভক্ত হয়েছেন, ভক্তের হৃদয় তাঁর বৈঠকখানা; বৈঠকখানায় গেলে যেমন বাবুকে অনায়াসে দেখা যায়। তাই ভক্তের পূজাতে ভগবানের পূজা হয়।

কেশব আর তার দলের লোকগুলি এই কথাগুলি খুব মন দিয়ে শুনলে। পূর্ণিমা, চারিদিকে চাঁদের আলোক। গঙ্গাকূলে সিঁড়ির চাতালে সকলে বসে আছে! আমি বললাম, সকলে বল, 'ভাগবত ভক্ত ভগবান'।

তখন সকলে একসুরে বললে, ভাগবত ভক্ত ভগবান। আবার বললাম, বল, ব্রহ্মই শক্তি, শক্তিই ব্রহ্ম। তারা আবার একসুরে বললে, ব্রহ্মই শক্তি, শক্তিই ব্রহ্ম। তাদের বললুম, যাঁকে তোমরা ব্রহ্ম বল, তাঁকেই আমি মা বলি; মা বড় মধুর নাম।

যখন আবার তাদের বললাম, আবার বল, 'গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব'। তখন কেশব বললে, মহাশয় অতদূর নয়! তাহলে সকলে আমাদের গোঁড়া বৈষ্ণব মনে করবে।

ঝ. কেশবকে মাঝে মাঝে বলতাম, তোমরা যাঁকে ব্রহ্ম বল, তাঁকেই আমি শক্তি, তাদের বললুম, যাঁকে তোমরা ব্রহ্ম বল, তাঁকেই আমি মা বলি; মা বড় মধুর নাম।

যখন আবার তাদের বললাম, আবার বল, গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব। তখন কেশব বললে, মহাশয় অতদূর নয়! তাহলে সকলে আমাদের গোঁড়া বৈষ্ণব মনে করবে।

ঞ. কেশবকে মাঝে মাঝে বলতাম, তোমরা যাঁকে ব্রহ্ম বল, তাঁকেই আমি শক্তি, আদ্যাশক্তি বলি। যখন বাক্য মনের অতীত, নির্গুণ নিষ্ক্রিয়, তখন বেদে তাঁকে ব্রহ্ম বলেছে। যখন দেখি যে তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করছেন তখন তাঁকে শক্তি ; আদ্যাশক্তি এই সব বলি।

ট. কেশবকে বললাম, সংসারে হওয়া বড় কঠিন—যে ঘরে আচার আর তেঁতুল আর জলের জালা, সেই ঘরেই বিকারী রোগী কেমন করে ভাল হয় ; তাই মাঝে মাঝে সাধন ভজন করবার জন্য নির্জনে চলে যেতে হয়। গুঁড়ি মোটা হলে হাতী বেঁধে দেওয়া যায়, কিন্তু চারা গাছ ছাগলে গরুতে খেয়ে ফেলে। তাই কেশব লেকচারে বললে, তোমরা পাকা হয়ে সংসারে থাক।

কৃপা হলে। সেজবাবুর সঙ্গে আর এক জায়গায় গিয়েছিলুম। অনেক পণ্ডিত আমার সঙ্গে বিচার করতে এসেছিল। আমি তো মুখ্যু। তারা আমার সেই অবস্থা দেখলে আর আমার সঙ্গে কথাবার্তা হলে বলল, মহাশয়, আগে যা পড়েছি, তোমার সঙ্গে কথা কয়ে সে-সব পড়াবিদ্যা, সব থু হয়ে গেল। এখন বুঝেছি, তাঁর কৃপা হলে জ্ঞানের অভাব থাকে না। মূর্খ বিদ্বান হয়, বোবার কথা ফোটে।

কৃষ্ণকিশোর। আমি কৃষ্ণকিশোরের বাড়ি যেতুম। একদিন গিয়েছি, সে বললো, তুমি পান খাও কেন ? আমি বললুম, খুশি পান খাব, আর্শিতে মুখ দেখব, হাজার মেয়ের মধ্যে ন্যাংটা হয়ে নাচব। কৃষ্ণকিশোরের পরিবার বকতে লাগল, বলল, তুমি কারে কি বলো ? রামকৃষ্ণকে কি বলছ ?

কৃষ্ণকিশোরের বিশ্বাস। কৃষ্ণকিশোরের কি বিশ্বাস। বৃন্দাবন গিছল। সেখানে একদিন জলতৃষ্ণা পেয়েছে। কুয়ার কাছে গিয়ে দেখে একজন দাঁড়িয়ে রয়েছে। জিজ্ঞাসা করতে সে বলল, আমি নীচ জাতি, আপনি ব্রাহ্মণ, কেমন করে আপনার জল তুলে দেব ? কৃষ্ণকিশোর বলল, তুই বল 'শিব'। 'শিব শিব' বললেই তুই শুদ্ধ হয়ে যাবি। সে 'শিব শিব' বলে জল তুলে দিলে। অমনি আচারী ব্রাহ্মণ সেই জল খেলে। কি বিশ্বাস।

কৃষ্ণকিশোরের রাগ। এঁড়েদার ঘাটে সাধু এসেছিল। আমরা একদিন দেখতে যাব ভাবলুম। আমি কালীবাড়িতে হলধারীকে বললুম, কৃষ্ণকিশোর আর আমি সাধু দেখতে যাব। তুমি যাবে ? হলধারী বলল, একটা মাটির খাঁচা দেখতে গিয়ে কি হবে ? হলধারী গীতা বেদান্ত পড়ে কিনা, তাই সাধুকে বলল 'মাটির খাঁচা'। কৃষ্ণকিশোরকে গিয়ে আমি ঐকথা বললুম। সে মহা রেগে গেল। আর বলল, কি ! হলধারী এমন কথা বলেছে ? যে ঈশ্বর চিন্তা করে, যে রাম চিন্তা করে আর সেইজন্য সর্বত্যাগ করেছে, তার দেহ মাটির খাঁচা। সে জানে না যে ভক্তের দেহ চিন্ময়। এত রাগ—কালীবাড়িতে ফুল তুলতে আসত, হলধারীর সঙ্গে দেখা হলে মুখ ফিরিয়ে নিত। কথা কইবে না।

কৃষ্ণকিশোরের উন্মাদ। আমায় বলেছিল, পৈতেটা ফেললে কেন ? যখন আমার এই অবস্থা হ'ল, তখন আশ্বিনের ঝড়ের মতো একটা কি এসে কোথায় কি উড়িয়ে লয়ে গেল। আগেকার চিহ্ন কিছুই রইল না। হুঁশ নাই। কাপড় পড়ে যাচ্ছে,

তা পৈতে থাকবে কেমন করে ? আমি কৃষ্ণকিশোরকে বললুম, তোমার একবার উন্মাদ হয়, তাহলে তুমি বোঝ।
তাই হ'ল। তার নিজেরই উন্মাদ হ'ল। তখন সে কেবল ওঁ ওঁ বলত আর এক ঘরে চুপ করে বসে থাকত। সকলে মাথা গরম হয়েছে বলে কবিরাজ ডাকলে। নাটাগড়ের রাম কবিরাজ এল। কৃষ্ণকিশোর তাকে বলল, ওগো, আমার রোগ আরাম করো, কিন্তু দেখো ওঁকারটি যেন আরাম করো না।

কৃষ্ণকিশোরের ট্যাক্সো ভাবনা। রোগাদির জন্য তুলসী দিচ্ছে, কৃষ্ণকিশোর দেখে অবাক। আমি কৃষ্ণকিশোরের বাড়ি যাই যেতুম, আমাকে দেখে নৃত্য। একদিন গিয়ে দেখি বসে ভাবছে। জিজ্ঞাসা করলুম, কি হয়েছে ? বলল, টেক্সওয়ালা এসেছিল, তাই ভাবছি। বলেছে টাকা না দিলে ঘটি বাটি বেচে লবে। আমি বললুম, কি হবে ভেবে। না হয় ঘটি বাটি লয়ে যাবে। যদি বেঁধে লয়ে যায়, তোমাকে তো লয়ে যেতে পারবে না। তুমি তো 'খ' গো। কৃষ্ণকিশোর বলত, আমি আকাশবৎ। অধ্যাত্ম পড়ত কি না। মাঝে মাঝে তাকে 'তুমি খ' বলে ঠাট্টা করতুম। আমি হেসে বললুম, তুমি 'খ', ট্যাক্স তোমাকে তো টানতে পারবে না।

কৃষ্ণকিশোরের মন্ত্র। কৃষ্ণকিশোর বলেছিল, 'মরা মরা' শুদ্ধ মন্ত্র—ঋষি দিয়েছেন বলে। 'ম' মানে ঈশ্বর, 'রা' মানে জগৎ। তাই আগে বাল্মীকির মতো সব ত্যাগ করে নির্জনে গোপনে ব্যাকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে ঈশ্বরকে ডাকতে হয়। আগে দরকার ঈশ্বর-দর্শন। তারপর বিচার শাস্ত্রজগৎ।

কৃষ্ণদাস পাল। কৃষ্ণদাস পাল এসেছিল। দেখলুম রজো গুণ। তবে হিন্দু, জুতো বাইরে রাখলে। একটু কথা কয়ে দেখলুম ভিতরে কিছু নাই। জিজ্ঞাসা করলুম, মানুষের কর্তব্য কি ? তা বলে, জগতের উপকার করবে। আমি বললুম, হ্যাঁ গা, তুমি কে ? আর কি উপকার করবে ? আর জগৎ কতটুকু গা যে তুমি উপকার করবে ? আমি বলি, নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু। তাঁরই জয়। শ্রীমতী যখন সহস্র-ধারা কলসী লয়ে যাচ্ছিলেন, জল একটুও পড়ে নাই, সকলে তার প্রশংসা করতে লাগল। বলে, এমন সতী হবে না। তখন শ্রীমতী বলেন, তোমরা আমার জয় কেন দাও, বল কৃষ্ণের জয়। কৃষ্ণের জয়। আমি তার দাসীমাত্র।

গঙ্গাপ্রসাদ সেন। 'রোক' দ্রষ্টব্য।

গোবিন্দ রায়। দ্রঃ আল্লামন্ত্র গ্রহণ।

গৌরী পণ্ডিত। গৌরী পণ্ডিত ছিল, সাধকও ছিল। শক্তি সাধক, মার ভাবে মাঝে মাঝে উন্মত্ত হয়ে যেত। মাঝে মাঝে বলত, 'হারে রে, নিরালম্ব লম্বোদর-জননী কং যামি শরণম্'। তখন পণ্ডিতেরা কেঁচো হয়ে যেত। আমিও আবিষ্ট হয়ে যেতুম। আমার খাওয়া দেখে বলত, তুমি ভৈরবী নিয়ে সাধন করেছ ? একজন কর্তাভজা নিরাকারের ব্যাখ্যা করলে—নিরাকার অর্থাৎ নীরের আকার। গৌরী তাই শুনে মহা রেগে গেল। প্রথম প্রথম একটু গোঁড়া শাক্ত ছিল। তুলসীপাতা দুটো কাঠি করে তুলতো—ছুঁতো না। তারপর বাড়ি গেল। বাড়ি থেকে ফিরে এসে আর অমন করে নাই। গৌরী বেশ সব ব্যাখ্যা

করত। এ, ঐ ব্যাখ্যা করত। এ শিষ্য, ঐ তোমার ইষ্ট। আবার রাবণের দশ মুণ্ড বলত দশ ইন্দ্রিয়। তমোগুণে কুম্ভকর্ণ, রজোগুণে রাবণ, সত্ত্বগুণে বিভীষণ। তাই বিভীষণ রামকে লাভ করেছিল।
গৌরী বলেছিল, কালী গৌরাঙ্গ এক বোধ হলে তবে ঠিক জ্ঞান হয়। যিনি ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি। তিনি নররূপে শ্রীগৌরাঙ্গ। স্ত্রীকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পুজো করত। সকল স্ত্রীই ভগবতীর এক একটি রূপ।

চিনে স্যাঁকরা। কি অবস্থাই সব গেছে। দেশে চিনে স্যাঁকরা আর তার সব বয়সীদের বললুম, ওরে তোদের পায়ে পড়ি, একবার হরিবোল বল। সকলের পায়ে পড়তে যাই। তখন চিনে বললে, ওরে তোর এখন প্রথম অনুরাগ, তাই সব সমান বোধ হয়েছে। প্রথম ঝড় উঠলে যখন ধুলো ওড়ে, তখন আমগাছ তেঁতুলগাছ সব এক বোধ হয়। এটা আমগাছ, এটা তেঁতুলগাছ চেনা যায় না।

ছেলেবেলার স্মৃতি। ও দেশে ছেলেবেলায় আমায় পুরুষ মেয়ে সকলে ভালবাসত। আমার গান শুনত। আবার লোকদের নকল করতে পারতুম, সেই সব দেখত ও শুনত। তাদের বাড়ির বউরা আমার জন্য খাবার জিনিস রেখে দিত। কিন্তু কেউ অবিশ্বাস করত না। সকলে দেখত যেন বাড়ির ছেলে।
কিন্তু সুখের পায়রা ছিলুম। বেশ ভাল সংসার দেখলে আনাগোনা করতুম। যে বাড়িতে দুঃখ বিপদ দেখতুম সেখান থেকে পালাতুম।
ছোকরাদের ভিতর দু-একজন ভাল লোক দেখলে খুব ভাব করতুম। কারুর সঙ্গে সেঙ্গাত্ পাতাতুম। কিন্তু এখন তারা ঘোর বিষয়ী। এখন তারা কেউ কেউ এখানে আসে, এসে বলে, ও মা। পাঠশালেও যেমন দেখেছি এখানেও ঠিক তাই দেখছি।
পাঠশালে শুভঙ্করী আঁক ধাঁধা লাগত। কিন্তু চিত্র বেশ আঁকতে পারতুম; আর ছোট ছোট ঠাকুর বেশ গড়তে পারতুম।
সদাব্রত, অতিথিশালা, যেখানে দেখতুম সেখানে যেতুম, গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে দেখতুম।
কোনখানে রামায়ণ কি ভাগবত পাঠ হচ্ছে, তা বসে বসে শুনতুম তবে যদি ঢং করে পড়ত, তাহলে তার নকল করতুম, আর অন্য লোকদের শুনাতুম।
মেয়েদের ঢং বেশ বুঝতে পারতুম। তাদের কথা, সুর, নকল করতুম। কড়েরাঁড়ী বাপকে উত্তর দিচ্ছে, যা-ই। বারান্দায় মাগীরা ডাকছে, ও তপসে-মাছওলা! নষ্ট মেয়ে বুঝতে পারতুম। বিধবা সোজা সিঁথে কেটেছে আর খুব অনুরাগের সহিত গায়ে তেল মাখছে। লজ্জা কম, বসবার রকমই আলাদা।
থাক বিষয়ীদের কথা।

জন্ম। আমার বাবা গয়াতে গিছলেন। সেখানে রঘুবীর স্বপন দিলেন, আমি তোদের ছেলে হব। বাবা স্বপন দেখে বলেন, ঠাকুর, আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, কেমন

করে তোমার সেবা করবো। রঘুবীর বলেন—তা হয়ে যাবে।

জয়নারায়ণ পণ্ডিত। জয়নারায়ণ পণ্ডিত খুব উদার ছিল। গিয়ে দেখলুম বেশ ভাবটি। ছেলেগুলো দেখলুম ব্যুট পায়ে-দেওয়া,ইংরাজী-পড়া। অতবড় পণ্ডিত কিন্তু অহংকার ছিল না। নিজের মৃত্যুর কথা জানতে পেরে বলেছিল, আমি কাশীতে যাবো আর সেখানে দেহ রাখব। যা বললে, তাই শেষে করলে। আইন-মাফিক কাশীতে গিয়ে বাস হ'ল আর কাশীতেই দেহত্যাগ হ'ল।

জাতিভেদ কি আছে? কই আর আছে? কেশব সেনের বাড়ি চচ্চরি খেয়েছি, তবু একদিনের কথা বলছি। একটা লোক লম্বা দাড়িওয়ালা বরফ নিয়ে এসেছিল, তা কেমন খেতে ইচ্ছা হ'ল না, আবার একটু পরে একজন—তারই কাছ থেকে বরফ নিয়ে এল—ক্যাচর-ম্যাচর করে চিবিয়ে খেয়ে ফেললাম। তা জানো, জাতিভেদ আপনি খসে যায়। যেমন নারিকেল গাছ, তালগাছ বড় হয়, বেল্লো তো আপনি খসে পড়ে। জাতিভেদ তেমনি খসে যায়। টেনে ছিঁড়ো না, ঐ শালাদের মতো।

জ্ঞানোম্মাদ অবস্থা। সেজো বাবুর সঙ্গে ক'দিন বজরা করে হাওয়া খেতে গেলাম। সেই যাত্রায় নবদ্বীপেও যাওয়া হয়েছিল। বজরাতে দেখলাম মাঝিরা রাঁধছে। তাদের কাছে দাঁড়িয়ে আছি, সেজো বাবু বললে, বাবা ওখানে কি করছ? আমি হেসে বললাম, মাঝিরা বেশ রাঁধছে। সেজো বাবু বুঝেছে যে, ইনি এবারে চেয়ে খেতে পারেন। তাই বললে, বাবা সরে এসো, সরে এসো।

এখন কিন্তু আর পারি না। সে অবস্থা এখন নাই। এখন ব্রাহ্মণ হবে, আচারী হবে, ঠাকুরের ভোগ হবে, তবে ভাত খাবো।

টাকা। এখানে সিঁথির মহিন্দোর পাল পাঁচটি টাকা দিয়ে গিছলো—রামলালের কাছে। সে চলে গেলে পর রামলাল আমায় বললে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কেন দিয়েছে? রামলাল বললে, এখানের জন্যে দিয়েছে। তখন মনে উঠতে লাগল যে—দুধের দেনা রয়েছে, না হয় কতক শোধ দেওয়া যাবে। ওমা, রাত্রে শুয়ে আছি, হঠাৎ উঠে পড়লাম। একবার বুকের ভিতর বিল্লী আঁচড়াতে লাগল। তখন রামলালকে গিয়ে বললাম, কাকে দিয়েছে? তোর খুড়িকে কি দিয়েছে? রামলাল বললে, না আপনার জন্য দিয়েছে। তখন বললাম, না; এক্ষুনি টাকা ফিরিয়ে দিয়ে আয়, তা না হলে আমার শান্তি হবে না।

রামলাল ভোরে উঠে টাকা ফিরিয়ে দিয়ে আসে, তবে হয়।

তীর্থস্মৃতি। তীর্থে গেলাম তা এক একবার ভারী কষ্ট হ'ত। কাশীতে সেজো বাবুদের সঙ্গে রাজাবাবুদের বৈঠকখানায় গিয়েছিলাম। সেখানে দেখি তারা বিষয়ের কথা কচ্ছে!—টাকা, জমি, এই সব কথা। কথা শুনে আমি কাঁদতে লাগলাম। বললাম, মা কোথায় আনলি। দক্ষিণেশ্বরে যে আমি বেশ ছিলাম। পইরাগে দেখলাম—সেই পুকুর, সেই দূর্বা, সেই গাছ, সেই তেঁতুল পাতা! কেবল তফাৎ পশ্চিমে লোকের ভুষির মতো বাহ্যে।

তবে তীর্থে উদ্দীপন হয় বটে। মথুরবাবুর সঙ্গে বৃন্দাবনে গেলাম। মথুরবাবুর বাড়ির মেয়েরাও ছিল—হৃদেও ছিল। কালীয়দমন ঘাট দেখবামাত্রই উদ্দীপন হ'ত—আমি বিহ্বল হয়ে যেতাম।—হৃদে আমায় যমুনার সেই ঘাটে ছেলেটির মতন নাওয়াত।

যমুনার তীরে সন্ধ্যার সময় বেড়াতে যেতাম। যমুনার চড়া দিয়ে সেই সময় গোষ্ঠ হতে গরু সব ফিরে আসত। দেখবামাত্র আমার কৃষ্ণের উদ্দীপন হ'ল, উন্মত্তের ন্যায় আমি দৌড়তে লাগলাম—'কৃষ্ণ কই, কৃষ্ণ কই' এই বলতে বলতে। পাল্কী করে শ্যামকুন্ড রাধাকুন্ডের পথে যাচ্ছি, গোবর্ধন দেখতে নামলাম, গোবর্ধন দেখবামাত্রই একেবারে বিহ্বল, দৌড়ে গিয়ে গোবর্ধনের উপরে দাঁড়িয়ে পড়লুম।—আর বাহ্যশূন্য হয়ে গেলাম। তখন ব্রজবাসীরা গিয়ে আমায় নামিয়ে আনে। শ্যামকুন্ড রাধাকুন্ড পথে সেই মাঠ, আর গাছপালা, হরিণ—এই সব দেখে বিহ্বল হয়ে গেলাম। চক্ষের জলে কাপড় ভিজে যেতে লাগল। মনে হতে লাগল, কৃষ্ণ রে, সবই রয়েছে, কেবল তোকে দেখতে পাচ্ছি না। পাল্কীর ভিতরে বসে, কিন্তু একবার একটি কথা কইবার শক্তি নাই—চুপ করে বসে। হৃদে পাল্কীর পিছনে আসছিল। বেয়ারাদের বলে দিছলো 'খুব হুঁশিয়ার।'

গঙ্গামায়ী বড় যত্ন করত। অনেক বয়স। নিধুবনের কাছে কুটীরে একলা থাকত। আমার অবস্থা আর ভাব দেখে বলতো—ইনি সাক্ষাৎ রাধা দেহ ধারণ করে এসেছেন। আমায় দুলালী বলে ডাকতো। তাকে পেলে আমার খাওয়া দাওয়া, বাসায় ফিরে যাওয়া সব ভুল হয়ে যেত। হৃদে এক এক দিন বাসা থেকে খাবার এনে খাইয়ে যেত—সেও খাবার জিনিস তয়ের করে খাওয়াত।

গঙ্গামায়ীর ভাব হ'ত। ভাব দেখবার জন্য লোকের মেলা হ'ত। ভাবেতে একদিন হৃদয়ের কাঁধে চড়েছিল।

গঙ্গামায়ীর কাছ থেকে দেশে চলে আসবার আমার ইচ্ছে ছিল না। সব ঠিক ঠাক, আমি সিদ্ধ চালের ভাত খাব; গঙ্গামায়ীর বিছানা ঘরের এদিকে হবে আমার বিছানা ওদিকে হবে। সব ঠিক ঠাক। হৃদে তখন বলে, তোমার এত পেটের অসুখ—কে দেখবে। গঙ্গামায়ী বলে, কেন, আমি দেখবো, আমি সেবা করবো। হৃদে এক হাত ধরে টানে আর গঙ্গামায়ী এক হাত ধরে টানে—এমন সময় মাকে মনে পড়ল।—মা সেই একলা দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ির নবতে। আর থাকা হ'ল না। তখন বললাম—না, আমায় যেতে হবে।

ভুক করা। আমার কথা লবে কে? আমি সঙ্গী খুঁজছি—আমার ভাবের লোক। খুব ভক্ত দেখলে মনে হয়, এই বুঝি আমার ভাব নিতে পারবে। আবার দেখি, সে আর একরকম হয়ে যায়।

একটা ভূত সঙ্গী খুঁজছিল। শনি মঙ্গলবারে অপঘাতে মৃত্যু হ'লে ভূত হয়। ভূতটা, যেই দ্যাখে কেউ শনি মঙ্গলবারে ঐ রকম করে মরছে, অমনি দৌড়ে যায়। মনে করে, এইবার বুঝি আমার সঙ্গী হ'ল। কিন্তু কাছেও যাওয়া, আর সে লোকটা দাঁড়িয়ে উঠেছে। হয় তো ছাদ থেকে পড়ে অজ্ঞান হয়েছে, আবার বেঁচে উঠেছে।

সেজো বাবুর ভাব হ'ল। সর্বদাই মাতালের মতো থাকে—কোনও কাজ করতে পারে না। তখন সবাই বলে, এ রকম হ'লে বিষয় দেখবে কে? ছোট ভটচার্জি নিশ্চয় কোনও তুক করেছে।

নরেন্দ্র যখন প্রথম প্রথম আসে, ওর বুকে হাত দিতে বেহুঁশ হ'য়ে গেল। তারপর চৈতন্য হ'লে কেঁদে বলতে লাগল, ওগো আমায় এমন করলে কেন? আমার যে বাবা আছে, আমার যে মা আছে গো। 'আমার' 'আমার' করা, এটি অজ্ঞান থেকে হয়।

ত্যাগের জন্য রাজসিক ভাব। আমি রাজসিক ভাবের আরোপ করতাম—ত্যাগ করবার জন্য। সাধ হয়েছিল সাঁচ্চা জরীর পোশাক পরবো, আঙটি আঙ্গুলে দেব, নল দিয়ে গুড়গুড়িতে তামাক খাব। সাঁচ্চা জরীর পোশাক পরলাম—এরা (মথুরবাবু) আনিয়ে দিলে। খানিকক্ষণ পরে মনকে বললাম—মন, এর নাম সাঁচ্চা জরীর পোশাক। তখন সেগুলোকে খুলে ফেলে দিলাম। আর ভাল লাগল না। বললাম মন, এরই নাম শাল—এরই নাম আঙটি। এরই নাম নল দিয়ে গুড়গুড়িতে তামাক খাওয়া। সেই যে সব ফেলে দিলাম আর মনে উঠে নাই।

দাসীভাবে। আমি সখীভাবে অনেক দিন ছিলাম। বলতাম, আমি আনন্দময়ী ব্রহ্মময়ীর দাসী—ওগো দাসীরা আমায় তোমরা দাসী কর, আমি গরব ক'রে চলে যাব, বলতে বলতে যে, আমি ব্রহ্মময়ীর দাসী।

দিদির পূজা। দিদি—হৃদের মা—আমার পা পূজা ক'রতো ফুল-চন্দন দিয়ে। একদিন তার মাথায় পা দিয়ে (মা) বল্লে, তোর কাশীতেই মৃত্যু হবে।

দিব্যোন্মাদ অবস্থা। আমার তখন খুব অসুখ। সরা সরা বাহ্যে যাচ্ছি। মাথায় যেন দু'লাখ পিঁপড়ে কামড়াচ্ছে। কিন্তু ঈশ্বরীয় কথা রাতদিন চলছে। নাটাগড়ের রাম কবিরাজ দেখতে এলো। সে দেখে, আমি বসে বিচার করছি। তখন সে বললে, এ কি পাগল। দু'খানা হাড় নিয়ে বিচার করছে। যখন পেটের ব্যামোতে বড় ভুগছি, হৃদে বললে, মাকে একবার বল না, যাতে আরাম হয়। আমার রোগের জন্য বলতে লজ্জা হ'ল। বললুম, মা, সুসাইটিতে মানুষেরহাড় দেখেছিলুম, তার দিয়ে জুড়ে জুড়ে মানুষের আকৃতি; মা, এ রকম করে শরীর একটু শক্ত করে দাও, তাহলে তোমার নাম গুণকীর্তন করব।

হৃদে কিন্তু আমার অনেক করেছিল—অনেক সেবা করেছিল। হাতে করে গু পরিষ্কার করত। তেমনি শেষে শাস্তিও দিয়েছিল। এতশাস্তি দিতযে,পোস্তার উপর গিয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে দেহত্যাগ করতে গিয়েছিলুম। কিন্তু আমার অনেক করেছিল। ছেলেকে যেমন মানুষ করে, সেইরকম করে আমাকে দেখেছে। আমি তো রাতদিন বেঁহুশ হয়ে থাকতুম, তার উপর আবার অনেকদিন ধরে ব্যামোয় ভুগেছি। ও যে-রকম করে আমায় রাখত, সেই রকম আমি থাকতুম।

হৃদে যখন বড় যন্ত্রণা দিচ্ছে, তখন এখান থেকে কাশী চলে যাবো মতলব হ'ল। ভাবলুম, কাপড় লব, কিন্তু টাকা কেমন করে লব? আর কাশী যাওয়া হ'ল না।

দীননাথ মুখুজ্যে। একদিন শুনলুম বাগবাজারের পোলের কাছে দীন মুখুজ্যে বলে একটি ভাল লোক আছে। ভক্ত। সেজবাবুকে ধরলুম, আমি দীন মুখুজ্যের বাড়ি যাব। সেজবাবু কি করে, গাড়ি করে নিয়ে গেল। বাড়িটি ছোট। আবার মস্ত গাড়ি করে এক বড়মানুষ এসেছে। তারাও অপ্রস্তুত, আমরাও অপ্রস্তুত। তার আবার ছেলের পৈতে। কোথায় বসায়? আমরা পাশের ঘরে যাচ্ছিলুম, তা বলে উঠল, ও ঘরে মেয়েরা, যাবেন না। মহা অপ্রস্তুত। সেজবাবু ফিরবার সময় বললে, বাবা, তোমার কথা আর শুনব না। আমি হাসতে লাগলুম।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সেজোবাবুর (রানী রাসমণির জামাতা শ্রীযুক্ত মথুরনাথ বিশ্বাস) সঙ্গে দেবেন্দ্র ঠাকুরকে দেখতে গিছিলাম। সেজোবাবুকে বললুম, আমি শুনেছি দেবেন্দ্র ঠাকুর ঈশ্বর চিন্তা করে, আমার তাকে দেখবার ইচ্ছা হয়। সেজোবাবু বললে, 'আচ্ছা বাবা, আমি তোমায় নিয়ে যাব; আমরা হিন্দু কলেজে এক ক্লাসে পড়তুম, আমার সঙ্গে বেশ ভাব আছে।' সেজোবাবুর সঙ্গে অনেক দিন পরে দেখা হ'ল। দেখে দেবেন্দ্র বললে, তোমার একটু বদলেছে—তোমার ভুঁড়ি হয়েছে। সেজোবাবু আমার কথা বলল, ইনি তোমায় দেখতে এসেছেন — ইনি ঈশ্বর-ঈশ্বর ক'রে পাগল। আমি লক্ষণ দেখবার জন্য দেবেন্দ্রকে বললুম, 'দেখি গা, তোমার গা।' দেবেন্দ্র গায়ের জামা তুললে, দেখলাম—গৌরবর্ণ তার উপর সিঁদুর ছড়ান। তখন দেবেন্দ্রের চুল পাকে নাই।

প্রথম যাবার পর একটু অভিমান দেখেছিলাম। তা হবে না গা? অত ঐশ্বর্য, বিদ্যা, মান সম্ভ্রম? অভিমান দেখে সেজোবাবুকে বললুম, আচ্ছা, অভিমান জ্ঞানে হয়, না অজ্ঞানে হয়? যার ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে তার কি 'আমি পণ্ডিত', 'আমি জ্ঞানী', 'আমি ধনী' বলে অভিমান থাকতে পারে?

দেবেন্দ্রের সঙ্গে কথা কইতে কইতে আমার হঠাৎ সেই অবস্থাটি হ'ল। সেই অবস্থাটি হ'লে কে কিরূপ লোক দেখতে পাই। আমার ভিতর থেকে হী হী ক'রে একটা হাসি উঠল। যখন ঐ অবস্থাটা হয়, তখন পণ্ডিত-ফণ্ডিত তৃণ জ্ঞান হয়! যদি দেখি, পণ্ডিতের বিবেকবৈরাগ্য নাই, তখন খড়-কুটোর মতো বোধ হয়। তখন দেখি, যেন শকুনি খুব উঁচুতে উঠেছে কিন্তু ভাগাড়ের দিকে নজর।

দেখলাম, যোগ ভোগ দুই-ই আছে; অনেক ছেলেপুলে, ছোট ছোট; ডাক্তার এসেছে; তবেই হ'ল, অত জ্ঞানী হ'য়ে সংসার নিয়ে সর্বদা থাকতে হয়। বললুম, তুমি কলির জনক। জনক এদিক উদিক দু'দিক রেখে খেয়েছিল দুধের বাটি। তুমি সংসারে থেকে ঈশ্বরে মন রেখেছো শুনে তোমায় দেখতে এসেছি; আমায় ঈশ্বরীয় কথা কিছু শুনাও।

তখন বেদ থেকে কিছু কিছু শুনালে। বললে, এই জগৎ যেন একটি ঝাড়ের মতো, আর জীব হয়েছে—এক-একটি ঝাড়ের দীপ। আমি এখানে পঞ্চবটীতে যখন ধ্যান করতুম ঠিক ঐ রকম দেখেছিলাম। দেবেন্দ্রের কথার সঙ্গে মিলল দেখে ভাবলুম, তবে তো খুব বড়লোক। ব্যাখ্যা করতে বললুম—তা বললে, এ জগৎ কে জানতো?—ঈশ্বর মানুষ করেছেন, তাঁর মহিমা প্রকাশ করবার জন্য। ঝাড়ের আলো না থাকলে সব অন্ধকার, ঝাড় পর্যন্ত দেখা যায় না।

অনেক কথাবার্তার পর দেবেন্দ্র খুশি হ'য়ে বললে, 'আপনাকে উৎসবে (ব্রহ্মোৎসব) আসতে হবে।' আমি বললাম, 'সে ঈশ্বরের ইচ্ছা ; আমার তো এই অবস্থা দেখছো !—কখন কি ভাবে তিনি রাখেন।' দেবেন্দ্র বললে, 'না, আসতে হবে ; তবে ধুতি আর উড়ানি পরে এসো—তোমাকে এলোমেলো দেখে কেউ কিছু বললে, আমার কষ্ট হবে।' আমি বললাম, 'তা পারবো না। আমি বাবু হ'তে পারবো না।' দেবেন্দ্র, সেজোবাবু সব হাসতে লাগলো।

তার পর দিনই সেজোবাবুর কাছে দেবেন্দ্রের চিঠি এলো—আমাকে উৎসব দেখতে যেতে বারণ ক'রেছে। বলে—অসভ্যতা হবে, গায়ে উড়ানি থাকবে না।

দৈবস্বভাব। দৈবস্বভাব—দেবতার প্রকৃতি। এতে লোকভয় কম থাকে। যদি গলায় মালা, গায়ে চন্দন, ধূপ ধুনার গন্ধ দেওয়া যায় ; তা হ'লে সমাধি হ'য়ে যায়।—ঠিক বোধ হ'য়ে যায় যে, অন্তরে নারায়ণ আছেন—নারায়ণ দেহ ধারণ করে এসেছেন। আমি টের পেয়েছি।

দক্ষিণেশ্বরে যখন আমার প্রথম এইরূপ অবস্থা হ'ল, কিছুদিন পরে একটি ভদ্রঘরের বামুনের মেয়ে এসেছিল। বড় সুলক্ষণা। যেই গলায় মালা আর ধূপ ধুনা দেওয়া হ'ল, অমনি সমাধিস্থ। কিছুক্ষণ পরে আনন্দ—আর ধারা পড়তে লাগলো। আমি তখন প্রণাম ক'রে বললুম, 'মা আমার হবে ?' তা বললে, 'হাঁ।'

ধর্মমত। আমি সব রকম করেছি—সব পথই মানি। শাক্তদেরও মানি, বৈষ্ণবদেরও মানি, আবার বেদান্তবাদীদেরও মানি। এখানে তাই সব মতের লোক আসে। আর সকলেই মনে করে, ইনি আমাদেরই মতের লোক। আজকালকার ব্রহ্মজ্ঞানীদেরও মানি।

একজনের একটি রঙ-এর গামলা ছিল। গামলার আশ্চর্য গুণ যে, যে যে রঙে কাপড় ছোপাতে চাইবে তার কাপড় সেই রঙে ছুপে যেত।

কিন্তু একজন চালাক লোক বলেছিল, 'তুমি যে রঙে রঙেছো, আমায় সেই রঙটি দিতে হবে।'

কেন একঘেয়ে হব ? অমুক মতের লোক তা হলে আসবে না। এ ভয় আমার নাই। কেউ আসুক আর না আসুক তাতে আমার বয়ে গেছে ; লোক কিসে হাতে থাকবে, এমন কিছু আমার মনে নাই। অধর সেন বড় কর্মের জন্য মাকে বলতে বলেছিল—তা ওর সে কর্ম হ'ল না। ও তাতে যদি কিছু মনে করে, আমার বয়ে গেছে !

আবার কেশব সেনের বাড়ী গিয়ে আর এক ভাব হ'ল। ওরা নিরাকার নিরাকার করে ; তাই ভাবে বল্লুম, মা, এখানে আসিস নি, এরা তোর রূপ-টূপ মানে না।

নকশা খেলা। তোমাদের সব ত্যাগ করতে হবে কেন ? তোমরা বসে বসে বেশ আছ। সারে মাতে ! তোমরা বেশ আছ। নকশা খেলা জান ? একরকম তাস খেলা। সতের ফোঁটার বেশি হলে জ্বলে যায়। আমি বেশি কাটিয়ে জ্বলে গেছি।

তোমরা খুব স্যায়না। কেউ দশে আছ, কেউ ছয়ে আছ, কেউ পাঁচে আছ। বেশি কাটাও নাই,তাই আমার মতো জ্বলে যাও নাই। খেলা চলছে। এ'ত বেশ। সত্য বলছি তোমরা সংসার করছো এতে দোষ নাই। তবে ঈশ্বরের দিকে মন রাখতে হবে। তা না হলে হবে না। এক হাতে কর্ম কর, আর এক হাতে ঈশ্বরকে ধরে থাকো। কর্ম শেষ হলে দুই হাতে ঈশ্বরকে ধরবে। অনাসক্ত হয়ে সংসারে থেকে কর্ম করলে, সব মিথ্যা জেনে জ্ঞানের পর সংসারে থাকলে, ঠিক ঈশ্বর লাভ হয়। যারা কষ্টে ছাড়ে তারা হীন থাকের লোক।

নররূপে জন্ম। তপস্যার জোরে নারায়ণ সন্তান হ'য়ে জন্মগ্রহণ করেন। ও দেশে যাবার রাস্তায় রণজিত রায়ের দীঘি আছে। রণজিত রায়ের ঘরে ভগবতী কন্যা হ'য়ে জন্মেছিলেন। এখনও চৈত্র মাসে মেলা হয়। আমার বড় যাবার ইচ্ছা হয়।— আর এখন হয় না।

রণজিত রায় ওখানকার জমিদার ছিল। তপস্যার জেরে তাঁকে কন্যারূপে পেয়েছিল। মেয়েটিকে বড়ই স্নেহ করে। সেই স্নেহের গুণে তিনি আট্‌কে ছিলেন, বাপের কাছ ছাড়া প্রায় হ'তেন না। একদিন সে জমিদারীর কাজ করছে, ভারী ব্যস্ত; মেয়েটি ছেলেব স্বভাবে কেবল বলছে, 'বাবা, এটা কি ; ওটা কি।' বাপ অনেক মিষ্টি করে বললে—'মা এখন যাও, বড় কাজ পড়েছে।' মেয়ে কোন মতে যায় না। শেষে বাপ অন্যমনস্ক হয়ে বললে, 'তুই এখান থেকে দূর হ'। মা তখন এই ছুতো করে বাড়ী থেকে চলে গেলেন। সেই সময় একজন শাঁখারী রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। তাকে ডেকে শাঁখা পরা হ'ল। দাম দেবার কথায় বল্লেন, ঘরের অমুক কুলুঙ্গিতে টাকা আছে, লবে। এই ব'লে সেখান থেকে চলে গেলেন, আর দেখা গেল না। এদিকে শাঁখারী টাকার জন্য ডাকাডাকি ক'রছে। তখন মেয়ে বাড়ীতে নাই দেখে সকলে ছুটে এলো। রণজিত রায় নানাস্থানে লোক পাঠালে সন্ধান করবার জন্য। শাঁখারীর টাকা ঠিক সেই কুলুঙ্গিতে পাওয়া গেল। রণজিত রায় কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছেন, এমন সময় লোকজন এসে বল্লে যে, দীঘিতে কি দেখা যাচ্ছে। সকলে দীঘির ধারে গিয়ে দেখে যে শাঁখা পরা হাতটি জলের উপর তুলেছেন। তার পর আর দেখা গেল না। এখনও ভগবতীর পূজো ঐ মেলার সময় হয়—বারুণীর দিনে। এ সব সত্য।

নরেন্দ্র। ১. নরেন্দ্র যখন প্রথম এলো—ময়লা একখানা চাদর গায়ে, কিন্তু চোখ-মুখ দেখে বোধ হ'ল ভিতরে কিছু আছে। তখন বেশি গান জানত না, দু একটা গান গাইলে—'মন চল নিজ নিকেতনে' আর 'যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে'। যখন আসত, একঘর লোক, তবু ওর দিক পানে চেয়েই কথা কইতুম। ও বলত, এদের সঙ্গে কথা কন, তবে কইতুম। যদু মল্লিকের বাগানে কাঁদতুম, ওকে দেখবার জন্য পাগল হয়েছিলুম। এখানে ভোলানাথের হাত ধরে কান্না। ভোলানাথ বললে, একটা কায়েতের ছেলের জন্য মশায় আপনার এরূপ করা উচিত নয়। মোটা বামুন একদিন হাত জোড় করে বললে, মশায়, ওর সামান্য পড়াশুনা, ওর জন্য আপনি এত অধীর কেন হন?

ভবনাথ নরেনের জুড়ী—দুজনে যেন স্ত্রী পুরুষ। তাই ভবনাথকে নরেন্দ্রের

কাছে বাসা করতে বললুম। ওরা দুজনেই অরূপের ঘর।

২. নরেন্দ্রের খুব উঁচু ঘর—নিরাকারের ঘর। পুরুষের সত্তা। এত ভক্ত আসছে—ওর মতো একটিও নেই। এক একবার বসে খতাই। তা দেখি, অন্য পদ্ম কারু দশদল, কারু ষোড়শদল, কারু শতদল, কিন্তু পদ্ম মধ্যে নরেন্দ্র সহস্রদল। অন্যেরা কলসী ঘটি এসব হতে পারে, নরেন্দ্র জালা। ডোবা পুষ্করিণীর মধ্যে নরেন্দ্র বড় দিঘী, যেমন হালদার-পুকুর। মাছের মধ্যে নরেন্দ্র রাঙা-চক্ষু বড় রুই, আর সব নানারকম মাছ—পোনা, কাঠি, বাটা—এই সব। খুব আধার—অনেক জিনিষ ধরে। বড় ফুটোওলা বাঁশ। নরেন্দ্র কিছুর বশ নয়। ও আসক্তি, ইন্দ্রিয়সুখের বশ নয়। পুরুষ পায়রা।

নানকপন্থী ছোকরা সাধুর শিক্ষা। কাশীতে নানকপন্থী ছোকরা সাধু দেখেছিলুম। আমায় বলত প্রেমী সাধু। কাশীতে তাদের মঠ আছে। একদিন আমায় সেখানে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গেল। মোহান্তকে দেখলুম। যেন একটি গিন্নী। তাকে জিজ্ঞাসা করলুম, উপায় কি ? সে বললে, কলিযুগে নারদীয় ভক্তি।

নারায়ণ শাস্ত্রী। নারায়ণ শাস্ত্রীর খুব বৈরাগ্য হয়েছিল। অতবড় পণ্ডিত—স্ত্রী ত্যাগ করে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। নারায়ণ শাস্ত্রী শুধু পণ্ডিত নয়, সাধ্য-সাধনা করেছিল। পঁচিশ বছর একটানা পড়েছিল। সাতবছর ন্যায় পড়েছিল, তবু 'হর হর' বলতে বলতে ভাব হ'ত। জয়পুরের রাজা সভাপণ্ডিত করতে চেয়েছিল, তা সে-কাজ স্বীকার করলে না। দক্ষিণেশ্বরে প্রায় এসে থাকতো। বশিষ্ঠাশ্রমে যাবার ভারি ইচ্ছা—সেখানে তপস্যা করবে। যাবার কথা আমাকে প্রায় বলত। আমি তাকে সেখানে যেতে বারণ করলুম। তখন বলে, কোনদিন মরে যাবো। সাধন-ভজন কবে করব—ডুবকি কব ফাট যায়েগা। অনেক জেদাজেদির পর আমি যেতে বললুম।

শুনতে পাই কেউ কেউ বলে, নারায়ণ শাস্ত্রী নাকি শরীর ত্যাগ করেছে, তপস্যা করবার সময় ভৈরব নাকি চড় মেরেছিল। আবার কেউ কেউ বলে, বেঁচে আছে—এই আমরা তাকে রেলে তুলে দিয়ে এলুম।

দ্রঃ উন্মাদ অবস্থা।

নিত্য-লীলা দু-ই লই। শুধু জ্ঞানী একঘেয়ে—কেবল বিচার কচ্চে 'এ নয় এ নয়—এ সব স্বপ্নবৎ।' আমি দু'হাত ছেড়ে দিয়েছি, তাই সব লই।

একজন ব্যানের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। ব্যান তখন সুতো কাটছিল, নানা রকমের রেশমের সুতো। 'ব্যান' তার ব্যানকে দেখে খুব আনন্দ করতে লাগলো ; আর বললে—'ব্যান, তুমি এসেছ ব'লে আমার যে কি আনন্দ হয়েছে, তা বলতে পারি না—যাই তোমার জন্য কিছু জল খাবার আনিগে।' ব্যান জল-খাবার আনতে গেছে ;—এদিকে নানা রঙের রেশমের সুতা দেখে এ ব্যানের লোভ হয়েছে। সে একতারা সুতা বগলে ক'রে লুকিয়ে ফেললে। ব্যান জল-খাবার নিয়ে এলো ; আর অতি উৎসাহের সহিত—জল খাওয়াতে লাগলো। কিন্তু সুতার দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে বুঝতে পারল যে, একতারা সুতো ব্যান সরিয়েছেন। তখন সে সুতোটা আদায় করবার একটা ফন্দী ঠাওরালে।

সে বলছে, 'ব্যান, অনেক দিনের পর তোমার সহিত সাক্ষাৎ হ'ল। আজ ভারী আনন্দের দিন। আমার ভারী ইচ্ছা কচ্ছে যে দুজনে নৃত্য করি।' সে বললে —'ভাই, আমারও ভারী আনন্দ হয়েছে।' তখন দুই ব্যানে নৃত্য করতে লাগলো। ব্যান দেখলে যে, ইনি বাহু না তুলে নৃত্য করছেন। তখন তিনি বললেন, 'এস ব্যান দুহাত তুলে আমরা নাচি, আজ ভারী আনন্দের দিন।' কিন্তু তিনি এক হাতে বগল টিপে আর একটি হাত তুলে নাচতে লাগলেন। তখন ব্যান বললেন, 'ব্যান ওকি। এক হাত তুলে নাচা কি, এস দুহাত তুলে নাচি। এই দেখ, আমি দু'হাত তুলে নাচছি'। কিন্তু তিনি বগল টিপে হেসে হেসে এক হাত তুলেই নাচতে লাগলেন আর বললেন, 'যে যেমন জানে ব্যান।'

আমি বগলে তাই দিয়ে টিপি না—আমি দু'হাত ছেড়ে দিয়েছি—আমার ভয় নাই। তাই আমি নিত্য-লীলা দু-ই লই।

দ্রঃ ঋষিরা ভয়তরাসে।

ন্যাংটা (তোতাপুরীর) শিক্ষা। আমি এক জ্ঞানীর পাল্লায় পড়েছিলুম। ন্যাংটা বেদান্তের উপদেশ দিলে। তিনদিনেই সমাধি। মাধবীতলায় ঐ সমাধি দেখে সে হতবুদ্ধি হয়ে বললে, আরে, এ কেয়া রে! পরে সে বুঝতে পারলে এর ভিতর কে আছে। তখন আমায় বলে, তুমি আমায় ছেড়ে দাও। ওকথা শুনে আমার ভাবাবস্থা হয়ে গেল। আমি সেই অবস্থায় বললুম, বেদান্তবোধ না হলে তোমার যাবার যো নাই। তখন রাতদিন তার কাছে কেবল বেদান্ত। এগার মাস বেদান্ত শোনালে। কিন্তু ভক্তির বীজ আর যায় না। ফিরে ঘুরে সেই 'মা মা'। মন কুড়িয়ে এক করে যাই এনেছি অমান মার মূর্তি এসে সামনে দাঁড়াল। তখন আর তাঁকে ত্যাগ করে তার পরে আগিয়ে যেতে ইচ্ছা হয় না। যতবার মন থেকে সব জিনিষ তাড়িয়ে নিরালম্ব হয়ে থাকতে চেষ্টা করি, ততবারই ঐরূপ হয়। শেষে ভেবে চিন্তে মনে খুব জোর এনে, জ্ঞানকে অসি ভেবে সেই অসি দিয়ে ঐ মূর্তিটাকে মনে মনে দুখানা করে কেটে ফেললুম। তখন মনে আর কিছুই রইল না—হু হু করে একেবারে নির্বিকল্প অবস্থায় পৌঁছুল।

ন্যাংটা আমায় শেখাতো—উপদেশ দিত, গীতা দশবার বললে যা হয় তাই গীতার সার। অর্থাৎ 'গীতা গীতা' দশবার বলতে বলতে 'ত্যাগী ত্যাগী' হয়ে যায়। কিরূপে স্ব-স্বরূপে থাকা যায় ন্যাংটা উপদেশ দিত, মন বুদ্ধিতে লয় করো, বুদ্ধি আত্মাতে লয় করো, তবে স্ব-স্বরূপে থাকবে।

ন্যাংটার কাছে বেদান্ত শুনেছিলুম, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। বাজিকর এসে কত বাজি করে, আমের চারা, আম পর্যন্ত হ'ল। কিন্তু এসব বাজি। বাজিকরই সত্য। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম কিরূপ? যেমন অনন্ত সাগর—ঊর্ধ্বে নীচে, ডাইনে বামে জলে জল। কারণ-সলিল জল স্থির, কার্য হলে তরঙ্গ। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়—কার্য। আবার বলব, বিচার যেখানে থেমে যায়, সেই ব্রহ্ম। যেমন কর্পূর জ্বালালে পুড়ে যায়, একটু ছাইও থাকে না। ব্রহ্ম বাক্য মনের অতীত। নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিয়েছিল। এসে আর খবর দিল না। সমুদ্রেই রয়ে গেল। মনেই জগৎ আবার মনেই লয় হয়। জ্ঞানীর ধ্যানের কথা বলল ন্যাংটা। জলে

জল, অধঃ ঊর্ধ্ব পরিপূর্ণ। জীব যেন মনে, জলে আনন্দে সে সাঁতার দিচ্ছে। ঠিক ধ্যান হলে এইটি সত্য সত্য দেখবে। সিদ্ধাই থাকা এক মহা গোল। ন্যাংটা আমায় শেখালে।
দ্রঃ ঈশ্বর দর্শন।

পদ্মলোচন। পদ্মলোচন ভারী জ্ঞানী ছিল। কিন্তু আমি 'মা মা' করতুম তবু আমায় খুব মানতো। পদ্মলোচন বর্ধমানের রাজার সভাপণ্ডিত ছিল। কলকাতায় এসেছিল, এসে কামারহাটির কাছে একটি বাগানে ছিল। আমার পণ্ডিত দেখবার ইচ্ছা হ'ল। হৃদেকে পাঠিয়ে দিলুম জানতে অভিমান আছে কিনা। শুনলুম পণ্ডিতের অভিমান নাই। আমার সঙ্গে দেখা হ'ল। এত জ্ঞানী আর পণ্ডিত তবু আমার মুখে রামপ্রসাদের গান শুনে কান্না। কথা কয়ে এমন সুখ কোথাও পাই নাই। আমায় বললে, ভক্তের সঙ্গ করব—এ কামনা ত্যাগ কর, নচেৎ নানারকমের লোক তোমায় পতিত করবে। বৈষ্ণবচরণের গুরু উৎসবানন্দের সঙ্গে লিখে বিচার করেছিল। আমায় আবার বললে, আপনি একটু শুনুন। একটা সভায় বিচার হয়েছিল, শিব বড় না ব্রহ্মা বড়। শেষে ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা পদ্মলোচনকে জিজ্ঞাসা করলে। পদ্মলোচন এমনি সরল, সে বললে, আমার চৌদ্দপুরুষ শিবও দেখে নাই, ব্রহ্মাও দেখে নাই। কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ শুনে আমায় একদিন বললে, ও সব ত্যাগ করেছ কেন? এটা মাটি, এটা টাকা—এ ভেদবুদ্ধি তো অজ্ঞান থেকে হয়। আমি কি বলব, বললুম, কে জানে বাপু, আমার টাকা-কড়ি ওসব ভাল লাগে না।

পরমহংস অবস্থা। পরমহংসের স্বভাব ঠিক পাঁচ বছরের বালকের মতো। সব চৈতন্যময় দেখে।

যখন আমি ও দেশে (কামারপুকুরে), রামলালের ভাই (শিবরাম) তখন ৪/৫ বছর বয়স, পুকুরের ধারে ফড়িং ধরতে যাচ্ছে। পাতা নড়ছে, আর পাতার শব্দ পাছে হয়, তাই পাতাকে বলছে, চোপ! আমি ফড়িং ধরবো। ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে, আমার সঙ্গে ঘরের ভিতর সে আছে; বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে—তবুও দ্বার খুলে খুলে বাহিরে যেতে চায়। বকার পর আর বাহিরে গেল না, উঁকি মেরে মেরে এক একবার দেখছে, বিদ্যুৎ—আর বলছে, খুড়ো! আবার চকমকি ঠুকছে।

পরমহংস বালকের ন্যায়—আত্মপর নাই, ঐহিক সম্বন্ধের আঁট নাই। রামলালের ভাই একদিন বলছে, তুমি খুড়ো না পিসে?

পরমহংসের বালকের ন্যায় গতিবিধির হিসাব নাই। সব ব্রহ্মময় দেখে—কোথায় যাচ্ছে—কোথায় চলছে—হিসাব নাই। রামলালের ভাই হৃদের বাড়ী দুর্গাপুজো দেখতে গিছিল। হৃদের বাড়ী থেকে ছটকে আপনা আপনি কোন দিকে চলে গেছে! চার বছরের ছেলে দেখে পথের লোক জিজ্ঞাসা করছে, তুই কোথা থেকে এলি? তা কিছু বলতে পারে না। কেবল বল্লে—'চালা' (অর্থাৎ যে আটচালায় পুজো হয়েছে)। যখন জিজ্ঞাসা করলে, কার বাড়ী থেকে এসেছিস? তখন কেবল বলে—'দাদা'।

পরীক্ষা। আমার এই অবস্থার পর (দিবোন্মাদ অবস্থার পর) আমাকে বাঁড়বার (পরীক্ষার) জন্য আর আমার পাগলামি সারাবার জন্য তারা একজন রাঁড় এনে ঘরে বসিয়ে দিয়ে গেল—সুন্দর, চোখ ভাল। আমি 'মা মা' বলে ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম আর হলধারীকে আর সব লোকদের বলে দিলুম। এই অবস্থায় 'মা মা' বলে কাঁদতুম, কেঁদে কেঁদে বলতুম, মা রক্ষা কর, মা আমায় নিখাদ কর। যেন সৎ থেকে অসতে মন না যায়।

পিতৃদেব। আমার বাবা যখন খড়ম পরে রাস্তায় চলতেন, গাঁয়ের দোকানীরা দাঁড়িয়ে উঠত। বলত, ঐ তিনি আসছেন। যখন হালদারপুকুরে স্নান করতে যেতেন, লোকেরা সাহস করে নাইতে যেত না। খপর নিত, উনি কি স্নান করে গেছেন? 'রঘুবীর রঘুবীর' বলতেন আর তাঁর বুক রক্তবর্ণ হয়ে যেত।

পূর্ণজ্ঞানীর বর্ণনা। দক্ষিণেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পরে একজন পাগল এসেছিল—পূর্ণজ্ঞানী। ছেঁড়া জুতা, হাতে কঞ্চি—এক হাতে একটি ভাঁড় আবচারা; গঙ্গায় ডুব দিয়ে উঠে, কোন সন্ধ্যা আহ্নিক নাই, কোঁচড়ে কি ছিল তাই খেলে। তার পর কালীঘরে গিয়ে স্তব করতে লাগল। মন্দির কেঁপে গিয়েছিল। হলধারী তখন কালীঘরে ছিল। অতিথিশালায় এরা তাকে ভাত দেয় নাই—তাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। পাত কুড়িয়ে খেতে লাগল—যেখানে কুকুরগুলো খাচ্ছে। মাঝে মাঝে কুকুরগুলিকে সরিয়ে নিজে খেতে লাগলো—তা কুকুরগুলো কিছু বলে নাই। হলধারী পেছু পেছু গিয়েছিল, আর জিজ্ঞাসা করেছিল, 'তুমি কে! তুমি কি পূর্ণজ্ঞানী?' তখন সে বলেছিল, 'আমি পূর্ণজ্ঞানী। চপ!'

আমি হলধারীর কাছে যখন এ সব কথা শুনলাম, আমার বুক গুর গুর করতে লাগলো, আর হৃদেকে জড়িয়ে ধরলুম। মাকে বললাম, 'মা, তবে আমারও কি এই অবস্থা হবে!' আমরা দেখতে গেলাম—আমাদের কাছে খুব জ্ঞানের কথা—অন্য লোক এলে পাগলামি। যখন চলে গেল, হলধারী অনেকখানি সঙ্গে গিয়েছিল। ফটক পার হলে হলধারীকে বলেছিল, 'তোকে আর কি বলবো। এই ডোবার জল আর গঙ্গাজলে যখন কোন ভেদবুদ্ধি থাকবে না, তখন জানবি পূর্ণ জ্ঞান হয়েছে।' তারপর বেশ হন্ হন্ ক'রে চলে গেল।

পূর্বদর্শন। কিরূপ লোক (ভক্ত) এখানে আসবে, আসবার আগে দেখিয়ে দেয়। বটতলা থেকে বকুলতলা পর্যন্ত চৈতন্যদেবের সংকীর্তনের দল দেখালে ; তাতে বলরামকে দেখলাম—না হলে মিছরি এ সব দেবে কে! আর এঁকে দেখেছিলাম। কেশব সেনের সঙ্গে দেখা হবার আগে, তাকে দেখলাম। সমাধি অবস্থায় দেখলাম কেশব সেন আর তার দল। একঘর লোক আমার সামনে বসে রয়েছে। কেশবকে দেখাচ্ছে, যেন একটি ময়ূর তার পাখা বিস্তার করে বসে রয়েছে। পাখা অর্থাৎ দলবল। কেশবের মাথায় দেখলাম লালমণি। ওটি রজোগুণের চিহ্ন। কেশব শিষ্যদের বলছে—'ইনি কি বলছেন, তোমরা সব শোনো।' মাকে বললাম, মা এদের ইংরাজী মত—এদের বলা কেন। তার পর মা বুঝিয়ে দিলে যে, কলিতে এ রকম হবে। তখন এখান থেকে হরিনাম আর মায়ের নাম নিয়ে গেল। তাই

মা কেশবের দল থেকে বিজয়কে নিলে। কিন্তু আদি সমাজে গেল না।

(নিজেকে দেখাইয়া) এর (আমার) ভিতর একটা কিছু আছে। গোপাল সেন ব'লে একটি ছেলে আসতো—অনেক দিন হ'ল। এর ভিতর যিনি আছেন গোপালের বুকে পা দিলে। সে ভাবে বলতে লাগলো, তোমার এখন দেরী আছে। আমি ঐহিকদের সঙ্গে থাকতে পারছি না—তারপর 'যাই' ব'লে বাড়ী চলে গেল। তার পর শুনলাম দেহত্যাগ করেছে। সেই বোধ হয় নিত্যগোপাল। আশ্চর্য দর্শন সব হয়েছে। অখণ্ড সচ্চিদানন্দ দর্শন। তার ভিতর দেখছি, মাঝে বেড়া দেওয়া দুই থাক। একধারে কেদার চুনী, আর আর অনেক সাকারবাদী ভক্ত। বেড়ার আরএক ধারে টকটকে লাল সুরকীর কাঁড়ির মতো জ্যোতিঃ। তার মধ্যে বসে নরেন্দ্র।—সমাধিস্থ।

ধ্যানস্থ দেখে বল্লুম, 'ও নরেন্দ্র!' একটু চোখ চাইলে।—বুঝলুম এই একরূপে সিমলেতে কায়েতের ছেলে হয়ে আছে।—তখন বল্লাম, 'মা, ওকে মায়ায় বদ্ধ কর!—তা না হলে সমাধিস্থ হয়ে দেহত্যাগ করবে।—কেদার সাকারবাদী, উঁকি মেরে দেখে শিউরে উঠে পালালো।

তাই ভাবি এর (নিজের) ভিতর মা স্বয়ং ভক্ত লয়ে লীলা করছেন। যখন প্রথম এই অবস্থা হ'ল, তখন জ্যোতিঃতে দেহ জ্বল জ্বল করতো। বুক লাল হয়ে যেতো। তখন বল্লুম, 'মা, বাইরে প্রকাশ হয়ো না, ঢুকে যাও, ঢুকে যাও!' তাই এখন এই হীন দেহ।

তা না হলে লোকে জ্বালাতন করতো। লোকের ভিড় লেগে যেতো—সেরূপ জ্যোতির্ময় দেহ থাকলে। এখন বাহিরে প্রকাশ নাই। এতে আগাছা পালায়—যারা শুদ্ধভক্ত তারাই কেবল থাকবে। এই ব্যারাম হয়েছে কেন?—এর মানে ঐ যাদের সকাম ভক্তি, তারা ব্যারাম অবস্থা দেখলে চলে যাবে।

সাধ ছিল—মাকে বলেছিলাম, মা, ভক্তের রাজা হব!

আবার মনে উঠলো, 'যে আন্তরিক ঈশ্বরকে ডাকবে তার এখানে আসতেই হবে! আসতেই হবে!' দ্যাখো, তাই হচ্ছে—সেই সব লোকই আসছে।

এর ভিতরে কে আছেন, আমার বাপেরা জানতো! বাপ গয়াতে স্বপ্ন দেখেছিলেন—রঘুবীর বলছেন, 'আমি তোমার ছেলে হব।'

এর ভিতরে তিনিই আছেন। কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ! এ কি আমার কর্ম। স্ত্রী-সম্ভোগ স্বপনেও হ'ল না।

ন্যাংটা বেদান্তের উপদেশ দিলে। তিন দিনেই সমাধি। মাধবীতলায় ঐ সমাধি অবস্থা দেখে সে হতবুদ্ধি হয়ে বলছে, 'আরে এ কেয়া রে!' পরে সে বুঝতে পারলে—এর ভিতর কে আছে। তখন আমায় বলে, 'তুমি আমায় ছেড়ে দাও!' ওকথা শুনে আমার ভাবাবস্থা হয়ে গেল;—আমি সেই অবস্থায় বললাম, 'বেদান্ত বোধ না হলে তোমার যাবার যো নাই।'

তখন রাত দিন তার কাছে; কেবল বেদান্ত। বামনী বলতো, 'বাবা, বেদান্ত শুনো না!—ওতে ভক্তির হানি হবে।'

মাকে যাই বললাম 'মা, এ দেহ রক্ষা কেমন করে হবে, আর সাধু ভক্ত লয়ে কেমন

করে থাকবো!—একটা বড় মানুষ জুটিয়ে দাও। তাই সেজোবাবু চৌদ্দ বৎসর ধরে সেবা করলে!

এর ভিতর যিনি আছে, আগে থাকতে জানিয়ে দেয়, কোন থাকের ভক্ত আসবে। যাই দেখি গৌরাঙ্গরূপ সামনে এসেছেন, অমনি বুঝতে পারি গৌরভক্ত আসছে। যদি শাক্ত আসে, তা হলে শক্তিরূপ—কালীরূপ—দর্শন হয়।

কুঠীর উপর থেকে আরতির সময় চেচাঁতাম, 'ওরে, তোরা কে কোথায় আছিস আয়!' দ্যাখো, এখন সব ক্রমে ক্রমে এসে জুটছে!

এর ভিতর তিনি নিজে রয়েছেন—যেন নিজে থেকে এই সব ভক্ত লয়ে কাজ করছেন।

এক-একজন ভক্তের অবস্থা কি আশ্চর্য! ছোট নরেন—এর কুম্ভক আপনি হয়! আবার সমাধি! এক-একবার কখন কখন আড়াই ঘণ্টা! কখনও বেশী! কি আশ্চর্য!

সব রকম সাধন এখানে হয়ে গেছে—জ্ঞানযোগ ভক্তিযোগ কর্মযোগ। হঠযোগ পর্যন্ত—আয়ু বাড়াবার জন্য! এর ভিতর একজন আছে। তা না হলে সমাধির পর ভক্তি ভক্ত লয়ে কেমন করে আছি। কোয়ার সিং বলতো, সমাধির পর ফিরে আসা লোক কখন দেখি নাই নাই।—তুমিই নানক।'

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্কিম একজন পণ্ডিত। বঙ্কিমের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, মানুষের কর্তব্য কি? তা বলে, আহার নিদ্রা মৈথুন। এই সকল কথাবার্তা শুনে আমার ঘৃণা হ'ল। বললুম যে, তোমার এ কিরকম কথা। তুমি তো বড় ছ্যাঁচড়া। যা সব রাতদিন চিন্তা করছ, তাই আবার মুখ দিয়ে বের হচ্ছে। মুলো খেলে মুলোর ঢেঁকুর ওঠে। তারপর অনেক ঈশ্বরীয় কথা হ'ল। ঘরে সংকীর্তন হ'ল। আমি আবার নাচলুম। তখন বলে, মহাশয়, আমাদের ওখানে একবার যাবেন। আমি বললুম, সে ঈশ্বরের ইচ্ছা। তখন বলে, আমাদের সেখানে ভক্ত আছে দেখবেন।

বাবার স্বভাব। আমার বাবা যখন খড়ম পরে রাস্তায় চলতেন, গাঁয়ের দোকানীরা দাঁড়িয়ে উঠত। বলত, ঐ তিনি আসছেন। যখন হালদারপুকুরে স্নান করতে যেতেন, লোকেরা সাহস করে নাইতে যেত না। খপর নিত, উনি কি স্নান করে গেছেন? রঘুবীর রঘুবীর বলতেন আর তাঁর বুক রক্তবর্ণ হয়ে যেত।

বাল্য প্রণয়। রামের স্মৃতি দ্রষ্টব্য।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। ঐ অবস্থায় ভাবে বিজয়ের বুকে পা দিলুম, এদিকে তো বিজয়কে এত ভক্তি করি। সেই বিজয়ের গায়ে পা দিলুম, তার কি বল দেখি। বিজয়ের বাপ ভাগবত পড়তে পড়তে অজ্ঞান হয়ে যেতো। বিজয় মাঝে মাঝে 'হরি হরি' বলে উঠে পড়ে। বাপ ওরূপ না হলে ছেলে অমন ভক্ত হয় না। আজকাল বিজয় যা কিছু দর্শন করছে সব ঠিক ঠিক। সাকার-নিরাকারের কথা বিজয় বললে, যেমন বহুরূপীর রং—লাল নীল সবুজও হচ্ছে, আবার কোনো রং নাই। কখনো সগুণ, কখনো নির্গুণ। বিজয় বেশ সরল। খুব উদার না

হলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। কাল অধর সেনের বাড়ি গিছল, তা যেন আপনার বাড়ি—সবাই যেন আপনার। বিষয়বুদ্ধি না গেলে উদার সরল হয় না। বিজয় এখন বেশ হয়েছে। হরি হরি বলতে বলতে মাটিতে পড়ে যায়। চারটে রাত পর্যন্ত কীর্তন ধ্যান এই সব নিয়ে থাকে। এখন গেরুয়া পরে আছে। ঠাকুর বিগ্রহ দেখলে একেবারে সাষ্টাঙ্গ। গদাধরের পাঠবাড়িতে আমার সঙ্গে গিছল। আমি বললুম, এখানে তিনি ধ্যান করতেন। সেই জায়গায় অমনি সাষ্টাঙ্গ।

বিজয়ের শাশুড়ি বললে, কই আমার কি হয়েছে? এখনও সকলের খেতে পারি না। আমি বললুম, সকলের খেলেই কি জ্ঞান হয়? কুকুর যা-তা খায়, তাই বলে কি কুকুর জ্ঞানী?

বিদ্যাসাগর। দেখলুম বিদ্যাসাগরকে—অনেক পড়া আছে, কিন্তু অন্তরে কি আছে দেখে নাই। ছেলেদের লেখাপড়া শিখিয়ে আনন্দ। ভগবানের আনন্দের আস্বাদ পায় নাই। শুধু পড়লে কি হবে? ধারণা কই? পাঁজিতে লিখেছে, বিশ আড়া জল, কিন্তু পাঁজি টিপলে এক ফোঁটাও পড়ে না।

বিদ্যাসাগর বলেছিল, মহাশয়, তিনি কি কারুকে বেশি শক্তি দিয়েছেন, কারুকে কম শক্তি দিয়েছেন? আমি বললুম, বিভুরূপে তিনি সকলের ভিতরে আছেন—আমার ভিতরে যেমনি, পিঁপড়েটির ভিতরেও তেমনি। কিন্তু শক্তিবিশেষ আছে। যদি সকলেই সমান হবে তবে ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নাম শুনে তোমায় আমরা কেন দেখতে এসেছি? তোমার কি দুটো শিং বেরিয়েছে, তাই দেখতে এসেছি? তা নয়, তুমি দয়ালু, তুমি পণ্ডিত, এই সব গুণ তোমার অপরের চেয়ে বেশি আছে, তাই তোমার এত নাম। দেখ না এমন লোক আছে যে একলা একশো লোককে হারাতে পারে। আবার এমন আছে একজনের ভয়ে পালায়। যদি শক্তিবিশেষ না হয়, লোকে কেশবকে এত মানতো কেন। গীতায় আছে, যাকে অনেকে গণে মানে—তা বিদ্যার জন্যেই হোক বা গাওনা-বাজনার জন্যেই হোক বা লেকচার দেবার জন্যেই হোক বা আর কিছুর জন্যেই হোক—নিশ্চিত জেনো যে তাতে ঈশ্বরের বিশেষ শক্তি আছে।

বৈষ্ণবচরণ। আমি বৈষ্ণবচরণের অনেক সুখ্যাত করে সেজবাবুর কাছে আনালুম। সেজবাবু খুব যত্নথাতির করলে। রুপার বাসন বার করে জলখাওয়া পর্যন্ত। তারপর সেজবাবুর সামনে বলে কি—আমাদের কেশবমন্ত্র না নিলে কিছুই হবে না। সেজবাবু শাক্ত, ভগবতীর উপাসক। মুখ রাঙা হয়ে উঠল। আমি আবার বৈষ্ণবচরণের গা টিপি।

বৃন্দাবনে। আমি বৃন্দাবনে গিছলাম—সেজো বাবুর সঙ্গে।

মথুরার ধ্রুবঘাট যাই দেখলাম অমনি দপ করে দর্শন হ'ল, বসুদেব কৃষ্ণ কোলে ল'য়ে যমুনা পার হচ্ছেন।

আবার সন্ধ্যার সময় যমুনা পুলিনে বেড়াচ্ছি, বালির উপর ছোট ছোট খোড়ো ঘর। বড় কুলগাছ। গোধূলির সময় গাভীরা গোষ্ঠ থেকে ফিরে আসছে। দেখলাম হেঁটে যমুনা পার হচ্ছে। তার পরেই কতকগুলি রাখাল গাভীদের নিয়ে পার হচ্ছে।

যেই দেখা, অমনি 'কোথায়, কৃষ্ণ !' বলে—বেহুঁশ হ'য়ে গেলাম।
শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড দর্শন ক'রতে ইচ্ছা হয়েছিল। পাল্কী করে আমায় পাঠিয়ে দিলে। অনেকটা পথ; লুচি জিলিপী পাল্কীর ভিতরে দিলে। মাঠ পার হবার সময় এই ভেবে কাঁদতে লাগলাম, 'কৃষ্ণ রে! তুই নাই, কিন্তু সেই সব স্থান রয়েছে! সেই মাঠ—তুমি গোরু চরাতে!'
হৃদে রাস্তায় সঙ্গে সঙ্গে পেছনে আসছিল। আমি চক্ষের জলে ভাসতে লাগলাম। বিয়ারাদের দাঁড়াতে বলতে পারলাম না।
শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ডতে গিয়ে দেখলাম, সাধুরা একটি একটি ঝুপড়ীর মতো করেছে;—তার ভিতরে পিছনে ফিরে সাধন-ভজন করছে—পাছে লোকের উপর দৃষ্টিপাত হয়। দ্বাদশ বন দেখবার উপযুক্ত।
বঙ্কুবিহারীকে দেখে ভাব হয়েছিল, আমি তাঁকে ধরতে গিছিলাম। গোবিনজীকে দুইবার দেখতে চাইলাম না। মথুরায় গিয়ে রাখাল-কৃষ্ণকে স্বপন দেখেছিলাম। হৃদে ও সেজোবাবু দেখেছিল।
ব্রহ্মবোধ। কে জানে বাপু, আমার এই রকম অবস্থা। আমি কেবল নিত্য থেকে লীলায় নেমে আসি, আবার লীলা থেকে নিত্যে যাই।
নিত্যে পঁহুছানোর নাম ব্রহ্মজ্ঞান। বড় কঠিন। একেবারে বিষয়-বুদ্ধি না গেলে হয় না। হিমালয়ের ঘরে যখন ভগবতী জন্মগ্রহণ করলেন, তখন পিতাকে নানা-রূপে দর্শন দিলেন। হিমালয় বললেন, মা, আমি ব্রহ্মদর্শন করতে ইচ্ছা করি। তখন ভগবতী বলছেন, পিতা, যদি তা ইচ্ছা করেন তাহলে আপনার সাধুসঙ্গ করতে হবে। সংসার থেকে তফাৎ হয়ে নির্জনে মাঝে মাঝে সাধুসঙ্গ করবেন।
সেই এক থেকেই অনেক হয়েছে—নিত্য থেকেই লীলা। এক অবস্থায় 'অনেক' চলে যায়, আবার 'এক' ও চলে যায়—কেন না এক থাকলেই দুই। তিনি যে উপমা-রহিত—উপমা দিয়ে বুঝবার যো নাই। অন্ধকার ও আলোর মধ্যে। আমরা যে আলো দেখি সে আলো নয়—এ জড় আলো নয়।
আবার যখন তিনি অবস্থা বদলে দেন—যখন লীলাতে মন নামিয়ে আনেন—তখন দেখি ঈশ্বর মায়া জীব জগৎ—তিনি সব হয়ে রয়েছেন।
আবার কখনও তিনি দেখান তিনি এই সমস্ত জীব জগৎ করেছেন—যেমন বাবু আর তার বাগান। তিনি কর্তা আর তাঁরই এই সমস্ত জীব-জগৎ—এইটির নাম জ্ঞান। আর 'আমি কর্তা', 'আমি গুরু', 'আমি বাবা' এরই নাম অজ্ঞান। আর আমার এই সমস্ত গৃহপরিবার, ধন, জন এরই নাম অজ্ঞান।
ভক্তিযোগে প্রাপ্তি। ভক্তিযোগে সব পাওয়া যায়। আমি মার কাছে কেঁদে কেঁদে বলেছিলাম, 'মা, যোগীরা যোগ করে যা জেনেছে, জ্ঞানীরা বিচার করে যা জেনেছে—আমায় জানিয়ে দাও—আমায় দেখিয়ে দাও।' মা আমায় সব দেখিয়ে দিয়েছেন। ব্যাকুল হয়ে তাঁর কাছে কাঁদলে তিনি সব জানিয়ে দেন। বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, তন্ত্র—এসব শাস্ত্রে কি আছে, সব তিনি আমায় জানিয়ে দিয়েছেন।
ভক্তের অবস্থায়। ভক্তের অবস্থায়—বিজ্ঞানীর অবস্থায়—রেখেছে। তাই রাখাল প্রভৃতির সঙ্গে ফর্চাকিমি করি। জ্ঞানীর অবস্থায় রাখলে উটি হ'ত না।

এ অবস্থায় দেখি মা-ই সব হয়েছেন। সর্বত্র তাঁকে দেখতে পাই।

কালীঘরে দেখলাম, মা-ই হয়েছেন—দুষ্টলোক পর্যন্ত—ভাগবত পণ্ডিতের ভাই পর্যন্ত।

রামলালের মা-কে বকতে গিয়ে আর পারলাম না। দেখলাম তাঁরই একটি রূপ। মাকে কুমারীর ভিতর দেখতে পাই বলে কুমারী পূজা করি।

আমার মাগ (ভক্তদের শ্রীশ্রীমা) পায়ে হাত বুলায়ে দেয়—তার পর আমি আবার নমস্কার করি।

তোমরা আমার পায়ে হাত দিয়ে নমস্কার করো—হৃদে থাকলে পায়ে হাত দেয় কে! —কারুকে পা ছুঁতে দিতো না।

এই অবস্থায় রেখেছে বলে নমস্কার ফিরুতে হয়।

দ্যাখো, দুষ্ট লোককে পর্যন্ত বাদ দিবার জো নাই। তুলসী শুকনো হোক,, ছোট হোক, ঠাকুর সেবায় লাগবে।

'ভক্তের আমি।' ও 'আমি' এক একবার যায়। তখন ব্রহ্মজ্ঞান হ'য়ে সমাধিস্থ হয়। আমারও যায়। কিন্তু বরাবর নয়। সা রে গা মা পা ধা নি—কিন্তু 'নি'তে অনেকক্ষণ থাকা যায় না—আবার নীচের গ্রামে নামতে হয়। আমি, বলি 'মা আমায় ব্রহ্মজ্ঞান দিও না।' আগে সাকারবাদীরা খুব আসতো। তারপর ইদানীং ব্রহ্মজ্ঞানীরা আসতে আরম্ভ করলে। তখন প্রায় ঐরূপ বেহুঁশ হয়ে সমাধিস্থ হ'তাম—আর হুঁশ হলেই বলতাম, মা আমায় ব্রহ্মজ্ঞান দিও না।

ভগবান দর্শন। চিত্তশুদ্ধি না হ'লে ভগবান দর্শন হয় না। কাম, ক্রোধ, লোভ, এসব জয় করলে তবে তাঁর কৃপা হয়; তখন দর্শন হয়! তোমাদের অতি গুহ্য কথা বলছি, কাম জয় করবার জন্য আমি অনেক কাণ্ড করেছিলাম। এমন কি আনন্দ আসনের চারিদিকে 'জয় কালী' 'জয় কালী'—বলে অনেকবার প্রদক্ষিণ করেছিলাম। আমার দশ এগার বৎসর বয়সে যখন ও দেশে ছিলুম, সেই সময়ে ঐ অবস্থাটি (সমাধি অবস্থা) হয়েছিল; মাঠ দিয়ে যেতে যেতে যা দর্শন করলাম তাতে বিহ্বল হয়েছিলাম। ঈশ্বর দর্শনের কতকগুলি লক্ষণ আছে। জ্যোতি দেখা যায়, আনন্দ হয়। বুকের ভিতর তুবড়ির মতো গুরু গুরু করে মহাবায়ু ওঠে।

ভবনাথ মুখোপাধ্যায় (মুহুরী)। ভবনাথ বিয়ে করেছে। কিন্তু সমস্ত রাত্রি স্ত্রীর সঙ্গে কেবল ধর্মকথা কয়। ঈশ্বরের কথা নিয়ে দু'জনে থাকে। আমি বললুম, পরিবারের সঙ্গে একটু আমোদ-আহ্লাদ করবি। তখন রেগে রোক করে বললে, কি! আমরাও আমোদ-আহ্লাদ নিয়ে থাকবো?

ভাবোন্মত্ত অবস্থা। কি অবস্থা গেছে। হরগৌরীভাবে কত দিন ছিলুম। আবার কত দিন রাধাকৃষ্ণ-ভাবে। কখন সীতারামের ভাবে। রাধার ভাবে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কর্তুম, সীতার ভাবে রাম রাম কর্তুম।

তবে লীলাই শেষ নয়। এই সব ভাবের পর বললুম, মা এসবে বিচ্ছেদ আছে। যার বিচ্ছেদ নাই, এমন অবস্থা ক'রে দাও। তাই কতদিন অখণ্ড সচ্চিদানন্দ এই ভাবে রইলুম। ঠাকুরদের ছবি ঘর থেকে বার ক'রে দিলুম।

তাঁকে সর্বভূতে দর্শন করতে লাগলুম। পূজা উঠে গেল। এই বেলগাছ। বেল-পাতা তুলতে আসতুম। একদিন পাতা ছিঁড়তে গিয়ে আঁশ খানিকটা উঠে এল। দেখলাম গাছ চৈতন্যময়। মনে কষ্ট হ'ল। দূর্বা তুলতে গিয়ে দেখি, আর সে রকম ক'রে তুলতে পারিনে। তখন রোক ক'রে তুলতে গেলুম।

আমি লেবু কাটতে পারি না। সেদিন অনেক কষ্টে, 'জয় কালী' ব'লে তাঁর সম্মুখে বলির মতো ক'রে তবে কাটতে পেরেছিলুম। একদিন ফুল তুলতে গিয়ে দেখিয়ে দিলে—গাছে ফুল ফুটে আছে, যেন সম্মুখে বিরাট—পূজা হয়ে গেছে—বিরাটের মাথায় ফুলের তোড়া। আর ফুল তোলা হ'ল না।

তিনি মানুষ হয়েও লীলা ক'রছেন। আমি দেখি, সাক্ষাৎ নারায়ণ। কাঠ ঘসতে ঘসতে যেমন আগুন বেরোয়, ভক্তির জোর থাকলে মানুষেতেই ঈশ্বর দর্শন হয়। তেমন টোপ হ'লে বড় রুই কাতলা কপ, করে খায়।

প্রেমোন্মাদ হলে সর্বভূতে সাক্ষাৎকার হয়। গোপীরা সর্বভূতে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করেছিল। কৃষ্ণময় দেখেছিল। বলেছিল, আমিই কৃষ্ণ! তখন উন্মাদ অবস্থা! গাছ দেখে বলে, এরা তপস্বী, শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান ক'রছে! তৃণ দেখে বলে, শ্রীকৃষ্ণকে স্পর্শ ক'রে ঐ দেখ পৃথিবীর রোমাঞ্চ হয়েছে।

ভুল হয়েছে। একদিন একজন বড় মানুষ এসেছিল। আমায় বলে, মহাশয় এই মোকদ্দমাটি কিসে জিত হয় আপনার করে দিতে হবে। আপনার নাম শুনে এসেছি। আমি বললাম, বাপু, সে আমি নই—তোমার ভুল হয়েছে। সে অচলানন্দ।

ভোগ-লালসা। ভোগ লালসা থাকা ভাল নয়। আমি তাই জন্য যা যা মনে উঠতো অমনি ক'রে নিতাম।

বড়বাজারের রং করা সন্দেশ দেখে খেতে ইচ্ছা হ'ল। এরা আনিয়ে দিলে। খুব খেলুম, তারপর অসুখ।

ছেলেবেলা গঙ্গা নাইবার সময়, তখন নাথের বাগানে, একটি ছেলের কোমরে সোনার গোট দেখেছিলাম। এই অবস্থার পর সেই গোট পরতে সাধ হ'ল। তা বেশীক্ষণ রাখবার জো নাই—গোট পরে ভিতর দিয়ে শির্ শির্ করে উপরে বায়ু উঠতে লাগলো—সোনা গায়ে ঠেকেছে কি না? একটু রেখেই খুলে ফেলতে হ'ল। তা না হ'লে ছিঁড়ে ফেলতে হবে।

ধনেখালির খইচুর, খানাকুল কৃষ্ণনগরের সরভাজা, তাও খেতে সাধ হয়েছিল।

শম্ভুর চণ্ডীর গান শুনতে ইচ্ছা হয়েছিল। সে গান শোনার পর আবার রাজ-নারায়ণের চণ্ডী শুনতে ইচ্ছা হয়েছিল। তাও শোনা হ'ল।

অনেক সাধুরা সে সময়ে আসতো। তা সাধ হ'ল, তাদের সেবার জন্য আলাদা একটি ভাঁড়ার হয়। সেজোবাবু তাই করে দিলে। সেই ভাঁড়ার থেকে সাধুদের সিদে, কাঠ, এ সব দেওয়া হ'ত।

একবার মনে উঠলো যে খুব ভাল জরীর সাজ পরবো। আর রূপার গুড়গুড়িতে তামাক খাবো। সেজোবাবু নূতন সাজ, গুড়গুড়ি, সব পাঠিয়ে দিলে। সাজ পরা হ'ল। গুড়গুড়ি নানা রকম করে টানতে লাগলুম। একবার এপাশ থেকে,

একবার ওপাশ থেকে—উঁচু থেকে নীচু থেকে। তখন বল্লাম, মন এর নাম রূপার গুড়গুড়িতে তামাক খাওয়া। এই বলে গুড়গুড়ি ত্যাগ হয়ে গেল। সাজগুলো খানিক পরে খুলে ফেললাম—পা দিয়ে মাড়াতে লাগলাম—আর তার উপর থু থু করতে লাগলাম—বল্লাম, এর নাম সাজ। সাজে রজোগুণ হয়।

ভৈরবীচক্রে। কাশীতে একদিন ভৈরবীচক্রে নিয়ে গেল। একজন করে ভৈরব, একজন করে ভৈরবী। আমায় কারণ পান করতে বললে, আমি বললুম, মা, আমি কারণ ছুঁতে পারি না। তখন তারা খেতে লাগল। আমি মনে করলুম, এইবার বুঝি জপধ্যান করবে। তা নয়, নৃত্য আরম্ভ করলে। আমার ভয় হতে লাগল পাছে গঙ্গায় পড়ে যায়।

মধুসূদন দত্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ। নারায়ণ শাস্ত্রী যখন ছিল, মাইকেল এসেছিল। মথুর বাবুর বড় ছেলে দ্বারিক বাবু সঙ্গে করে এনেছিল। ম্যাগাজিনের সাহেবদের সঙ্গে মোকদ্দমা হবার যোগাড় হয়েছিল। তাই মাইকেলকে এনে বাবুরা পরামর্শ করছিল।

দপ্তরখানার সঙ্গে বড় ঘর। সেইখানে মাইকেলের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আমি নারায়ণ শাস্ত্রীকে কথা কইতে বল্লাম। সংস্কৃতে কথা ভাল বলতে পারলেন না। ভুল হতে লাগল। তখন ভাষায় কথা হ'ল।

নারায়ণ শাস্ত্রী বল্লে, 'তুমি নিজের ধর্ম কেন ছাড়লে।' মাইকেল পেট দেখিয়ে বলে, পেটের জন্য—ছাড়তে হয়েছে।

নারায়ণ শাস্ত্রী বলে, যে পেটের জন্য ধর্ম ছাড়ে তার সঙ্গে কথা কি কইব। তখন মাইকেল আমায় বল্লে, আপনি কিছু বলুন।

আমি বল্লাম, কে জানে কেন আমার কিছু বলতে ইচ্ছা করছে না। আমার মুখ কে যেন চেপে ধরছে।

মন্ত্র দেওয়া। আমি তো মন্ত্র দিই না। মন্ত্র দিলে শিষ্যের পাপ-তাপ নিতে হয়। মা আমায় বালকের অবস্থায় রেখেছেন। এখন তোমরা শিবপূজা যা বলে দিলাম তাই করো। মাঝে মাঝে আসবে—পরে ঈশ্বরের ইচ্ছায় যা হয় হবে। স্নানযাত্রার দিন আবার আসবার চেষ্টা করবে।

মহাভাবের অবস্থা। ক. সে অবস্থার পরে আনন্দও যেমন, আগে যন্ত্রণাও তেমনি। মহাভাব ঈশ্বরের ভাব—এই দেহ মনকে তোলপাড় করে দেয়। যেন একটা বড় হাতী কুঁড়ে ঘরে ঢুকেছে। ঘর তোলপাড়। হয়তো ভেঙ্গে-চুরে যায়।

ঈশ্বরের বিরহ-অগ্নি সামান্য নয়। রূপসনাতন যে গাছের তলায় বসে থাকতেন ঐ অবস্থা হ'লে এইরকম আছে যে, গাছের পাতা ঝলসা-পোড়া হয়ে যেত। আমি এই অবস্থায় তিনদিন অজ্ঞান হয়ে ছিলাম। নড়তে-চড়তে পারতাম না, এক জায়গায় পড়েছিলাম। হুঁশ হ'লে বামনী আমায় ধরে স্নান করাতে নিয়ে গেল। কিন্তু হাত দিয়ে গা ছোঁবার জো ছিল না। গা মোটা চাদর দিয়ে ঢাকা। বামনী সেই চাদরের উপরে হাত দিয়ে আমায় ধরে নিয়ে গিছল। গায়ে যে সব মাটি লেগেছিল, পুড়ে গিছল।

যখন সেই অবস্থা আসতো শিরদাঁড়ার ভিতর দিয়ে যেন ফাল চালিয়ে যেত 'প্রাণ

যায়', 'প্রাণ যায়' এই করতাম। কিন্তু তারপর খুব আনন্দ।

২. আগে কইমাছ জীইয়ে রাখা দেখে আশ্চর্য হতুম! মনে করতুম, এরা কি নিষ্ঠুর, এদের শেষকালে হত্যা করবে। অবস্থা যখন বদলাতে লাগল, তখন দেখি যে শরীরগুলো খোলমাত্র। থাকলেও এসে যায় না, গেলেও এসে যায় না।

মাতৃচিন্তা। বৃন্দাবনে গিয়ে আর আমার ফিরে আসতে ইচ্ছা হ'ল না। গঙ্গামার কাছে থাকবার কথা হ'ল। সব ঠিক ঠাক। এদিকে আমার বিছানা হবে ওদিকে গঙ্গামার বিছানা হবে, আর কলকাতায় যাব না, কৈবর্তের ভাত আর কতদিন খাব? তখন হৃদে বললে, না, তুমি কলকাতায় চল। সে একদিকে টানে, গঙ্গামা আর একদিকে টানে। আমার খুব থাকবার ইচ্ছা। এমন সময় মাকে মনে পড়ল। অমনি সব বদলে গেল। মা বুড়ো হয়েছেন। ভাবলুম, মার চিন্তা থাকলে ঈশ্বর-ফীশ্বর সব ঘুরে যাবে। তার চেয়ে তাঁর কাছে যাই, গিয়ে সেখানেই ঈশ্বর-চিন্তা করবো—নিশ্চিন্ত হয়ে।

মাতৃদর্শন। তিনি শুধু নিরাকার নন, তিনি আবার সাকার। তাঁর রূপ দর্শন করা যায়। ভাব-ভক্তির দ্বারা তাঁর সেই অতুলনীয় রূপ দর্শন করা যায়। মা নানা-রূপে দর্শন দেন।

কাল মাকে দেখলাম। গেরুয়া জামা পরা, মুড়ি সেলাই নাই। আমার সঙ্গে কথা কচ্ছেন।

আর একদিন মুসলমানের মেয়েরূপে আমার কাছে এসেছিলেন। মাথায় তিলক কিন্তু দিগম্বরী। ছয় সাত বছরের মেয়ে—আমার সঙ্গে সঙ্গে বেড়াতে লাগল ও ফচ্কিমি করতে লাগল।

হৃদের বাড়ীতে যখন ছিলাম—গৌরাঙ্গ দর্শন হয়েছিল—কালাপেড়ে কাপড় পরা।

হলধারী বলতো, তিনি ভাব-অভাবের অতীত। আমি মা'কে গিয়ে বল্লাম—মা, হলধারী এ-কথা বলছে, তা হলে রূপ-টুপ কি সব মিথ্যা? মা রতির মার বেশে আমার কাছে এসে বল্লে—'তুই ভাবেই থাক।' আমিও হলধারীকে তাই বল্লাম। এক একবার ও-কথা ভুলে যাই বলে কষ্ট হয়। ভাবে না থেকে দাঁত ভেঙ্গে গেল। তাই দৈববাণী বা প্রত্যক্ষ না হ'লে ভাবেই থাকবো—ভক্তি নিয়ে থাকবো। কি বল?

মার দর্শন। দিনরাত্রির প্রায় সময়ই মার কোনো না কোনো রকম দর্শন পেয়ে ভুলে থাকতুম তাই রক্ষা, নইলে এ খোলটা থাকা অসম্ভব হ'ত। এখন থেকে সুরু করে ছ বছরকাল এক তিল ঘুম হয়নি। চোখ পলকশূন্য হয়ে গিছল। সময় সময় চেষ্টা করেও পলক ফেলতে পারতুম না। সময়ের হুঁশ থাকত না। শরীর রক্ষার কথা প্রায় ভুলে গিছলুম। শরীরের দিকে যখন একটু আধটু মন আসত, তখন তার অবস্থা দেখে ভারি ভয় হ'ত। ভাবতুম, পাগল হতে বসেছি নাকি? আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চোখ আঙ্গুল দিয়ে দেখতুম, পলক পড়ে কিনা। তাতেও চোখ সমান পলকশূন্য। ভয়ে কেঁদে ফেলতুম আর মাকে বলতুম, মা, তোকে ডাকার, তোর উপর বিশ্বাস করার কি এই ফল হল। শরীরে বিষম

ব্যাধি দিলি। একটু পরেই আবার বলতুম, তা যা হবার হক্ গে, শরীর যায় যাক্, তুই কিন্তু আমায় ছাড়িস্ নি। আমায় দেখা দে, কৃপা কর, আমি যে মা, তোর পাদপদ্মে একান্ত শরণ নিয়েছি। তুই ভিন্ন আমার যে আর অন্য গতি নাই। এমনি কাঁদতে কাঁদতে মন আবার উৎসাহে ভরে উঠত, শরীরটাকে অতি তুচ্ছ হেয় বলে মনে হ'ত আর মার দর্শন ও অভয়বাণীতে আশ্বস্ত হতুম।

মার রূপ। একদিন কালীঘরে আসনে বসে মাকে চিন্তা করচি ; কিছুতেই মার মূর্তি মনে আনতে পারলুম না। তারপর দেখি কি—রমণী বলে একটা বেশ্যা ঘাটে স্নান করতে আসতো, তার মতো হয়ে পূজার ঘটের পাশ থেকে উঁকি মারছে। দেখে হাসি আর বলি—'ওমা, আজ তোর রমণী হতে ইচ্ছে হয়েছে—তা বেশ, ঐ রূপেই আজ পুজো নে।' আর একদিন গাড়ি করে মেছোবাজারের রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে দেখি কি—সেজে গুজে, খোঁপা বেঁধে, টিপ পরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে বাঁধা হুকোয় তামাক খাচ্চে, আর মোহিনী হয়ে লোকের মন ভুলাচ্চে। দেখে অবাক হয়ে বললুম—'মা। তুই এখানে এই ভাবে রয়েছিস?'—বলে প্রণাম করলুম।

যাত্রা-অভিনয়। আমি এ সব গান ছেলেবেলায় খুব গাইতাম। এক এক যাত্রার সমস্ত পালা গেয়ে দিতে পারতাম। কেউ কেউ বলত আমি কালীয়দমন যাত্রার দলে ছিলাম।

যোগমায়া। এখন মাকে বলছিলাম, আর বকতে পারি না। আর বলছিলাম, 'মা যেন একবার ছুঁয়ে দিলে লোকের চৈতন্য হয়।' যোগমায়ার এমনি মহিমা—তিনি ভেল্কি লাগিয়ে দিতে পারেন। বৃন্দাবন লীলায় যোগমায়া ভেল্কি লাগিয়ে দিলেন। তাঁরই বলে সুবোল কৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীমতীর মিলন ক'রে দিছলেন। যোগমায়া—যিনি আদ্যাশক্তি—তাঁর একটি আকর্ষণী শক্তি আছে। আমি ঐ শক্তির আরোপ করেছিলাম।

রাখাল। ক. নরেন্দ্র, রাখাল, ভবনাথ—এরা সব নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরকোটী। এদের শিক্ষা কেবল বাড়ার ভাগ।

খ. বটতলায় একটি ছেলে দেখেছিলুম। হৃদে বললে, তবে তোমার একটি ছেলে হবে। আমি বললুম, আমার যে মাতৃযোনি। আমার ছেলে হবে কেমন করে? সেই ছেলে রাখাল। কীর্তন শুনতে শুনতে রাখালকে দেখেছিলুম, ব্রজমণ্ডলের ভিতরে রয়েছে।

গ. আবার বলেছিলুম, মা, আমার তো সন্তান হবে না, কিন্তু ইচ্ছা করে একটি শুদ্ধ ভক্ত ছেলে আমার সঙ্গে সর্বদা থাকে। সেইরূপ একটি ছেলে আমায় দাও, তাই তো রাখাল হ'ল।

ঘ. রাখাল আমায় জিজ্ঞাসা করে যে, বাবার পাতে কি খাবো? আমি বলি, সে কি রে, তোর কি হয়েছে যে বাবার পাতে খাবি না।

এইখানে বসে পা টিপতে টিপতে রাখালের প্রথম ভাব হয়েছিল। একজন ভাগবতের পণ্ডিত এই ঘরে বসে ভাগবতের কথা বলছিল। সেই কথা শুনতে শুনতে রাখাল মাঝে মাঝে শিউরে উঠতে লাগল। তারপর একেবারে স্থির।

দ্বিতীয় ভাব বলরামের বাড়িতে—ভাবেতে শুয়ে পড়েছিল। রাখালের সাকার ঘর—নিরাকারের কথা শুনলে উঠে যাবে।

তার জন্য চণ্ডীকে মানলুম। সে যে আমার উপর সব নির্ভর করেছিল, বাড়ি-ঘর সব ছেড়ে। তার পরিবারের কাছে তাকে আমিই পাঠিয়ে দিতুম—একটু ভোগের বাকী ছিল।

রাজেন্দ্র মিত্র। রাজেন্দ্র মিত্র—আটশ' টাকা মাইনে—প্রয়াগে কুম্ভমেলা দেখে এসেছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কেমন গা, মেলায় কেমন সব সাধু দেখলে? রাজেন্দ্র বললে, কই, তেমন সাধু দেখতে পেলুম না। একজনকে দেখলুম বটে, কিন্তু তিনিও টাকা লন।

রামের স্মৃতি। শ্রীরাম আমার সঙ্গে পাঠশালায় পড়ত। তার সঙ্গে ছেলেবেলায় খুব প্রণয় ছিল। রাতদিন একসঙ্গে থাকতুম। তখন ষোল সতের বছর বয়স। লোকে বলত, এদের ভিতর একজন মেয়েমানুষ হলে দুজনে বিয়ে হ'ত। তাদের বাড়িতে দুজনে খেলা করতুম। তখনকার সব কথা মনে পড়ছে। তাদের কুটুম্বেরা পালকী চড়ে আসত। বেয়ারাগুলো হিঞ্জোর হিঞ্জোর বলতে থাকত।

রোক। গঙ্গাপ্রসাদ সেনের কাছে লয়ে গেল। গঙ্গাপ্রসাদ বলল, স্বর্ণপটপটি খেতে হবে, কিন্তু জল খেতে পাবে না, বেদানার রস খেতে পার। সকলে মনে করলে, জল না খেয়ে আমি কেমন করে থাকব। আমি রোক করলুম, আর জল খাব না। পরমহংস, আমি তো পাতিহাঁস নই, রাজহাঁস—দুধ খাব।

লক্ষ্য এক : ভিন্নপথ। আমায় সব ধর্ম একবার করে নিতে হয়েছিল—হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান—আবার শাক্ত, বৈষ্ণব, বেদান্ত, এ সব পথ দিয়েও আসতে হয়েছে। দেখলাম সেই এক ঈশ্বর—তাঁর কাছেই সকলি আসছে—ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়ে।

লিঙ্গপূজা। পরমহংসের আবার উন্মাদের অবস্থা হয়। যখন উন্মাদ হল, শিবলিঙ্গ বোধে নিজের লিঙ্গ পূজা করতাম। জীবন্তলিঙ্গপূজা। একটা আবার মুক্তা পরানো হ'ত। এখন আর পারি না।

শম্ভু মল্লিক। ক. যখন যেরূপ লোক আসবে আগে দেখিয়ে দিত। দেখালে পাঁচজন সেবায়েত। প্রথম সেজবাবু, তারপর শম্ভু মল্লিক—তাকে আগে কখনও দেখি নাই। ভাবে দেখলুম, গৌরবর্ণ পুরুষ, মাথায় তাজ। যখন অনেকদিন পরে শম্ভুকে দেখলুম, তখন মনে পড়ল, একেই আগে ভাবাবস্থায় দেখেছি।

খ. শম্ভু মল্লিক আমায় বলেছিল, ঢাল নাই তরোয়াল নাই, শান্তিরাম সিং। বলেছিল—যখন আমি তার বাড়িতে প্রায় যেতুম—তুমি এখানে এস, অবশ্য আমার সঙ্গে আলাপ করে আনন্দ পাও তাই এস—ঐটুকু আনন্দ আছে। বাগবাজার থেকে হেঁটে নিজের বাগানে আসত। কেউ বলেছিল, অত রাস্তা কেন গাড়ি করে আস না, বিপদ হতে পারে। তখন শম্ভু মুখ লাল করে বলে উঠেছিল, কি, তাঁর নাম করে বেরিয়েছি, আবার বিপদ! বিশ্বাসেতেই সব হয়। আমি বলতুম, অমুককে যদি দেখি, তবে বলি সত্য। অমুক খাজাঞ্চি যদি আমার সঙ্গে কথা কয়। তা যেটা মনে করতুম সেটাই মিলে যেত।

গ. শম্ভু বলেছিল, আর এখন এই আশীর্বাদ কর যাতে এই ঐশ্বর্য তাঁর পাদপদ্মে দিয়ে মরতে পারি। আমি বললুম, এ তোমার পক্ষেই ঐশ্বর্য। তাঁকে তুমি কি দেবে। তাঁর পক্ষে এগুলো কাঠ-মাটি।

নাক টেপা হওয়া ভাল নয়। শম্ভুর নাকটি টেপা ছিল। তাই অত জ্ঞান থেকেও তত সরল ছিল না।

শশধর তর্কচূড়ামণি। মুখ্যু-শুখ্যু মানুষ, পণ্ডিত শশধর দেখা করতে আসবে শুনে বড় ভয় হ'ল। পরণের কাপড়েরই হুঁশ থাকে না, কি বলতে কি বলব ভেবে একেবারে জড়সড় হলুম। মাকে বললুম, দেখিস মা, আমি তো তোকে ছাড়া শাস্তর-মাস্তর কিছুই জানি না, দেখিস্। তারপর একে বলি 'তুই তখন থাকিস্,' ওকে বলি 'তুই তখন আসিস্—তোদের সব দেখলে তবু ভরসা হবে।' পণ্ডিত যখন এসে বসল তখনও ভয় রয়েছে—চুপ করে বসে তার দিকেই দেখছি, তার কথাই শুনছি—এমন সময় দেখছি কি যেন তার ভিতরটা মা দেখিয়ে দিচ্ছে—শাস্তর-মাস্তর পড়লে কি হবে, বিবেক-বৈরাগ্য না হলে ও সব কিছুই নয়। তারপরই সড়সড় করে একটা মাথার দিকে উঠে গেল আর ভয়-ডর সব কোথায় চলে গেল। একেবারে বিভভুল হয়ে গেলুম। মুখ উঁচু হয়ে গিয়ে তার ভিতর থেকে যেন একটা কথার ফোয়ারা বেরুতে লাগল—এমনটা বোধ হতে লাগল। যত বেরুচ্ছে তত ভিতর থেকে যেন কে ঠেলে ঠেলে যোগান দিচ্ছে। ও দেশে ধান মাপবার সময় যেমন একজন 'রামে-রাম, দুইয়ে দুই' করে মাপে, আর একজন তার পেছনে বসে রাশ ঠেলে দেয়, সেইরূপ।

কিন্তু কি যে সব বলেছি তা কিছুই জানি না। যখন একটু হুঁশ হ'ল তখন দেখছি কি যে সে কাঁদছে—একেবারে ভিজে গেছে।

শিবদর্শন/অন্নপূর্ণাদর্শন। সেজোবাবুর সঙ্গে যখন কাশী গিয়েছিলাম, মণিকর্ণিকার ঘাটের কাছ দিয়া আমাদের নৌকা যাচ্ছিল। হঠাৎ শিবদর্শন। আমি নৌকার ধারে এসে দাঁড়িয়ে সমাধিস্থ। মাঝিরা হৃদেকে বলতে লাগল—'ধর! ধর!' পাছে পড়ে যাই! যেন জগতের যত গম্ভীর নিয়ে সেই ঘাটে দাঁড়িয়ে আছেন। প্রথমে দেখলাম দূরে দাঁড়িয়ে তারপর কাছে আসতে দেখলাম, তারপর আমার ভিতরে মিলিয়ে গেলেন!

ভাবে দেখলাম, সন্ন্যাসী হাতে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। একটি ঠাকুরবাড়ীতে ঢুকলাম—সোনার অন্নপূর্ণা দর্শন হ'ল।

শিবনাথ শাস্ত্রী। শিবনাথ বলেছিল, বেশি ঈশ্বর চিন্তা করলে বেহেড হয়ে যায়। আমি বললুম, কি! চৈতন্যকে চিন্তা করে কি কেউ অচৈতন্য হয়ে যায়। তিনি নিত্যশুদ্ধবোধরূপ—যার বোধে সব বোধ কচ্ছে, যার চৈতন্যে সব চৈতন্যময়। বলে নাকি কে সাহেবদের হয়েছিল, বেশি চিন্তা করে বেহেড হয়ে গিছল। তা হতে পারে। তারা ঐহিক পদার্থ চিন্তা করে। 'ভাবেতে ভরল তনু হরল গেয়ান'—এতে যে জ্ঞানের কথা আছে, সে জ্ঞান মানে বাহ্যজ্ঞান।

শুদ্ধাভক্তির প্রার্থনা। নারদকে রাম বললেন, তুমি আমার কাছে কিছু বর নাও। নারদ বললেন, রাম! আমার আর কি বাকী আছে? কি ব'র ল'ব? তবে যদি

একান্ত বর দিবে, এই বর দাও যেন তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি থাকে, আর যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই। রাম বললেন, নারদ। আর কিছু বর লও। নারদ আবার বললেন, রাম! আর কিছু আমি চাই না, যেন তোমার পাদপদ্মে আমার শুদ্ধাভক্তি থাকে, এই ক'রো।

আমি মার কাছে প্রার্থনা করেছিলাম; বলেছিলাম, মা! আমি লোকমান্য চাই না মা, অষ্টসিদ্ধি চাই না মা, ও মা! শতসিদ্ধি চাই না মা, দেহসুখ চাই না মা, কেবল এই করো যেন তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি হয় মা।

শ্রীরাম মল্লিক (বাল্যবন্ধু)। দেশে শ্রীরাম মল্লিককে অত ভালবাসতাম, কিন্তু এখানে যখন এলো তখন ছুঁতে পারলাম না।

শ্রীরামের সঙ্গে ছেলেবেলায় খুব প্রণয় ছিল। রাতদিন একসঙ্গে থাকতাম। একসঙ্গে শুয়ে থাকতাম। তখন ষোল-সতের বৎসর বয়স! লোকে বলতো, এদের ভিতর একজন মেয়েমানুষ হ'লে দুজনের বিয়ে হ'ত। তাদের বাড়িতে দুজনে খেলা করতাম, তখনকার সব কথা মনে পড়ছে। তাদের কুটুম্বেরা পাল্কি চড়ে আসতো, বেয়ারাগুলো 'হিঞ্জোড়া হিঞ্জোড়া' বলতে থাকতো।

শ্রীরামকে দেখবো বলে কতবার লোক পাঠিয়েছি; এখন চানকে দোকান করেছে! সেদিন এসেছিল, দু'দিন এখানে ছিল।

শ্রীরাম বললে, ছেলেপিলে হয় নাই। ভাইপোটিকে মানুষ করেছিলাম, সেটি মরে গেছে। বলতে বলতে শ্রীরাম দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে, চক্ষে জল এল, ভাইপোর জন্য খুব শোক হয়েছে।

আবার বললে, ছেলে হয় নাই ব'লে স্ত্রীর যত স্নেহ ঐ ভাইপোর উপর পড়েছিল; এখন সে শোকে অধীর হয়েছে। আমি তাকে বলি, ক্ষেপী! আর শোক করলে কি হবে? তুই কাশী যাবি?

বলে 'ক্ষেপী'—একেবারে ডাইলিউট (dilute) হয়ে গেছে। তাকে ছুঁতে পারলাম না। দেখলাম তাতে আর কিছু নাই।

সমাধি অবস্থা। আমার এই যে অবস্থাটা হয় (সমাধি অবস্থা) কেউ কেউ বলে রোগ। আমি বলি যাঁর চৈতন্যে জগৎ চৈতন্য হয়ে রয়েছে—তাঁর চিন্তা করে কেউ কি অচৈতন্য হয়?

সমাধি ও ভাব। সমাধি, ভাব, প্রেমের বটে। ও দেশে (শ্যামবাজারে) নটবর গোস্বামীর বাড়িতে কীর্তন হচ্ছিল—শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীগণ দর্শন করে সমাধিস্থ হলাম! বোধ হ'ল আমার লিঙ্গ শরীর (সূক্ষ্ম শরীর) শ্রীকৃষ্ণের পায় পায় বেড়াচ্ছে!

জোড়াসাঁকো হরিসভায় ঐরূপ কীর্তনের সময় সমাধি হয়ে বাহ্যশূন্য। সেদিন দেহত্যাগের সম্ভাবনা ছিল।

সাধনা। তিনি আমায় নানারূপে সাধন করিয়েছেন। প্রথম, পুরাণ মতের—তারপর তন্ত্র মতের, আবার বেদ মতের। প্রথমে পঞ্চবটীতে সাধনা করতাম। তুলসী কানন হ'ল—তার মধ্যে বসে ধ্যান করতাম। কখনও ব্যাকুল হয়ে 'মা! মা! বলে ডাকতাম—বা 'রাম! রাম!' করতাম।

যখন 'রাম রাম' করতাম তখন হনুমানের ভাবে হয়তো একটা ল্যাজ পরে বসে আছি। উম্মাদের অবস্থা। সে সময়ে পুজা করতে করতে গরদের কাপড় পরে আনন্দ হ'ত—পুজোরই আনন্দ।

তন্ত্র মতের সাধনা বেলতলায়। তখন তুলসী গাছ—সজনের খাড়া—এক মনে হ'ত।

সে অবস্থায় শিবানীর উচ্ছিষ্ট—সমস্ত রাত্রি পড়ে আছে—তা সাপে খেলে কি কিসে খেলে তার ঠিক নাই—ঐ উচ্ছিষ্টই আহার।

কুকুরের উপর চড়ে তার মুখে লুচি দিয়ে খাওয়াতাম, আর নিজেও খেতাম। সর্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ।—মাটিতে জল জমবে তাই আচমন; আমি সে মাটিতে পুকুর থেকে জল দিয়ে আচমন কল্লাম।

অবিদ্যাকে নাশ না করলে হবে না। আমি তাই বাঘ হতাম—হয়ে অবিদ্যাকে খেয়ে ফেলতাম।

বেদমতে সাধনের সময় সন্ন্যাস নিলাম। তখন চাঁদনীতে পড়ে থাকতাম—হৃদুকে বলতাম—আমি সন্ন্যাসী হয়েছি, চাঁদনীতে ভাত খাবো।

সাধনা (বেদমন্ত্রে)। বেদমন্ত্র সাধনের সময় সন্ন্যাস নিলুম। তখন চাঁদনীতে পড়ে থাকতুম—হৃদুকে বলতুম, আমি সন্ন্যাসী হয়েছি, চাঁদনীতে ভাত খাবো। হত্যা দিয়ে পড়েছিলুম। মাকে বললুম, আমি মুখ্যু, তুমি আমায় জানিয়ে দাও—বেদ পুরাণ তন্ত্রে, নানাশাস্ত্রে কি আছে। মা বললেন, বেদান্তের সার ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। যে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের কথা বেদে আছে তাকে তন্ত্রে বলে সচ্চিদানন্দঃ শিবঃ—আবার তাকেই পুরাণে বলে সচ্চিদানন্দঃ কৃষ্ণঃ। প্রত্যক্ষ দর্শনের পর যা যা অবস্থা হয় শাস্ত্রে আছে, সে সব হয়েছিল। বালকবৎ, উম্মাদবৎ, পিশাচবৎ, জড়বৎ। আর শাস্ত্রে যেরূপ আছে সেরূপ দর্শনও হ'ত।

কখনও দেখতুম জগৎময় আগুনের স্ফুলিঙ্গ। কখনও চারদিকে যেন পারার হ্রদ—ঝক্‌ঝক্ করছে। আবার কখনও রূপা গলার মতো দেখতুম। কখনও দেখতুম রংমশালের আলো যেন জ্বলছে। আবার দেখালে তিনিই জীবজগৎ চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন। ছাদে উঠে আবার সিঁড়িতে নামা। অনুলোম বিলোম।

একটা অবস্থা যায় তো আর একটা অবস্থা আসে। যেন ঢেঁকির পাট। একদিক নীচু হয় তো আর একদিক উঁচু হয়। যখন অন্তর্মুখ সমাধিস্থ, তখনও দেখছি তিনি। আবার যখন বাহিরের জগতে মন এলো তখনও দেখছি তিনি। যখন আরশির এপিঠ দেখছি তখনও তিনি, যখন উল্টো পিঠ দেখছি তখনও তিনি।

উঃ, আমার কি অবস্থা গেছে! মন অখণ্ডে লয় হয়ে যেত। এমন কতদিন। সব ভক্তি-ভক্ত ত্যাগ করলুম! জড় হলুম। দেখলুম মাথাটা নিরাকার, প্রাণ যায় যায়। রামলালের খুড়ীকে ডাকার মনে করলুম। ঘরে ছবিটবি যা ছিল সব সরিয়ে ফেলতে বললুম। আবার হুঁশ যখন আসে তখন প্রাণ যায় যায়। মন নেমে আসবার সময় প্রাণ আটুপাটু করতে থাকে। শেষে ভাবতে লাগলুম, তবে কি নিয়ে থাকব? তখন ভক্তি-ভক্তের উপর মন এলো। তখন লোককে জিজ্ঞাসা করে বেড়াতে লাগলুম যে, এ আমার কি হ'ল?

সাধনা (বৃন্দাবনে ভেক গ্রহণ)। আমি বৃন্দাবনে ভেক নিয়েছিলুম। পনের দিন রেখেছিলুম। সব ভাবই কিছুদিন কিছুদিন করতুম, তবে শান্তি হ'ত। বৃন্দাবনের বেশ ভাবটি। নূতন যাত্রী গেলে ব্রজবালকেরা বলতে থাকে, 'হরি বোলো গাঁঠরী খোলো।'

মথুরার ধ্রুবঘাট যেই দেখলুম, অমনি দপ্ করে দর্শন হ'ল, বসুদেব কৃষ্ণ কোলে লয়ে যমুনা পার হচ্ছেন। আবার সন্ধ্যার সময় যমুনা-পুলিনে বেড়াচ্ছি, বালির উপর ছোট ছোট খোড়ো ঘর। বড় কুলগাছ। গোধুলির সময় গাভীরা গোষ্ঠ থেকে ফিরে আসছে। দেখলুম, হেঁটে যমুনা পার হচ্ছে। তারপরই কতকগুলি রাখাল গাভীদের নিয়ে পার হচ্ছে। যেই দেখা অমনি 'কোথায় কৃষ্ণ' বলে বেহুঁশ হয়ে গেলুম।

শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড দর্শন করতে ইচ্ছা হয়েছিল। পালকী করে আমায় পাঠিয়ে দিলে। অনেকটা পথ; লুচি, জিলিপী পালকীর ভিতরে দিলে। মাঠ পার হবার সময় এই ভেবে কাঁদতে লাগলুম, 'কৃষ্ণরে তুই নাই, কিন্তু সেইসব স্থান রয়েছে। সেই মাঠ, তুমি গরু চরাতে'। হৃদে রাস্তায় সঙ্গে সঙ্গে পিছনে আসছিল। আমি চক্ষের জলে ভাসতে লাগলুম। বিয়ারাদের দাঁড়াতে বলতে পারলুম না। শ্যাম-কুণ্ড রাধাকুণ্ডতে গিয়ে দেখলুম, সাধুরা একটি একটি ঝুপড়ির মতো করেছে; তার ভিতরে পিছনে ফিরে সাধন-ভজন করছে—পাছে লোকের উপর দৃষ্টিপাত হয়। দ্বাদশবন দেখবার উপযুক্ত।

বঙ্কুবিহারীকে দেখে ভাব হয়েছিল, আমি তাঁকে ধরতে গিছলুম।

সাধনার সময়। সাধনার সময় ধ্যান করতে করতে আমি আরও কত কি দেখতাম। বেলতলায় ধ্যান করছি, পাপ পুরুষ এসে কত রকম লোভ দেখাতে লাগল। লড়ায়ে গোরার রূপ ধ'রে এসেছিল। টাকা, মান, রমণ সুখ নানা রকম শক্তি, এই সব দিতে চাইলে। আমি মাকে ডাকতে লাগলাম। বড় গুহ্য কথা। মা দেখা দিলেন, তখন আমি বললাম, মা ওকে কেটে ফেলো। মার সেই রূপ—সেই ভুবনমোহন রূপ—মনে পড়েছে। কৃষ্ণময়ীর রূপ।—কিন্তু চাউনীতে যেন জগৎটা নড়ছে।

আরও কত কি বলতে দেয় না।—মুখ যেন আটকে দেয়।

সজনে তুলসী এক বোধ হ'ত। ভেদ-বুদ্ধি দূর ক'রে দিলেন। বটতলায় ধ্যান করছি, দেখালে একজন দেড়ে মুসলমান (মোহম্মদ) সানকি ক'রে ভাত নিয়ে সামনে এলো। সানকি থেকে ম্লেচ্ছদের খাইয়ে আমাকে দুটি দিয়ে গেল। মা দেখালেন, এক বই দুই নাই। সচ্চিদানন্দই নানারূপ ধ'রে রয়েছেন। তিনিই জীব জগৎ সমস্তই হয়েছেন। তিনিই অন্ন হয়েছেন।—আমার বালক স্বভাব। হৃদে বললে, মামা, মাকে কিছু শক্তির কথা বলো—অমনি মাকে বলতে চললাম। এমনি অবস্থায় রেখেছে যে, যে ব্যক্তি কাছে থাকবে তার কথা শুনতে হয়। ছোট ছেলের যেমন কাছে লোক না থাকলে অন্ধকার দেখে—আমারও সেইরূপ হ'ত। হৃদে কাছে না থাকলে প্রাণ যায় যায় হ'ত। ঐ দেখো ঐ ভাবটা আসছে।—কথা কইতে কইতে উদ্দীপন হয়।

সাধনার সময়। সে সময় ধ্যানে দেখতে পেতাম, সত্য সত্য একজন কাছে শূলে হাতে ক'রে ব'সে আছে। ভয় দেখাচ্ছে—যদি ঈশ্বরের পাদপদ্মে মন না রাখি শূলের বাড়ি আমায় মারবে। ঠিক মন না হ'লে বুক যাবে।

কখনও মা এমন অবস্থা ক'রে দিতেন যে, নিত্য থেকে মন লীলায় নেমে আসতো। আবার কখনও লীলা থেকে নিত্যে মন উঠে যেতো।

যখন লীলায় মন নেমে আসতো কখনও সীতারামকে রাতদিন চিন্তা করতাম। আর সীতারামের রূপ সর্বদা দর্শন হ'ত—রামলালকে (রামের অষ্টধাতু নির্মিত ছোট বিগ্রহ) নিয়ে সর্বদা বেড়াতাম, কখনও নাওয়াতাম, কখনও খাওয়াতাম। আবার কখনও রাধাকৃষ্ণের ভাবে থাকতাম। ঐ রূপ সর্বদা দর্শন হ'ত। আবার কখনও গৌরাঙ্গের ভাবে থাকতাম, দুই ভাবের মিলন—পুরুষ ও প্রকৃতি ভাবের মিলন। এ অবস্থায় সর্বদাই গৌরাঙ্গের রূপ দর্শন হ'ত। আবার অবস্থা বদলে গেল!—তখন লীলা ত্যাগ ক'রে নিত্যতে মন উঠে গেল। সজনে তুলসী সব এক বোধ হ'তে লাগলো। ঈশ্বরীয় রূপ আর ভাল লাগলো না। বললাম, কিন্তু তোমাদের বিচ্ছেদ আছে। তখন তাদের তলায় রাখলাম। ঘরে যত ঈশ্বরীয় পট বা ছবি ছিল সব খুলে ফেললাম। কেবল সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ সেই আদি পুরুষকে চিন্তা করতে লাগলাম। নিজে দাসীভাবে রইলুম—পুরুষের দাসী।

আমি সব রকম সাধনা করেছি। সাধনা তিন প্রকার—সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক। সাত্ত্বিক সাধনায় তাঁকে ব্যাকুল হ'য়ে ডাকে বা তাঁর শুদ্ধ নামটি নিয়ে থাকে। আর কোন ফলাকাঙ্ক্ষা নাই। রাজসিক সাধনে নানা রকম প্রক্রিয়া—এতোবার পুরশ্চরণ করতে হবে, এত তীর্থ করতে হবে, পঞ্চতপা করতে হবে; ষোড়শোপচারে পূজা করতে হবে ইত্যাদি। তামসিক সাধন—তমোগুণ আশ্রয় ক'রে সাধন। জয় কালী! কি, তুই দেখা দিবিনি! এই গলায় ছুরি দেব যদি দেখা না দিস। এ সাধনায় শুদ্ধাচার নাই—যেমন তন্ত্রের সাধন।

সে অবস্থায় (সাধনার অবস্থায়) অদ্ভুত সব দর্শন হ'ত, আত্মার রমণ প্রত্যক্ষ দেখলাম। আমার মতো রূপ একজন আমার শরীরের ভিতর প্রবেশ করল। আর ষট্‌পদ্মের প্রত্যেক পদ্মের সঙ্গে রমণ করতে লাগল। ষট্‌পদ্ম মুদিত হ'য়েছিল—টক টক ক'রে রমণ করে তার একটি পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়—আর ঊর্ধ্বমুখ হ'য়ে যায়। এইরূপে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞাপদ্ম, সহস্রার সকল পদ্মগুলি ফুটে উঠলো। আর নীচে মুখ ছিল ঊর্ধ্বমুখ হ'ল, প্রত্যক্ষ দেখলাম।

সিদ্ধাই চাওয়া। হৃদে একদিন বললে, মামা, মার কাছে কিছু শক্তি চাও। কিছু সিদ্ধাই চাও। আমার বালকস্বভাব। কালীঘরে জপ করবার সময় মাকে বললুম, মা, হৃদে বলছে, কিছু শক্তি চাইতে, কিছু সিদ্ধাই চাইতে। অমনি দেখিয়ে দিলে, সামনে এসে পিছন ফিরে উবু হয়ে বসল একজন বুড়ো বেশ্যা, চল্লিশ বছর বয়স, ধামা পোঁদ, কাল পেড়ে কাপড় পরা—পড়্ পড়্ করে হাগছে। মা দেখিয়ে দিলে যে সিদ্ধাই এই বুড়ো বেশ্যার বিষ্ঠা। তখন হৃদেকে গিয়ে বকলুম আর বললুম, তুই কেন আমায় এমন কথা শিখিয়ে দিলি? তোর জন্যই তো

আমার এরূপ হ'ল ।

সেজোবাবুর কথা। সেজোবাবু বলে, বাবা, তোমার ভিতরে আর কিছু নাই—সেই ঈশ্বর আছেন। দেহটা কেবল ডোল মাত্র—যেমন বাহিরে কুমড়োর আকার কিন্তু ভিতরের শাঁস বীচি কিছুই নাই। তোমায় দেখলাম, যেন ঘোমটা দিয়ে কেউ চলে যাচ্ছে।

আগে থাকতে সব দেখিয়ে দেয়। বটতলায় (পঞ্চবটীতলায়) গৌরাঙ্গের সংকীর্তনের দল দেখেছিলাম। তার ভিতর যেন বলরামকে দেখেছিলাম,—আর যেন তোমায় দেখেছিলাম।

সংস্কৃত ভাষা। লাহাদের ওখানে বাবুরা পড়ত, বুঝতে পারতুম। কোন পণ্ডিত এসে যদি সংস্কৃতে কথা কয় তো বুঝতে পারি। কিন্তু নিজে সংস্কৃত কথা কইতে পারি না।

স্বাধীন ইচ্ছা। স্বাধীন ইচ্ছা (Free Will) কোথায় ? সকলই ঈশ্বরাধীন। ন্যাংটা অত বড় জ্ঞানী গো, সে-ই জলে ডুবতে গিছলো। এখানে এগার মাস ছিল ; পেটের ব্যারাম হ'ল, রোগের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে গঙ্গাতে ডুবতে গিছলো। ঘাটের কাছে অনেকটা চড়া, যত যায়, হাঁটু জলের চেয়ে আর বেশী হয় না ; তখন আবার বুঝলে ; বুঝে ফিরে এলো। আমার একবার খুব বাতিক বৃদ্ধি হয়েছিল, তাই গলায় ছুরি দিতে গিছলুম। তাই বলি মা আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী ; আমি রথ, তুমি রথী ; যেমন চালাও তেমনি চলি—যেমন করাও তেমনি করি।

হরমোহন মিত্র। হরমোহন যখন প্রথমে এলো বেশ লক্ষণ ছিল। দেখবার জন্যে আমি ব্যাকুল হতুম। তখন বয়স ১৭/১৮ হবে। প্রায় ডেকে ডেকে পাঠাই, আর যায় না। এখন মাগকে এনে আলাদা বাস করেছে। মামার বাড়ি ছিল, বেশ ছিল। সংসারের কোনো ঝঞ্ঝাট ছিল না। এখন আলাদা বাসা করে পরিবারের রোজ বাজার করে। সেদিন ওখানে গিয়েছিল। আমি বললুম, যা, এখান থেকে চলে যা—তোকে ছুঁতে আমার গা কেমন করে।

হরিপদ ঘোষ। হরিপদ সেদিন এসেছিল। তার চক্ষু দেখলুম, যেন চড়ে রয়েছে। বললুম, তুই কি খুব ধ্যান করিস ? তা মাথা হেঁট করে থাকে। আমি তখন বললুম, অতো নয় রে।

হলধারী। দ্রঃ ঈশ্বরদর্শন, অক্ষরের মানে। উন্মাদ অবস্থা-১

হাজরা। ক. হাজরা এখানে অনেক জপতপ করত। কিন্তু স্ত্রী, ছেলেপুলে, জমি এসব ছিল। কাজেকাজেই জপতপও করে, ভিতরে ভিতরে দালালিও করে। এ সব লোকের কথার ঠিক থাকে না। এই বলে মাছ খাব না, আবার খায়। টাকাওয়ালা লোক দেখলে কাছে ডাকত—ডেকে লম্বা লম্বা কথা শোনাতো। আবার তাদের বলত, রাখাল-টাখাল যা সব দেখছ ওরা জপতপ করতে পারে না—হো হো করে বেড়ায়। শ্রীরামপুর থেকে একটি গোঁসাই এসেছিল, অদ্বৈতবংশ। ইচ্ছা এখানে একরাত্রি দুরাত্রি থাকে। আমি যত্ন করে তাকে থাকতে বললুম। হাজরা বলে কি, খাজাঞ্চির কাছে ওকে পাঠাও। এ কথার মানে এই যে, দুধ-টুধ পাছে চায়, তাহলে হাজরার ভাগ থেকে কিছু দিতে হয়। আমি বললুম, তবে রে শালা

গোঁসাই বলে আমি ওঁর কাছে সাষ্টাঙ্গ হই, আর তুই সংসারে থেকে কামিনী-কাঞ্চন লয়ে নানা কাণ্ড করে—এখন একটু জপ করে এত অহঙ্কার হয়েছে। লজ্জা করে না।

আমি একদিন হাজরাকে জিজ্ঞাসা করলুম, তুমি বল কার কত সত্ত্বগুণ হয়েছে। সে বললে, নরেন্দ্রের ষোল আনা, আর আমার একটাকা দুই আনা। জিজ্ঞাসা করলুম, আমার কত হয়েছে? তা বললে, তোমার এখনও লালচে মারছে, তোমার বারো আনা।

দক্ষিণেশ্বরে বসে জপ করত, আবার ওরই ভিতর থেকে দালালির চেষ্টা করত। বাড়িতে কয় হাজার টাকা দেনা আছে—সেই দেনা শুধতে হবে। রাঁধুনী বামুনদের কথায় বলেছিল, ওসব লোকদের সঙ্গে আমরা কি কথা কই!

খ. হাজরা আবার শিক্ষা দেয়, তুমি কেন ছোকরাদের জন্য অত ভাবো। গাড়ি করে বলরামের বাড়ি যাচ্ছি, এমন সময় পথে মহাভাবনা হ'ল। বললুম, মা, হাজরা বলে, নরেন্দ্র আর সব ছোকরাদের জন্য আমি অত ভাবি কেন। সে বলে, তুমি ঈশ্বরচিন্তা ছেড়ে এ সব ছোকরাদের চিন্তা করছ কেন। এই কথা বলতে বলতে একেবারে দেখালে যে, তিনিই মানুষ হয়েছেন। শুদ্ধ আধারে স্পষ্ট প্রকাশ হন। সেইরূপ দর্শন করে যখন সমাধি একটু ভাঙ্গলো তখন হাজরার উপর রাগ করতে লাগলুম। বললুম, শালা আমার মন খারাপ করে দিছলো। আবার ভাবলুম, সে বেচারীরই বা দোষ কি? সে জানবে কেমন করে?

গ. হাজরার দোষ নাই। সাধক অবস্থায় সব মনটা 'নেতি নেতি' করে তাঁর দিকে দিতে হয়। সিদ্ধ অবস্থায় আলাদা কথা। তাঁকে লাভ করবার পর অনুলোম বিলোম। ঘোল ছেড়ে মাখন পেয়ে তখন বোধ হয়, ঘোলেরই মাখম, মাখমেরই ঘোল। তখন ঠিক বোধহয় তিনিই সব হয়েছেন। কোনোখানে বেশি প্রকাশ, কোনোখানে কম প্রকাশ। মাঝে মাঝে ও আমায় শিক্ষা দেয়। তর্ক যখন করে, হয়তো আমি গালাগালি দিয়ে বসলুম। তর্কের পর মশারির ভিতর হয়তো শুয়েছি, আবার কি বলেছি মনে করে বেরিয়ে এসে হাজরাকে প্রণাম করে যাই তবে হয়। হাজরা কোন রকমে বিশ্বাস করবে না যে ব্রহ্মও শক্তি, শক্তি আর শক্তিমান্ অভেদ। যখন নিষ্ক্রিয় তখন তাকে ব্রহ্ম বলে কই। যখন সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করেন তখন শক্তি বলি। কিন্তু একই বস্তু, অভেদ। অগ্নি বললে, দাহিকা শক্তি অমনি বোঝায়, দাহিকা শক্তি বললে অগ্নিকে মনে পড়ে। একটাকে ছেড়ে আর একটাকে চিন্তা করবার জো নাই। তখন প্রার্থনা করলুম, মা, হাজরা এখনকার মত পালটে দেবার চেষ্টা করছে। হয় ওকে বুঝিয়ে দে, নয় এখান থেকে সরিয়ে দে, তারপর দিন সে আবার এসে বললে, হাঁ, মানি তখন বলে যে বিভু সব জায়গায় আছেন। হাজরা একটি কম নয়!

তৃতীয় ভাগ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত
ও
পরিকর চরিতাভিধান

অক্ষয় (১৮৪৯—১৮৬৯) পি. রামকুমার চট্টোপাধ্যায়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের একমাত্র ভ্রাতুষ্পুত্র। জন্মের সাথেই মাতৃহারা। চোদ্দ বছর বয়সে (মতান্তরে ষোল) দক্ষিণেশ্বরে আসেন এবং ৺রাধাকান্ত দেবের পূজার দায়িত্ব পান। দক্ষিণেশ্বর মন্দির প্রাঙ্গণের বাইরের দিকে উত্তরাংশের কুঠিবাড়িতে থাকতেন। কুড়ি বছর বয়সে কুচেকোল গ্রামে বিয়ে হয় এবং ঐ বছরেই দক্ষিণেশ্বরে জ্বরবিকারে দেহত্যাগ করেন। এরপর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণও আর কোনদিন ঐ বাড়িতে বাস করেন নি।

অক্ষয়কুমার সেন (১৮৫০—৭.১২.১৯২৩) পি. হলধর, মা-বিধুমুখী। জ. বাঁকুড়ার বাজে ময়নাপুরে। ঠাকুর বাড়ির গৃহশিক্ষক ছিলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের সঙ্গে গিয়ে তিনি কাশীপুরে মহিমাচরণ চক্রবর্তীর বাড়িতে প্রথম তাঁকে দেখেন এবং মুগ্ধ হয়ে তাঁর কাছে যাতায়াত শুরু করেন। ক্রমে তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের পদসেবার অধিকার পান এবং ঠাকুর তাঁকে মন্ত্র দেন। এরপর তিনি প্রায় সাত বছর ধরে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি' নামে বাংলা পদ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের এক বিশাল জীবনীগ্রন্থ রচনা করেন। নিষ্ঠা, ঐতিহাসিক সততা ও কবিত্বে এই গ্রন্থ সমুজ্জ্বল। রামকৃষ্ণ জীবন তথ্যের এক আকর। পরে তিনি পদ্যে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের উপদেশ' (বঙ্গাব্দ ১৩০৩) এবং 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের উপদেশ' (বঙ্গাব্দ ১৩০৩) এবং 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মহিমা' (১৩১৭) নামেও দুটি গ্রন্থ রচনা করেন। কিছুকাল বসুমতী সাহিত্য মন্দিরে কাজ করেন। শেষ জীবন বড়ই দুঃখ কষ্টে কাটে। হাঁপানি রোগে তাঁর মৃত্যু হয়।

অখণ্ডানন্দ স্বামী (৩.৯.১৮৬৪—৭.২.১৯৩৭) পি. শ্রীমন্ত তর্করত্ন। মা—বামাসুন্দরী। জ. মাতুলালয়, আহেরীটোলা মানিক বসু ঘাট স্ট্রীট। মূল উপাধি ঘটক। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে বাগবাজারে দীননাথ বসুর বাড়িতে ঠাকুরের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ, একত্রে রাত্রিবাস, পদসেবা। নরেন্দ্রের সঙ্গে গভীর সখ্যতা। তাঁর দেহত্যাগের পর উত্তর ভারত ও হিমালয় ভ্রমণ। ১৮৯০ সালে বরাহনগর মঠে এসে সন্ন্যাস গ্রহণ এবং গঙ্গাধর নাম ত্যাগ করে এই নাম গ্রহণ। এরপর তিনি প্রায় সমগ্র পশ্চিম ভারত ভ্রমণ করেন। পরে নানা জনহিতকর কাজে ব্রতী হন। বহু বিদ্যালয় ও অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের সেবায় তাঁর আন্তরিক দরদ ফুটে ওঠে। সারগাছিতে যে আশ্রম ও বিদ্যালয় তা অখণ্ডানন্দের প্রতিষ্ঠিত। তিনি তিনবার তিব্বত ভ্রমণ করেন। শেষবার গুপ্তচর সন্দেহে তাঁকে গ্রেপ্তারও করা হয়। অনশন করে তিনি মুক্তি পান। তাঁর রচিত 'তিব্বতের পথে হিমালয়ে' এবং 'স্মৃতিকথা' উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। তিনি শেষ জীবনে মঠ ও মিশনের প্রেসিডেন্ট পদেও নির্বাচিত হন। তিনি বহুমূত্র রোগে ভুগে জীর্ণ হয়ে পড়লে বেলুড় মঠে নিয়ে আসা হয়। সেখানেই

তিনি দেহত্যাগ করেন। মঠে তিনি গঙ্গাধর মহারাজ নামে খ্যাত ছিলেন।

অঘোরমণি দেবী (১৮২২ ?—৮.৭.১৯০৬) পি. কাশীনাথ ভট্টাচার্য (ঘোষাল)। জ. চব্বিশ পরগণার কামারহাটি। নয় বৎসরে বিবাহ, তের-চৌদ্দ বৎসর বয়সে বৈধব্য। তাঁর বাপের বাড়ির কাছেই পটলডাঙ্গায় গোবিন্দচন্দ্র দত্তের ঠাকুর বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহের পূজক ছিলেন তাঁর দাদা নীলমাধব। সেই সূত্রে তিনি মন্দিরে যেতেন এবং ঠাকুরের সামনে প্রায় ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকতেন। দত্ত-গৃহিণী ক্রমে ঐ ঠাকুর বাড়িতে বাস শুরু করেন। তাঁর আগ্রহে ত্রিশ বৎসর বয়সে অঘোরমণিও ঠাকুর বাড়ির একটি ঘরে এসে ঠাঁই নেন। গোপালের সেবা-ধ্যান জপ গঙ্গাস্নান হয় তাঁর জীবন রীতি। দত্ত গৃহিণীর সঙ্গে নানা তীর্থেও ঘুরে আসেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের নাম শুনে ১৮৮৪ সালে দত্ত গৃহিণীর সঙ্গে নৌকো করে দেখা করতে আসেন দক্ষিণেশ্বরে। প্রথম দিন ঠাকুর তাদের নানা ধর্মোপদেশ দেন এবং নিজেও একদিন কামারহাটীর ঠাকুর বাড়ি গিয়ে ঘুরে আসেন। এমনিভাবে ঠাকুরের সান্নিধ্য তাঁর মনে নতুন প্রেরণা সঞ্চার করে। তিনি নানা দিব্যদর্শন করতে থাকেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে তিনি ইষ্টদেব গোপালকে দেখতে পান। ঠাকুরও তাঁকে ‘গোপালের মা’ বলে ডাকা শুরু করেন। অঘোরমণিও রামকৃষ্ণের জপ শুরু করেন। বলরাম মন্দিরে ১৮৮৫ সালে সকলের সাক্ষাতে সত্যি সত্যি রামকৃষ্ণদেব অঘোরমণিকে গোপাল রূপে দেখা দেন। রামকৃষ্ণদেব স্বামী ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে কামারহাটী গিয়ে আর একবার অঘোরমণির সেবা গ্রহণ করেন। এরপর থেকে অঘোরমণি একান্ত স্মরণ করলেই দর্শন পেতেন। কিন্তু ক্রমে তাঁর মনে অবিরাম দর্শনের বাসনা জাগে। ঠাকুর এই বাসনার নাম দেন ‘হরিবাই’। এ সময় ঠাকুর তাঁকে নানা রকম জিনিস খাওয়াতেন। বলতেন, এ সব হচ্ছে পূর্বজন্মে গোপাল-মা কর্তৃক গোপালকে খাওয়ানর শোধ। ঠাকুরের দেহরক্ষার পর গোপালের মা সর্বভূতে গোপাল দর্শন করতে থাকেন। ক্রমে তিনি নিজেই গোপালময় হয়ে ওঠেন। নিজেকেই তাঁর গোপাল বোধ হয়। ১৯০৪ সালে অসুস্থ তাঁকে কলকাতায় বলরাম মন্দিরে আনা হয়। ভগিনী নিবেদিতা তাঁকে নিজের ১৭নং বোসপাড়া লেনের বাড়িতে নিয়ে আসেন। ৬ই জুলাই তাঁকে গঙ্গাতীরে আনা হয়। সেখানে দু'দিন কাটিয়ে প্রত্যুষে তিনি দেহত্যাগ করেন।

অচলানন্দতীর্থাবধূত। পূর্বনাম রাজকুমার বা রামকুমার। হুগলী জেলার কোতরং-এর বাসিন্দা। তাঁর প্রধান আড্ডা ছিল কালীঘাটে। গৃহত্যাগ করে তিনি বীর ভাবে সাধনা শুরু করেন। তিনি মাঝে মাঝে শিষ্যদের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে এসে পঞ্চবটীতে সাধনায় বসতেন। কারণ পান করে স্থিরাসনে ধ্যান ছিল তাঁর রীতি। ঠাকুর কারণ পান পছন্দ না করলেও তিনি পীড়াপীড়ি করতেন।

অতুলকৃষ্ণ ঘোষ। নট ও নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের ভাই। ইনি ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের উকিল। এক সময়ে তিনি রামকৃষ্ণদেবকে ‘রাজহংস’ বলে বিদ্রূপ করতেন। পরে তিনি কল্পতরু ঠাকুরের কৃপা পান এবং তাঁর সেবা করেন।

অদ্বৈতানন্দ স্বামী (১৮২৮ শ্রাবণ, কৃষ্ণাচতুর্দশী—২৮.১০. ১৯০৯) পি. গোবর্ধন

ঘোষ। জ. জগদ্দলপুর (রাজপুর), ২৪ পরগণা। পূর্বনাম গোপালচন্দ্র। সিঁথিতে থেকে চীনাবাজারে বেণীমাধব পালের দোকানে সামান্য চাকরী করতেন। বেণীমাধব বাবুর সিঁথির বাগান বাড়িতে ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে ১৮৭৫ সালে প্রথম রামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ পান। পরে ১৮৮৩ সালে পত্নীবিয়োগে শোকাতুর হয়ে কবিরাজ মহেন্দ্র পালের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে আসেন। ক্রমে লাটু (স্বামী অদ্ভুতানন্দ)-র সঙ্গে একত্রে রামকৃষ্ণদেব এবং শ্রীমায়ের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তীর্থ করতে বেরিয়ে তিনি বারো জন সন্ন্যাসীকে দেবার জন্য বারো খানি বস্ত্র, উড়নি, রুদ্রাক্ষের মালা ইত্যাদি আনেন। রামকৃষ্ণদেব নিজে হাতে সেগুলি নরেন্দ্রাদি বারো জনকে দেন। এদের মধ্যে এক গিরিশচন্দ্র ছাড়া আর সকলেই পরে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন, গোপাল নিজেও তাদের একজন। রামকৃষ্ণদেবের মৃত্যুর পর গোপাল বরাহনগর মঠে অবস্থান করতে থাকেন এবং সন্ন্যাস লন। কাশীতে বংশী দত্তের কুঠিতে তিনি পাঁচ বছর কঠোর সাধনা করেন। পরে বিবেকানন্দের আহ্বানে আসেন আলমবাজার মঠে, সেখান থেকে বেলুড় মঠে। এখান থেকে তিনি কয়েকবার তীর্থভ্রমণেও যান। বিবেকানন্দ বেলুড় মঠের যে এগার জন ট্রাস্টি নির্বাচন করেন, তিনি ছিলেন তাদের মধ্যে একজন। তিনি দুবার (১৯০৩, ১৯০৯) সংঘের অস্থায়ী সভাপতিও নির্বাচিত হন।

অদ্ভুতানন্দ (?—২৪.৪.১৯২০)। জঃ ছাপরাজেলা। পূর্বনাম রাখতুরাম। দরিদ্র গৃহে জন্ম। শৈশবে মাতৃপিতৃহীন। তিনি রামকৃষ্ণদেবের ভক্ত রামচন্দ্র দত্তের বাড়িতে গৃহভৃত্যের কাজ করতেন। এই সময় তাঁর নাম হয় লালটু। ১৮৭৯ সালের কাছাকাছি তিনি রামচন্দ্রের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুরের প্রথম দর্শন পান। বারবার যাওয়া আসা এবং রামকৃষ্ণদেবের সেবার ভেতর দিয়ে তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠেন। রামকৃষ্ণদেব তাকে আদর করে লাটু বলে ডাকতেন। ১৮৮১র জুন মাসে লাটু চাকরি ছেড়ে হৃদয় মুখোপাধ্যায়ের বদলে তাঁর সেবক হিসাবে নিযুক্ত হন। ঠাকুর তাকে লেখাপড়া শেখাবার চেষ্টা করেন। লাটুর ভাল লাগে নি। ঠাকুরের সঙ্গ তার আত্মিক উন্নতি ঘটায়। তাঁর নির্দেশে লাটু মায়ের সেবাও করতেন। ঠাকুরের দেহত্যাগের পর শ্রীমায়ের সঙ্গে বৃন্দাবন ঘুরে এসে বরাহনগর মঠে সন্ন্যাসগ্রহণ করেন। অদ্ভুত সরল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। কঠোর নিয়ম শৃংখলা মানতেন। রামচন্দ্র এবং তাঁর স্ত্রী অসুস্থ হলে তাদের সেবা করেন পুত্রের মত। বিবেকানন্দ তাঁকে মঠের ও সঙ্গের একজন ট্রাস্টি মনোনীত করেন। কিন্তু বিষয়ে জড়াবার ভয়ে তিনি রাজি হন নি। শ্রীমাকে তার লক্ষ্মী-স্বরূপা মনে হত। কাশী বসবাস কালে তিনি একদিন আবেগ উন্মাদনায় বিশ্বনাথের জন্য সংগৃহীত ফুলে শ্রীমায়ের পূজা করেন। শেষ আট বছর তিনি কাশীতে হাড়ারবাগে অবস্থান করেন। তার ভেতর দিব্যভাব প্রকট হয়ে ওঠে। এখানে ভক্তমণ্ডলে তিনি উপদেশ দিলেন। তাঁর শিষ্য সিদ্ধানন্দ তার উপদেশাবলী সংকলন করে 'সৎকথা' নামে প্রকাশ করেন। শেষ বয়সে তিনি বহুমূত্র রোগে জর্জরিত হয়ে পড়েন। কয়েকটি অস্ত্রোপচারের পর তিনি দেহত্যাগ করেন। তাঁর দেহ গঙ্গাগর্ভে বিসর্জিত হয়। কাশীতে অদ্ভুতানন্দ স্মৃতি ভবনে

আজও মাঘী পূর্ণিমায় লাটু মহারাজের জন্মোৎসব হয়।

অধরলাল সেন (২.৩.১৮৫৫—১৪.১.৮৫)। পি-ধনগোপাল। জ-কলকাতা আহেরী-টোলায়। ১৮৭৭-এ বি.এ. পাশ করে দুবছর পর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন। সংবাদপত্রে রামকৃষ্ণদেবের কথা পড়ে সন্দেহবাদী নাস্তিক ভাবাপন্ন এই ধনী সুবর্ণবণিক-সন্তান ১৮৮৩-তে প্রথম ঠাকুরকে দেখতে আসেন। ঠাকুর তাঁকে বিমুগ্ধ করেন। তার জিহ্বায় কিছু লিখে দেন। কথামৃতের পঞ্চম ভাগের সপ্তম খন্ডের চতুর্থ অধ্যায়ে তা বর্ণিত হয়েছে। তিনি কয়েকবার অধরের বাড়িতেও যান। তাঁর বাড়িতেই বঙ্কিমচন্দ্র চটোপাধ্যায়ের সঙ্গে রামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ হয়। নানা কর্মস্থলে পারদর্শিতা দেখিয়ে তিনি কলকাতার ডেপুটি কালেক্টর হয়ে ফিরে আসেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত হন এবং ফ্যাকালটি অব আটর্স-এর সদস্য হন। এত ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি নিয়মিত রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন, মহানন্দ লাভ করতেন। ১৮৮৫-র ৬ জানুয়ারী তিনি ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে ধনুষ্টংকার রোগে আক্রান্ত হন। রামকৃষ্ণদেব তার মৃত্যুশয্যায় উপস্থিত হয়ে তার গায়ে হাত বুলান এবং অভয়বাণী শুনান। অধরচন্দ্রের কবিখ্যাতি ছিল। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য সাধক চরিত মালায় তাঁর জীবন কথা বর্ণিত আছে।

অন্নদাপ্রসাদ বাগচি (১৮৪৯-১৯০৫)। প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী। ১৮৮৫ সালের ২৭ অক্টোবর শ্যামপুকুরের বাসায় ঠাকুরকে দেখতে এসে তাঁকে কয়েকটি ছবি উপহার দেন। কথামৃতে ৪।২৯।১-এ তার কথা আছে।

অবিনাশচন্দ্র দাঁ। রামকৃষ্ণদেবের গৃহীভক্ত ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বন্ধু। বরাহ-নগর ৩৬নং কুঠিঘাট রোডে থাকতেন। তিনি ভবনাথের উদ্যোগে ১৮৮৩ সালের অক্টোবর মাসের এক সকালে (রবিবার) দক্ষিণেশ্বর কালিবাড়ির রাধাকান্তদেবের মন্দিরে উত্তর রোয়াকে সদাশিব মন্দিরের দিকে তাকিয়ে রামকৃষ্ণদেব যখন ভাবা-বিষ্ট হন, তখন তাঁর ফটো তোলেন। ঠাকুরের এই ফটোটি সর্বাধিক প্রচারিত—তাঁর প্রায় সব মর্মর মূর্তির আদর্শ। রামকৃষ্ণদেব এই ফটো দেখে বলেছিলেন, এর অতি উচ্চভাব। শোনা যায় ফটো তোলায় রামকৃষ্ণদেবের সম্মতি ছিল না। আগে থেকে স্থান নির্বাচন করে রেখে নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সেখানে নিয়ে আসেন এবং ভগবৎ প্রসঙ্গ আলোচনা শুরু করেন। ঠাকুর সমাধিস্থ হলে ফটো তোলা হয়। এ বক্তব্য স্বামী অখন্ডানন্দের। অবিনাশচন্দ্র ভাল পাখোয়াজ বাজাতেন। গানও গাইতেন। তিনি পরবর্তী সময়ে ঠাকুরকে গানও শোনান এবং আশীর্বাদ পান।

অভেদানন্দ স্বামী। (২.১০.১৮৬৬—২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ খ্রী) পি—রসিকচন্দ্র চন্দ্র। মা—নয়নতারা। জ.২২ নিমুগোস্বামীলেন,কলি। পূর্বনাম কালীপ্রসাদ। জীবিতদের মধ্যে ছিলেন দ্বিতীয়। মেধাবী ছাত্র। প্রবেশিকা পাশ করে যোগ-শাস্ত্রপাঠ ও যোগাভ্যাসের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং সেই উদ্দেশ্যে দক্ষিণেশ্বর এসে রামকৃষ্ণদেবের আকর্ষণে পড়েন। রামকৃষ্ণ তার জিহ্বায় বীজমন্ত্র লিখে তাকে ধ্যানস্থ করেন। তাঁর বাবা ঠাকুরের কাছে এসে পুত্রকে ফেরৎ চান। রামকৃষ্ণদেব

জানান যে তিনি তাকে গ্রহণ করেছেন, ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়। তিনি বলতেন, কালীপ্রসাদের মধ্যে কৃষ্ণের অংশ আছে। ঠাকুরের দেহত্যাগের পর তিনি শ্রীমার সঙ্গে বৃন্দাবনেযান এবংসেখান থেকে ফিরে বরাহনগর মঠে ১৮৮৭র জানুয়ারীতে সন্ন্যাস নিয়ে স্বামী অভেদানন্দ নাম গ্রহণ করেন। এই সময় ভারত ভ্রমণ, বেদান্ত-চর্চা এবং কঠোর তপস্যার মধ্যে তাঁর জীবন কাটে। স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বানে তিনি ১৮৯৬-এর সেপ্টেম্বরে লণ্ডনে যান এবং লণ্ডনের প্রচারকার্যের দায় পান। পর বৎসর তিনি নিউ ইয়র্কে গিয়ে সেখানকার বেদান্ত সোসাইটির ভার নেন। দু-তিন বৎসর আমেরিকার নানাস্থানে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদান্তদর্শনের ওপর বক্তৃতা দেন। ১৯০৬ সালে কলকাতায় তাঁকে বিপুল জন-সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। ঐ বছরেই তিনি আবার ইউরোপে যান। এই সময় নিউইয়র্কের কাছেই বেদান্ত সমিতির নিজস্ব বাড়ির জন্য ৩৭০ একর জমি সহ একটি বাড়ি কেনা হয়। অভেদানন্দ এই সময় 'ইণ্ডিয়া আণ্ডার বৃটিশ রুল', নামে এক বক্তৃতা এবং 'ইণ্ডিয়া এণ্ড হার পিপল' নামে এক বই লিখে বৃটিশ সরকারের বিরাগভাজন হন। আমেরিকার ভারতীয় ছাত্রদের সুবিধার জন্য তিনি ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে ইন্দো ইউরোপীয় ক্লাব গঠন করেন। ১৯১২ সালে নিউইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটি থেকে অবসর নিয়ে তিনি আগের কেনা জমিতে, বার্কসায়ারের শান্তি আশ্রমে আসেন। এখানে থাকাকালে, তিনি নানাদেশে বক্তৃতা করেন। ২৫ বছর বিদেশে প্রচারকার্য চালাবার পর তিনি হনোলুলু, জাপান, সংহাই, হংকং, ম্যানিলা, সিঙ্গাপুর, কোয়ালালামপুর, ও রেঙ্গুন হয়ে কলকাতায় ফিরে আসেন। এরপর কয়েক বৎসর নানাস্থানে সংবর্ধনা লাভ এবং বক্তৃতাদান পর্ব চলে। ১৯২২ সালে কাশ্মীর এবং তিব্বত ভ্রমণে যান। তিব্বতের হেমিস মঠে রক্ষিত যীশুখৃষ্টের তিব্বতী ভাষায় লেখা জীবনীর পাণ্ডুলিপি থেকে তিনি জনৈক লামার সাহায্যে কিছুটা ইংরাজী অনুবাদ করিয়ে আনেন। সংঘ ও মঠের নানা কাজের মধ্যে বিজড়িত অভেদানন্দ ১৯২৭ থেকে বেদান্ত সমিতির মুখপত্র 'বিশ্ববাণী' প্রকাশ করতে থাকেন। তাঁর নানাকাজের মধ্যে রাজরাজকৃষ্ণ স্ট্রীটে রামকৃষ্ণ মন্দির, দার্জিলিং-এ বেদান্ত আশ্রমের পত্তন তাঁর অন্যতম কীর্তি। ১৯৩৭ সালের ২১ সেপ্টেম্বর দার্জিলিং থেকে ফিরবার পথে তিনি ট্রেন দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। ট্রেন থেকে, লাফিয়ে পড়ে বুকে আঘাত পান, সপ্তাহের মধ্যে বেলুড় মঠে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি অসংখ্য গ্রন্থরচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল, Gospel of Ramkrishna Reincarnation, How to be a Yogi, India and Her People, আত্মবিকাশ, দেবান্তবাণী, হিন্দুধর্মে নারীর স্থান, মনের বিচিত্ররূপ। তিনি দীর্ঘদিন বিশ্ববাণী পত্রিকা সম্পাদনা করেন।

অমৃতলাল সরকার। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের পুত্র। কথামৃত (৩।২০।৩) অনুসারে তিনিও বাবার সঙ্গে এসে রামকৃষ্ণদেবের সস্নেহ উপদেশ লাভ করেন।

অশ্বিনীকুমার দত্ত (২৫.১.১৮৫৬—৭.১১.১৯২০)। পি. ব্রজমোহন। জ. পটুয়াখালি। বাড়ি বাটাজোড়, বরিশাল। কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে তিনি বি.এ, বি.এল পাশ করে বরিশালে ওকালতি করতে গিয়ে বাবার নামে এক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

করেন। ঐ বিদ্যালয় ক্রমে কলেজে পরিণত হয়। নানা জনহিতকর কাজের ভেতর দিয়ে অশ্বিনীকুমার বরিশালে জাতীয়তাবোধের উদ্বোধক হয়ে ওঠেন। সে কালের জাতীয় আন্দোলনে অশ্বিনীকুমারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তিনি এ জন্য কারাদণ্ডও ভোগ করেন। স্বয়ং গান্ধীজি তাঁকে শ্রদ্ধা জানান। তাঁর প্রেরণাতেই মুকুন্দ দাসের জন্ম হয়। তিনি ভক্তিযোগ, কর্মযোগ, প্রেম, দুর্গোৎসবতত্ত্ব ইত্যাদি বহু গ্রন্থও রচনা করেন।

অশ্বিনীকুমার ১৮৮১ সালে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কথামৃতের তৃতীয় ভাগের ১৬ খণ্ডের শেষে রামচন্দ্র দত্তের বাড়িতে এক সাক্ষাৎকারের বর্ণনা আছে। প্রথমভাগের পরিশিষ্টের ২য় পরিচ্ছেদ হিসাবে অশ্বিনী দত্তের নিজের লেখা বিবরণী সংযুক্ত আছে।

আশুতোষ রায়। বেঁটে খাটো সরকারী চাকুরে মানুষটি মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে যেতেন। তিনি ভক্তমনের জন্য রামকৃষ্ণদেবের প্রীতিলাভ করেছিলেন। ঠাকুর তাঁকে প্রীতিবশে বুনো সরষে বলতেন। তাঁর হাতের ওজন দেখে বলেছিলেন, তোর হবে। তবে দেরীতে। আশুবাবু চাকরী উপলক্ষ্যে শিলং বদলী হন। তিনি সেখানে ভাগবদ্ আলোচনা ও কথামৃত পাঠের এক আসর বসান। সভ্যেরা বেশির ভাগছিল সরকারী চাকুরী। তারা বদলি হওয়ায় চক্র ভাঙ্গার দশা হয়। তখন এক রাতে আশুবাবু 'বুনো সরষে' ডাকে চমকে ওঠেন। বিস্মিত ভাবে দেখেন তাঁর সামনে রামকৃষ্ণদেব। তাঁর হাতে চিমটে, পরণে গৈরিক বসন, পায়ে খড়ম। তিনি তাঁকে চক্র না ভাঙ্গতে নির্দেশ দিয়ে অদৃশ্য হন। আশুবাবু আবার চক্র গড়ে তোলেন।

ঈশান কবিরাজ। কথামৃতকার মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের বড় দিদির বিয়ে হয় এই বাড়িতে এদের বসত ছিল বরাহনগরে। মহেন্দ্রনাথ যখন প্রথম রামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করেন (২৬.২.১৮৮২) তখন এই বাড়িতেই থাকতেন। কথামৃত অনুসারে (১।১।৩) তিনিও ঠাকুরের পরিচিত মানুষ ছিলেন।

ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। অ্যাকাউন্ট্যাট জেনারেল অফিসের সুপারিন্টেন্ডেন্ট ছিলেন। বর্তমান ১৯নং কেশব সেন স্ট্রীটে তাঁর বাড়ি ছিল। তিনি রামকৃষ্ণের গৃহীভক্ত, দাতা ও ধার্মিক ছিলেন। ঠাকুর একাধিকবার তাঁর বাড়িতে এসেছেন। বিবেকানন্দও বহুবার এঁর বাড়িতে গান গেয়ে সকলকে মুগ্ধ করেছেন। তাঁর পুত্র সতীশচন্দ্র ছিলেন বিবেকানন্দের সহপাঠী, তাঁর নাতি শ্রীশচন্দ্র ছিলেন কথামৃতকারের সহপাঠী। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ৭৩।৭৪ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (২৬.৯.১৮২০—২৯.৭.১৮৯১)। পি. ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। মা. প্রভাবতী। বীরসিংহ গ্রামে জন্ম মেদিনীপুর জেলা। স্বনামধন্য সমাজসেবী, সাহিত্যব্রতী এবং শিক্ষাবিদ্। নরেন্দ্রনাথ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মেট্রোপলিটন স্কুলের ছাত্র ছিলেন। একসময় নরেন্দ্রনাথ নিজেও এই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের

পদে ছিলেন। এই সমাজ সংস্কারকের সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছা হওয়ায় মহেন্দ্রনাথ অগ্রণী হয়ে যোগাযোগ করেন এবং বিদ্যাসাগরের সম্মতিতে ১৮৮২ সালের ৫ আগস্ট শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকে ঘোড়ার গাড়িতে করে দক্ষিণেশ্বর থেকে বিদ্যাসাগর মশাই-এর বাদুড় বাগানের বাড়িতে নিয়ে যান। কথামৃতের (১।১।৭)-এ এই সাক্ষাৎকারের বিবরণ আছে। সেখানে নানা তত্ত্বকথার আলোচনা ও গান হয়। সেখানে ঠাকুর আহার করেন। রাত নটায় তিনি দক্ষিণেশ্বর যাত্রা করেন। বিদ্যাসাগর দক্ষিণেশ্বরে যাবার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন কিন্তু যাওয়া হয় নি। ঠাকুর নিজে বিদ্যাসাগরের পাণ্ডিত্য ও দয়ার প্রশংসা করতেন। তাঁর অন্তরে সোনা আছে। তা ঈশ্বরমুখী হলে আর এত কাজ করতে পারতেন না বলে ঠাকুর অভিমত দেন।

উপেন্দ্র ডাক্তার। কথামৃত অনুসারে (৩।২৪।১) ১৮৮৬ সালের ১৪ মার্চ রামকৃষ্ণদেবের অসুখ বাড়লে গিরিশচন্দ্র উপেন্দ্রনাথ এবং কবিরাজ নবগোপালকে সঙ্গে করে গভীর রাত্রে কাশীপুর বাগানবাড়িতে ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হন।

উপেন্দ্রনাথ মজুমদার। ঠাকুরের গৃহীভক্ত। লাটু মহারাজ যাঁর বাড়িতে বাল্যে গৃহভৃত্যের কাজ করতেন সেই রামচন্দ্র দত্ত ছিলেন উপেন্দ্রনাথের ভাগনী-জামাই। ইনি কল্পতরু রামকৃষ্ণের কৃপালাভ করেন।

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (২৮.২.১৮৬৮—৩১.৩.১৯১৯)। পি. পূর্ণচন্দ্র। বাল্যে সামান্য লেখাপড়া শিখে প্রথমে অন্যের চাকরি করা নিয়ে জীবনযাত্রা শুরু করেন। পরে বটতলায় এক বই-এর দোকান কিনে স্বাধীন ব্যবসায়ে মনোযোগী হন। দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার বা অধর সেনের বাড়িতেই তিনি প্রথম রামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ পান। কথামৃতে একবারই মাত্র তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের বিবরণ আছে (৩।১৩।৪)। শোনা যায় তাঁর বটতলার দোকানে উপস্থিত হয়ে রামকৃষ্ণদেব তার সমৃদ্ধির আশীর্বাদ করেন। উপেন্দ্রনাথ সত্যিই ঐশ্বর্যের মালিক হন। কিন্তু ভক্তমন সর্বদাই সুপ্রকাশ ছিল। সস্তায় মহামূল্য সাধারণ মানুষের হাতে পেঁছে দেবার সংকল্প তাঁর জনহিতকর মানসিকতারই পরিচায়ক। রামকৃষ্ণদেবের দেহত্যাগের পর সন্ন্যাসীদের দুর্ভাগ্যের দিনে তিনি নানাভাবে সহায়তা করেন। বিবেকানন্দের প্রতিষ্ঠার পূর্বে তাঁর বিরোধীদের সঙ্গে সংগ্রামে উপেন্দ্রনাথের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। সাপ্তাহিক বসুমতী (২৫.৮.১৮৯৬) ও দৈনিক বসুমতী (৬.৮.১৯১৪) পত্রিকা প্রতিষ্ঠা তাঁর অন্যতম কৃতিত্ব। তিনি 'সাহিত্য কল্পদ্রুম' পত্রিকার সম্পাদনা ও বেশ কিছু ধর্মগ্রন্থ প্রচার করেন।

উলোর বামনদাস। পুরো নাম বামনদাস মুখোপাধ্যায়। এঁর বাড়ি ছিল নদীয়া জেলার বীরনগর বা উলোতে। তিনি কিছুকাল দক্ষিণেশ্বরে দেবমণ্ডলের বাগান বাড়িতে ছিলেন। তিনি হৃদয়ের সঙ্গে ঠাকুরকে দেখতে যান। ঠাকুরের তখন সাধক অবস্থা। দেখে ফিরবার সময় মন্তব্য করেন যে, বাঘের মত ঈশ্বরী তাঁকে ধরেছেন। ছাড়ায় সাধ্য কার। বামনদাসকে কথামৃতকার উলোর বামনদাস নামে উল্লেখ করেছেন। কাশীপুরে বামনদাস প্রতিষ্ঠিত কালীমন্দির আছে।

উস্তাগর। ইনি একজন মুসলমান সাধক। দক্ষিণেশ্বরের কালী বাড়ির ফটকের উত্তর দিকে বাঁশ ঝাড়ের মধ্যে তাঁর কুটির ছিল। রামকৃষ্ণদেবের ঘরের উত্তর দিকের বারান্দায় এসে তিনি বসতেন। দুজনের মধ্যে মুসলমান ধর্ম নিয়ে আলোচনা হ'ত। রামকৃষ্ণদেব তাঁকে প্রতিদিনই কিছু আহার্য দিতেন। তিনি তা মাথায় করে নিয়ে যেতেন। তিনি কখনও কখনও ঠাকুরকে বলতেন, 'তুমিই আমার আল্লা'।

ওয়াজেদ আলি খাঁ। দ্রষ্টব্য গোবিন্দ রায়।

কাত্যায়নী দেবী। রামকৃষ্ণদেবের বড় দিদি। চব্বিশ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হলে ক্ষুদিরাম (পিতা) গয়ায় যান তার পিণ্ড দিতে। সেখানেই তিনি গঙ্গাধরকে পুত্র রূপে পাবেন এই স্বপ্নাদেশ পান।

কাপ্তেন। কথামৃতে এই নামে উল্লেখিত হলেও প্রকৃত নাম বিশ্বনাথ উপাধ্যায়। তিনি নৈষ্ঠিক কণৌজী ব্রাহ্মণ। নেপাল সরকারের কর্মচারী ছিলেন। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই গোপাল ভক্ত পান। তিনি বেলুড়ে নেপাল সরকারের কাঠের গোলার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ছিলেন। স্বপ্নে রামকৃষ্ণকে দেখে দক্ষিণেশ্বরে আসেন। দেখা না হওয়ায় দেবী দর্শন করে ফিরবার পথে গঙ্গাতীরে ঠাকুরকে দেখেই তার স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষ বলে চিহ্নিত করেন। সেই রাত্রি তিনি ঠাকুর সান্নিধ্যে কাটান। ১৮৮২ সালের ২ এপ্রিল রামকৃষ্ণদেব তাঁর শ্যামপুকুর-এর বাড়িতে আসেন। একবার রাজ সকারের বিরাগভাজন হন বিশ্বনাথ। ঠাকুরের কৃপায় রাজা শুধু রোষই পরিহার করেন না, তাঁকে ক্যাপ্টেন পদবি দিয়ে কলকাতাস্থ নেপাল সরকারের সমস্ত কাজকর্মের প্রধান পদে উন্নীত করেন। তার থেকেই ঠাকুর সকৌতুকে তাকে কাপ্তেন বলে ডাকতেন। কথামৃতে তিনি কাপ্তেন নামেই বিবৃত হয়েছেন। এই ভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষটি ঠাকুরকে অহোরাত্র সমাধিমগ্ন দেখেছেন বহুবার।

কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। তিনি ছিলেন বিদ্যাসাগর কলেজে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক। মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল। মাস্টার মশাই মহেন্দ্রনাথ তাঁকে শুঁড়ির দোকানে যাবে ত আমার সঙ্গে এস, বলে বলরাম মন্দিরে ঠাকুরের কাছে নিয়ে আসেন। কথামৃতে এ কাহিনী বর্ণিত আছে (৫।১।১)।

কালীপদ ঘোষ (১৮৪৯—২৮.৬.১৯০৫)। পি. গুরুপ্রসাদ ঘোষ। জ. কলিকাতা, শ্যামপুকুর। গিরিশচন্দ্র ঘোষের অন্তরঙ্গ বন্ধু—দুজনকে একত্রে জগাই মাধাই বলা হত। কালীবাবুর ভক্তিমতী স্ত্রী স্বামীর চরিত্র সংশোধনের আবেদন করেন ঠাকুরের কাছে। গিরিশচন্দ্র ১৮৮৪-র কোন সময়ে তাঁকে রামকৃষ্ণদেবের কাছে নিয়ে আসেন। দ্বিতীয় সাক্ষাতে ঠাকুর তাঁকে নিয়ে ভাড়া করা নৌকায় কলকাতার দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। ধর্মালোচনা করতে করতে কালীর জিহ্বায় আঙ্গুল দিয়ে কি লিখে দেন। কালীর মধ্যে পরিবর্তন শুরু হয়। ঠাকুরের শেষ দিনগুলি শ্যামপুকুরের বাড়িতে হওয়ায় ঘোষ পরিবার দিবারাত্র তাঁর সেবা করত। ঠাকুরের

বিদায়ে কালীর ব্যাকুলতা বাড়ে। শেষ জীবন কাটে তাঁর বোম্বেতে। সন্ন্যাসী ভ্রাতারা বোম্বাইতে গেলে তাঁর বাড়িতে উঠতেন। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

কাশীর মেয়ে। ১৮৭৬ সালে দক্ষিণেশ্বরে একবার রামকৃষ্ণদেব দীর্ঘস্থায়ী আমাশয় রোগে ভুগছিলেন। এই সময় কোথা থেকে তিনি এসে হাজির হন এবং ঠাকুরকে অযাচিত সেবায় সুস্থ করে তোলেন। সবাই তাঁকে কাশীর মেয়ে বলত। ঠাকুর সেরে উঠবার পর তিনি চলে যান। অবশ্য তার আগে তিনি দুটি কাজ করেন। শম্ভুবাবুর দেওয়া চালাঘর থেকে শ্রীমার বাস উঠিয়ে তাঁকে নিয়ে আসেন দক্ষিণেশ্বরে নহবৎখানায়। এমনি করে শ্রীমা স্বামীসেবায় ব্রতী হন। তিনিই নিজে উপস্থিত থেকে শ্রীমাকে ঠাকুরের ঘরে নিয়ে গিয়ে ঘোমটা খুলে সংকোচ দূর করে দেন। ঠাকুরের দেহত্যাগের পর কাশী গিয়ে শ্রীমা তাঁকে বহু খুঁজে দেখেন। কিন্তু তাঁর সন্ধান পান নি। তাঁর পূর্ব-পর জীবন সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। শ্রীমা তাঁকে প্রাচীন মেয়ে বলে উল্লেখ করতেন।

কিশোরীমোহন গুপ্ত। কথামৃতকার মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন তিনি। দাদার সঙ্গেই তিনি ঠাকুরের কাছে আসেন এবং ভক্তে পরিণত হন। কথামৃতে বহুবার তার উল্লেখ আছে। ঠাকুর তাঁকে দাদার থেকেও সরল বলে উল্লেখ করতেন।

কিশোরীমোহন রায়। রামকৃষ্ণদেবের গৃহীভক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সান্যালের বন্ধু ছিলেন কিশোরীমোহন। কৃষ্ণনগরে বাড়ি ছিল। বনহুগলীতে সরকারী অফিসে চাকরী করতেন। কাশীপুরে ঠাকুর কল্পতরু হয়ে কিশোরীমোহনকে কৃপা করেন। তিনি কিছুদিন উদ্বোধন পত্রিকার কাজ চালান।

কৃষ্ণকিশোর ভট্টাচার্য। ২৪ পরগণার আড়িয়াদেহে বাস করতেন। রামভক্ত এবং সাধক। রামকৃষ্ণদেব তাঁর বাড়িতে যেতেন অধ্যাত্ম রামায়ণের পাঠ শুনতে। ঠাকুর বলতেন, তিনি রামনামে সিদ্ধ মানুষ। তিনি বিশ্বাস করতেন রাম বললেই সব শুদ্ধ। রাম বলে নিম্নবর্ণের মানুষ জল দিলেও তা তিনি গ্রহণ করতেন। তিনি বলতেন, তিনি 'খ' অর্থাৎ আকাশের মত নির্লিপ্ত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বৃদ্ধ বয়সে তাঁর দুই পুত্রের মৃত্যুতে কাতর হৃদয়েই কৃষ্ণকিশোরকে তিরোহিত হতে হয়।

কৃষ্ণভাবিনী। বলরাম বসুর স্ত্রী। পি-তারাপ্রসাদ ঘোষ। মা. মাতঙ্গিনী। স্বামীর মতই রামকৃষ্ণ-গতপ্রাণা। নিজেও অত্যন্ত অভিমানশূন্য দানশীলা ছিলেন। শোনা যায় প্রতিবেশীর কন্যাদায়ে তিনি হাতের বালাগুলো দিয়েছিলেন। একদিন দুধ জ্বাল দিতে দিতে তাঁর ঠাকুরের জন্য মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তিনি যোগীন মাকে সঙ্গে করে তখুনি যান দক্ষিণেশ্বরে। আশ্চর্যের বিষয় সেদিন বিকাল থেকে রামকৃষ্ণদেব খাঁটি দুধ খাবার ইচ্ছে প্রকাশ করছিলেন। কৃষ্ণভাবিনী ঠাকুরকে দুধ খাইয়ে তৃপ্ত হয়ে বাড়ি ফেরেন। স্বামীর মৃত্যুর পরেও তিনি প্রায় ত্রিশ বৎসর জীবিত ছিলেন।

(কৃষ্ণ) ভাবিনী। বাগবাজারের নেবুবাগান অঞ্চলের বাসিন্দা এই মহিলাকে সকলে ভাবিনী বলে উল্লেখ করতেন। তার রান্না খেতে খুবই ভালবাসতেন

ঠাকুর। বাগবাজার বলরাম মন্দিরে এলেই ঠাকুরের রান্নার জন্য তার ডাক পড়ত। তিনি তাকে বলতেন শুক্তোয় সিদ্ধ বৈকুন্ঠের রাঁধুনী। তার সমগ্র জীবনকথা সংগ্রহ করা যায় নি।

কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়। রামকৃষ্ণদেবের গৃহীভক্ত। তিনি ছিলেন হালিশহর নিবাসী গোলকচন্দ্র শিরোমণি মশাই-এর সম্পর্কিত ভ্রাতা। গোলকচন্দ্রের কথকতার খ্যাতি ছিল। গোলকনাথের সঙ্গেই তিনি দক্ষিণেশ্বরে এসে রামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ পান। এক সময়ে তিনি ব্রাহ্ম সমাজেও যাতায়াত করতেন। তিনি নিত্যগোপাল বসুকে ছোট ঠাকুর ও রামকৃষ্ণদেবকে বড় ঠাকুর বলতেন। ঢাকায় থাকাকালে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সঙ্গে রামকৃষ্ণ বিষয়ে তাঁর আলোচনা চলত। শোনা যায় এলাহাবাদে তিনি একবার আত্মহত্যা করতে গিয়ে অলৌকিকভাবে রক্ষা পান।

কেনারাম ভট্টাচার্য। রামকৃষ্ণদেবকে শাক্ত মতে দীক্ষিত করেন। তিনি কলকাতা বৈঠকখানা অঞ্চলে বাস করতেন। দক্ষিণেশ্বরে তিনি মাঝে মাঝে আসতেন। সম্ভবতঃ ১৮৫৬ সালে দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরে বসেই রামকৃষ্ণদেব তাঁর কাছে শাক্তমন্ত্রে দীক্ষিত হন।

কেশবচন্দ্র সেন (১৯.১১.১৮৩৮—৮.১.১৮৮৪)। পি. প্যারীমোহন। মা. সারদা-সুন্দরী। কলুটোলার সেনবংশে জন্ম। হিন্দু কলেজে বঙ্কিমচন্দ্রের সহপাঠী। বাল্য থেকেই ধর্মবোধ প্রবল ছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ১৮৫৭ সালে তিনি ব্রাহ্ম সমাজে যোগ দেন। অচিরেই তিনি দেবেন্দ্রনাথের প্রিয়পাত্র এবং সমাজনেতা হন। চাকরি ছেড়ে দিয়ে সমাজ সংগঠনে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি নানা সামাজিক আন্দোলন, রাজনৈতিক আদর্শ প্রচার ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ইন্ডিয়ান মিরর নামে সংবাদপত্র, সানডে মিরর নামে পত্রিকা তাঁর কৃতিত্ব। তিনি সুলভ সমাচার নামে এক বাংলা দৈনিক এবং ধর্মতত্ত্ব নামে একটি মাসিক পত্রিকাও প্রকাশ করতে থাকেন। ভারতীয় ধর্ম সত্য প্রচারের জন্য কেশব সেন বিলাতে গিয়ে বিপুল সংবর্ধনা লাভ করেন। ধর্মতত্ত্ব প্রচারকদের মধ্যে তাঁর মত বিশ্বখ্যাত মানুষ তখন ছিল না। তিনিই প্রথম বাঙলায় কোরাণ শরিফ এবং মেসকতে শরিফ অনুবাদ করেন। গীতা, ভাগবত, বেদান্তের ভাষ্য রচনা করেন। শ্রীকৃষ্ণ, চৈতন্য, গুরু নানক, খ্রীষ্ট ও মুসলমান সাধকদের জীবনী সংগ্রহ করেন। তাঁর সঙ্গে রামকৃষ্ণের অতি অন্তরঙ্গতা ছিল।

জোড়াসাঁকোয় আদি ব্রাহ্মসমাজে তিনি প্রথম কেশবচন্দ্রকে দেখেছেন। কেশব-চন্দ্রের ধ্যান দেখেই তিনি বোঝেন যে তিনি সাধন পথে অনেকদূর এগিয়েছেন। এই সময় ১৮৭৫ সালের ১৫ই মার্চ তিনি জয়গোপাল সেনের বাগান বাড়িতে গিয়ে কেশব সেনের সঙ্গে দেখা করেন। এ সময় থেকেই তাঁদের মধ্যে অন্তরঙ্গতা দেখা দেয়। এর কয়েকদিন পরেই ইন্ডিয়ান মিররে রামকৃষ্ণদেবের চিন্তার গভীরতা ও প্রকাশের সরলতা বিষয়ে সংবাদ প্রকাশিত হয়। তাঁর ধর্মতত্ত্ব পত্রিকাতে রাম-কৃষ্ণদেবের এক সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রকাশিত হয়। বর্তমান ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউটে ছিল কেশব সেনের কমলকুঠি। সেখানে দণ্ডায়মান অবস্থায় সমাধিস্থ যে ফটো তোলা হয়, তাই রামকৃষ্ণদেবের প্রথম ফটো। এখান থেকে কেশব সেন রামকৃষ্ণ-

দেবকে এক মূল্যবান রত্ন ভাবতে থাকেন। ঠাকুরের গৃহীভক্তদের তিনি ঠাকুরের দেহের প্রতি যত্ন নিতে বলেন। এই সময়ে ঠাকুর প্রায় সাতমাস কামারপুকুরে ছিলেন। অদর্শনে বিচলিত কেশব সেন তাঁর কাছে লোক পাঠান। এর মধ্যে ঠাকুর ফিরে আসেন দক্ষিণেশ্বরে। বহুজন সহ ১৮৮১র পয়লা জানুয়ারী কেশব সেন আসেন তাঁর কাছে। এর পরও তাঁদের সাক্ষাতের সংখ্যা দশের ওপরে। তিনি 'পরমহংসের উক্তি' নামে এক গ্রন্থ সংকলন করেছিলেন। অত্যধিক পরিশ্রমে ভগ্নস্বাস্থ্য কেশব সেন মা মা বলতে বলতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। কেশব সেনের মৃত্যুতে রামকৃষ্ণদেব নিতান্ত ভেঙ্গে পড়েছিলেন। আর কারো অসুস্থতায় বা মৃত্যুতে তাঁকে এত বিচলিত হতে দেখা যায় নি।

কৈলাস বসু, (ডাক্তার) স্যার (১২৫৭ ?—৬ মাঘ ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ)। কলকাতায় জন্ম। ১৮৭৪ সালে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে ডাক্তারী পাশ করে ক্যাম্বেল মেডিক্যাল হাসপাতালের রেসিডেন্ট মেডিক্যাল অফিসার হন। প্রধানতঃ তাঁর চেষ্টাতে বাঙলার পশুচিকিৎসা কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি ট্রপিক্যাল মেডিসিন স্কুলের জন্য বহু টাকা সংগ্রহ করেন। তিনি বহু হাসপাতাল পিঁজরাপোল, কুষ্ঠ নিবাস ইত্যাদির প্রতিষ্ঠা কর্মে ব্রতী ছিলেন। তিনি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ফেলো ও অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। ভারতীয় ডাক্তারদের মধ্যে তিনিই প্রথম 'স্যার' উপাধিতে ভূষিত হন। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে গান্ধিজীরও অনেক আগে 'কাইজার-ই-হিন্দ্' উপাধিতে ভূষিত করেন।

রামচন্দ্র দত্তের অনুরোধে তিনি রামকৃষ্ণদেবকে দেখতে যান। তিনি নাকি সর্ত করেন যে রামকৃষ্ণদেব যদি ভাললোক হয় তবে তিনি চিকিৎসা করবেন, নইলে কান মলে দিয়ে চলে আসবেন। কাশীপুরে পেঁছে তিনি নীচে পুকুরের চাতালে বসে থাকেন। তখন রামকৃষ্ণের পাঠান লোক এসে বলেন, আপনি কি ঠাকুরের কান মলে দিতে চেয়েছেন ? তাহলে ঠাকুর আপনাকেই ডাকছেন। লজ্জিত কৈলাসচন্দ্র এসে রামকৃষ্ণদেবের পদতলে পতিত হন। সেই থেকে তিনি তাঁকে গুরু বলে মানতেন।

কেয়ার সিং। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির উত্তর পাশে সরকারী বারুদখানায় একদল শিখ বাস করতে। কেয়ার সিং ছিল তাদের সর্দার। সে রামকৃষ্ণদেবকে নানকতুল্য ভাবত। তাঁকে সাধু ভোজনে নিমন্ত্রিত করে আলাদা ভাবে ভোজন করাত। কথামৃতের দ্বিতীয় ভাগের সপ্তম খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে কেয়ার সিং-এর কথা আছে।

খোকা। মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত দ্রষ্টব্য।

ক্ষীরোদচন্দ্র মিত্র। মাস্টার মশাই-এর ছাত্র। মাত্র বারো বৎসর বয়সে ১৮৮৫ সালের ৬ এপ্রিল বলরাম বসুর বলরাম মন্দিরে ঠাকুরের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ। ঐ দিন প্রণামের পর ক্ষীরোদ পদসেবা করে। প্রতিবেশী সুবোধচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে (যিনি পরে স্বামী সুবোধানন্দ রূপে পরিচিত হন) তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সঙ্গে যাতায়াত করতেন। ঠাকুর তার জিহ্বাতে কিছু লিখে দেন।

ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় (১৭৭৫—১৮৪২)। পি. মাণিকরাম। জ. দেরেপুর গ্রাম। নিষ্ঠাবান, দৃঢ়চেতা এবং অশূদ্র-প্রতিগ্রাহী বলে ক্ষুদিরামের খ্যাতি ছিল। প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পর ২৫ বছর বয়সে তিনি চন্দ্রমণিকে বিবাহ করেন। তাঁর চল্লিশ বছর বয়সে জমিদারের হয়ে মিথ্যা সাক্ষী দিতে অসম্মত হওয়ায় তাঁকে এক পুত্র রামকুমার ও কন্যা কাত্যায়নীকে নিয়ে, দেরেপুরের ভিটা এবং প্রায় দেড়শ বিঘা জমি ছেড়ে চলে আসতে হয়। কামারপুকুরের জমিদার সুখলাল গোস্বামী তাঁকে লক্ষ্মীজলা নামক স্থানে সামান্য ধানী জমি এবং নিজের বাড়ির একাংশ ছেড়ে দিয়ে আশ্রয় দেন। এখানে আসবার পর তিনি স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে রঘুবীর শিলাচক্র পান। ছেলেমেয়েদের বিয়ে দিয়ে তিনি পদব্রজে রামেশ্বর তীর্থে গিয়ে সেখান থেকে বাণলিঙ্গ শিব আনয়ন করেন। এরপর তাঁর দ্বিতীয় পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। নাম রাখাহয় রামেশ্বর। ইতোমধ্যে কাত্যায়নী মারা যান। তার পিণ্ডদান করতে গয়ায় গিয়ে স্বপ্না দেশ পান যে স্বয়ং গদাধর বিষ্ণু পুত্ররূপে তাঁর গৃহে আর্বির্ভূত হচ্ছেন। এর বছরখানেক পর ১৮৩৭ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারী রামকৃষ্ণদেবের জন্ম হয়। নাম হয় গদাধার। দু বছর পর সর্বকনিষ্ঠা সন্তান সর্বমঙ্গলার জন্মহয়। ১৮৪২ সালের শেষদিকে তিনি ভাগ্নে রামচাঁদের আহ্বানে সেলিমপুরে ভগ্নির বাড়ি যান দূর্গোৎসবে যোগ দিতে। সেখানে গ্রহণী রোগে আক্রান্ত হয়ে বিজয়ার দিনের বিকেলে তিনি দেহত্যাগ করেন।

গঙ্গাপ্রসাদ সেন। (২.৫.১২৩১—১৩০২ বঙ্গাব্দ)। পি. নীলাম্বর সেন। জ. বিক্রমপুরের কোমরপুর গ্রাম। আঠারো বছর বয়সে কুমারটুলিতে কবিরাজী শুরু করেন। মথুরানাথই গঙ্গাপ্রসাদকে রামকৃষ্ণদেবের চিকিৎসার জন্য নিয়ে যান। তাঁর শেষ রোগেরও চিকিৎসা তিনি করেন। সারবে কিনা জিজ্ঞাসা করায় তিনি প্রথম থেকেই নেতিবাচক উত্তর দেন।

গঙ্গামাতা। বৃন্দাবনের এক সিদ্ধা সাধিকা। ইনি সখীভাবে সাধনা করতেন। তাঁর প্রায় আশি বছর বয়সে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তিনি রামকৃষ্ণের মধ্যে রাধিকাভাব দেখে তাঁকে বৃন্দাবনে থেকে যেতে অনুরোধ করেন। রামকৃষ্ণ দেব প্রায় সম্মত হন। তখন মথুরানাথ মাতা চন্দ্রমণির কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তখন রামকৃষ্ণ প্রত্যাবর্তন করেন। ঠাকুর বলেন বৃন্দাবনে গঙ্গামাতা অতি উচ্চ-ভাবের সাধিকা।

গণেশ ঘোষাল। কামারপুকুরের লোক। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের বাল্যসখা।

গয়াবিষ্ণু। পি-ধর্মদাস লাহা। রামকৃষ্ণের বাল্যসখা ও সহপাঠী। লাহাবাবু উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্থাপন করে দেন। এ সম্বন্ধ আজীবন অটুট ছিল।

গিরিজা। চন্দ্র ও গিরিজা দ্রষ্টব্য :

গিরিশচন্দ্র ঘোষ। (২৮. ২.১৮৪৪—৮.২.১৯১২)। পি. নীলকমল মা. রাইমণি। বাগবাজার, কলকাতা। বিখ্যাত নট, নাট্যকার ও কবি। ত্রিশ বৎসর বয়সে প্রথমা-পত্নীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয় বিবাহ করেন, এই সময় কলেরায় মুমূর্ষু অবস্থায় এক দিব্যমূর্তি দেখেন এবং আরোগ্য লাভ করেন। এই সময় থেকে তার মতি পরি-

বর্তিত হয় ও আধ্যাত্মিক চিন্তা দেখা যায়। তাঁর পৌরাণিক নাটকই প্রথম নারী-দেরও রঙ্গমঞ্চে আকৃষ্ট করে আনে। এমনকি স্বয়ং রামকৃষ্ণদেব আসেন তাঁর নাটক দেখতে। ইতঃপূর্বে বাগবাজারে বলরাম বসু বা রামচন্দ্র দত্তের বাড়িতে ঠাকুরকে দেখলেও ওখান থেকেই তাঁর আকর্ষণের সূচনা। তিনি মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে যাওয়া শুরু করেন। রামকৃষ্ণের অবতারত্বে দৃঢ় বিশ্বাস তাঁর। রামকৃষ্ণ তাঁকে ভক্ত ভৈরব বলতেন। গিরিশচন্দ্রের মধ্যে আত্মগ্লানি শুরু হয়। তিনি কাদা ঘাটা থেকে অর্থাৎ থিয়েটার করা থেকে মুক্তি পেতে যান। কিন্তু ওতে লোকশিক্ষা হয় বলে ঠাকুর তাঁকে ঐ কাজেই যুক্ত থাকতে বলেন। গিরিশচন্দ্র ঠাকুরকে তাঁর হয়ে বকলমা দেন। ১৮৮৫ সালের শ্যামাপূজার রাত্রে গিরিশচন্দ্রই ঠাকুরকে জগন্মাতা জ্ঞানে প্রথম মাল্যবিভূষিত করে গান শুরু করেন। তিনি কাশীপুরে গিরিশ-চন্দ্রকে গেরুয়া দান করেন। গিরিশচন্দ্রের বিশ্বাস ছিল যে তাঁর ক্যান্সার নিয়েই ঠাকুরের ঐ কণ্ঠ। বকলমা দেওয়ায় ঠাকুর ঐ বেদনাও গ্রহণ করেছেন। একসময় মদমত্ত গিরিশচন্দ্র ঠাকুরকে পরজন্মে তাঁর পুত্র হয়ে জন্মাতে আবেদন করেন। দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে তাঁর এক হাবাগোবা পুত্র জন্মায়। গিরিশচন্দ্রের বিশ্বাস ছিল সেই পুত্রই রামকৃষ্ণ। পুত্রটি শতায়ু ছিল। তিনি ঠাকুরের মৃত্যুর পরেও তাঁকে দেখতে পেতেন। একবার জয়রামবাটি গিয়ে শ্রীমাকে দেখে তিনি অভিভূত হন। তাঁর সেই মুমূর্ষু অবস্থায় যাকে দেখেছিলেন, তিনি এই দেবীই বটে। শ্রীমা বলেন, তিনিই তাঁর প্রকৃত মাতা। পরবর্তী জীবনে গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকগুলি পরিপূর্ণ রামকৃষ্ণ প্রভাবিত।

গিরীন্দ্রনাথ মিত্র। গিরিন মিত্র নামে উল্লেখিত। ইনি ঠাকুরভক্ত সুরেন্দ্রনাথের ভাই। অফিসের চাকুরিয়া। খুবই আসতেন ঠাকুরের কাছে।

গোপাল (চন্দ্র) সেন। গোপাল এবং তার বন্ধু গোবিন্দ পাল বাস করত বরাহ-নগরে। রামকৃষ্ণদেবের মতে এরা জীবন্মুক্ত যুবক। সংসার এদের কাছে বিষবৎ বলে বোধ হত। গোপালের ভাব-সমাধি হত। গোবিন্দ তাকে ঠাকুরের কাছে নিয়ে আসে। এদের দুজনকেই ঠাকুর ভালবাসতেন। বলতেন গোবিন্দ প্রহ্লাদ অংশে আর গোপাল ধ্রুব অংশে জন্মেছে। অল্প বয়সে গোবিন্দ মারা যায়। গোপাল দেওঘরে আত্মহত্যা করে। ঠাকুর বলতেন, ঐ দশায় আত্মহত্যায় কোন পাপ হয় না। তিনিও বহুবার আত্মহত্যা করতে যান।

গোপালের মা। অঘোরমণি দেবী দ্রষ্টব্য।

গোপীদাস। খোলবাদক। কথামৃতের বর্ণনা মতে (৫।৯ পরিশিষ্ট) ইনি দক্ষিণে-শ্বরের পঞ্চবটীতে সংকীর্তনে খোল বাজাতেন। ১৮৮১ সালের ১ জানুয়ারী ঠাকুর নিজে গান ধরেন এবং সমাধিস্থ হন।

গোবিন্দ দেওয়ান। পরবর্তীকালে যিনি স্বামী বিজ্ঞানানন্দ নামে পরিচিত হন, সেই হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় বেলঘরিয়ায় গোবিন্দ দেওয়ানের বাড়িতে প্রথম রাম-কৃষ্ণদেবকে দেখেন। দেওয়ানজীর বাড়িতে তিনি একবার যান।

গোবিন্দ পাল। গোপালচন্দ্র সেন দ্রষ্টব্য।

গোবিন্দ রায়। ইনি সিদ্ধ সুফী সাধক। রামকৃষ্ণদেবকে ইনিই ঐশ্লামিক মতে সাধনা

করান। দমদমের কাছে কোন কৈবর্ত্ত পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। তিনি পরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। আরবী পারসী ভাষায় তাঁর দক্ষতা ছিল। তিনি কিছুদিন দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীতে বাস করেন। তখনই ঠাকুরকে ঐশ্লামিক মতে সাধনায় যুক্ত করান। রামকৃষ্ণদেব তিনদিনে সিদ্ধিলাভ করেন। তাঁর ঐশ্লামিক নাম ওয়াজেদ আলি খাঁ।

গোলাপ মা। (১৮৬৫ ? —১৯.২.১৯২৪)। কথামৃতে তাঁকে শোকাতুরা ব্রাহ্মণী রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। পাথুরেঘাটার রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের শাশুড়ী তিনি। তিনি শুধু অকালে স্বামী হারালেন, তাঁর পুত্রকন্যারাও অকালে মারা যায়। শোকাতুর অন্নপূর্ণা দেবীকে যোগীন মা নিয়ে আসেন ঠাকুরের কাছে। তিনি ঠাকুরের কথায় অপরিসীম শান্তি পান। ঠাকুর ১৮৮৬ সালের ২৮ জুলাই তাঁর বাড়িতে গিয়ে হাজির হন। অন্নপূর্ণা আনন্দে আত্মহারা হন। পরে তিনি দক্ষিণেশ্বরে এসে শ্রীমার সঙ্গে বাস করতে থাকেন। রামকৃষ্ণদেব তাকে গোলাপ-দিদি বলতেন। তার থেকে তাঁর পরিচয় হয় গোলাপ-মা। তিনি দিবারাত্র রামকৃষ্ণকে স্বপ্ন দেখতেন। ঠাকুরের তিরোধানের পর তিনি শ্রীমাকে দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে আসেন এবং তাঁর দিবারাত্রের সঙ্গী হ'ল। শ্রীমাও গোপালমা ছাড়া অসহায় বোধ করতেন। তাঁর তীক্ষ্ন স্পষ্টবাদিতা ছিল ঈশ্বরের বিধানের মত। মায়ের বাড়িতেই তিনি দেহরক্ষা করেন।

গোষ্ঠ। কথামৃত (২।৪।২) অনুসারে বিখ্যাত খোলবাদক। রামকৃষ্ণদেব এর খোল বাজনা শুনে রেমোঞ্চিত হতেন।

দ্র· নরোত্তম।

গৌরী পন্ডিত। বীরাচারী তান্ত্রিক সাধক। মূলনাম গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য। বাড়ি ছিল বাঁকুড়ার ইন্দাস গ্রামে। তিনি বাঁ হাতের ওপর একমণ কাঠ প্রজ্জ্বলিত করে ডান হাতে তাতে আহুতি দিতেন। তার কিছু শক্তি ছিল। সেই শক্তিবলে তিনি অপরের শক্তি হরণ করে তাকে পরাজিত করতেন। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণেশ্বরে এলে শ্রীঠাকুর নিজ শক্তি প্রভাবে গৌরী পন্ডিতকে নিষ্ক্রিয় করে দেন। গৌরী-পন্ডিত তাঁকে অবতার বলে ঘোষণা করেন। তিনি প্রায় দুবছর সেখানে ছিলেন। ঠাকুরের সাহচর্যে তাঁর তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হয়। তিনি চিরতরে গৃহত্যাগ করেন। ১৮৮২ সলের ১ জানুয়ারী ব্রহ্মভক্ত জ্ঞান চৌধুরীর বাড়িতে তাঁর সঙ্গে গেরুয়াধারী গৌরী পন্ডিতের আর একবার দেখা হয়।

গৌরীমা। (১৯৫৭ ?—১৯৩৮)। বিদুষী শক্তি সাধিকা। গঙ্গাসাগরে স্নান করতে গিয়ে একদল সন্ন্যাসীর সঙ্গে পালিয়ে যান। প্রায় সারাভারতের সমস্ত তীর্থে ঘোরেন। বৃন্দাবনে বলরাম বসুর কাছে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের কথা শুনে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যান। বিমুগ্ধ গৌরীদাসী সেখানে থেকে রামকৃষ্ণদেব ও সারদামার সেবা করতে থাকেন। তিনি নিজে চৈতন্যভক্ত ছিলেন। তিনি ভাবতেন নবদ্বীপ তাঁর শ্বশুরবাড়ি—নিত্যানন্দ ভাসুর। এখন রামকৃষ্ণে শ্রীচৈতন্যে অভেদ ভাবতে থাকেন। ঠাকুরের দেহত্যাগের পর তিনি বৃন্দাবনে যান এবং কঠোর তপস্যায় ব্রতী হন। রামকৃষ্ণদেব শ্রীমাকে বৈধব্যচিহ্ন ধারণে নিষেধ করেন। এর শাস্ত্রীয়

ব্যাখ্যা নিয়ে যখন তোলপাড় চলছে তখন গৌরীমা জানান, ঠাকুর নিত্য বর্তমান। তাঁর অদর্শন বাহ্যিক ব্যাপার মাত্র। তাই লক্ষ্মীরূপা মায়ের বৈধব্যচিহ্ন ধারণ হবে ঠাকুরের নিত্যতাকে অস্বীকার করা। এতে জগতের অকল্যাণ। তাঁর এ ব্যাখ্যা স্বীকৃত হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায়, রামকৃষ্ণদেব গৌরীমাকে বলতেন, আমি জল ঢালছি, তুই কাদা চটকা। গৌরীমার পরবর্তী জীবন ও কার্যাবলী যেন ঠাকুরের নির্দেশিত পথে কাদা চটকান। মা ও মেয়েদের ব্যাপক শিক্ষাদান করে নারীমুক্তি ছিল গৌরীমার লক্ষ্য। এই উন্নতমনা নারীদের ভেতর থেকে আত্ম-নিবেদনকারী একদল সন্ন্যাসিনী গঠন ছিল তাঁর লক্ষ্য। তাঁর প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীসার-দেশ্বরী আশ্রম ও কলকাতা গৌরীমাতা সরণীতে তার শাখা আজও তাঁর কীর্তির সাক্ষ্য দিচ্ছে। তিরোধানের আগে থেকেই তিনি বলতে থাকেন, ঠাকুর সুতো টানছে। তাঁর আজীবন পূজিত নারায়ণ শিলা যা তিনি পূজার সময় ছাড়া গলায় ঝুলিয়ে রাখতেন, তা অন্যের হাতে গচ্ছিত করে লোকান্তরে যাত্রা করেন।

চন্দ্র ও গিরিজা। রামকৃষ্ণদেবের তান্ত্রিক সাধনার গুরু ভৈরবী ব্রাহ্মণীর শিষ্য। রামকৃষ্ণদেবের আগে ভৈরবী এদের দীক্ষা দেন। তিনি দক্ষিণেশ্বরে আছেন সংবাদ পেয়ে এঁরা দীক্ষণেশ্বরে এসেছিলেন। চন্দ্রের মধ্যে প্রচুর বিষ্ণুশক্তি আছে একথা রামকৃষ্ণদেব বলতেন। ঠাকুরের দেওয়া গৈরিকবাস পরে চন্দ্র বিহ্বল হয়ে থাকতেন। বহুপরে চন্দ্র ১৮৯৯ সালে একবার বেলুড়ে আসেন।

চন্দ্র চাটুজ্জে। ইনি কর্তাভজা সম্প্রদায়ের লোক। কথামৃতের বর্ণনানুসারে (৪।১৫।৩) তিনি বলরাম মন্দিরে ঠাকুরের সন্নিকটে আসেন।

চন্দ্রমণি। (১৭৯১-২৭.১.১৮৭৬) রামকৃষ্ণদেবের জননী। সারাটি মায়াপুর। ১৭৯৯ সালে ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তার বিবাহ হয়। এটি ক্ষুদিরামের দ্বিতীয় বিবাহ। অত্যধিক সরল ছিলেন। এজন্য সকলে তাকে হাউড়ে বলত। তাঁর মোট তিন পুত্র এবং এক কন্যা। পুত্রদের মধ্যে রামকৃষ্ণদেব সর্ব-কনিষ্ঠ। ঠাকুরকে গর্ভে ধারণ করে তিনি নানারকম দিব্যদর্শন করতেন। এজন্য তাঁর ভয় এবং উৎকন্ঠার সীমা ছিল না। গর্ভ অনুভবের আগে তিনি দেখেন যুগীদের শিব মন্দির থেকে একটা জ্যোতি তাঁর দেহে প্রবেশ করছে। তিনি মূর্চ্ছিত হন। তিনি জীবনের শেষ বার বছর দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন। একবার মথুরবাবু তাঁকে কিছু দান করতে চান। অনেক পেড়াপেড়িতে তিনি এক আনার দোক্তাপাতা কিনে দিতে বলেন। ঠাকুর গয়ায় গিয়ে মায়ের উদ্দেশ্যে তর্পণ সমাপ্ত করতে পারেন নি। নানাভাবে তা অসম্পন্ন থাকে। দৈব অভিপ্রায় ভেবে ঠাকুর 'গলিত কর্ম' জনিত হস্ত প্রক্ষালণ করতে যান। কিন্তু সে জলও তিনি হাতে তুলতে পারেন নি। অবশেষে শ্রীমা ১৮৯০ সালের মার্চের কোন সময়ে তাঁর তর্পণ সারেন।

চিনু বা চিনে শাঁখারী। মূল নাম শ্রীনিবাস শাঁখারী। কামারপুকুরে তার একটি ছোট মুদি দোকান ছিল। সঙ্গে সে জাত ব্যবসাও করত। বয়সে অনেক বড়। সরল ধর্মভীরু বৈষ্ণব। গদাধরের শৈশবেই চিনু তাঁর স্বরূপ বুঝেছিল। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে স্বয়ং চৈতন্যদেব গদাধররূপে আবির্ভূত হয়েছেন। তাই চিনু বয়সে ছোট ঐ লোককে ইষ্ট দেবতারূপে পূজা করত। বলা যায় চিনু রাম-

কৃষ্ণের বাল্য পরিকর। অতি দীর্ঘজীবী এই মানুষটি রামকৃষ্ণদেবের বিবাহাদিও দেখেছিল। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ঠাকুর আমাশায় রোগে জীর্ণ হয়ে যখন কামারপুকুরে যান, তখনও চিনু বেঁচে। ঠাকুরের সঙ্গলাভে সে কৃতার্থ হয়। রামকৃষ্ণদেব বলতেন, 'চিম্ময়ের বলরামভাব।' 'কখনও চিনে শাঁখারী'ও বলতেন।

চুনীলাল বসু। (১৮৪৯-৩০.৫.১৯০৬)। জ. মৃ—কলকাতা ৫৮বি, রামকান্ত বসু স্ট্রীটের পৈত্রিক ভবনে। তিনি হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন। কলকাতা কর্পোরেশানে চাকরী করতেন। সাধু দেখবার আকাঙ্ক্ষায় দক্ষিণেশ্বরে এসে রামকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হন। তাঁর নির্দেশমত যোগব্যায়াম করে তাঁর হাঁপানি সেরে যায়। তিনি রামকৃষ্ণদেবকে অবতার বলে বিশ্বাস করতেন। বিবেকানন্দ তাঁকে ডাকতেন নারায়ণ বলে। কথামৃতের ৪।৩।২-এ তাঁর উল্লেখ আছে।

জগদম্বা দেবী। রানী রাসমণির কনিষ্ঠা কন্যা। তিনি ছিলেন মথুরামোহন বিশ্বাসের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। তিনি রামকৃষ্ণদেবের সেবায় ছিলেন স্বামীর সহযোগিনী। ব্যারাকপুরের দক্ষিণে গঙ্গাতীরে চানকে তিনি এক মন্দির নির্মাণ করে সেখানে ৺অন্নপূর্ণার এক বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন, রামকৃষ্ণদেব একবার সেখানে গিয়েছিলেন। একবার তিনি অসুস্থ হলে মথুরামোহনের ক্রন্দনে ব্যথিত রামকৃষ্ণদেব তার রোগ নিজে গ্রহণ করে জগদম্বাকে সুস্থ করে তোলেন। ১।১।১৮৮১-এ তার মৃত্যু হয়।

জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। (১৮৬১-১৯৩২) জ. খুলনাজেলার বাগেরহাট মহকুমায়। তিনি বরিশালের ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক ছিলেন। উচ্চ অধ্যাত্মজ্ঞানের অধিকারী, আকুমার এই মানুষটিকে অশ্বিনীকুমার দত্তই সঙ্গে করে দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে আসেন। ঠাকুর তাকে বলেন 'অরুণোদয়ের আগে তোলা মাখন'। কথামৃতের প্রথম ভাগের পরিশিষ্টের ২য় পরিচ্ছেদে তার কথা আছে।

জটাধারী। ইনি একজন রামাইত সম্প্রদায়ের সাধু। ১৮৬৩ সালে তিনি দক্ষিণেশ্বরে আসেন। রামকৃষ্ণদেব এঁর কাছে গোপাল মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি বাৎসল্যভাবের সাধনা দ্বারা শ্রীরামের গোপাল মূর্তি দর্শন করেন এবং সর্বজীবে তার প্রকাশ অনুভব করেন। এই সাধুর কাছে 'রামলালা' নামে এক ধাতু গঠিত রামচন্দ্রের বালবিগ্রহ ছিল। রামকৃষ্ণের কাছে মূর্তিটি সজীব হয়ে উঠেছিল। তিান মুহূর্ত মাত্র তাঁকে ছেড়ে থাকতে পারতেন না। জাটাধারী নিজেও অনুভব করেন যে রামলালা নিজেও রামকৃষ্ণের কাছে থাকতে চান। এই সন্ন্যাসী তাঁর ইষ্টবিগ্রহ তখন রামকৃষ্ণদেবকে দিয়ে চলে যান।

জয়গোপাল সেন। প্রবীণ ব্রাহ্ম কিন্তু রামকৃষ্ণদেবের ভক্ত। বেলঘরিয়ায় ৮নং বি. টি. রোডে তার যে বাগানবাড়ি ছিল, সেখানে রামকৃষ্ণদেব কেশব সেনের সঙ্গে দেখা করতে যান। জয়গোপাল সেনের বাড়ি ছিল কলকাতার মাথাঘসা গলিতে। সে বাড়িতেও ঠাকুর গিয়েছিলেন। জয়গোপাল নিজেও দক্ষিণেশ্বরে আসতেন।

জয় মুখুজ্জ্যে। ইনি একদিন অন্যমনস্ক অবস্থায় গঙ্গাতীরে বসে জপ করছিলেন।

রামকৃষ্ণদেব দিব্যোম্মাদ অবস্থায় সেই পথে যেতে যেতে তাঁকে দেখে চড় মারেন।

জোসেফ কুক্। ১৮৮২ সালের ২৩ফেব্রুয়ারী জোসেফ কুক ও একজন আমেরিকান পাদ্রী মিসেস্ পিগটকে স্টিমারে করে কেশব সেন দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে আসেন এবং রামকৃষ্ণদেবকে স্টিমারে তুলে নেন। স্টিমারে রামকৃষ্ণদেবের সমাধি দেখে তারা বিস্মিত হন। কথামৃতে একথার উল্লেখ আছে ১।১।২, ১।১।৩, ৫।১।৩ ও ৪।২৪।৩-এ।

জ্ঞান চৌধুরী। ইনি একজন উচ্চশিক্ষিত সরকারী কর্মচারী ছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে মাঝে মাঝে আসতেন। তাঁর বাড়িতে সিমুলিয়া ব্রাহ্ম সমাজের উৎসবে ১৮৮২ সালের জানুয়ারীতে রামকৃষ্ণদেব নিমন্ত্রিত হন এবং উপস্থিত হন।

জ্ঞানানন্দ স্বামী (দক্ষ মহারাজ)। তিনি ব্রাহ্মসমাজের সভ্য ছিলেন। রামকৃষ্ণ-দেবের কাছে বারবার আসতেন। খুব সরল মানুষ। বিবেকানন্দ পরে তাকে বরাহনগর মঠে সন্ন্যাসে দীক্ষা দেন। তিনি বৃন্দাবনের মঠে থাকতেন। তার মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছিল। তিনি বরাহনগরে এসে সুস্থ হতে পারেন ভেবে এখানে ফিরিয়া আনা হয়। কিন্তু মঠ থেকে তিনি হারিয়ে যান। কলকাতার ফুটপাতে তাঁর মৃতদেহ পাওয়া যায়।

ঝুনো সরষে। আশুতোষ রায় দ্রষ্টব্য।

ডাকাত বাবা। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে শ্রীমা কামারপুকুর থেকে দক্ষিণেশ্বর আসবার পথে আরামবাগ এবং তারকেশ্বরের মধ্যে তেলোভেলো ও কৈকালার মাঠ পার হবার সময় শ্রান্ত হয়ে সঙ্গীদলত্যাক্ত হন। এক ভীষণদর্শন পুরুষ তার স্ত্রীসহ এসে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। তিনি তাদের বাবা মা ডেকে এমন প্রীতিনির্ভর সরল বিশ্বাসী আচরণ করেন যে সত্যি সত্যিই ঐ ডাকাত দম্পতি বিগলিত হয় এবং তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ ও যথাস্থানে পৌঁছে দেবার আয়োজন করে। বিদায়ক্ষণ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। ডাকাতদম্পতি দাক্ষিণাত্যে ঠাকুরকে দেখতে যেতে প্রতিশ্রুত হয়। রামকৃষ্ণদেব তাদের প্রতি কন্যা-জামাতার মতই আচরণ করতেন।

তারকনাথ ঘোষাল (১৬.১১.১৮৫৩-২০.২.১৯৩৪)। পি. শক্তিসাধক রামকানাই। মা. বামাসুন্দরী। মা তারকেশ্বরের স্বপ্নাদেশে পুত্র পান বলে এই নাম। পুত্রের ন বছর বয়সে মায়ের মৃত্যু। বাবার দ্বিতীয় দার-পরিগ্রহণ। প্রবেশিকা পরীক্ষা না দিয়েই তারক তীর্থ ভ্রমণে যায়। চাকরী গ্রহণ করে। বিবাহ করে। ব্রাহ্ম-সমাজে যাতায়াত করতে করতে ১৮৮০ সালে রামচন্দ্র দত্তের বাড়িতে প্রথম ঠাকুরকে দেখা। দক্ষিণেশ্বরে তাঁর কাছে যাতায়াত ও কৃপালাভ। ঠাকুর পঞ্চবটীতে তার জিভে কিছু লিখেও দেন। স্ত্রীর মৃত্যুতে পিতার অনুমতি নিয়ে গৃহত্যাগ করেন। রামকৃষ্ণদেবের মৃত্যুর পর তিনি মিশনে যোগ দেন ও সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। পরবর্তী কালে মঠ ও মিশনের কাজে শিবানন্দ স্বামীর (তারকনাথের

সন্ন্যাস নাম) অবদান প্রচুর। স্বামীজী তাকে মহাপুরুষ বলতেন। এজন্য মিশনে তিনি মহাপুরুষ মহারাজ নামে খ্যাত ছিলেন।

তারক মুখোপাধ্যায়। বিবাহিত এই ব্যক্তি নানা দুঃখ যন্ত্রণার মধ্যে ঠাকুরের প্রতি আকৃষ্ট হন। তার বাপ মা তাকে ঠাকুরের কাছে আসতে নিষেধ করতেন। কর্তব্যপরায়ণ পুত্র হিসাবে তারক সে নির্দেশ লঙ্ঘনে জোর পেতেন না। তখন ঠাকুর তাকে বলেন যে, ঈশ্বরের জন্য বাপমার আদেশ লঙ্ঘনে দোষ হয় না। একথা কথামৃতে বর্ণিত হয়েছে (৩।১২।৪)। তার বাড়ি বেলঘরিয়ায় হওয়ায় কথামৃত 'তাকে বেলঘরের তারক' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, তার পুত্র গৌরীশংকর স্বামীজির শিষ্য ছিলেন।

তুলসীদাস দত্ত (তুলসীচরণ)। (২৩.১২.১৮৬৩-২৬.৪.১৯০৮)। পি. দেবনাথ, মা-থাকমণি। জ. বাগবাজার, বোসপাড়া লেনের পৈত্রিক বাড়িতে, বুধবার রাত্রি প্রথম প্রহরে। পিতামাতার ষষ্ঠ সন্তান। দশবৎসরে তিনি মাতৃহীন হন, চৌদ্দ বৎসর বয়সে পিতৃহীন। নানা সময়ে হরিনাথ চট্টোপাধ্যায় (স্বামী তুরীয়ানন্দ), গঙ্গাধর গঙ্গোপাধ্যায় (অখণ্ডানন্দ) ও হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় (স্বামী বিজ্ঞানানন্দ) তার সহপাঠী ছিলেন। আঠার উনিশ বছর বয়সে বলরাম বসুর বাড়িতে প্রথম ঠাকুরের দর্শন পান। এরপর প্রায়ই একা একা দক্ষিণেশ্বরে আসতেন। ঠাকুর তাকে উপদেশ দিতেন। কথামৃত ৪।২৩।৭ ও ৯ পরিচ্ছেদে তার কথা আছে। রামকৃষ্ণদেবের দেহত্যাগের পর স্বামী বিবেকানন্দ তাকে দীক্ষা দেন ও নির্মলানন্দ নাম রাখেন। তিনি অভেদানন্দের সহকারি হিসাবে আমেরিকায় ছিলেন। এদেশে ফিরেও তিনি প্রায় কুড়িটি শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন।

তোতাপুরী। রামকৃষ্ণদেবকে অদ্বৈত বেদান্তমতে সাধনা করান। তিনি উত্তর-পশ্চিম ভারতে থাকতেন। পুরী ও গঙ্গাসাগরে তীর্থ করতে গিয়ে ফিরবার পথে ১৮৬৫ সালের প্রথমদিকে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হন। রামকৃষ্ণদেবকে দেখে তিনি আকৃষ্ট হন। উপযুক্ত আধার ভেবে তিনি তাঁকে অদ্বৈত সাধনমার্গে দীক্ষা দেন। রামকৃষ্ণদেবের মা তখন দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন। তাকে না জানিয়েই রামকৃষ্ণদেব সন্ন্যাস নেন এবং গুরুর নির্দেশ মতো মাত্র তিনদিনে এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। তোতাপুরী নিজে যা চল্লিশ বছরের সাধনায় অর্জন করেন, তা রামকৃষ্ণদেবকে মাত্র তিনদিনে অর্জন করতে দেখে তিনি বিস্মিত হন। শিষ্যের আকর্ষণে তিনি দক্ষিণেশ্বরে প্রায় এক বছর থেকে যান। আর শিষ্যের শক্তি দেখে অদ্বৈত তত্ত্ব বিরোধী শক্তি মাহাত্ম্যেও তাঁর বিশ্বাস জন্মে। উত্তর ভারতের আম্বালা থেকে প্রায় ৫০ মাইল দূরে নির্জনে আজও তার মঠ আছে।

ত্রৈলঙ্গ স্বামী (১৬০৭-১৮৮৭)। পি. নরসিংহ রাও, মা-বিদ্যাবতী। জ. অন্ধ্রপ্রদেশ, হোলিয়া গ্রামে। পূর্বনাম শিবরাম রাও। শিবাবতার। কাশীতেই তাঁর জীবনের বেশির ভাগ সময় কেটেছে। তাঁকে চলন্ত শিব বলা হত। রামকৃষ্ণদেব তাঁর সঙ্গে কয়েকবার দেখা করেন। তাঁদের মধ্যে ইঙ্গিতে ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কথাবার্তা হয়।

দয়ানন্দ সরস্বতী স্বামী। (১৮২৪-৮৩) জ. কাথিয়াবাড়ের মারভিনগরে। পূর্ব নাম

মূলশংকর। সংস্কৃতভাষায় সুপণ্ডিত। হিন্দী ও গুজরাটীতে ব্যুৎপত্তি ছিল। বেদ-বেদান্ত ও হিন্দুশাস্ত্র ছিল কণ্ঠস্থ। পিতার আদেশের বিরুদ্ধেই তিনি মূর্তি পূজা বিরোধী মতাদর্শ প্রচার শুরু করেন। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে গৃহত্যাগ করে স্বামী বিরজানন্দ সরস্বতীর কাছে দীক্ষা নেন। কঠোর তপস্যার শেষে ১৮৬৩ সালে বৈদিক ধর্ম প্রচারের জন্য ভারত-ভ্রমণ শুরু করেন। ১৮৬৯ সালে কাশীতে এক শাস্ত্রীয় সম্মেলনে তিনি বিচারে জয়লাভ করায় তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে সারা ভারতে। পাঞ্জাব, গুজরাট, রাজপুতনা, উত্তর প্রদেশে তাঁর মতাদর্শ ব্যাপক সমর্থন লাভ করে। মূলতঃ তিনি ছিলেন একেশ্বরবাদী। খৃষ্ট ও মহম্মদের ধর্মের প্রতি তাঁর প্রবল বীতরাগ স্পষ্ট। তিনি বেদকে সর্বচিন্তা ও আদর্শের প্রতীক মনে করতেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত সংঘের নাম আর্য সমাজ।

দয়ানন্দ ১৫ ডিসেম্বর ১৮৭২ থেকে ১৫ এপ্রিল ১৮৭৩ পর্যন্ত কলকাতায় ছিলেন। বর্তমানে যেখানে ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট, সেখানে তখন ছিল জোড়াসাঁকো ঠাকুরদের বাগানবাড়ি। সেই বাড়িতে তিনি ছিলেন। রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ও আলোচনা হয়। রামকৃষ্ণ কাশীতে গিয়েও তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। কথামৃতে ১।১৩।৫, ২০।১৩।৬, ২।১৯১২-৩-এ তাঁর প্রসঙ্গে বর্ণনা আছে।

দিগম্বর বাউল। রামকৃষ্ণদেবের সমসাময়িক মানুষ। কর্তাভজা সম্প্রদায়ের সাধক। রামকৃষ্ণদেব তাকে 'হরিনামে সিদ্ধ' বলে বর্ণনা করতেন।

দীন মুখুজ্জ্যে। কলকাতা বাগবাজারের বাসিন্দা। এঁর ভক্তির কথা শুনে রামকৃষ্ণদেব একদিন তাঁর বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হন।

দুকীড় (ডাক্তার)। ব্রাহ্মভক্ত রাজেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়িতে ১৮৮১ সালের ১০ ডিসেম্বর রামকৃষ্ণদেব সমাধিস্থ হলে ইনি চোখে আঙুল দিয়ে পরীক্ষা করেন।

দুর্গাচরণ নাগ। (২১.৮.১৮৪৬-২৮.১২.১৮৯৯)। পি. দীনদয়াল, মা-ত্রিপুরাসুন্দরী। জ. ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জ মহকুমার দেওভোগ গ্রামে। দারিদ্র্যে বাল্যজীবন কাটে। কলকাতায় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাদ্বারা সামান্য অর্জন করতেন। তিনি কুলগুরুর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। সুরেশচন্দ্র দত্ত নামক বন্ধুর সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে আসেন এবং অচিরে তাঁর ভক্তমধ্যে গণ্য হন। প্রবল আবেগে তিনি সংসার ত্যাগ করতে চান। কিন্তু ঠাকুরের আদেশ না মেলায় তিনি আদর্শ গৃহী জীবন যাপন করতে থাকেন। তিনি চাকুরী এবং চিকিৎসা ছেড়ে দেন। তাঁর পরহিতব্রত ছিল অননুকরণীয়। রামকৃষ্ণদেবের রোগ আকর্ষণে তৎপর হন নাগমশাই। রামকৃষ্ণদেব তাঁকে নিবৃত্ত করেন। রামকৃষ্ণদেব তাঁকে বলতেন জ্বলন্ত আগুন।

দুর্গাচরণ ডাক্তার। (১৮১৯-২২.২.১৮৭০) বিখ্যাত চিকিৎসাবিদ্। সেকালের বিখ্যাত ডাক্তার জ্যাকসন তাকে নেটিভ জ্যাকসন বলতেন। বিখ্যাত দেশনেতা সুরেন্দ্র-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা তিনি। দক্ষিণেশ্বর থেকে রামকৃষ্ণদেব কয়েকজনকে (গোলাপ মা, লাটু ও কালীপ্রসাদ) নিয়ে তার কাছে এসেছিলেন চিকিৎসার জন্য।

দুর্গাদাস পাইন। কামারপুকুরে রামকৃষ্ণদেবের বাড়ির দক্ষিণদিকে ছিল ধনী পাইন-

দের বাড়ি। দুর্গাদাস একদিন দম্ভভরে বলেন যে তাঁর বাড়িতে তিনি অবরোধ প্রথা কঠোর ভাবে রক্ষা করেন। তা ভাঙবার ক্ষমতা কারো নেই। এতে বালক গদাধর কৌতুক বোধ করে এবং সুতো বেচা গরীব তাঁতী মেয়ে সেজে পাইন বাড়িতে ঢুকে ঘণ্টা তিনেক কাটাবার পব দাদার ডাকে অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে আসে। দুর্গাদাস অবরোধ প্রথা নিয়ে আর কোনদিন গর্ব প্রকাশ করেন নি।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫)। বিখ্যাত ব্রাহ্মনেতা। ব্রাহ্মগণ তাকে মহর্ষি বলতেন। দেবেন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণদেবের ১৯ বৎসর আগে জন্মে ১৯ বৎসর পরে পরলোক গমন করেন। রামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব থেকে স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যু সবই তার জীবদ্দশায় ঘটে। কথামৃতের ১।১৩।৫-এ দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে রামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাতের বর্ণনা আছে। তবে রামকৃষ্ণদেব বলেছেন 'কলির জনক'। বলেছেন যোগ ভোগ দুই-ই আছে।

দেবেন্দ্রনাথ বসু (ব্যাঙবাবু)। এই সাহিত্যিক ও নাট্যকার রামকৃষ্ণদেবের দর্শন-লাভ করেছিলেন। উদ্বোধন কার্যালয় থেকে 'পরমহংসদেব' নামে তার এক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার। কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের অনুজ ভ্রাতা। জোড়া-সাঁকো ঠাকুর বাড়িতে সেরেস্তার কাজ করতেন। তিনি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাকে ঋণ থেকে মুক্তি দেন। দক্ষিণেশ্বরে এসে রাম-কৃষ্ণদেবের আশ্রয় পান। তিনি দেবেন্দ্রের জিহ্বায় কিছু লিখে দেন। দরিদ্র দেবেন্দ্র নাথ ঋণ করেও ঠাকুরকে তার বাড়িতে নিয়ে যান। এর বর্ণনা আছে কথামৃতের ৩।১২।২-৪ পরিচ্ছেদ জুড়ে। দেবেন্দ্রনাথ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপাশনালয়ের প্রতিষ্ঠাতা।

ধনী কর্মকার। (কামারণী) কামারপুকুর নিবাসী মধুসূদন কর্মকারের বিধবা কন্যা। লাহাবাবুদের বাড়ির পাশে বাস করেতেন। চন্দ্রমণির সহচরী। গদাধরকে খুব ভালবাসতেন। তার আকাঙ্ক্ষা ছিল তিনি গদাধরের মুখে মাতৃ সম্বোধন পাবেন। গদাধর তা বুঝে তার উপনয়নের সময় ধনীকে ভিক্ষামা করেন। এরপর থেকে তিনি তাকে মা বলে ডাকতেন। ধনীও তাঁকে পুত্রবৎ স্নেহ করতেন। রামকৃষ্ণদেব তাঁর রান্না খেতেও খুব ভালবাসতেন।

ধর্মদাস লাহা। কামারপুকুর গ্রামের জমিদার। তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব ছিল গদাধরের বাল্যজীবনে। এঁর প্রতিষ্ঠিত পাঠশালাতেই গদাধরের শিক্ষা। এঁর প্রতিষ্ঠিত অতিথিশালায় নিয়ত যে সব সাধু সন্ন্যাসী আসত,তাদের অত্যন্ত প্রভাব ছিল তাঁর বাল্যকালে। ধর্মদাসবাবুর সমর্থনেই ঠাকুর অব্রাহ্মণ ধনী কামারনীকে ভিক্ষামা করতে অভিভাবকদের সম্মতি লাভ করেছিলেন। ধর্মদাস বাবুর পুত্র গয়াবিষ্ণু ছিল গদাধরের সহপাঠী। গয়াবিষ্ণুর বিধবা দিদি প্রসন্ন-ময়ী ছিলেন চন্দ্রমণির সহচরী। লাহা ভবন ছিল গদাধরের লীলা নিকেতন। এই বাড়ির এক শ্রাদ্ধবাসরে এক অমীমাংসিত সমস্যার সমাধান করে দিয়ে গদাধর প্রথম পণ্ডিতদের অকুণ্ঠ প্রশংসা ও আশীর্বাদলাভ করেন।

নকুড় বাবাজী । জনৈক ভক্ত বৈষ্ণব। ঝামাপুকুরে এর একটা দোকান ছিল। দাদার কাছে থাকবার সময় গদাধর এর দোকানে গিয়ে বসতেন। পানিহাটিতে রাঘব পণ্ডিতের বাড়ির মহোৎসবে যোগ দিত নকুড় বাবাজী। ফিরবার পথে দক্ষিণেশ্বরে তাঁর সঙ্গে দেখা করে যেতেন। কথামৃতে ৫।৫।৪-এ তার কথা আছে।

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত । (১৮৬২-১৯৪০)। প্রত্যক্ষতঃ ইনি রামকৃষ্ণ পরিকর নন। কুচবিহারের রাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ ভূপের সঙ্গে কেশবচন্দ্র এসে যেদিন (১৫. ৭. ১৮৮১) রামকৃষ্ণদেবকে স্টিমবোটে নিয়ে সোমড়া পর্যন্ত ঘুরে আসেন, সেদিন নগেন্দ্রনাথও ঐ বোটে উপস্থিত ছিলেন। এই ভ্রমণ কথার সমুজ্জ্বল বর্ণনা শুনেই মহেন্দ্রনাথ (শ্রীম) দক্ষিণেশ্বরে আসেন। রামকৃষ্ণদেবের দেহত্যাগের পর যে অনুরাগীরা কাশীপুরে এসেছিলেন, নগেন্দ্রনাথ তাদের একজন। পরবর্তী সময়ে রামকৃষ্ণদেব সম্পর্কে তাঁর নানা গ্রন্থ ও প্রবন্ধ বিশেষ খ্যাতিলাভ করে। তাঁর এক প্রবন্ধ পড়ে স্বয়ং রোমাঁ রোল্যাঁ বিমুগ্ধের মতো তাকে পত্র লেখেন।

নন্দ (লাল) বসু । ইনি বিখ্যাত শিল্পী নন্দলাল বসু নন। শিল্পী নন্দলালের সঙ্গে পরবর্তী কালে মঠ ও মিশনের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। বেলুড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরের বেদী ও তার পৃষ্ঠপটে, মন্দিরগাত্রের নব-গ্রহ মূর্তির পরিকল্পনা শিল্পী নন্দলাল বসুর। কামারপুকুরের মন্দিরও তার পরিকল্পিত। মূলতঃ নিবেদিতার মারফতই তার সঙ্গে মঠ ও মিশনের সম্পর্ক ঘটে। কিন্তু এই নন্দ বসু ছিলেন বাগবাজারের বাসিন্দা। ঠাকুর দেবতার সুন্দর ও বিচিত্র চিত্র সংগ্রহের নেশা ছিল তার। এ সংবাদ পেয়ে রামকৃষ্ণদেব এক দিন তার বাড়ি গিয়ে হাজির হন (২৮. ৭. ১৮৮৫)। ফিরবার সময় গৃহস্থের মঙ্গলার্থে রামকৃষ্ণদেব কিছু চেয়ে খেয়ে ফেরেন। কথামৃত ৩।১৮।১-৩ পরিচ্ছেদে এ প্রসঙ্গে বর্ণনা আছে।

নফর বন্দ্যোপাধ্যায় । শিহড় গ্রামের সঙ্গতিসম্পন্ন ভক্তিমান মানুষ। রামকৃষ্ণদেব একবার শিহরে গিয়ে কীর্তনে মেতে ওঠেন। সেদিন নফরবাবু ঠাকুরের বহু সেবা ও পরিচর্যা করেন।

নবগোপাল ঘোষ । (১৮৩২-১৯০১) বাদুড় বাগানের এই বাসিন্দা দুই পত্নীর মৃত্যুর পর তৃতীয় পত্নী গ্রহণ করে প্রবল ভক্তি ভাবাপন্ন হয়ে পড়েন। তাঁর স্ত্রীও উচ্চ ভাবমার্গের মানুষ ছিলেন। রামকৃষ্ণদেব তাকে ছিন্নমস্তার অংশ বলতেন। কথামৃতে (১।১৬।৩) একবার মাত্র নবগোপালের উল্লেখ আছে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের পুঁথিতেও তার কথা আছে। কল্পতরু উৎসবের দিনে নবগোপাল ঠাকুরের কাছে আশীর্বাদ পান। তিনি রামকৃষ্ণ চিন্তায় এত বিভোর থাকতেন যে সকলে তাকে জয়রামকৃষ্ণবাবু বলে ব্যঙ্গ করত। নবগোপাল গায়েও মাখতেন না। বরং হাওড়ার এক অঞ্চলের নাম রামকৃষ্ণপুর জেনে বাড়ি বিক্রি করে সেখানে উঠে গেলেন বাড়ি করে। তাঁর বাড়িতে রামকৃষ্ণ প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠার দিনে (৬.২.৮২) স্বামী বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, প্রেমানন্দ, তুরীয়ানন্দ, লাটুমহারাজ

ইত্যাদি উপস্থিত ছিলেন। ঐ দিনেই তিনি বিখ্যাত রামকৃষ্ণ প্রণামমন্ত্র রচনা করেন।

স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে।
অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ ॥

তাঁর দ্বিতীয় পুত্র পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করে অম্বিকানন্দ নাম গ্রহণ করেন। মঠে তিনি নীরদ মহারাজ নামে খ্যাত ছিলেন।

নবদ্বীপ গোস্বামী। পাণিহাটিতে রাঘব পণ্ডিতের বাড়িতে চিড়ামহোৎসবে যোগ দিতে গেলে ১৮ জুন ১৮৮৩-তে নবদ্বীপ গোস্বামীর সঙ্গে রামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ হয়। স্থানীয় মণিমোহন সেনের বাড়িতে ধর্ম আলোচনা কালে রামকৃষ্ণদেব বলেন, গীতাকে ওল্টালে যে ত্যাগ শব্দ পাওয়া যায় তাই গীতার মূল কথা। নবদ্বীপ গোস্বামী রামকৃষ্ণের মতকে সমর্থন করে ব্যুৎপত্তিগত ব্যাখ্যা দেন। গীতাকে ওল্টালে ত্যাগী হয় না, হয় তাগী। কিন্তু তগ্ ধাতু থেকে সৃষ্ট এই তাগী শব্দেরও অর্থ 'ত্যাগী'। কথামৃতের ৪।৬।২ পরিচ্ছেদে এ বর্ণনা আছে।

নবাই চৈতন্য। প্রকৃত নাম নবগোপাল মিত্র। রামকৃষ্ণদেবের গৃহীভক্ত মনোমোহনের ইনি জ্যাঠামশাই। রামকৃষ্ণদেবকে দেখে এবং তাঁর কৃপালাভ করে ইনি গৃহত্যাগ করে কোন্নগরের গঙ্গাতীরে পুরাতন ঘাটে কুটীর করে দিনরাত সাধনভজন করতেন। ১৮৮২-র ডিসেম্বরে রামকৃষ্ণদেব তার কুটীরে যান। কথামৃতের ২।২৩।৩ ও ৪।১৮।৩-এ তার প্রসঙ্গ আছে।

নবীনচন্দ্র পাল (কবিরাজ)। বাগবাজারে বাস করতেন। অসুস্থ রামকৃষ্ণদেবকে শ্যামপুকুরে এবং পরে কাশীপুরেও ইনি চিকিৎসা করেন।

নবীন নিয়োগী। দক্ষিণেশ্বরের বাসিন্দা। ৫ অক্টোবর ১৮৮৪ তারিখে সকালে ঠাকুর এদের বাড়িতে নীলকণ্ঠের যাত্রাগান শুনতে গিয়েছিলেন। তিনি নবীনবাবু সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে তার যোগভোগ দুই-ই আছে।

নরেন/ছোট নরেন। কলকাতা শ্যামপুকুরে বাড়ি। মহেন্দ্র গুপ্তের ছাত্র। ছাত্রাবস্থাতেই রামকৃষ্ণদেবের সাহচর্য পান। রামকৃষ্ণদেব নিজেও তাকে ডেকে পাঠাতেন। তার শুদ্ধভাব ঠাকুরকে তৃপ্ত করত। কিন্তু বাপ-মায়ের পেড়াপীড়িতে তাকে বিয়ে করতে হয়। দম্পত্য জীবন সুখের ছিল না। অ্যাটর্নী হয়েছিলেন। পসার ছিল না। রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম সেক্রেটারী ও আইন-উপদেষ্টা হন।

নরেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দ) (১২.১.১৮৬৩-৪.৭.১৯০২)। পি. বিশ্বনাথ। জ. শিমুলিয়া, কলকাতা। শৈশবে নাম বীরেশ্বর বা বিলে। বাবা এ্যাটর্নী ছিলেন। নরেন ছিলেন মেধাবী ছাত্র। বি. এ পাশ করে ওকালতি পড়বার সময় পিতার মৃত্যুতে সাংসারিক অনটন দেখা যায়। তখন কিছুদিন মেট্রোপলিটন স্কুলে শিক্ষকতা করেন। কলেজে পড়বার সময় বেদান্ত বিষয়ে রামমোহনের গ্রন্থ পড়ে ব্রাহ্ম মতের প্রতি আকৃষ্ট হন। এফ. এ. পড়বার সময় রামকৃষ্ণদেবের কথা শোনেন অধ্যায় উইলিয়ম হেস্টির কাছে। ১৮৮১ সালের নভেম্বরে সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়িতে প্রথম সাক্ষাৎ হয় রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে। এদিন তার গান শুনে ঠাকুর বিমুগ্ধ হন এবং দক্ষিণেশ্বরে আমন্ত্রণ করেন। ঐ ডিসেম্বরেই দক্ষিণেশ্বরে এলেন

নরেন্দ্রনাথ। রামকৃষ্ণদেব ঐদিনেই তাকে জানিয়ে দিলেন যে তিনি নররূপে নারায়ণ, জীবের দুর্গতি মোচনের জন্যই তার দেহধারণ। নরেন্দ্র প্রশ্নে জর্জরিত করলেন রামকৃষ্ণকে। কিন্তু তাঁর সরল অথচ সুদৃঢ় প্রত্যয়, তাঁর পবিত্রতা নরেন্দ্রকে বিমুগ্ধ আকর্ষণে যেন কোন এক লোকে নিয়ে গেল। সাংসারিক দারিদ্র্যের তাড়নায় ভবতারিণীর মন্দিরে গিয়ে নরেন্দ্রনাথ অর্থ চাইতে পারল না, চাইল বিবেক বৈরাগ্য। রামকৃষ্ণ তাকে শেখালেন, জীবে দয়া নয়—শিবজ্ঞানে জীবের সেবা। নরেন্দ্র 'মুক্তি' চাইলে রামকৃষ্ণ বলতেন, হাজার মানুষকে আশ্রয় দেবার মতো বুক যার, সে কেন চাইবে মুক্তি ? দেহত্যাগের আগে রামকৃষ্ণদেব তাঁর তপস্যার সর্বফল দিয়ে যান নরেন্দ্রকে। নরেন্দ্র এরপর সন্ন্যাস গ্রহণ করে বিবেকানন্দরূপে পরিচিত হন (১৬ আগষ্ট, ১৮৮৬)। এরপর বিবেকান্দ প্রায় সারা ভারত পরিব্রজন করেন। গয়পুরে সভাপণ্ডিতদের কাছে শেখেন অষ্ট্যাধ্যায়ী পাণিনি, ক্ষেত্রীর সভাপণ্ডিত নারায়ণ দাসের কাছে পতঞ্জলি মহাভাষ্য, পোরবন্দরের পাণ্ডুরং-এর কাছে বেদান্ত। মাদ্রাজ থাকাকালে শিষ্যদের অনুরোধে, শ্রীমার অনুমতি নিয়ে তিনি শিকাগো মহাসভায় যোগদানের জন্য ৩১ মে ১৮৯৩ আমেরিকা যাত্রা করলেন। এই সভায় বিবেকানন্দের বাণী সারা বিশ্বকে মাতিয়ে তুলল। গোটা ইউরোপেই তিনি বক্তৃতা দিয়ে, সংগঠন গড়ে, রামকৃষ্ণদেবের বাণী প্রচার করে দেশে ফিরলেন ১৮৯৭ সালে। বেলুড় মঠ ইত্যাদি স্থাপন করে ১৮৯৯-এর জুনে আবার তিনি আমেরিকা যান। ফেরার পথে প্যারিসে ধর্ম সম্মেলনে যোগ দেন। ভারতে ফিরে রামকৃষ্ণ সেবাসদন, ব্রহ্মচর্যাশ্রম, হোম, পাঠশালা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করেন।

স্বল্পায়ু জীবনে সংঘ ও মিশনের কাজের মধ্যে জড়িত থেকেও বিবেকানন্দ গোটা সমাজকে আলোড়িত করেন অন্ততঃ তিন দিক থেকে। এক, সংস্কার ও আচারের আচরণ ছিন্ন করে তিনি যেন ভারতাত্মাকে বদ্ধতা থেকে মুক্তি দেন দেশকে জাতীয়তাবোধ ও মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ করে। দুই, বিশ্বের কাছে ভারতকে সমুন্নত সজীব মূর্তিতে প্রতিষ্ঠা করে। তিন, এক সমুন্নত ভাবদীপ্ত কথ্যভাষা-নির্ভর সাহিত্যসম্ভার উপহার দিয়ে।

নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পি. অধ্যাপক রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। গৃহবিবাদের ফলে শ্যামপুকুরে বাসা করেন। দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। কথামৃতে ৫।১৫।৩ পরিচ্ছেদে তাঁর সম্পর্কে লেখা হয়েছে।

নরোত্তম। একজন কীর্তনীয়া। রামকৃষ্ণদেব নিজেও এর কীর্তন শুনতে ভালবাসতেন, তাঁর ভক্তরাও। তাই ভক্তগৃহে উৎসবের আয়োজন হলেই এঁর ডাক পড়ত। সঙ্গে গোষ্ঠ থাকত খোলবাদক। এ জুটি সকলেরই প্রিয় ছিল। দ্রঃ গোষ্ঠ

নিরঞ্জন / নিরঞ্জনানন্দ স্বামী (১৮৬৪-১৯০৪)। জ. ২৪ পরগণার রাজার হাটের বিষ্ণুপুর। পূর্বনাম নিত্যরঞ্জন ঘোষ। সবল স্বাস্থ্য, নির্ভীক যুবক। কলকাতায় মামাবাড়ি থেকে পড়াশুনা করত। প্লাঞ্চেটের ভাল মিডিয়াম ছিল। ১৮৮১।৮২ সালে রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ। প্রথম দিনেই ঠাকুর তাকে কাছে টেনে নেন। ঠাকুর বলতেন তাঁর রামচন্দ্রের অংশে জন্ম। বলতেন, নরেন্দ্র

রাখাল নিরঞ্জন এদের ব্যাটাছেলের ভাব (কথামৃত ৪।১৪।১)। ঠাকুরের বা বিবেকানন্দের অসুস্থতায় নিরঞ্জন শুধু সেবা করেন নি, দর্শকদের অকারণ কৌতূহল থেকে, প্রয়োজনে লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে রক্ষা করেছে রোগীকে। কথামৃতে ৪।২৩।৭ পরিচ্ছেদেও তার কথা আছে।

নির্মলানন্দ স্বামী (১৮৬৩-১৯৩৮)। দ্রঃ তুলসীদাস দত্ত।

নীলকণ্ঠ যাত্রাওয়ালা (১৮৪১-১৯১১) বিখ্যাত যাত্রাওয়ালা। বর্ধমান জেলার ধরনী গ্রাম নিবাসী ছিলেন। এককালে গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রাদলে কৃষ্ণের দূতীর ভূমিকায় অভিনয় করতেন। দক্ষিণেশ্বরে নবীন নিয়োগীর বাড়িতে ঠাকুর সদলে তার গান শুনতে আসেন। সেদিন বিকেলে নীলকণ্ঠ আসেন ঠাকুরের কাছে। তার শ্যাম বিষয়ক গান শুনতে শুনতে রামকৃষ্ণদেব সমাধিস্থ হন। এরপর রামকৃষ্ণদেব নিজে গান শুরু করেন। গানের আবেশে নাচতে থাকেন। সবমিলিয়ে এক অসাধারণ দৃশ্যের অবতাড়না হয়। নীলকণ্ঠ নিজেকে ধন্য মনে করে। কথামৃতে ৪।২২।৫ পরিচ্ছেদে একবর্ণনা আছে।

নীলমণিবাবু। ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের সঙ্গে এই অধ্যাপক ভদ্রলোক ৬ নভেম্বর ১৮৮৫ শ্যামপুকুরের বাসায় এসে প্রথম রামকৃষ্ণদেবকে দেখেন। কথামৃতে দুবার তার উল্লেখ আছে (৩।২২।২ ও ৩।১৭।১)।

নীলমাধববাবু। গাজীপুর নিবাসী ব্রাহ্মভক্ত। ১৮৮২ সালের ২৭ অক্টোবর কেশব সেনের সঙ্গে রামকৃষ্ণদেব যখন জাহাজে করে যাচ্ছিলেন, তখন ইনি সঙ্গে ছিলেন। তিনি রামকৃষ্ণদেবকে গাজীপুরের পওহারী বাবার কথা বলেন।

পল্টু। ভাল নাম প্রমথনাথ কর। কথামৃতে তাকে পল্টু নামেই উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি কলুটোলার হেমচন্দ্র করের পুত্র। পরবর্তী জীবনে অ্যাটর্ণি হন। মাস্টারমশাই শ্রীমর ছাত্র হিসাবে এসে খুব শৈশবেই তিনি রামকৃষ্ণদেবকে দেখেন এবং সান্নিধ্য পান। ৩।১২।২ পরিচ্ছেদে তার উল্লেখ আছে।

পাগলিনী। কথামৃতে এই পাগলিনীর উল্লেখ আছে। রামকৃষ্ণদেব তার গান শুনে সমাধিস্থ হতেন। কিন্তু সে রামকৃষ্ণের প্রতি ভিন্নভাব পোষণ করত। রামকৃষ্ণদেব এতে বিরক্ত হতেন। তাই নিরঞ্জন তাকে দেখলেই লাঠি নিয়ে তাড়া করত। শোনা যায় গিরিশচন্দ্র বিল্বমঙ্গল নাটকে এই পাগলিনীকেই অমর করে রেখেছেন।

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার[১]। (১৮৪০-১৯০৫) পি. গিরিশচন্দ্র। জ. হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়া গ্রামে, মাতুলালয়ে। বিখ্যাত ব্রাহ্মনেতা। ধর্মতত্ত্ব প্রচারের জন্য সমস্ত ভারত, ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান ভ্রমণ করেন। তিনিও কেশব সেনের মত দক্ষিণেশ্বরে আসতেন। কথামৃতে নানা স্থানে (১।১।৩, ১।৮।২, ১।১০ ৫-৮, ২।১৩।৩) তার উল্লেখ আছে।

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার[২] (ডাক্তার)। (১৮৫১-১৯২২)। বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক। তিনি শ্যামপুকুর ও কাশীপুরে ঠাকুরকে চিকিৎসার জন্য যান। কথামৃতে ৩।২১।৩, ৪।১২।৩ পরিচ্ছেদে তার উল্লেখ আছে।

প্রতাপচন্দ্র হাজরা। হুগলী জেলার মড়াগেড়ে নামক গ্রামের সদ্গোপ বংশজাত

এই যুবক শিহড় গ্রামের হৃদয় মুখুজ্জের বাড়িতেই প্রথম ঠাকুরকে দেখেন। পরে মা স্ত্রী পুত্র গৃহ ছেড়ে দক্ষিণেশ্বরে এসে রামকৃষ্ণদেবের আশ্রয় নেন। জপতপ করলেও সরল মানুষ ছিল না। রামকৃষ্ণদেবের চেয়ে কোথাও কোথাও নিজেকে বড় ভাবত। এক সময় নরেন্দ্রনাথকেও সে আকর্ষণ করেছিল। পরে অবশ্য তার সব মোহ কাটে এবং নরেন্দ্রের আগ্রহাতিশয্যে তিনি রামকৃষ্ণের করুণা পান।

প্রভুদয়াল মিশ্র। এক বিচিত্র মানুষ এই প্রভুদয়াল। পশ্চিমভারতের এই ব্রাহ্মণ সন্তান, একই দিনে দুই ভ্রাতার আকস্মিক মৃত্যুর আঘাতে বৈরাগ্য অবলম্বন করে গৃহত্যাগ করেন এবং অনুরাগবশে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। অথচ পরতেন গৈরিক বসন, তপস্যা করতেন হিন্দুমতে। পওহারী বাবার কাছে রামকৃষ্ণদেবের কথা শোনেন। একদিন তাঁকে ধ্যানেও দেখতে পান। তখন ছদ্মবেশে শ্যামপুকুরে এসে রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে দেখা করেন ১৮৮৫ সালের ৩ অক্টোবর। সেখানে তিনি ভাবস্থ ঠাকুরের মধ্যে যীশুর দর্শন পান। কথামৃতেও মিশ্রের প্রসঙ্গ আছে (৪।৩০।২)।

প্রসন্নময়ী। কামাপুকুরের জমিদার ধর্মদাস লাহার বিধবা কন্যা। গদাধরের বাল্য লীলাক্ষেত্র ছিল লাহাদের বাড়ি। প্রসন্নময়ীর ভাই গয়াবিষ্ণু গদাধরের সহপাঠী ছিল। প্রসন্নময়ী গদাধরকে খুব ভালবাসত। তার মধ্যে গোপালভাব লক্ষ্য করত। বালকের আট বছর বয়সে বিশালাক্ষীর মন্দিরে যাবার সময় হঠাৎ সংজ্ঞা হারালে এর পরামর্শে বিশালাক্ষীর নাম শোনাতে চৈতন্য ফিরে আসে।। ইনি পরবর্তী কালে চন্দ্রমণির সহচরী হন। ঠাকুরও মাকে সর্বদা তার সঙ্গে পরামর্শ করে সব কাজ করেত নির্দেশ দেন।

প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। হুগলী জেলার জনাইগ্রামের অধিবাসী। থাকতেন কলকাতা রামধন মিত্র লেনে। সওদাগর অফিসে কাজ করতেন আর মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে আসতেন। বেদান্ত চর্চায় আগ্রহ ছিল। একবার ঠাকুরকে নিজের বাড়িতে নিয়ে উৎসব করেন। কথামৃতে ২।১৩।১ পরিচ্ছেদে তার প্রসঙ্গে বর্ণনা আছে।

প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়। বাগবাজার রাজবল্লভপাড়ার বাসিন্দা। পৈত্রিক নিবাস কেদেটি গ্রাম। ইনি এবং এর দাদা মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন থিয়সফিস্ট। এদের ময়দা-সুজি-তেল কল ছিল। দুজনেই ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করতেন। প্রাচীন স্টারে ‘চৈতন্যলীলা’ অভিনয় দেখতে যাবার আগে ঠাকুর এদের কারখানায় গিয়েছিলেন।

প্রেমানন্দ স্বামী। (১৮৬১-১৯১৮)। দ্রঃ বাবুরাম ঘোষ।

ফকির। প্রকৃত নাম যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য। বলরাম বসুদের পুরোহিত বংশীয় পুরুষ। রামকৃষ্ণদেব তার মুখে স্তোত্রাদি শুনতে ভালবাসতেন। কথামৃতে ৩।২৬।১ পরিচ্ছেদে তার উল্লেখ আছে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। (২৬.৬.১৮৩৮-৮.৪.১৮৯৪)। কাঁঠালপাড়া-২৪ পরগণা।

পি. যাদবচন্দ্র। খ্যাত সাহিত্যস্রষ্টা, ঔপন্যাসিক, বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের উদ্গাতা। বাঙলাদেশের নব জাগরণের অন্যতম প্রধান পুরুষ। ১৮৮৪ সালের ৬ ডিসেম্বর রামকৃষ্ণভক্ত ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট অধরলাল সেনের বেনেটোলার বাড়িতে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম রামকৃষ্ণদেবকে দেখেন। অধর সেনের কথা থেকে মনে হয় সেদিন রামকৃষ্ণ-দেবকে দেখতেই তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাদের সেদিনের সাক্ষাৎকার পঞ্চমভাগের (ক) পরিশিষ্টের ১-৬ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। সেদিন বঙ্কিমচন্দ্র বিশেষ চিন্তিত ছিলেন। উভয়েই নিজ নিজ স্থানে নিমন্ত্রণ করেন। কিন্তু কেউই গিয়ে উঠতে পারেন নি। তবে ঠাকুর দেবীচৌধুরানী আনিয়ে আগ্রহের সঙ্গে পড়েন। কথামৃত (১।১৭।৩) থেকে জানা যায় অসুস্থ রামকৃষ্ণদেব ডাঃ মহেন্দ্র-লাল সরকারের কাছে বঙ্কিমচন্দ্র প্রসঙ্গ তোলেন।

বলরাম বসু। (১৮৪২-১৮৯০) পি. রাধামোহন। জন্ম, বাগবাজার, কলকাতা। বলরাম পিতার মধ্যমপুত্র। শৈশব থেকে ধর্মভাবাপন্ন। বড় মেয়ে ভুবনমোহিনীর বিয়ে দিতে কলকাতায় এসে খুড়তুতো ভাই হরবল্লভের ৫৭নং রামকান্ত বসু স্ট্রীটের বাড়িতে বাস করতে থাকেন। মনে হয় ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে তিনি গিয়ে প্রথম রামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করেন। বলরাম সপরিবারে আন্তরিকভাবে রামকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত হন। গৃহীভক্তদের মধ্যে আর কেউ রামকৃষ্ণদেবের এত অন্তরঙ্গ ছিলেন না। বলরামের বাড়িতে তিনি কমবেশি ১০০ বার আসেন। বল-রামের 'শুদ্ধ অন্ন' বলে তিনি তার অন্নগ্রহণ করতেন। তার স্ত্রী কৃষ্ণভামিনী অসুস্থ হলে সারদামণিকে পাঠান সংবাদ নিতে। কাশীপুরে রামকৃষ্ণদেবের অবস্থান কালে তাঁর সেবার সমস্ত অর্থ বলরাম নিতেন। তাঁর তিরোধানের পর তাঁর শিষ্যদেরও তিনি পরম সমাদরে অপ্যায়ন করতেন।

বাগচী অন্নদাপ্রসাদ। দ্রঃ অন্নদাপ্রসাদ বাগচী।

বাবুরাম ঘোষ। ১০।১২।১৮৬১-৩০।৭।১৯১৮)। পি. তারাপ্রসাদ, মা-মাতঙ্গিনী-দেবী। জ. হুগলীজেলার আঁটপুর। মধ্যমপুত্র। জ্যেষ্ঠাকন্যা কৃষ্ণভামিনী ছিলেন বলরাম বসুর স্ত্রী। সহপাঠী রাখালচন্দ্র ঘোষ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ)-এর সঙ্গে গিয়ে প্রথম রামকৃষ্ণদেবকে দেখেন ১৮৮১।৮২ সালে। প্রথম দিনেই ঠাকুর বাবুরাম ও রাখালকে আপন করে নেন। তিনি বলতেন, বাবুরামের হাড় পর্যন্ত শুদ্ধ। বলতেন, বাবুরামের প্রকৃতিভাব। তিনি মা-মাতঙ্গিনীর কাছে তার এই পুত্রটি ভিক্ষা চান। মা, সৌভাগ্যজ্ঞানে পুত্রকে রামকৃষ্ণের চরণে দান করেন। পরবর্তী জীবনে বাবুরাম প্রেমানন্দ স্বামী বা বাবুরাম মহারাজ নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন মঠের জননী স্বরূপ। কথামৃতের চতুর্থভাগের ১৪।১ ও ১৮।১-এ তার কথা আছে।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। (২.৮.১৮৪১-৪.৬.১৮৯৯) পি. আনন্দচন্দ্র, মা-স্বর্ণময়ী। পিতার তৃতীয়পক্ষের কনিষ্ঠপুত্র। জ. নদীয়ার শিকারপুর, ঝুলন পূর্ণিমার রাত্রে। আড়াই বছর বয়সে পিতৃহীন। পাঁচবছরে জেঠাইমা দত্তক নেন। ১৮ বছর বয়সে বিবাহ। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে পড়তে পড়তে দেবেন্দ্রনাথের কাছে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। তার আদর্শনিষ্ঠা ও পরোপকার বৃত্তির জন্য তাকে ব্রাহ্ম-

সমাজের আচার্য পদ দেওয়া হয়। দেবেন্দ্রনাথের রক্ষণশীলতা ও কেশব সেনের উগ্র আচরণ কোনটিই তিনি সমর্থন করতে পারেন নি। ফলে তিনি ব্রাহ্মসংঘ ত্যাগ করেন। তাঁর ওপরে রামকৃষ্ণের প্রভাব প্রবল হয়ে ওঠে। এক সময় রামকৃষ্ণদেব কেশব-বিজয়ের মতবিরোধ দূর করতেও সচেষ্ট হন। ১৮৮৪ সালে ১৯ অক্টোবর সিঁথির বেণী পালের বাড়িতে ব্রাহ্ম উৎসবে আচার্যের আসনে বসে বিজয় আর্ত আবেগে মা মা করে ডেকে ওঠেন। ঢাকাতে ধ্যান করতে বসে তিনি রামকৃষ্ণকে প্রত্যক্ষ করেন। তাঁর রোগশয্যার পাশে দাঁড়িয়ে সব সংশয় ঝেড়ে ফেলে বিজয়কৃষ্ণ বলেন, 'এখানেই পূর্ণ ষোল আনা দেখছি। কথামৃতে বহুস্থানে তাঁর প্রসঙ্গ আছে।

বিনোদিনী। (১৮৬৩-১৯৪২) কলকাতার বিখ্যাত নাট্যাভিনেত্রী। নট ও নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ ছিলেন বিনোদিনীর নাট্যগুরু। গিরিশচন্দ্রের চৈতন্যলীলায় বিনোদিনীর অসাধারণ ভাবান্মত্ত অভিনয় দেখে শ্রীরামকৃষ্ণও অভিভূত হন। তাকে আশীর্বাদ করেন'তোমার চৈতন্য হোক মা'। রামকৃষ্ণদেব তাঁর অভিনীত আরও অনেক নাটক দেখতে আসেন। রুগ্ন ঠাকুরকে বিনোদিনী ছদ্মবেশে দেখতে আসেন। ঠাকুর আশীর্বাদ করেন।

বিবেকানন্দ স্বামী। নরেন্দ্রনাথ দত্ত দ্রষ্টব্য।

বিশ্বনাথ উপাধ্যায়। কাপ্তেন দ্রষ্টব্য।

বিষ্ণু। রামকৃষ্ণদেবের এক ভক্তযুবক। আড়িয়াদহে বাড়ি ছিল। সংসারবিমুখ এই যুবক দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করত। ঠাকুর বলতেন, এটাই বিষ্ণুর শেষ জন্ম। বিষ্ণু আত্মহত্যা করে। ঠাকুর বলেন, জ্ঞানলাভের পর স্বেচ্ছায় দেহপাতে পাপ হয় না।

বিন্দে ঝি। দক্ষিণেশ্বরের মহিলা কর্মী। ১৮৭৭-এর ২ জুন সে কাজে লাগে। তারপর থেকে প্রায় আট বছর রামকৃষ্ণদেব ও শ্রীমার সেবা করে।

বেণীমাধব পাল/বেণীপাল। এই ব্রাহ্ম ভদ্রলোকের সিঁথির বা গান বাড়িতে শরৎ এবং বসন্তে ব্রাহ্ম উৎসব হত। রামকৃষ্ণদেব অনেকবার এই উৎসবে যোগ দিয়েছেন। কথামৃতে ১৮৮২-র ২৮ অক্টোবর, ১৮৮৩র ২২ এপ্রিল ও ১৮৮৪র ১৯ অক্টোবর তাঁর যোগদানের কথা বর্ণিত আছে। ঘোড়ার গাড়িতে উঠে ঘোড়াকে চাবুক মারা অসহ্য লাগত রামকৃষ্ণদেবের। তাই রামকৃষ্ণদেব যাবেন জানলে বেণীবাবু এমন গাড়ি পাঠাতেন, যে ঘোড়া ইঙ্গিত মাত্রে চলতে থাকত।

বৈকুণ্ঠ সান্যাল। (১৮৫৭-১৯৩৭)। পি. দীননাথ সান্যাল। জ. বেলপুকুর, নদীয়া। অল্পবয়সে ঠাকুরের সান্নিধ্যে আসেন। কল্পতরু ঠাকুর তাকে কৃপা করেন। কৃপানন্দ নামে সন্ন্যাস গ্রহণ করেও তা রক্ষা করেন নি। তাঁর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলামৃত তথ্যবহুল আকর গ্রন্থ।

বৈকুণ্ঠ সেন। জয়গোপাল সেনের ভাই। ১৮৮৩ সালের ২৮ নভেম্বর তাদের বাড়িতে উপস্থিত রামকৃষ্ণদেবকে তিনি জিজ্ঞাসা করেন; জগৎ মিথ্যা কিনা।

বৈষ্ণবচরণ। রামকৃষ্ণদেবের নির্দেশে ঠাকুর ভক্ত অধরচন্দ্র যেন প্রতিদিন এর কীর্তন শুনতেন। ১৮৮০ সালের ১ অক্টোবর অধর সেনের বাড়িতে রামকৃষ্ণদেব

এর কীর্তন শোনেন। পরে বলরাম মন্দিরেও এর কীর্তন শুনেছেন।

বৈষ্ণবচরণ গোস্বামী। পি. উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ, মা. পদ্ম। ইনি কর্তাভজা সাধক। পানিহাটির দন্ড মহোৎসবে রামকৃষ্ণদেবকে প্রথম দেখেন এবং প্রথম থেকেই ঠাকুর সম্পর্কে উচ্চধারণা পোষণ করেন। পরে তিনি প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে আজীবন। তিনিই ঠাকুরকে কাছিবাগানের কর্তাভজা সমাজে নিয়ে যান। তার নিমন্ত্রণেই কলুটোলার হরিসভায় গিয়ে ভাবোন্মত্ত অবস্থায় নাচতে নাচতে শ্রীগৌরাঙ্গের আসনে বসেন।

ব্রজমোহন দত্ত। মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তের বাবা তিনি দক্ষিণেশ্বরে এসে ঠাকুরকে দেখে বিমুগ্ধ হয়ে কয়েকদিন থেকে যান। সমবেত উকিলদের সঙ্গে বৈষয়িক আলোচনা করতে দেখে একদিন রামকৃষ্ণদেব নিষেধ করেন। দত্তমশাই খুব লজ্জিত হন। ঠাকুরের কাছে বিষয় রোগের ওষুধ প্রার্থনা করেন।

ব্রহ্মানন্দ স্বামী (১৮৩২-১৯২২)। রাখালচন্দ্র ঘোষ দ্রষ্টব্য।

ভগবানদাস বাবাজী। বৈষ্ণব সাধক। বর্ধমান জেলার কালনার গঙ্গাতীরবর্তী মহাপ্রভুপাড়ায় আশ্রম ছিল। এখানেই জীবন অতিবাহিত করেন। ১২৭৭ বঙ্গাব্দের কোন সময় শ্রীরামকৃষ্ণ মথুরবাবুর সঙ্গে ভগবানদাসের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। ইতঃপূর্বে কলুটোলা হরিসভায় রামকৃষ্ণের চৈতন্যস্থান গ্রহণের কথা পল্লবিত হয়ে তার কানে আসায় বাবাজী রামকৃষ্ণ সম্পর্কে কটূক্তি করেছিলেন। এখন সাক্ষাৎ পরিচয়ে তিনি স্বীকার করেন, রামকৃষ্ণ চৈতন্যস্থান দখল করলে কোন অপরাধ হয় না। অনেক পরে শ্রীম তার সঙ্গে দেখা করলে. বাবাজী রামকৃষ্ণ সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত কথা বলেন। কথামৃতে একাহিনী বর্ণিত আছে ১।১০।৪।

ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়। (১৮৬৩-১৮৯৬) পি. রামদাস, মা ইচ্ছাময়ীদেবী। একমাত্র পুত্র। বরাহনগর কলুটোলায় জন্ম। ছেলেবেলা থেকে জনহিতকর কার্যে ব্রতী। নরেন্দ্রের সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব। ১৮৮১-তে ঠাকুরের সান্নিধ্যে আসেন। ১৮৮৩-তে বিবাহ হয়। ঠাকুর নরেন্দ্র ও ভবনাথকে বলতেন পুরুষ ও প্রকৃতি, বলতেন, হরিহরাত্মা—নিত্যসিদ্ধ, অরূপের ঘর। তার আহ্বানে অবিনাশ দাঁ দক্ষিণেশ্বরে এসে ৺বিষ্ণু মন্দিরের রোয়াকে বসা ঠাকুরের যে ছবি তোলেন, তাই বেলুড়মঠের রামকৃষ্ণ মূর্তির আদর্শ।

ভাই ভূপতি (১৮৮৫-১৯২১)। কথামৃতে দুইবার (১।১৬।৩, ৪।২৯।১) ভাই ভূপতির উল্লেখ আছে। পি. বিহারীলাল মুখোপাধ্যায়। জ. কলিকাতা, রাধা-বল্লভ পাড়া। বলরাম মন্দিরে প্রথম রামকৃষ্ণদেবকে দেখেন। পরে দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত শুরু করেন। ভূপতিনাথ আগে থেকে নানা দিব্যদর্শন করতেন। এক দিন সকালে গিয়ে রামকৃষ্ণদেবকে গান শোনান। সেই গান শুনে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হয়ে তাকে স্পর্শ করেন। স্পর্শ করা মাত্র তার সর্বভূতে ঈশ্বরদর্শন হয়। তিনি দেবাদিষ্ট হয়ে তাঁকে গুরুরূপে বরণ করেন। কল্পতরু ঠাকুরের কৃপালব্ধদের মধ্যে ভূপতিনাথও একজন। পরে তিনি ত্রৈলঙ্গ স্বামী ও ভাস্করানন্দ সরস্বতীর শিষ্যত্ব স্বীকার করেও যোগসিদ্ধ হন। পরবর্তী সময়ে তাঁর বহুশিষ্যাদি হয়।

২৪-পরগণার বারাসতের কাছে তাঁর স্মৃতিতে ঋষভ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়।

ভৈরবী-ব্রাহ্মণী। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের তন্ত্রসাধনার গুরু। যশোর জেলার কোন ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান। নাম যোগেশ্বরী। ১৮৬১ সালের কোন সময়ে তিনি দক্ষিণেশ্বরে আসেন এবং রামকৃষ্ণদেবকে চৌষট্টি প্রকার তন্ত্রসাধনা করান। তিনিই প্রথম রামকৃষ্ণদেবকে অবতার বলে ঘোষণা করেন। দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ির উত্তরে দেবমণ্ডলের ঘাটে তাঁর থাকবার আয়োজন হয়। ১৮৬৭ সালের শেষ দিকে তিনি রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে একবার কামারপুকুরে যান। সারদাদেবী তাকে মায়ের মতই সেবা করতেন। এখান থেকেই তিনি কাশী চলে যান। পর বৎসর তীর্থ-যাত্রায় রামকৃষ্ণ কাশীতে তার সঙ্গে শেষবারের মত দেখা করেন। বৃন্দাবনে তার শেষ জীবন অতিবাহিত হয়।

ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির প্রথম মুহুরী এবং পরে খাজাঞ্চী। তিনি রামকৃষ্ণদেবকে শ্রদ্ধাভক্তি করতেন এবং মাঝে মাঝে মহাভারত-পাঠ করে শোনাতেন। কথামৃতের ২।১০।৩-এ তার কথা আছে।

ভোলানাথ বসু। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে বিদ্যাসুন্দর নাটকে বিদ্যার এবং রত্নাবলী নাটকে সখীর ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য বিদ্যাসাগর মশাই তাকে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেন। দক্ষিণেশ্বরের নাটমন্দিরে ভোলানাথের বিদ্যার অভিনয়ে নৈপুণ্য দেখে রামকৃষ্ণদেব মুগ্ধ হন এবং মন্তব্য করেন যে, যিনি গানবাজনা বা কোন বিষয়ে পটুত্ব অর্জন করে, সে ইচ্ছা করলে সহজেই ঈশ্বরলাভ করতে পারে।

মণিমোহন সেন। ভক্তবৈষ্ণব। পানিহাটিতে তারমন্দিরে প্রতি বৎসর রাধাগোবিন্দের উৎসব হত এবং রামকৃষ্ণদেব নিমন্ত্রিত হয়ে যোগ দিতেন। একবার তিনি মণি-মোহনের বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম ও প্রসাদ গ্রহণ করেন। ১৮৮৪ সালের ২০ মার্চ তিনি দক্ষিণেশ্বরে এসে ঠাকুরের সঙ্গলাভ করেন। মথুরাবাবুর মৃত্যুর পর তিনি কিছুদিন রামকৃষ্ণদেবকে সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ করতেন। কথা-মৃতের চতুর্থভাগের ষষ্ঠ ও দ্বাদশ খণ্ডে তার কথা আছে।

মণিলাল মল্লিক। ধনী ব্রাহ্ম। রামকৃষ্ণদেবের ভক্ত। সিঁদুরেপটিতে তার বাসগৃহে ব্রাহ্মসমাজের বাৎসরিক উৎসব হত। রামকৃষ্ণদেব আমন্ত্রিত হয়ে সেখানে যোগ দিতেন। কথামৃতে এমন দুটি উৎসবের বর্ণনা আছে (৫।৩।১ ও ১।৮।১৪)।

মনীন্দ্র/মনীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত/খোকা। ১৯৭১-১৯৩৯) পি. গোসাঁইদাস। পরবর্তী জীবনে ইনি ঈশ্বরগুপ্তের সংবাদ প্রভাকর উত্তাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হন। ছেলেবেলায় ১১।১২ বৎসর বয়সে প্রথম রামকৃষ্ণদেবকে দেখেন। তিন বৎসর পর শ্যামপুকুরে অসুস্থ রামকৃষ্ণের সান্নিধ্য পান তিনি। কথামৃতে মণীন্দ্র বা খোকা বলে উল্লেখ (৩।২১।১, ৩।২২।২)।

মথুরবাবু/মথুরামোহন বিশ্বাস। (?-১৮৭১) রানী রাসমণির তৃতীয়া কন্যা করুণাময়ীর সঙ্গে তার বিয়ে হয়। এই সূত্রে সকলে তাকে সেজোবাবু বলতেন। করুণাময়ীর অকালমৃত্যু হলে রানী রাসমণি চতুর্থা কন্যা জগদম্বার সঙ্গে তার

বিয়ে দেন। খুলনার সাতক্ষীরা মহকুমায় তাঁর নিজস্ব জমিদারী ছিল। শ্বশুরের মৃত্যুতে তিনি ঐ সম্পত্তিরও তত্ত্ব বধায়ক হন। প্রকৃতপক্ষে মথুরামোহন ছিলেন সর্বপ্রকারে রামকৃষ্ণদেবের গুণমুগ্ধ। তাঁকে সবদিক থেকে রক্ষা ও পোষণের দায় তিনি গ্রহণ করেন। পণ্ডিত সমাজকে ডেকে তিনিই রামকৃষ্ণের অবতারত্বের প্রতিষ্ঠা করেন। প্রায় চোদ্দ বছর ঠাকুর সেবা ও সংবর্ধনা করে তিনি লোকান্তরিত হন।

মধু ডাক্তার/মধুসূদন ডাক্তার। রামকৃষ্ণদেবকে যারা নানা সময়ে চিকিৎসা করেছেন, তাদের অন্যতম। দক্ষিণেশ্বরের নবীন নিয়োগীর বাড়িতে যাত্রাগান শুনতে গিয়ে রামকৃষ্ণদেব তাকে কাঁদতে দেখেন। অন্য একদিন ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়ে গিয়ে ঠাকুরের হাতের হাড় ভেঙ্গে গেলে মধু ডাক্তার সেখানেই কাঠ এবং ব্যাণ্ডেজ দিয়ে তা বেঁধে দেন। কথামৃতের চতুর্থ ভাগের ২২।৩ ও ১০।৩-এ এ প্রসঙ্গের উল্লেখ আছে।

মধুসূদন দত্ত (মাইকেল)। (১৮২৪-১৮৭৩)। যশস্বী কবি ও নাট্যকার। একটি মামলার পরামর্শের জন্য মথুরামোহনের পুত্র দ্বারিকবাবু মাইকেল মধুসূদন দত্তকে দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে গেলে রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। সেখানে নারায়ণ শাস্ত্রীর সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে তিনি জানান যে তিনি পেটের দায়ে খ্রীষ্টান হন। এ কথা শুনে রামকৃষ্ণ এত ক্ষুব্ধ হন যে মধুসূদন তার কাছে কিছু শুনতে চাইলে তিনি কথা বলেন নি। পুঁথি ও লীলা প্রসঙ্গে অবশ্য দুখানি রামপ্রসাদী গান গেয়ে শোনাবার কথা আছে।

মনোমোহন মিত্র। (১৮৫১-১৯০৩)। পি. রায়বাহাদুর ভুবনমোহন মিত্র, মা-শ্যামাসুন্দরী। রাখালচন্দ্র ঘোষ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) মনোমোহনের ভগ্নিপতি। সুলভ সমাচারে রামকৃষ্ণদেব সম্পর্কে পরে মাসতুতো ভাই রামচন্দ্র দত্তের সঙ্গে ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ঠাকুরের কাছে আসেন। ক্রমে রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা বাড়ে এবং তিনি তাঁর পায়ে আত্মসমর্পণ করেন। এই দুই ভাই তখন থেকে ঠাকুরকে যুগাবতার বলে প্রচার করতে থাকেন। 'তত্ত্বসার' এবং 'তত্ত্ব প্রকাশিকা' নামে দুটি গ্রন্থে মনোমোহন ঠাকুরের উপদেশ প্রচার করেন। কথামৃত থেকে জানা যায় ১৮৮১ সালের ৩ ডিসেম্বর ঠাকুর তার বাড়িতে যান। তাঁর অসুস্থাবস্থাতেও তিনি নানা ভাবে সাহায্য করেন।

মন্মথ। বাগবাজার গোসাঁইপাড়ার ভাড়াটে গুণ্ডা। একবার ঠাকুর এসেছেন যোগীন মার বাড়িতে। যোগীন মার বিরুদ্ধ ছিল তার এক ভাই হীরালাল। সে ঠাকুরকে ভয় দেখাতে পাঠায় মন্মথকে। মন্মথ ঠাকুরকে দেখে এবং কথা বলে বিমোহিত হয়ে কেঁদে সব কথা স্বীকার করে। ঠাকুর তাকে দক্ষিণেশ্বরে নিমন্ত্রণ করেন। সে যায়। ঠাকুরের কৃপাও পায়। ঠাকুরের তিরোধানের পর বরাহনগর মঠেও সে কয়েকবার যায়। এ সময়ে বিসূচিকায় তার মৃত্যু হয়।

মহিমাচরণ চক্রবর্তী। রামকৃষ্ণদেবের গুণগ্রাহী। কাশীপুরে বাড়ি। বেদান্তচর্চা করতেন। রামকৃষ্ণদেব তার কাছে সংস্কৃত শ্লোক শুনতে চাইতেন। কাশীপুরে তিনি সাধনচক্রে বসতেন। এরা ওঙ্কার সাধনের জন্য একতারা যন্ত্র রাখতেন,

শংখও বাজাতেন। কথামৃতে বহুস্থানে তার উল্লেখ আছে।

মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত। (১৪.৭.১৮৫৪-৪.৬.১৯৩২)। পি. মধুসূদন, মা. স্বর্ণময়ী দেবী। চার পুত্র, চার কন্যার মধ্যে মহেন্দ্র তৃতীয়। শিশুকাল থেকে তিনি ধর্মভাবাপন্ন। কৃতিত্বের সঙ্গে বি. এ. পাশ করে বিভিন্ন স্কুলে প্রধান-শিক্ষক পদে কাজ করেন। মেট্রপলিটন স্কুলের শ্যামবাজার ব্রাঞ্চে প্রধান শিক্ষকের পদে যুক্ত থাকাকালে ১৮৮২ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারী তিনি রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে প্রথম দেখা করতে আসেন। অল্প দিনেই তিনি ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে গণ্য হন। তিনি নানা ভাবে ভক্তমণ্ডলী, মঠ ও মিশনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। কিন্তু তার শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত'। ছেলেবেলা থেকে ডাইরী লেখার অভ্যাস তার। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দেখার দিন থেকে দেহত্যাগের সময় পর্যন্ত বিভিন্ন দিনের যে সমস্ত তথ্য তিনি সঞ্চয় করে রেখেছিলেন, সেগুলি চোখের সামনে ধরলেই মনোমধ্যে যেন দৃশ্যগুলি সঞ্জীবিত হয়ে উঠত। তিনি ভাবাবেগে বলে যেতেন। অপরে লিখে নিত। এজন্যই কথামৃত এত জীবন্ত, এত প্রত্যক্ষবৎ। আর তাই লেখা থাকে শ্রীম কথিত। গ্রন্থেও তিনি নিজেকে যথাসম্ভব গোপন রেখেছেন। কোথাও মণি মাস্টার, শ্রীম ইত্যাদি নানা নামের আড়ালে গুপ্ত থেকেছেন।

মহেন্দ্রনাথ গোস্বামী। কলকাতার সিমলে অঞ্চলের বাসিন্দা। ঠাকুরের প্রিয়পাত্র। সংবাদ পেলেই তিনি ঠাকুর যে বাড়িতে যেতেন, সেখানে গিয়ে হাজির হতেন। যদু মল্লিকের বাগান বাড়িতে ভাগবত উৎসবের সময় দুজনের একত্রে থাকবার সুযোগ হয়।

মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় দ্রষ্টব্য।

মহেন্দ্রলাল সরকার। (২.১১.১৮৩৩-২৩.২.১৯০৪)। পি. তারকনাথ। জ. পাইকপাড়া হাওড়া। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে আই.এম.এস ও ১৮৬৩ খ্রীঃ এম ডি উপাধি পান। প্রথমে হোমিওপ্যাথির বিরুদ্ধবাদী হলেও পরে তার মত বদলায়। এবং হোমিওপ্যাথির সমর্থক, প্রচারক ও শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক হিসাবে পরিগণিত হন। তিনি মথুরামোহনের জীবদ্দশায় তার পারিবারিক চিকিৎসক ছিলেন। সেই সূত্রে রামকৃষ্ণদেবের চিকিৎসার জন্য তাঁকে ডাকা হয়। শ্যামপুকুরে ঠাকুরের চিকিৎসা করতে এসে তিনি তার দর্শনীও নিতেন না। একবার ঠাকুরের সমাধ অবস্থায় তাকে পরীক্ষা করে তিনি বিস্মিত হন।

মহেশচন্দ্র সরকার (১৮১৮-১৮৮৭)। ইনি কাশীর একজন বিখ্যাত বীণকর। কাশীতে তীর্থ করতে এসে রামকৃষ্ণদেব একবার তার বীণ শুনতে যান। বাজনা শুনতে শুনতে ঠাকুরের ভাবাবেশ হয়। সে অবস্থায় তিনি বীণা বাদনের সঙ্গে গান গাইতে থাকেন। মহেশচন্দ্র বিস্মিত হয়ে ক্রমে নিজেই ঠাকুরের গানের সঙ্গে মিলিয়ে বীণ বাজাতে থাকেন। বিমুগ্ধ মহেশচন্দ্র, যে কদিন ঠাকুর কাশীতে ছিলেন, সে কদিন তাঁর কাছে ছুটে আসতেন।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত। মধুসূদন দত্ত দ্রষ্টব্য।

মাণিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কামারপুকুরের পাশের গ্রাম ভুরসুবেতে মাণিক চন্দ্রের বাস ছিল। তিনি আঞ্চলিক জমিদার ছিলেন। রামকৃষ্ণদেবের বাবা ক্ষুদিরামের

বন্ধু ছিলেন তিনি। তার আগ্রহে অনেক সময় ক্ষুদিরাম বালক গদাধরকে তার বাড়িতে নিয়ে যেতেন। বালককে নানাভাবে আদর আহ্লাদ করতেন মাণিকচন্দ্র। 'মাণিক রাজা' নামে খ্যাত এই বদান্য মানুষটির আমবাগানে গদাধর বন্ধু-বান্ধব নিয়ে যাত্রাভিনয়ের খেলা করতেন।

যতীন দেব। শোভাবাজার রাজবাড়ির ছেলে। দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণদেবের কাছে যাতায়াত ছিল। রামকৃষ্ণদেব তাকে ভালবাসতেন। ১৮৮৫ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারী স্টারে বৃষকেতুর অভিনয় দেখতে যাবার সময় রামকৃষ্ণদেব যতীন দেবকেও সঙ্গে নেন। অভিনয় দর্শন শেষে ঠাকুর জলখাবার ভাগ করে দেবার সময় নরেনকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলে যতীন দেব ঠাকুরের পক্ষপাতিত্বের প্রতিবাদ করেন। এর ভেতর দিয়ে তার সুরসিক মনের পরিচয় ফুটে ওঠে। কথামৃতে ৫।১৭।৩ পরিচ্ছেদে এই বর্ণনা আছে।

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর। (১৮৩১-১৯০৮)। পাথুরেঘাটার বিখ্যাত জমিদার। তিনি মহারাজা উপাধি পান। যদুমল্লিকের বাগান বাড়িতে ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। 'কর্তব্য কি' এ প্রশ্নের উত্তরে রামকৃষ্ণদেব যা বলেন তা তিনি সংসারীলোকের মুক্তি হওয়া বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করেন। এবং যুধিষ্ঠিরের নরকদর্শনের উদাহরণ দেন। এতে বিক্ষুব্ধ ঠাকুর তাকে কিছু কটু কথা শোনান। হৃদয় তাকে বাধা দেন। পরে আর একবার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়িতে ঠাকুর উপস্থিত হয়েছেন সংবাদ পেয়েও তিনি অসুস্থতার জন্য দেখা করতে আসেন নি।

যদুলাল মল্লিক। (২৯.৪.১৮৪৪-৫.২.১৮৯৪)। কলকাতা পাথুরেঘাটার ধনী মতিলাল মল্লিকের দত্তক পুত্র। যদুলাল নিজে বাগ্মী, ছাত্রবন্ধু, এবং ভগবদ্‌ভক্ত ছিলেন। ১৮৮৩ সালের ২১ জুলাই যদুবাবুর বাড়িতে তাঁর নিত্যসেবিত সিংহবাহিনী মূর্তি দেখতে এসে সমাধিস্থ হন। যদুবাবু এবং তার মা ও মাসী ঠাকুরকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন। ঠাকুরও প্রায়ই তাদের বাগানে বেড়াতে যেতেন। সেখানে এক দেওয়ালে যীশু ক্রোড়ে মাতা মেরীর মূর্তি দেখে রামকৃষ্ণদেব ভাবাবিষ্ট হন। তিনদিন আবিষ্ট থেকে পঞ্চবটীতে তিনি যীশুর দর্শন লাভ করেন। ঐ বাড়িতেই এক গায়কের মুখে চৈতন্যলীলার গান শুনে আকৃষ্ট হয়ে তিনি স্টারে 'চৈতন্যলীলা' নাটকাভিনয় দেখতে যান।

যাদবকিশোর গোস্বামী। নিত্যানন্দের বংশধর। পণ্ডিত। রামকৃষ্ণ অনুরাগী। ইনি একদিন ঠাকুরকে দক্ষিণেশ্বর থেকে খড়দহে এনে শ্রীশ্রীরাধাশ্যামসুন্দরের বিগ্রহ দেখান। সেখানে ঠাকুর প্রসাদ গ্রহণ করেন। ঠাকুর অবশ্য শ্যাম বিগ্রহে কালীমূর্তি দেখেছিলেন বলে কেউ কেউ লিখেছেন।

যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী/স্বামী যোগানন্দ। (৩০.৩.১৮৬১-২৮.৩.১৮৯৯)। পি. নবীনচন্দ্র। বাল্যে দক্ষিণেশ্বরে বাস করেও রামকৃষ্ণদেবকে চিনতেন না। প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশের পর বিবাহ করতে বাধ্য হন। এই সময় কেশব সেনের লেখায় রামকৃষ্ণ সম্পর্কে জানতে পারেন। ভয়ে ভয়েই রামকৃষ্ণদেবের কাছে উপস্থিত হন। রামকৃষ্ণদেবের বাণী তাকে আশ্বাস দেয়। একদিন রাত্রে যোগীন্দ্রনাথ ঠাকুরের

কাম পরীক্ষা করতে অগ্রসর হয়। 'কাম' মিথ্যা প্রমাণিত হয়। কিন্তু যোগীন ধরা পড়ে। রামকৃষ্ণদেব গুরুকে সর্বপ্রকারে পরীক্ষা করে নেবার এ প্রবণতাকে প্রশংসা করেন। কাশীপুরে যতীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে প্রাণপণে সেবাযত্ন করে। পরে শ্রীমার সঙ্গে বৃন্দাবন বাস কালে শ্রীমার কাছে মন্ত্রদীক্ষা নেন। ১৮৮৭ সালে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। পরবর্তী সময়ে সংঘ ও মিশনের কাজে জীবন ব্যয় করেন। সন্ন্যাস অবস্থায় তার নাম হয় যোগানন্দ।

যোগীন মা। (১৬.১.১৮৫১-৪.৬.১৯২৪)। পি. প্রসন্নকুমার মিত্র। জন্ম. বাগবাজার কলকাতা। দ্বিতীয় পক্ষের দ্বিতীয় কন্যা। স্বামী অত্যাচারী ছিলেন। ফলে পিত্রালয়ে চলে আসেন। একপুত্র আগেই মারা যায়। সঙ্গে আনেন এক কন্যা। নাম গণু। এজন্য কথামৃতে (৩।১৯।১-২) তাকে গণুর মা বলা হয়েছে। তিনি মামাশ্বশুর বলরামবাবুর বাড়িতেই রামকৃষ্ণদেবকে প্রথম দেখেন। তিনি পূর্বেই কুলগুরুর কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন। কিন্তু ধ্যানে বসলে শ্রীমা ও ঠাকুরকে দেখতেন। রামকৃষ্ণের তিরোধানের পর তিনি কঠোর তপে তাঁর দর্শন পান। শ্রীমা বলতেন মেয়েদের মধ্যে যোগীন জ্ঞানী। তিনি স্বামী সারদানন্দের কাছে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ভারতের সমস্ত তীর্থ ঘুরেছিলেন তিনি। নিবেদিতার **Cradle Tales of Hinduism** এবং স্বামী সারদানন্দের লীলাপ্রসঙ্গ রচনায় যোগীন মার স্মৃতি ছিল মস্ত সহায়।

রতির মা। কর্তাভজা সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবী। বৈষ্ণবচরণ দাসের শিষ্যা। তিনি পাইক-পাড়ার রাজা লালাবাবুর স্ত্রী কাত্যায়নীদেবীর সহচরী ছিলেন। অতি শুদ্ধাচারে জীবনযাপন করতেন। মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরেও আসতেন। একদিন কালীর প্রসাদ খেতে দেখেন রামকৃষ্ণদেবকে। সেই থেকে বৈষ্ণবী রতির মা আর দক্ষিণে-শ্বরে আসতেন না। ঠাকুর একদিন দেবীকে রতির মার বেশে দেখেন। তিনি ঠাকুরকে 'ভাবে' থাকতে বলেন। কথামৃতে ৪।১৫।১, ৫।১২।১ ও ৪।১।২। পরিচ্ছেদে রতির মার কথা আছে।

রাখাল/রাখালচন্দ্র ঘোষ। স্বামী ব্রহ্মানন্দ দ্রষ্টব্য।

রাখাল হালদার। বহুবাজারের বাসিন্দা এক ডাক্তার। ঠাকুরের শেষ অসুস্থতার সময় যারা চিকিৎসা করেন। তাদের একজন।

রাজমোহন। কলকাতা সিমলা অঞ্চলের ব্রাহ্ম। ঠাকুরভক্ত। তার বাড়িতে নরেন্দ্র প্রভৃতি যুবকেরা ব্রাহ্ম উপাসনা করে শুনে ১৮৮২ সালের ১৬ নভেম্বর সন্ধ্যার পর রামকৃষ্ণদেব স্বয়ং সেখানে উপস্থিত হন। কথামৃতে ৫।২।৩ পরিচ্ছেদে উল্লেখ আছে।

রাজেন্দ্রলাল দত্ত। (১৮১৮-১৮৮৯)। সেকালের বিখ্যাত ডাক্তার। মহেন্দ্রলালের মত তিনিও প্রথমে এলোপ্যাথি মতে চিকিৎসা করতেন। পরে হোমিওপ্যাথিতে বিশ্বাসী হন। মহেন্দ্রসরকারের সমর্থক ও অনুপ্রেরণাদাতা ছিলেন। রামকৃষ্ণ-দেবের চিকিৎসকদের মধ্যে তিনিও একজন। প্রীতিবশে তিনি ফলাদি সংগ্রহ করে আনতেন। এক সময় তিনি ঠাকুরকে একজোড়া মখমলের চটি উপহার দেন। সে

চটি আজও বেলুড় মঠে পূজিত হয়।

রানী রাসমণি (১৭৯৩-১৯.২.১৮৬১)। পি. হরেকৃষ্ণ দাস, কৃষিজীবী, মাহিষ্য। মা. রামপ্রিয়া। বাল্যে সামান্য লেখাপড়া শেখেন। অসামান্য রূপবতী ছিলেন। ১১ বছর বয়সে কলকাতার বিশিষ্ট ধনী প্রীতিরাম মাড়ের পুত্র রামচন্দ্রের সঙ্গে বিয়ে হয়। তার আগমনে স্বামীকুলের ঐশ্বর্য বাড়ে। স্বামী রায়বাহাদুর উপাধি পান, জমিদারী হয়। তাঁর চার কন্যা—পদ্মমণি, কুমারী, করুণাময়ী ও জগদম্বা। ১৮৩৬ সালে রামচন্দ্র পরলোকগমন করেন। রানী জামাতাদের সাহায্যে সুদক্ষ ভাবে জমিদারী পরিচালন করতে থাকেন। তৃতীয় জামাতা মথুরামোহন এবিষয়ে রানীর দক্ষিণহস্ত ছিলেন। করুণাময়ীর মৃত্যু হলে রানী কনিষ্ঠা কন্যাকেও মথুরামোহনকে অর্পণ করেন। তীক্ষ্ন বিষয়-বুদ্ধি, জনহিতকর কর্ম এবং ধর্ম-চর্চার প্রতি আকর্ষণে রানী এক অসাধারণ চরিত্র। সিপাহী-বিদ্রোহের ডামা-ডোলে তিনি প্রচুর কোম্পানীর কাগজ সস্তায় কিনে প্রচুর অর্থাগম করেন আবার গঙ্গার জলকর রহিত করার ব্যাপারে সরকারের সঙ্গে বিরোধ করে প্রচুর অর্থ অকাতরে ব্যয় করেন। অযাচিত দান, রাস্তাঘাট নির্মাণ, প্রজাদের অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা ইত্যাদি তার অননুকরণীয় চরিত্র লক্ষণ। তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি দক্ষিণেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠা। স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে তিনি এ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু তিনি অব্রাহ্মণ বলে সেকালের পণ্ডিতেরা তাঁকে মন্দির প্রতিষ্ঠায় বাধা দিয়েছিলেন। রামকৃষ্ণদেবের অগ্রজ রামকুমারের পৌরোহিত্যে ৩১ মে ১৮৫৫ তারিখে স্নানযাত্রার দিনে মহাসমারোহে সেই মন্দিরে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হয়। প্রথমে রাম-কুমারই নিত্য পূজার দায় নেন। পরে রামকৃষ্ণদেব ঐ দায় নিয়েছিলেন। এই সময় থেকে রাসমণি রামকৃষ্ণদেবের সমর্থক ও পোষক। তার রীতিবিরুদ্ধ কার্য-কলাপে অন্য কর্মচারীরা বিক্ষুব্ধ হলেও, রানীর সমর্থনে রামকৃষ্ণের বিরুদ্ধে কারো কিছু করা বা বলার সাধ্য ছিল না। এমনকি রামকৃষ্ণদেবের গান শুনতে শুনতে রানী অন্যমনস্ক হলে, এখানে বসেও বিষয়চিন্তা বলে রামকৃষ্ণ তার গালে চড় মারলে সবাই যখন উত্তেজিত, তখনও রানী অনুতপ্ত চিত্তে রামকৃষ্ণের শাসনকে মেনে নেন এবং তাঁর মহত্ত্বে আরও বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। ঠাকুরের মতে রানী রাসমণি জগন্মাতার অষ্টনায়িকার অন্যতমা। মাতৃপূজার পুনঃ প্রচারার্থে তার জন্ম।

রাধানাথ রায়। পি. জগদীশ। কৈশব সেনের ভাই কৃষ্ণবিহারীর সহপাঠী। ১৮৭১ খ্রী. এম. এ. পাশ করেন। পাশের সংবাদ বের হবার পরদিন সগর্বে দক্ষিণেশ্বরে আসেন। কিন্তু রামকৃষ্ণদেবের সাহচর্যে ভক্ত হয়ে যান।

রামকবিরাজ। কথামৃতে ২।১০।৫ পরিচ্ছেদে তার উল্লেখ আছে। ইনি ঠাকুরের পেটের অসুখের সময় দক্ষিণেশ্বরে তাকে দেখতে আসেন।

রামকুমার চট্টোপাধ্যায়। (১৮০৯-১৮৫৭) পি. ক্ষুদিরাম। জ. দেরেগ্রাম। সংস্কৃত কাব্য সাহিত্য ব্যাকরণ ও জ্যোতিষে পণ্ডিত। ১৮৫০ সালে রামকুমার কলকাতায় এসে ঝামাপুকুরে এক টোল খোলেন। বছর দুই পরে ভাই গদাধরকেও কলকাতায় আনেন। তার সমর্থনে ও শাস্ত্রীয় বিধানে এবং তার পৌরোহিত্যে রানী রাসমণির

দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হয়। প্রথমে তিনিই নিত্য পূজার দায় গ্রহণ করেন। পরে ভাই গদাধর সব কাজের দায় নিলে তিনি শ্যামনগর মূলজোড়ে গিয়ে সান্নিপাতিক জ্বরে দেহত্যাগ করেন।

রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। দক্ষিণেশ্বরে রাধাকান্তদেবের পূজক। আলমবাজার তার বাড়ি ছিল। রামকৃষ্ণদেব তার তত্ত্বাবধানে পূজা করতেন। কথামৃতে ৪।১৬।৩ পরিচ্ছেদে তার উল্লেখ আছে।

রামচন্দ্র দত্ত। (৩০.১০.১৮৫১-১৭.১১.১৮৯৯) পি. নৃসিংহপ্রসাদ, মা, তুলসীমণি। বাল্যে ভক্তিভাব থাকলেও যৌবনে বিজ্ঞান চর্চার বশে ঘোর যুক্তিবাদী ও নাস্তিক। কুরচির ছাল থেকে 'কুরচিসিন' নামে আমাশয়ের ওষুধ আবিকার করে বিখ্যাত হন ও প্রচুর অর্থোপার্জন করেন। এক কন্যার মৃত্যুতে অশান্ত হৃদয়ে মাসতুত ভাই মনোমোহন মিত্রের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে এসে রামকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হন। স্বপ্নে রামকৃষ্ণের কাছ থেকে মন্ত্র পান। কিন্তু তার মনে সন্দেহ জন্মাতে থাকে। একদিন ঠাকুর এ জন্য তাকে মৃদু ভৎসান করে মন্ত্র ফিরিয়ে নেন এবং তাকেই ইষ্ট বলে ধ্যান করতে বলেন। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে বৈশাখী পূর্ণিমায় ফুলদোলের দিন ঠাকুর তার বাড়ি যান। এরপর থেকে দুই ভাই তাঁকে অবতার বলে প্রচার শুরু করেন এবং ঠাকুরের উপদেশাবলী একত্রিত করে 'তত্ত্বসার' ও 'তত্ত্বপ্রকাশক নামে দুটি গ্রন্থ প্রচার করেন। শেষ জীবন রামকৃষ্ণবিষয়ক বক্তৃতা, গ্রন্থরচনা ইত্যাদিতে কাটে। রামচন্দ্র বিবেকানন্দের দূর সম্পর্কের দাদা, বাল্যে এক সময় বিশ্বনাথ দত্তের (বিবেকানন্দের পিতা) বাড়িতেও তিনি ছিলেন।

রামতারণ। কথামৃতে ৪।২৭।৩ এর উল্লেখ আছে। তিনি গিরিশচন্দ্রের স্টারে যুক্ত ছিলেন। ১৮৮৫ সালের ২৩ অক্টোবর শ্যামপুকুরে বাসায় তিনি ঠাকুরকে গান গেয়ে শোনান।

রাম মল্লিক। কথামৃতে ৩।১৭।২ পরিচ্ছেদে শিহড় গ্রামবাসী এই সহপাঠীর উল্লেখ শোনা যায় রামকৃষ্ণের মুখে।

রামলাল চট্টোপাধ্যায়। (১৮৬০-১৯৩৪) রামকৃষ্ণদেবের মধ্যম ভাই রামেশ্বরের বড় ছেলে। কাকা তাকে আদর করে রামনেলো বলতেন। তার পিতা রামেশ্বরের মৃত্যুর পর রামলাল দক্ষিণেশ্বরে এসে ৺ভবতারিণীর পূজকপদ গ্রহণ করে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সে এ পদে ছিল। রামলাল রামকৃষ্ণদেবের মতো নাচতে গাইতে পারতেন। ঠাকুর কল্পতরু হয়ে তাকেও কৃপা করেন। রামকৃষ্ণদেবের মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারী হিসাবে সকলে তার নেতৃত্ব চায়। কিন্তু তার সে যোগ্যতা ছিল না। বিশেষত খুড়িমা শ্রীমার প্রতি তার অবজ্ঞা সকলের কাছে অসহনীয় ছিল। তার স্মৃতি কথা অবলম্বন করে তার পুত্র হরিহর চট্টোপাধ্যায় 'শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণদেব স্মৃতিকথা' নামে এক গ্রন্থরচনা করেন।

রামেশ্বর চট্টোপাধ্যায় (১৮২৬-৭৩)। রামকৃষ্ণদেবের মধ্যম ভ্রাতা। পিতা রামেশ্বর থেকে ঘুরে আসবার পর জন্ম বলে ঐ নাম রাখা হয়। চির উদাসীন রামেশ্বর লেখাপড়া শিখেও যথেষ্ট উপার্জন করতে পারতেন না। তিনি জীবনের শেষ চার বছর দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দিরের পূজক দিলেন। তার মৃত্যুতে তার

স্থলাভিসিক্ত হয় তার পুত্র।

রাসমণি রানী। রানী রাসমণি দ্রষ্টব্য।

রাখালণী। ইনি পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণস্মৃতি কথকদের একজন। কামারপুকুরে রামকৃষ্ণদেবের বাল্যলীলা, এবং ভৈরবী ব্রাহ্মণী ও শ্রীমা পর্ব দেখেন। 'লীলা-প্রসঙ্গে' বহুকথা এর কাছ থেকে সংগৃহীত।

লক্ষ্মীনারায়ণ মারোয়াড়ী। ৪।২১।৪ পরিচ্ছেদে কথামৃতে এর উল্লেখ আছে। ইনি ঠাকুরকে দশ হাজার টাকা লিখে দিতে চেয়েছিলেন। শোনামাত্র ঠাকুর মূর্চ্ছিত হন। মূর্চ্ছাভঙ্গের পর বলেন, তিনি যে অবস্থায় আছেন, তাতে টাকা ছোঁয়া চলে না।

শম্ভুচরণ মল্লিক। (?-১৮৭৭) পি. সনাতন মল্লিক। বণিককুলে জন্ম। সিঁদুরে পাটির বাড়িতে জন্ম। ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন। তিনি কেশব সেনকে ঠাকুরের কাছে গিয়ে আসেন। কথামৃতে ৫।৩।২ দ্রষ্টব্য। পরবর্তী জীবনে ঠাকুরের রসদদার। শম্ভুবাবু রামকৃষ্ণদেবকে বাইবেল ও যীশু সম্পর্কে অবহিত করেন। তিনি এবং তার স্ত্রী ঠাকুর ও শ্রীমার সুখসুবিধার দিকে বিশেষ নজর রাখতেন। দক্ষিণেশ্বরের নহবতে শ্রীমার থাকতে অসুবিধা দেখে তিনি কাছেই জমি কিনে বাড়ি করে দেন। শম্ভু মল্লিক শেষ জীবনে ঠাকুরের রসদদার। মূত্র রোগে ভুগে অসুস্থ হলে ঠাকুর দেখে এসে বলেন, শম্ভুর প্রদীপে তেল নেই। কথামৃতে বহু-স্থানে তার উল্লেখ আছে।

শরচন্দ্র মিত্র। আড়িয়াদেহের বাসিন্দা। ব্যায়াম ও কুস্তি চর্চা করত। দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ির দারোয়ানদের সঙ্গে কুস্তি লড়তে আসত। প্রায়দিনই তাকে হারতে হত। একদিন ঠাকুরের পরামর্শ মত লড়ে তিনি হারিয়ে দেন তার শক্তিশালী হিন্দুস্থানী প্রতিদ্বন্দ্বীকে। ঠাকুর খুশি হয়ে তাকে ডেকে এনে মিঠাই খাওয়ান। এর পর থেকে তিনি তাকে বাঙালীর বীর ছেলে বলে উল্লেখ করতেন।

শশধর তর্কচূড়ামণি। (১৮০৫-১৯২৮) পি· হলধর বিদ্যামণি, মা. সুরেশ্বরীদেবী। জ. ফরিদপুর মুখডোবাগ্রাম। বৈদিকচতুর্বেদী কশ্যপ বংশ। পিতার নিকট শাস্ত্রীয় শিক্ষা। অধ্যাপনা। হিন্দুধর্মপ্রচারে নানাস্থানে ভ্রমণ। শেষ বয়সে কাশিমবাজারের জমিদার অন্নদাপ্রসাদ রায়ের সভাপণ্ডিত হন এবং মুর্শিবাদের খাগড়ায় বাড়ি তৈরী করে বাস করতে থাকেন। ১৮৮৪ সালে তিনি কলেজ স্ট্রীটে কিছুদিন বাস করেন। সেই সময় ২৫ জুন রথযাত্রার দিন ঈশান মুখোপাধ্যায়কে সঙ্গে করে রামকৃষ্ণদেবে তার কাছে আসেন। সেদিনের কথাবার্তায় আকৃষ্ট হয়ে শশধর এক সপ্তাহের মধ্যে (৩০।৬) দক্ষিণেশ্বর উপস্থিত হন। ঠাকুর সেদিন তার সম্পর্কে বলেন ডাইলিউট হয়ে গেছে। (কথামৃত ৩।৯।৬)। শুষ্ক বক্তৃতার বিরুদ্ধে শুনতে শুনতে শশধর বক্তৃতা দেওয়া বন্ধ করেন।

শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। (১৮৪০-১৯২৫) পি. রাজকুমার। জ. চব্বিশপরগণার বরাহনগর। ব্রাহ্ম। উচ্চ সরকারী কর্মচারী। বিলাত যান। বিপত্নীক হয়ে বিধবা

বিবাহ করেন। বরাহনগর বিধবা আশ্রম ও মহিলা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ১৮৭৩ সালে শম্ভুনাথ মল্লিকের বাড়িতে প্রথম ঠাকুরকে দেখেন। তিনি প্রায়ই রামকৃষ্ণদেবের কাছে যেতেন। পরবর্তী কালে তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

শশিভূষণ ঘোষ। বাগবাজার নিবাসী। ডাক্তার। তিনি রামকৃষ্ণদেবকে দীর্ঘকাল কাছ থেকে দেখেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরিত নামে তিনি এক গ্রন্থ রচনা করেন। তাতে লেখকের নাম ছিল না। ছিল শ্রীমুখ কথিত।

শিবনাথ শাস্ত্রী। (৩১.১.১৮৪৭—৩০.৯.১৯১৯) পি. হরানন্দ ভট্টাচার্য, মা. গোলোকমণি। জ. চাঙ্গড়িপোতা, ২৪-পরগণা মামাবাড়ি। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী তার সহপাঠী। সোমপ্রকাশ পত্রিকার সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ তার মামা। এম. এ পাশ করে শাস্ত্রী উপাধি পান। ব্রাহ্ম সমাজের প্রভাবে এসে ১৮৬৯ সালে কেশবসেনের পৌরোহিত্যে 'ভারতীয় ব্রাহ্মসমাজ' গঠন করেন। উপবীত ত্যাগ করায় পিতা ত্যাজ্য পুত্র করেন। সাউথ সুবার্বান স্কুলের প্রধান শিক্ষক পদে থাকবার সময় ইন্ডিয়ান মিরার পত্রিকার পড়ে এবং আর একজন ব্রাহ্মভক্তের কাছে শুনে প্রথম রামকৃষ্ণদেবকে দেখতে যান। তিনি একদিন একজন পাদরি বন্ধুকেও দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে গিয়ে ছিলেন। এই সময় কেশব সেনের মেয়ের বিয়ে উপলক্ষ্যে গোলযোগ উপস্থিত হলে কলকাতা টাউন হলে সভা ডেকে 'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ' গঠন করেন। এ সময়ে নরেন্দ্রনাথ ও রাখালচন্দ্রও তার সঙ্গী ছিলেন। তিনি আজীবন এই প্রতিষ্ঠানে যুক্ত থাকেন। রামকৃষ্ণদেবের অন্তিম অসুখের সময় তিনি ঠাকুরকে দেখতে আসেন। কথামৃতে বহুবার তার প্রসঙ্গের উল্লেখ আছে। শাস্ত্রী মশাই নিজেও তার গ্রন্থে রামকৃষ্ণদেবের প্রভাব স্বীকার করেছেন। যদিও তিনি রামকৃষ্ণের ভাবসমাধিকে আবেগ-জনিত মূর্চ্ছা বলে বর্ণনা করেছেন। এমন কি তিনি তাঁর মস্তিষ্ক বিকৃতিও আবিষ্কার করেন। গিরিশচন্দ্রাদির অবস্থিতিও তিনি সুনজরে দেখতেন না।

শিবানন্দ স্বামী। তারকনাথ ঘোষাল দ্রষ্টব্য।

শ্যামাপদ ভট্টাচার্য, ন্যায়বাগীশ। হুগলী জেলার আটপুরের বাসিন্দা। বহু শাস্ত্র পাঠ করেও তৃপ্ত না হয়ে, পরমার্থ লাভের আশায় ১৮৮৫ সালের ২৭ আগষ্ট দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণদেবের কাছে আসেন। গঙ্গার ঘাটে আহ্নিকে বসে বারংবার রামকৃষ্ণের মূর্ত্তি দেখে বিস্মিত হন। তৎক্ষণাৎ তিনি উঠে গিয়ে ঠাকুরের স্মরণাপন্ন হন। কথামৃতে ৪।২৫।১ ও ৪।২৬।১-এ এই প্রসঙ্গে বর্ণনা আছে।

শ্রীনাথ ডাক্তার। রামকৃষ্ণদেবের শেষ অসুস্থতার অন্যতম চিকিৎসক। কথামৃতের ৩।২৬।২ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীনাথ মিত্র। পি. কাশীশ্বর মিশ্র। আদি ব্রাহ্মসমাজ ভুক্ত। ১৮৮২ সালের ডিসেম্বরে প্রথম দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণদেবের সান্নিধ্য আসেন। পর বৎসর ২মে এদের বাড়িতে যে ব্রাহ্মঅনুষ্ঠান হয় তাতে রামকৃষ্ণদেব নিমন্ত্রিত ছিলেন। এই সময় রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদিও সম্ভবতঃ উপস্থিত ছিলেন। কথামৃত ৫।৩।২ ও ৪।৪।১-এ এ প্রসঙ্গ আছে।

শ্রীনিবাস শাঁখারী। চিনে শাঁখারী দ্রষ্টব্য।

সৌরিন্দ্রমোহন ঠাকুর। (১৮৪০-১৯১৪) পি. হরকুমার। পাথুরেঘাটার ঠাকুর বংশের রত্ন। রাজা ও স্যার উপাধি পান। কাপ্তেন বিশ্বনাথের সঙ্গে রামকৃষ্ণদেব এর বাড়ি গিয়ে ছিলেন।

হরমোহন মিত্র। নরেন্দ্রনাথের সহপাঠী এবং ঠাকুরের ভক্ত। কথামৃতে তার উল্লেখ আছে ৩।১৬।১ ও ৪।১৫।৩-এ। আজীবন রামকৃষ্ণ-অনুরক্ত ও নরেন্দ্র-প্রিয়। চিকাগো বক্তৃতার পর স্বামীজি এ'কেই প্রথম পত্রিকার কাটিং পাঠান।

হরিপদ। রামকৃষ্ণদেবের এই ভক্তটি বাগবাজারের মহেন্দ্রনাথ ও তার ভাই প্রিয় নাথের সঙ্গে প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে যেতেন। রামকৃষ্ণদেব তার ভক্তিকে উৎপেতে ভক্তি বলেছেন। দ্রঃ কথামৃত ৩।১৪।৪।

হরিপদ ঘোষ। মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে আসেন। কথকতা জানতেন। ধ্যান করতেন। চক্ষু আরক্ত থাকত। ১৮৮৩ সালের ২০ আগষ্ট প্রথম দর্শন। একে উপলক্ষ্য করেই কুমড়োকাটা বড়ঠাকুর ইত্যাদি উপদেশ।
কথামৃত ৩।৫।১ দ্রষ্টব্য।

হরিবল্লভ বসু। রামকৃষ্ণদেবের ভক্ত বলরাম বসুর জ্যাঠতুত ভাই। 'বলরাম মন্দির'-এর প্রকৃত মালিক ছিলেন। বলরামের রামকৃষ্ণপ্রীতি তার অনেক আত্মীয় ভাল নজরে দেখতেন না। তারা রায়বাহাদুর হরবল্লভকে কটকে নানা কটূক্তি জানাল। ফলে উকিল সাহেব সরেজমিনে তদন্তে আসেন এবং ১৮৮৫ সালের ৩১ অক্টোবর শ্যামপুকুরের বাসায় তাদের প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে। সপ্তাহ খানেক পর আবার উভয়ের সাক্ষাৎ হয়। আর একদিন বলরাম মন্দিরে উভয়ে উভয়ের দিকে তাকিয়ে শুধুই কাঁদেন। বাক্‌বিনিময় হয় নি। কথামৃতে ৩।২২।২ পরিচ্ছেদে হরবল্লভের কথা আছে।

হরিশচন্দ্র মুস্তাফী। ইনি রামকৃষ্ণদেবের গৃহী ভক্ত দেবেন্দ্র মজুমদারের মামা। ইনি ১৮৮৬ সালের ১ জানুয়ারী কাশীপুর বাগান বাড়িতে প্রথম রামকৃষ্ণদেবের কৃপা পান। তারপর তিনি নীচে নেমে এসে বাগানে কল্পতরু হল।

হলধারী। প্রকৃত নাম রামতারক চট্টোপাধ্যায়। রামকৃষ্ণদেবের খুল্লতাত কানাই-রাম চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ঠাকুর হলধারী বলে ডাকতেন। সাধক অবস্থায় যখন তিনি বিধিমত পুজার্চনা পারছেন না, সেই সময় হলধারী কলকাতার আসেন জীবিকার সন্ধানে। জানতে পেরে মথুরবাবু তাকে দক্ষিণেশ্বরে কাজ দেন। তিনি রামকৃষ্ণদেবের সাধনা ও জীবনের বহু অংশের প্রত্যক্ষদর্শী। তিনি সিদ্ধবাক্‌ ছিলেন। তিনি রামকৃষ্ণের অবতারত্বে বিশ্বাস করতেন না। শেষ পর্যন্ত তার এ অবিশ্বাস যায় কিনা; বোঝা যায় না। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরে ছিলেন। কথামৃতে বহুবার তার প্রসঙ্গ এসেছে।

হাজরা। প্রতাপচন্দ্র হাজরা দ্রষ্টব্য।

হীরানন্দ। কথামৃতে একবার তার প্রসঙ্গ আছে (১।২৭।৫)। সিন্ধু দেশীয় পণ্ডিত ও ভক্ত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এ পাশ করেন ছাত্রাবস্থায়

কেশব সেন ও রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে পরিচিত হন। মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে রাত্রি যাপনও করেছেন। রামকৃষ্ণদেবের অন্তিম অসুস্থতায় দেখাও করতে আসেন।

হৃদয়। (১৮৩৮-১৮৯৯) পুরো নাম হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায়। রামকৃষ্ণদেবের পিসতুতো বোন হেমাঙ্গিনীর তৃতীয় পুত্র। শিহড় গ্রামে এদের বাড়ি। হৃদয় দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে থেকে পঁচিশ বছর যত্নের সঙ্গে সেবা করেছিল। সাধকাবস্থায় হৃদয় না থাকলে ঠাকুরের দেহ ধারণই অসম্ভব হ'ত—এ মত তিনি নিজেই প্রকাশ করেছেন। বয়সে তিনি ছিলেন মামার চেয়ে দুবছরের ছোট। ১৮৮১ সালে মথুরবাবুর মধ্যম পুত্র ত্রৈলোক্যনাথের বিরাগ ভাজন হয়ে কর্মচ্যুত হন। প্রথমে কিছুদিন তিনি কাছেই যদুলাল মল্লিকের বাড়িতে থাকতেন। ঠাকুর তার প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র পাঠিয়ে দিতেন। এক সময় তাকে কাপড় বিক্রি করতেও দেখা গেছে। পরবর্তী সময়ে হৃদয়রাম ঠাকুরের জীবন সম্পর্কে বহু তথ্য জানিয়েছেন।

● গ্রন্থপঞ্জী ●

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ (১ ও ২ খণ্ড) স্বামী সারদানন্দ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি—অক্ষয়কুমার সেন।

উদ্বোধন পত্রিকা।

History of the Ramakrishna Math and Mission
—Swami Gambhirananda.

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা অভিধান—কালীজীবন সেনশর্মা।

বাঙালী চরিতাভিধান—সংসদ প্রণীত।

জীবনীকোষ—শশীভূষণ বিদ্যালঙ্কার।

ভারতকোষ (পাঁচ খণ্ড) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্।

সরল বাংলা অভিধান—সুবলচন্দ্র মিত্র।

রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—শিবনাথ শাস্ত্রী

ভারতের সাধক—শঙ্করনাথ রায়।

মহেন্দ্রনাথ দত্ত : জীবনী ও মনীষা—সুনীলবিহারী ঘোষ সম্পাদিত

বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ (১-৩ খণ্ড) শঙ্করীপ্রসাদ বসু।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্গরঙ্গমঞ্চ—নলিনী রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (১-৫ খণ্ড) শ্রীম কথিত।

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।